সাইয়েদ কুতুব শহীদ
তাফসীর
ফী যিলালিল
কোরআন
৬ষ্ঠ খন্ড
কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
AL-QURAN ACADEMY LONDON
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৬ষ্ঠ খন্ড

সূরা আল আনয়াম

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন

(৬ষ্ঠ খন্ড সূরা আল আনআম)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
১২৪ হোয়াইটচ্যাপল রোড (দোতলা) লন্ডন ই১ ১জে ই, ইউকে
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭৬৫০ ৮৭৭০, ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবা: ০৭৫৩৯ ২২৪ ৯২৫, ০৭৯৫৬ ৪৬৬ ৯৫৫

বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬

বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ (৩৬২) ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট, দোকান নং ২১৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩ ৯৯৭

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৭

৯ম সংস্করণ
যিলহজ্জ ১৪৩১ নবেম্বর ২০১০ কার্তিক ১৪১৭

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer

'Fi Zilalil Quran'

Author

Syed Qutb Shaheed

Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition

Hafiz Munir Uddin Ahmed

6th Volume

(Surah Al Anaam)

Published by
Khadija Akhtar Rezayee
Director Al Quran Academy London
124 Whitechapel Road (1st Floor) London E1 1JE, UK
Phone & Fax : 0044 020 7650 8770, 020 7274 9164 Mob : 07539 224 925, 07956 466 955

Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526

Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor) Mogbazar, Dhaka
38/3 Computer Market, Stall No- 215, Bangla Bazar, Dhaka-1100
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363 997

1st Edition
1997
9th Edition
Zi'l Hajj 1431 November 2010

Price Tk. 250 .00

E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-010-8

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক–এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়- হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত- এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা ইতিমধ্যেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে ঊর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'-'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি-তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ—আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্‌র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তো আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা– কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরায় আল আনয়াম

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কোরআনুল কারীমের যে সকল সূরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিলো সেইগুলোকে মক্কী সূরা বলে। মক্কী জীবনের সময়কাল ছিলো পূর্ণ তেরো বছর। এ সূরাগুলোতে একটি মাত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়ে পরিবর্তন না হলেও বিষয়টিকে বিভিন্ন আংগিকে পেশ করা হয়েছে। আল কোরআনের অন্যমত বৈশিষ্ট্য এবং পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো কথা বা বিষয় একাধিকবার পেশ করা হলেও প্রতি বারেই নতুন এক ভাষা ও ভংগিতে পেশ করা হয়, যার ফলে প্রত্যেকটি সূরা পাঠকের কাছে বিষয়সহ প্রতি বারেই নতুন মনে হয়।

প্রথম যে বিষয়টির ওপর কোরআনুল কারীমের আলোচনা শুরু হয়েছে তা হচ্ছে এই- 'দ্বীন'-এর জন্যে সব থেকে বড় এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয় হচ্ছে 'আকীদা বিশ্বাস'। এটাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা যায়। এ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা প্রভুত্ব ও মানুষের দাসত্ব এবং প্রভু ও তার গোলামের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়।

এ বিষয়ের আলোচনায় গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ মানুষই- তা সে যে কোনো এলাকার হোক না কেন। আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করায় সে আরবী, কিন্তু মানুষ হিসাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের সাথে তার একটা মানবীয় সম্পর্ক সব সময়েই থাকবে।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, আসল বিষয় হচ্ছে 'মানুষ'- যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ সৃষ্টির বুকে তার অস্তিত্ব আসল বিষয় এবং এখান থেকে জীবন শেষে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও মানুষের বিষয়। সৃষ্টির সব কিছু এবং সকল প্রাণীর সাথে সম্পর্কের বিষয়টিও মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সকল সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যে সম্পর্ক সেও মানুষকেই কেন্দ্র করে। এ এমন একটি বিষয়, যার কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ গোটা সৃষ্টির মূল ব্যাপার-ই হচ্ছে মানুষ।

আল কোরআনের এই মক্কী সূরাটি সেই মানুষকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। মানুষকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টির সব কিছু আবর্তিত হচ্ছে এবং মানুষের জীবনের ব্যাখ্যা দানই এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরাটির মধ্যে প্রধান জিজ্ঞাসা মানুষকে কেন্দ্র করেই, সে কে? কোত্থেকে এসেছে সে? কেমন করে এলো? কেন এলো? এ জীবন শেষে সে কোথায় যাবে? 'না' থেকে তাকে অস্তিত্বে কে নিয়ে এলো? কে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে এবং কোথায় নিয়ে যাবে? যে ধরণীকে সে অনুভব করছে এবং দেখছে তা কী জিনিস? আল কোরআন তাকে এসব প্রশ্নের খোলামেলা ও বাস্তবসম্মত জবাব বলে দিচ্ছে। আর তার দৃষ্টির অন্তরালে যা কিছু আছে, সে একমাত্র অনুভূতি দিয়েই তা বুঝতে পারে কিন্তু দেখতে পায় না। তাই বা কী জিনিস? এই রহস্যাবৃত সৃষ্টিকে কে অস্তিত্ব দান করলো? কে এসব কিছুর ব্যবস্থাপনা করছে এবং কেই বা পরিচালনা করছে এসব কিছুকে? কে আনছে এর মধ্যে নতুনত্ব এবং কেই বা তাকে সামনের দিকে অবিরামভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে? আর এমনিভাবে কোরআন তাকে আরও বলছে কিভাবে এ সৃষ্টির সাথে ও তার স্রষ্টার সাথে তার যোগাযোগ হচ্ছে এবং বান্দা তার স্রষ্টার সাথে কিভাবেই বা যোগাযোগ করে চলেছে?

এই সব প্রধান প্রধান বিষয় নিয়েই মানুষের অস্তিত্ব টিকে আছে। আর সর্বকালে এইগুলো হচ্ছে প্রধান সেই সব বিষয়, যার ওপর নির্ভর করছে গোটা সৃষ্টি।

এইভাবে পূর্ণ তেরোটি বছর ধরে মানুষের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বড় বড় সমস্যা নিয়েই আল কোরআনের অবতারণা এবং এই সব বিষয় সমাধান করার কাজে এ মহাগ্রন্থ নিয়োজিত থেকেছে। মানুষের জীবনের ছোট বড় সকল সমস্যাই আল কোরআনের বিবেচ্য বিষয়।

তবে, কোরআনুল কারীম মানুষের মৌলিক এসব বিষয়াদির সীমা পেরিয়ে ততোদিন পর্যন্ত জীবনের শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়নি, যতোদিন না এর জন্যে পরিবেশ

সৃষ্টি হয়েছে এবং বাস্তবিকই এর প্রয়োজন হয়েছে। অতপর গোটা মানবমন্ডলীর বিরোধীদের সকল বিদ্বেষের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এ পাক কালামের আবেদন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাঁর দেয়া এ জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাংগ ও বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করা এবং তার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবেই মক্কী জীবনের ঐ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গড়ে তোলা হয় যাবতীয় আয়োজন।

আর আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দানকারী হচ্ছেন সাহাবারা এবং তাদের জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো সেই ব্যবস্থাকে চালু করা যার মাধ্যমে এই দ্বীন বাস্তব জীবনে ফুটে ওঠে– এটাই হচ্ছে এমন এক মহান কাজ যা যে কোনো বিজয়ী ব্যবস্থার মধ্যে চালু থাকতে পারে। এ সময়ে বাতিল ব্যবস্থা দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআনের দাওয়াত এবং ইসলামী আকীদাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। তারপর এ পবিত্র মক্কা নগরীতে মোহাম্মদ (স.) যতোদিন উপস্থিত ছিলেন, ততোদিন তিনি একামতে দ্বীনের বিস্তারিত কোনো বিবরণ দেননি এবং মুসলমানদের জন্যে বিস্তারিত কোনো আইন কানুনও প্রণয়ন করেননি।

আল্লাহর হেকমতের দাবী ছিলো দাওয়াতের প্রথম ও মূল কথাটির দিকেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং রেসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স.) সর্ব প্রথম কালেমায়ে তাইয়্যেবা- লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ– এই কথার দিকে আহবান জানান এবং মানুষকে এ কথার সাক্ষ্য দান করার জন্যে ডাকতে থাকেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য, পূজনীয় এবং সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলতে কেউ নেই। এ দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি মানুষকে জানাতে থাকেন যে, তাদের রব-প্রতিপালক মুনিব এবং আইনদাতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং তাদের কর্তব্য শুধু তাঁরই নিরংকুশ আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা, অন্য কারো নয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে আরবদের কাছে একথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ দাওয়াত গ্রহণ করা মোটেই কোনো সহজ কাজ নয়। তারা (আরবীভাষী হিসাবে আরবী শব্দ) ইলাহ-এর অর্থ ভালোভাবেই বুঝতো। লাইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যে ইলাহ্ শব্দের অর্থ, তারা ঠিকই বুঝেছিলো– 'শাসন ক্ষমতার কর্তৃত্ব'। তারা এটাও বুঝেছিলো উলুহিয়্যাত এবং পবিত্র আল্লাহ্র একত্ব শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ধর্মজাযক, গোত্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলীয় নেতা ও শাসনকর্তা– যে যেখানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বও সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র হাতে তুলে দেয়াই হচ্ছে আল্লাহ্র উলুহিয়্যাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এ ক্ষমতা বলতে বুঝায় বিবেকবুদ্ধির মধ্যে অবস্থিত আল্লাহর ক্ষমতার চেতনা সৃষ্টি করা, তাঁকেই সকল ক্ষমতার মালিক বলে অনুভব করা, জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ ও ঘটনাবলী ফয়সালার ব্যাপারে একমাত্র তাঁরই ক্ষমতাকে চূড়ান্ত মনে করা, সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে তাঁরই আইন মানা, তাঁর আইন মতোই বিচার ফয়সালা করা এবং গোটা দেহ ও মনের মধ্যে তাঁরই আধিপত্যকে স্বীকার করা। আরবী ভাষাভাষীরা অবশ্যই জানতো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র অর্থ পৃথিবীর সকল ক্ষমতা, যা বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারীরা কুক্ষিগত করে রেখেছিলো এবং নানা ওজুহাতে তারা এসব ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেছিলো, এগুলোর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর এই ক্ষমতায় ভাগ বসানোর অধিকার আল্লাহ তায়ালা কাউকেই দেননি, অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে মনগড়া যে সব আইন তৈরী করে রেখেছে, এর কোনোটির অধিকার মানুষের নেই। ইলাহ-এর এই সর্বব্যাপী অর্থের কোনোটিই আরবদের চেতনার বাইরের জিনিস ছিলো না, যেহেতু তাদের ভাষার অর্থ তারাই ভালোভাবে বুঝে। আর এই কারণেই তারা বুঝতো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বুঝায় এবং এই কথাটি গ্রহণ করতে আহবান জানানোর উদ্দেশ্যই বা কি। তারা জানতো এই কথা গ্রহণ করলে তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গিয়ে

পৌছবে এবং নেতৃবৃন্দরাও জানতো যে, বিভিন্ন জিনিস ও অঞ্চলের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের ক্ষমতাকে তাদের থেকে সর্বাত্মক ও চূড়ান্তভাবে কেড়ে নেয়া হবে। এই সমস্ত অর্থ মনের মধ্যে রেখেই তারা এই কঠিন দাওয়াতের মোকাবেলা করেছে এবং যতোভাবেই এই দাওয়াতের বিরোধিতা করা সম্ভব তারা তা করেছে। এই দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্যে যতো প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারতো তার কোনোটাই বাদ রাখে নাই।

এখন দেখতে হবে এই দাওয়াতের সূচনা এই তাওহীদের কথা দিয়ে কেন শুরু করা হলো, আর কেনই বা আল্লাহ তায়ালা চাইলেন এই দাওয়াতী কাজ শুরু করার সাথে সাথে এ ধরনের কষ্ট রসূলের এবং তাঁর সাথীদের হোক?

অবশ্য রসূলুল্লাহ (স.) এই মহান দ্বীন নিয়ে যখন প্রেরিত হয়েছিলেন, তখন আরব দেশের বেশীর ভাগ উর্বর এবং অধিক ধনী এলাকাগুলো আরবদের হাতে ছিলো না। অপেক্ষকৃত ভালো অঞ্চলগুলো ছিলো অনারবদের হাতে।

উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সিরিয়ার পুরো অঞ্চলটিই ছিলো রোম সাম্রাজ্যের কতৃত্বাধীনে। রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক আরব আমীর এই অঞ্চলটি শাসন করতো। দক্ষিণে অবস্থিত ইয়ামান ছিলো পারস্যের শাসনাধিন এবং পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলটিকেও চালাতো কিছু সংখ্যক আরব আমীর। আরবদের হাতে ছিলো মাত্র হেজায, নাজদ এবং অনুর্বর কিছু মরু অঞ্চল, যার কোনো কোনো এলাকায় কিছু খেজুরবৃক্ষ এবং বাবলা গাছ উৎপন্ন হতো।

এখন দেখা দরকার মোহাম্মদ (স.)-এর হাতে কী ছিলো। কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ কালে হাজরে আসওয়াদটিকে তার নিজ স্থানে রাখার প্রশ্নে তাঁকে 'আল আমীন' বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো এবং তাঁর ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্যে কোরায়শের সকল নেতৃবৃন্দ একমত হয়েছিলো। উপরন্তু তিনি কোরায়শদের মধ্যে বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত বলে বিবেচিত হতেন। উত্তরাঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী রোমশক্তি ও দক্ষিণের পারস্য শক্তির প্রভাবমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে দ্বিধা বিভক্তি এবং বংশ পরম্পরাক্রমে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ক্ষয়িষ্ণু আরব কাবিলাগুলোকে একত্রিত করার মতো যোগ্যতা ও ক্ষমতা মোহাম্মদ (স.)-এর ছিলো। একমাত্র তিনিই আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা ও তাদের গুণাবলীকে তুলে ধরার যোগ্যতা রাখতেন এবং একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিলো সারা আরবের বুকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলা।

সেদিন যদি রসূল (স.) আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহবান জানিয়ে সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত করতে চাইতেন, তাহলে নিসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় সকল আরববাসী তাঁর ডাকে সাড়া দিতো। দীর্ঘ তেরোটি বছর ব্যাপী আরব উপদ্বীপের ক্ষমতাধরদের সাথে এই কঠিন সংঘাতে লিপ্ত না হয়ে সহজেই তিনি আরব বিশ্বের নেতৃপদে বরিত হতে পারতেন।

আর অনেক সময়ে একথাও বলা হয় যে, মোহাম্মদ (স.) এতো উন্নতমানের চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, যদি তিনি আরবদেরকে সংগঠিত করে অপরদের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের লক্ষ্যে নেতৃত্ব দিতেন, তাহলে অবশ্যই সবাই তাঁকে নেতা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে সম্মিলিত ভাবে সকল ক্ষমতা তুলে দিতো এবং তিনি সবার অবিসংবাদিত নেতা হয়ে যেতেন। তারপর তারা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আর কেউ রুখে দাঁড়ানোর সুযোগ পেতো না এবং এইভাবে আল্লাহর নির্দেশিত কাজ সহজেই সকল জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো।

কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে এই পদ্ধতিতে কাজ করতে নির্দেশ দেননি। তাঁকে সর্বপ্রথম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রকাশ্য দাওয়াত দান করার জন্যে নির্দেশ দিলেন এবং এর

প্রতিক্রিয়ায় যে বাধা বিপত্তি বিপদ আপদ ঘাত প্রতিঘাত আসবে, এই দাওয়াত গ্রহণকারী ছোট দলটিকে তা সহ্য করার জন্যে উৎসাহিত করলেন।

কিন্তু কেন? আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা কিছুতেই তাঁর রসূল ও তাঁর সংগী সাথীদেরকে কখনো কষ্ট দিতে চান না। আসলে, আল্লাহ তায়ালা জানেন, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথ ওইটি নয়। রোমের তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) এবং পারস্যের তাগুতী শক্তিকে আরব তাগূতদের দ্বারা তিনি পরাভূত করতে চাননি কারণ তাগুতরা সবাই একই প্রকার তাগূত! পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। এজন্যে এ পৃথিবীকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই মুক্ত করতে হবে। আর আল্লাহর এ বিশ্বকে মুক্ত করতে হলে কালেমায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র ঝান্ডা-কে বুলন্দ করতে হবে। সুতরাং, পথ এটা নয় যে, রোমান তাগুত ও পারসিক তাগুতদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আরব তাগুতদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তাগুত বা আল্লাহদ্রোহী শক্তি সবাই সমান অপরাধী ও মানুষের জন্যে সবাই সমান ক্ষতিকর। নিশ্চয়ই মানুষ একমাত্র আল্লাহরই প্রিয় বান্দা । কিন্তু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- এর পতাকা সমুন্নত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কিছুতেই এক আল্লাহর বান্দা হতে বা থাকতে পারে না। কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ আরবী ভাষাভাষীরা এটিই বুঝে যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কেই শাসন ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং মানুষের জীবনের জন্যে আইন কানুন দেয়ার একচ্ছত্র মালিকও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। কারো ওপর কারো কোনোই ক্ষমতা নেই। কারণ সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে জাতীয়তা একমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। ঈমানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ জাতীয়তার দৃষ্টিতে রোম, পারস্য ও আরবের অধিবাসিরা সবাই সমান, আল্লাহর ঝান্ডা তলে সকল শ্রেণী ও রংয়ের মানুষ এক। এটিই হচ্ছে সঠিক পথ। রসূলুল্লাহ (স.) এই জীবন ব্যবস্থা নিয়েই প্রেরিত হয়েছিলেন এর আগে আরব সমাজ স্থাপন করেছিলো সম্পদ ও ইনসাফ বিতরণের ক্ষেত্রে এক নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অতি অল্প কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সম্পদ ও ব্যবসা কুক্ষিগত হয়েছিলো, যারা সূদের ব্যবসা করে তাদের ব্যবসা ও সম্পদকে বহু বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলেছিলো এবং সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী ছিলো কপর্দকহীন– দু একখানি রুটির কাংগাল। ক্ষুধার জ্বালায় তারা ছিলো জর্জরিত। আর সম্পদের মালিক যারা। তারাই ছিলো আভিজাত্য ও মান সম্ভ্রমের অধিকারী। তারা একাধারে পুঁজিরও পাহাড় গড়ে তুলেছিলো এবং মান-সম্ভ্রম ও সর্ব প্রকার মর্যাদার অধিকারীও তারাই ছিলো।

হাঁ, মহানবী (স.)-এর হাতে ছিলো একতার সুদৃঢ় পতাকা, যা উত্তোলন করে তিনি এই সব মিথ্যা আভিজাত্যের ধ্বাজাধারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন এবং জনগণের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওইসব সম্পদশালীর হাত থেকে সম্পদের পাহাড় খসিয়ে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের জন্যে মানুষকে ডাক দেয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও অবশ্য তাঁর হাতে ছিলো।

সেদিন রসূল (স.) যদি সত্য সত্যই মযলুম জনতাকে এইভাবে ডাক দিতেন, তাহলে আরব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো এবং বিজয়ী হয়ে যেতো। এই ভাগের লোকেরা সম্পদ ও সম্ভ্রমের মোকাবেলায় দ্বীন ইসলামের নতুন এই দাওয়াতের সাথেই থাকতো, তবু 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- র দাওয়াত সবাই সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করতে পারতো না এবং বিচ্ছিন্ন এই গোত্রসমূহের কাছে সামগ্রিক ভাবে এ দাওয়াত গ্রহণযোগ্যও হতো না।

আবার এমনও বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.)-এর ব্যবহার এতই সুন্দর ছিলো যে, ওই অবস্থায় সংখ্যাধিক্য লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর অল্প কিছু সংখ্যক পিছিয়ে থাকা লোকও ধীরে ধীরে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতো এবং তাঁর নেতৃত্ব সহজেই সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো।

এইভাবে তাঁর রব তাঁকে তাওহীদের দাওয়াত দান করার যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা পালন করার সাথে সাথে তাঁর আধিপত্যও কায়েম হয়ে যেতো। আর এইভাবে তাঁর ক্ষমতা মেনে নেয়ার সাথে সাথে তাঁর রবের ক্ষমতার প্রতিও অতি সহজে আনুগত্য এসে যেতো।

কিন্তু মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এইভাবে কাজ করার জন্যে এগিয়ে দেন নাই।

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জানেন ইসলামী দাওয়াত দান করার প্রকৃত পথ এটা নয়। তিনি অবশ্যই জানেন যে, একমাত্র মৌলিক বিশ্বাসের কারণেই সমাজে সামাজিক ইনসাফ প্রসার লাভ করতে পারে, সকল কাজ পরিচালনার জন্যে আকীদার কারণেই আল্লাহর দিকে মোড় নেয়া হয়। সুতরাং আকীদা ঠিক হয়ে গেলেই সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বোধের সাথে বিচ্ছিন্ন আরব গোত্রগুলোর জন্যে প্রদত্ত ফয়সালাসমূহ সাধারণভাবে কবুল করা হতো। সামাজিক বিষয়সমূহ ও মোহাম্মদ (স)-কেই ফয়সালাদাতা মেনে নেয়া হতো এবং বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ অবশ্যই স্বীকার করতো যে, তিনি অবশ্যই এমন ফয়সালা দেবেন যাতে আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে যাবেন। আর তখনই মানুষ আনুগত্যপূর্ণ হৃদয় নিয়ে বুঝতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আনুগত্যের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। আকীদার বিভ্রান্তি দূর হয়ে যখন মানুষ সার্বিক বিশ্বাসের দিকে এগিয়ে আসবে, তখনই অন্তরগুলো লোভ লালসার হাতছানি ও হিংসা-বিদ্বেষের কুটিলতা পরিহার করতে সক্ষম হবে। তখন শুধু ঢাল তলোয়ার ও লাঠি সোডা বা ভীতি প্রদর্শন দ্বারা মানুষ কাজ পরিচালনা করবে না। আকীদা ঠিক হয়ে গেলে অন্তরগুলো বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ হবে না বা মানুষের আত্মাও সেইভাবে বিষাক্ত হবে না যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র দাওয়াত অস্বীকারকারীদের মন বরাবর থেকেছে।

গোটা আরব উপদ্বীপের মানুষের চরিত্র যখন নিম্নতম স্তরে নেমে গিয়েছিলো এবং আরব বেদুইনদের মতো তাদের হৃদয়গুলা হয়ে গিয়েছিলো কঠোর। সেই সময়েই রসূলুল্লাহ (স.) তাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। সমাজের সর্বত্র যুলুম নির্যাতন কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ছিলো তা যুহায়ের ইবনে আবি সুলামীর নীচের কবিতাংশ থেকে সহজে বুঝা যায়।

যে নিজের পানশালাকে তরবারি দ্বারা রক্ষা করতে পারে না অচিরেই তাকে ভেংগে দেয়া হয়।

আর যে মানুষের প্রতি যুলুম করে না তার প্রতি সকল দিক থেকে প্রতিনিয়ত অবশ্যই যুলুম করা হয়।

এই রকমই আর একটি সুপরিচিত কথা দ্বারা ওপরের কথার সমর্থনে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, 'তোমার ভাইকে সাহায্য করো, তা সে যালেম হোক বা মযলুম হোক।'

সমাজের সর্বত্র সাধারণভাবে মদ ও জুয়ার প্রচলন ছিলো এবং পরস্পরকে এসব ন্যাক্কারজনক জিনিসের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হতো এবং এগুলো দ্বারা আভিজাত্যের প্রদর্শনীও করা হতো। এই চরিত্র সম্পর্কে জাহেলিয়াতের আমলের জনৈক কবি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তারাফা এবনুল আবদ এর নীচের কবিতার সাথে মিল খায়।

'আহ যদি পেতাম আমি তিনটি জিনিস, যা একজন যুবকের কাছে সৌন্দর্যের বস্তু হতে পারে– তোমার ভালোবাসা, যা আমি তখন পাইনি যখন চেয়েছি, সকল আবেগ সহকারে রংগীন মদিরা হাতে, রোষ-কষায়িত লোচনে হেরিছো মোর পানে, সাথে সাথে অশ্রুভেজা আনতো চোখে দিয়েছো এগিয়ে সুরার পেয়ালাটিরে!'

আরবরা বিভিন্নভাবে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতো। একটি হাদীস থেকে তাদের কদর্য জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকখানি আন্দায করা যায়, যা হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

জাহেলী যামানায় চার ধরনের বিবাহরীতি প্রচলিত ছিলো– এক, বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির মতো। কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তার বোন অথবা মেয়ের জন্যে বিয়ের প্রস্তাব দিতো এবং তারপর 'দেন মোহর' ঠিক করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিলো কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো 'তুমি হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে উঠলে অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে নিজেকে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তাব দিয়ো এবং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করো।' এ সময়ে, অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার পর, তার দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা এটা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার (পূর্ব) স্বামী তার থেকে দূরে থাকতো। উক্ত ব্যক্তি দ্বারা গর্ভে সন্তান আসা সম্পর্কে জানা গেলে তার শেষের স্বামী, চাইলে তাঁর সাথে মেলামেশা করতে থাকতো। এটা সে করতো তার হবু সন্তানের প্রতি দরদের কারণেই। এ বিবাহটিকে বলা হতো ধার করা বিবাহ। তৃতীয় বিবাহ পদ্ধতি ছিলো, দশ জনের কম কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হতো এবং পর্যায়ক্রমে কোনো স্ত্রীলোকের সাথে মিলিত হতো। তারপর সেই স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হওয়ার পর বাচ্চা দিলে এবং বেশ কিছু দিন কেটে গেলে মহিলাটি ওই লোকদেরকে খবর দিতো। (সামাজিক বাধ্য বাধকতার কারণে) এ খবর পেয়ে তাদের মধ্যে কারো না এসে উপায় থাকতো না। যাই হোক, তারা আসতো এবং ওই মহিলা বলতো তোমরা কি করেছো না করেছো তা তোমরা অবশ্যই জানো, এখন আমি এই বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছি। সুতরাং হে অমুক ব্যক্তি, এ বাচ্চাটি তোমার, নাও পছন্দ মতো এর নাম রাখো। তারপর ওই লোকটি তার বাচ্চাকে নিয়ে নিতো। আর না নিয়ে তার কোনো উপায় থাকতো না। চতুর্থ নিয়মটি ছিলো বহু লোক যৌন চাহীদা পূরণের জন্যে কোনো মহিলার কাছে আসতো সে কাউকে মানা করতো না। এরা অবশ্য সমাজে সম্মানী বলে বিবেচিত না হয়ে বেশ্যা বলে পরিচিত থাকতো এবং তাদের পরিচয় সহ কোনো পতাকা তার বাড়িতে টানিয়ে রাখতো। যার খুশী এসব মহিলার কাছে আসতো এবং ওপরে বর্ণিত মতে বাচ্চা হলে মহিলা যাকে ডেকে বাচ্চা দিতো তাকে ওই বাচ্চা নিতেই হতো। (বোখারী, কেতাবুন্নিকাহ)

মোহাম্মদ (স.)-এর সাধ্যের মধ্যে একাজটিও ছিলো যে, তিনি সমাজ সংস্কারের জন্যে মানুষকে আহবান জানাতে পারতেন, যার দ্বারা মানুষের চারিত্রিক উন্নতি ও ব্যবহার সুন্দর হতে পারতো, সমাজ পরিচ্ছন্ন এবং ব্যক্তি চরিত্র পবিত্র হওয়ার পথ খোলাসা হতো, মানুষের মধ্যে পারস্পারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পেতো এবং আদান প্রদান ও সামাজিক মেলামেশার মধ্যে ভারসাম্য পয়দা হতে পারতো।

আর অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স.) যখন যে এলাকায় বসবাস করেছেন সেখানে এসব সংস্কারমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন, যেমন করে অন্যান্য সংস্কারকরা যে কোনো পরিবেশে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করে থাকেন। নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় তারা অবশ্যই কিছু সংখ্যক পবিত্র আত্মার লোক তৈরী করতে সক্ষম হন, তাদের মধ্য থেকে চারিত্রিক দোষ ও কদর্য ব্যবহার দূরীভূত করতেও পারেন এবং সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন ব্যবহার পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা বহু মন্দ ও ক্ষতিকর আচরণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন।

এমনও কেউ কেউ বলেছেন, যদি রসূল (স.) এভাবে তাঁর সংস্কার অভিযান চালাতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি সফল হতেন এবং বহু লোক একেবারে শুরুতেই তাঁর ডাকে সাড়া দিতো। বিস্তর সংখ্যক লোক তাঁর দলভুক্ত হয়ে তাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করতে পারতো এবং তাদের ব্যক্তিগত চরিত্রকে পবিত্র করতে পারতো। আর এর ফলে এই লোকদের পক্ষে অতি সহজেই ইসলামী আকীদা গ্রহণ করাও সহজ হতো। সুতরাং এইভাবে কাজ করলে, একেবারে প্রথম দিকেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাওয়াত দান করা থেকে অনেক বেশী কাজ হতো!

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই জানেন যে, না এটা সঠিক পথ বা পদ্ধতি নয়। তিনিই ভালো করে জানেন যে, সঠিক আকীদার ভীতছাড়া কোনো মযবুত চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। এই আকীদা-ই স্থাপন করে নৈতিকতার মানদন্ড এবং জীবনের সঠিক মূল্যবোধ, আর এইভাবে এ কালেমা স্থির করে দেয় সেই ক্ষমতাকে যার ওপরে নির্ভর করে এসব মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানদন্ড, যেমন করে স্থির করে দেয় এর প্রতিদানপ্রাপ্তিকে যা ক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমেই হাসিল হতে পারে। এইভাবেই এই কালেমার ধারক বাহক এবং এর বিরোধীরা নিজ নিজ কাজের ফল ভোগ করে। আর এই আকীদা স্থির না হওয়া পর্যন্ত সর্বপ্রকারের মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক বুনিয়াদ সব কিছু নড়বড় করতে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো শৃংখলা টেকে না। কোনো ক্ষমতা স্থায়ী হয় না এবং কোনো প্রতিদান প্রাপ্তিরও আশা করা যায় না।

অতপর দীর্ঘদিন ধরে রসূলুল্লাহ (স.) ও সাহাবাদের কঠিন চেষ্টা-সাধনার পর মুসলমানদের আকীদা যখন স্থির হয়ে গেলো, বিশ্বাস যখন মযবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেলো এবং যখন স্থির হয়ে গেলো সেই ক্ষমতা যার ওপর ভর করে এই আকীদা দাঁড়াতে পারে, তখনই আল্লাহর বান্দারা তাদের রবকে ঠিকমত চিনতে সক্ষম হলো এবং একমাত্র তাঁর আনুগত্য করার জন্যে তারা সংকল্পবদ্ধ হলো। আর সেই সময়েই মানুষ-মানুষের গোলামী ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে মুক্তি লাভ করলো। এই ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান চালু করার ফলেই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র দাওয়াত সঠিকভাবে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হলো আর তখনই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরিকল্পিত দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ, তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের দ্বারা সম্ভব পর হলো।

এই সময়ে পৃথিবী রোম ও পারস্যের গোলামী থেকে নাজাত পেলো ঠিকই কিন্তু আবরদের কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো না বরং তখন আসলে প্রতিষ্ঠিত হলো আল্লাহর ক্ষমতা। সেই সময়ে গোটা বিশ্ব একাধারে রোম, পারস্য ও জাতীয়তাবাদী আরব তথা সর্ব প্রকার আল্লাহদ্রোহী শক্তির নাগপাশ থেকে রেহাই পেলো।

এ সময়ে সমাজের মানুষ সাধারণভাবে সামষ্টিক যুলুম থেকে মুক্তি পেলো এবং প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, যা আল্লাহর সুষ্ঠ ব্যবস্থা অনুযায়ী পৃথিবীর বুকে সুবিচার ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করেছিলো। এসময়ে মানুষ সব কিছুকে আল্লাহর প্রেরিত মানদন্ডে পরিমাপ করার সুযোগ পেলো এবং একমাত্র আল্লাহর নামেই তাঁর দেয়া সামাজিক বিচার ব্যবস্থা চালু করলো, যার নাম রাখা হলো ইসলামের ঝান্ডা, এ নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম এর জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ ঝান্ডার ওপর লিখিত হলো কালেমা –'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

এই পবিত্র কালেমা দ্বারা মানুষের মন পবিত্র হলো। চরিত্রের উন্নতি সাধিত হলো এবং তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে গেলো। এ মহান কালেমা গ্রহণ করায় মানুষের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে আমুল পরিবর্তন এলো, যা কড়া-কড়িভাবে আল্লাহর আইন ও শাস্তি-বিধান জারী করার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো। তবে, হয়তো কোনো কোনো জায়গায় এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে। কারণ জাহেলি যামানায় গড়ে ওঠা কিছু লোভ লালসা নবদীক্ষিত মুসলমানদের কারো কারো মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি মারতো। এতদসত্তেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রতিদান পাওয়ার আকাংখা এবং আল্লাহর সামনে লজ্জা, তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি ভয়ের অনুভূতি সাধারণ ভাবে তাদের লোভ লালসাকে দমিত রেখেছিলো।

এ পবিত্র কালেমা এমন মানবতাবোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো এবং মানুষের মর্যাদাবোধকে এমনভাবে উন্নীত করলো যে তাদের চরিত্রে এবং তাদের জীবনের সর্ব বিভাগে চূড়ান্ত পরিবর্তন আসলো যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি, এমনকি ইসলামের ছায়াতলে গড়ে ওঠা মানবতাবোধের এতো উৎকর্ষ সাধিত হলো যা ইসলামী আমল ছাড়া ইতিপূর্বে আর কখনো সম্ভব হয়নি।

সদগুণাবলীর পূর্ণ বিকাশ এবং পরিপূর্ণতা ইসলামের এই স্বর্ণযুগেই একমাত্র সম্ভব হয়েছিলো। যেহেতু এই সময়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় সংগঠন এবং সরকার কর্তৃক ইসলামী আইন কানুন যথাযথভাবে কায়েম হয়েছিলো। রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করার মাধ্যমেই তৎকালীন নেতৃবৃন্দ দ্বীন ইসলামকে পূর্ণত্ব-দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন– যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়। অবশ্য, রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা লাভের পূর্বেই (রসূলুল্লাহ (স.)-এর শিক্ষা ও পরিচালনায়) ইসলামের আকীদা বিশ্বাস মুসলমানদের মন মগযে কায়েম হয়ে গিয়েছিলো এবং এ অবিচল ঈমানের বহিপ্রকাশ ঘটেছিলো তাঁদের আমল আখলাক ও আচার আচরণে, চরিত্র ও আনুগত্যের আনুষ্ঠানিক প্রদর্শনীতে (নামায রোযা ইত্যাদির মাধ্যমে)। মক্কী যিন্দেগীর তের বছর সময়ের প্রশিক্ষণ কালেই তারা ঈমানের যে স্বাদ পেয়েছিলেন তাতে সেই সময় থেকেই তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন যে, যে কোনো মূল্যেই হোক না কেন, এমন কি জীবনের বিনিময়েও যদি হয়, তারা পৃথিবীর বুকে ইসলামকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে চালু করবেনই করবেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কারো প্রাধান্য বা কোনো ক্ষমতাকে অন্তরায় হতে দেবেন না। এমনকি দ্বীনের মর্যাদাকে তারা নিজেরাও ভূলুণ্ঠিত করবেন না। এ ওয়াদা পূরণের পথে পার্থিব যে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে এলে তারা বলিষ্ঠভাবে তার মোকাবেলা করবেন। তাদের এ ওয়াদা– এ দৃঢ় সংকল্প একমাত্র জান্নাত লাভের জন্যেই। আর এ জন্যেই তারা যে কোনো ভয়ংকর যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। যতো পরীক্ষাই এ পথে এসেছে এবং দাওয়াত দান কালে যতো বাধা বিপত্তি এসেছে ঈমানী বলে তা তারা অতিক্রম করেছেন।

তাই দেখা যায়, জাহেলি যামানার ন্যায় অন্য সকল যামানাতে এবং সকল দেশে ক্ষমতার পক্ষ থেকে এই কালেমারই বিরোধিতা করা হয়েছে। যেহেতু এ কালেমা আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কারো শাসন ক্ষমতা কোনো প্রকার প্রাধান্য বিস্তারকে কোনো অবস্থাতেই মেনে নিতে রাজী হয়নি। তাই, দুনিয়ায় যারা নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, তারা এই কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র দাওয়াতকে কিছুতেই বর্দাশত করতে পারে না।

তারপর যখন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন প্রকার বিপদ আপদের মুখোমুখি করলেন তখন তারা সবর করলেন এবং সকল কঠিন অবস্থাতে তাঁরা দৃঢ়তা অবলম্বন করলেন। এইভাবে তারা তাদের নফসের চাহিদা মেটানোর তাগিদ থেকে মুক্ত হলেন এবং আল্লাহ তায়ালা জেনে নিলেন যে, তারা দুনিয়ায় প্রতিদান পাওয়ার অপেক্ষা করে না। এ প্রতিদান যাই হোক না কেন, তাদের হাতে এ দাওয়াতী কাজের জন্যে সহায়তা হিসাবে কোনো শক্তি যদি এগিয়ে আসে এবং তাদের প্রচেষ্টায় দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার রূপ নিয়ে যদি নাও আসে এবং তারা কোনো সম্প্রদায় বা জাতি হিসাবে কোনো সম্মান লাভ করুক আর নাই করুক, এতে তাদের কোনো পরওয়া নাই। এমনকি নিজ দেশে বা অন্য কোথাও যদি তাদের সম্মান না থাকে, না থাকে যদি কোনো মর্যাদা তাদের নিজ পরিবেশে বা নিজ বাড়ীতে তাতেও তাদের কোনো দুঃখ নাই।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন তাদের মনের সকল অবস্থা জেনে নিলেন, তখন তিনি তাদেরকে তাঁর মহান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আমানত দান করলেন এবং তাদের মনের মধ্যে, বিবেকে, ব্যবহারে ও চেতনার মধ্যে তাঁরই শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ববোধ পয়দা করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তাদের অন্তরাত্মার মধ্যে, তাদের সম্পদে, তাঁদের ঘরে বাইরে সর্বস্থানে এবং সকল সময়ে তারা এই কালেমা প্রতিষ্ঠার জন্যে দায়িত্বশীল হলেন এবং তাদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করা হলো, তখন তাদেরই হাতে আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বও দেয়া হলো। কারণ তারাই জানতেন যে, এসব আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং তিনিই তাদেরকে এসব কঠিন কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এই পবিত্র জীবন ব্যবস্থা এতো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না যদি প্রথমে কালেমার দাওয়াত ওইভাবে না দেয়া হতো। যদি কালেমায়ে তাইয়্যবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ঝান্ডা-কে ওইভাবে উড্ডীন না করা হতো এবং এর ধারক ও বাহকদের মর্যাদাকে সমুন্নত না করা হতো। বাহ্যিক দিক দিয়ে এ দ্বীনকে কঠিন মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মানুষের জন্যে অত্যন্ত সহজ। তাই যদি না হতো, তাহলে ওই সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলায় এ মহান জীবন ব্যবস্থাকে কায়েম করা সম্ভব হতো না।

এই মোবারক জীবন ব্যবস্থা একান্তভাবেই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই এসেছে। যদিও দাওয়াতের সূচনালগ্নে আরববাসীদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছিলো কিন্তু এ দাওয়াত ছিলো সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে। এ দাওয়াত গ্রহণকারী পৃথিবীর সকল মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি। এ মুসলমান জাতিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তাদের সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন সাধনের জন্যে অথবা বলা যায় কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতীককে তুলে ধরার জন্যেই ছিলো এই সার্বজনীন আহ্বান।

তদানীন্তন মক্কার বুকে যে কঠিন অবস্থা বিরাজ করছিলো তার মোকাবেলায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেতনা মানুষের অন্তরে ও বোধ-শক্তিতে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বপ্রথম কাজ। এর প্রতিক্রিয়ায় বাইর থেকে যতো বাধাই আসুক না কেন, সে সব কিছু সহ্য করে এই কালেমাকে গ্রহণ করা এবং অন্য সকল মত ও পথ পরিত্যাগ করা এবং এই পথে মযবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা– এই ছিলো এ পথ গ্রহণকারীদের প্রথম দায়িত্ব।

আল কোরআনের প্রথম কাজ ছিলো, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত কর্মসূচীর কথা না বলে ও আইন কানুন এবং লেনদেন ইত্যাদি সম্পর্কে কথা না বলে, সর্ব প্রথম মানুষের মধ্যে কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক আর কেউ নাই– এই বিশ্বাসকে মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়া। আর এর জন্যে প্রয়োজন ছিলো যারা দাওয়াত কবুল করবেন তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমানের পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করার মনোভাব।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতিই হচ্ছে সেই ভাবে কাজ করা যার রূপরেখা এখানে পেশ করা হলো। এ দ্বীন একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মূলনীতির ওপর টিকে থাকতে পারে। যতো প্রকার সংগঠন ও আইন সংস্থা হতে পারে সব কিছুর মূলে এই বিরাট মূলনীতি কাজ করে। আর যখন সুউচ্চ, ছায়াদানকারী ঘন পত্র পল্লবিত এক বিশাল বৃক্ষ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা দিয়ে মৃদুমন্দভাবে হাওয়াতে দুলতে থাকে, তখন বুঝতে হবে মাটির গভীরে তার শিকড় অবশ্যই প্রোথিত রয়েছে, নচেত ওই বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ঠিক এইভাবে দ্বীন-ইসলামের মহা মহীরুহ যখন চতুর্দিকে শাখা বিস্তার করে তার সুশীতল ছায়াতলে নিগৃহীত ও শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলো, তখন তার মূলে কালেমায়ে তাইয়্যেবার মযবুত শেকড় মানুষের হৃদয়-মনের গভীরে অবশ্যই প্রোথিত করার প্রয়োজন ছিলো। তাই, সর্বপ্রথম এই শেকড় গাড়ার কাজটি করা হয়েছিলো যার ফলে জীবনের সর্বদিকে এবং ছোট-বড় সকল বিষয়ের ওপর এর প্রভাব যথাযথভাবে পড়েছিলো। যার ফলে এ মহান দ্বীন সর্বদিক দিয়ে সুসংহত হয়েছিলো এবং স্থাপিত হয়েছিলো সবখানে চমৎকার নিয়ম শৃংখলা, যার কোনো নযির পৃথিবীতে নাই। আর এইভাবে আখেরাতের জীবনের জন্যেও এই জীবন ব্যবস্থা কল্যাণকর ভূমিকায় কাজ করবে, কাজ করবে দৃশ্যমান জগতের প্রকাশ্য জিনিসের সাথে সাথে অদৃশ্য জগতের বিশ্বাসজনিত সব কিছুর ব্যাপারেও, কাজ করবে বস্তুগত জিনিসের সাথে সাথে বস্তুর উর্ধের রহস্যাবৃত জগতের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম

তথ্যের ব্যাপারেও। কাজেই এই বিশ্বাস দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সব কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী মূল শেকড় হিসাবে সদা সর্বদা কার্যকর আছে ও থাকবে।

দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও রহস্যের এ হচ্ছে একটি অনন্য দিক। এই মহান দ্বীনের প্রশস্ত পথ মোমেনের মযবুত ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে এবং তাকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে সহায়তা করে, তার আকীদার জন্যে সুদৃঢ় ভীত রচনা করে দেয় এবং সে ভীতকে মযবুত করে সর্বতোভাবে এই এর প্রভাব জীবনের সকল শাখা-প্রশাখার ওপর পড়তে থাকে। এই আকীদার মূল ভিত্তি মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে সঠিক অব্যর্থ ও একমাত্র কোনো বৃক্ষের দৃশ্যমান বাহ্যিক সকল শাখা প্রশাখার সাথে তার শেকড়ের যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তেমনি আকীদার সাথে জীবনের যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্ক ওই ভাবেই গভীর এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে ওঠে।

আর যখন কালেমায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং সুদূর প্রসারী এ বিশ্বাস কারো জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে, তখন জীবনের সকল বিষয়কে পরিচালনার জন্যে যে মহান ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আগমন তা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে এবং তখনই আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া অন্যদের প্রভুত্ব কার্যত উৎখাত হয়ে যায়। আর তখনই ছোটো বড়ো সকল জনপদ ঈমানের দাবী পূরণ করতে গিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এই আত্মসমর্পণের পরই পর্যায়ক্রমে মানুষ ইসলামের যাবতীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম ও আইন কানুন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। তখন তার বুকের মধ্যে ইসলামের আইন কানুন গ্রহণের ব্যাপারে আর কোনো আপত্তি থাকে না এবং কোনো আইন চালু করার ব্যাপারেও কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না, থাকে না হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানার কোনো ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধা বা আপত্তি। একারণেই আমরা দেখতে পাই মদের নেশায় বিভোর হওয়া সত্তেও মদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিলের সাথে সাথে তা সম্পূর্ণভাবেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো সূদ, জুয়া এবং জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত সকল কুপ্রথা। এসব অন্যায় কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো আল কোরআনের আয়াত দ্বারা অথবা রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিষেধাজ্ঞা জানার সাথে সাথেই। আর এখনকার অবস্থা হচ্ছে এই যে, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ, তার আইন কানুন, বিধি বিধান, শৃংখলা ও সংস্কারমূলক প্রকল্প, সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং সকল প্রকার প্রচারযন্ত্র সব কিছু ব্যবহার করেও এসব সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বড় জোর এতোটুকু হয়তো হচ্ছে যে, এসব আইনের প্রকাশ্য বিরোধিতা বন্ধ থাকছে কিন্তু সমাজের লোক সাধারণভাবে অন্যায় ও আইন বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকছে। (১)

ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে দ্বীন ইসলামের আর একটি প্রকৃতি লক্ষ্যযোগ্য। এই জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে মানুষের জীবনকে সার্বিকভাবে পরিচালনার জন্যে একমাত্র পূর্ণাংগ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধু দুনিয়ার জীবনের জন্যে কোনো মতবাদই নয়, বরং মানুষের জীবনের সকল কাজ ও বিষয়কে বাস্তবে পরিচালনা করে এবং এ জীবন ব্যবস্থা জীবনের সকল কার্যকলাপকে বাস্তবে নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক পথে পরিচালনা করতে এসেছে এবং আল্লাহর হুকুমেই সব কিছুকে এ ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই পরিচালনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রচলিত পদ্ধতিকে বহাল রেখেছেন, কখনও প্রচলিত পদ্ধতির মতোই কিছু বিধান দিয়েছেন এবং কখনও বা সব কিছু আমূল পরিবর্তন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিধান দিয়েছেন। সর্বোপরি, যে সমাজ তাঁর শাসন ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছে, সে সমাজের মানুষের বাস্তব জীবনের জন্যে যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা বিধান দিয়েছেন।

---

(১) কেমন করে আল্লাহ তায়ালা মদ নিষিদ্ধ করলেন আর কেমন করে মদ বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিক ব্যর্থ হলো দেখুন লেখকের গ্রহন্থঃ 'মা যা খাসিরাল আলামু বি-ইন্হিত্বাতিল মুসলেমীন

আল্লাহর এ বিধান এমন কোনো মতবাদ নয় যা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বরং এ হচ্ছে বাস্তব জীবনকে পরিচালনার জন্যে এক অমোঘ বিধান। সুতরাং যে মুসলিম সমাজ কালেমায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মধ্যে প্রকাশিত আকীদাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছে এবং মেনে নিয়েছে তাঁর শাসন ক্ষমতাকে, তাকে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো ক্ষমতার দাবীদারকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তাদের দেয়া যাবতীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিকে অস্বীকার করতে হবে।

এইভাবে এই নবগঠিত সমাজ যখন বাস্তবে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তখনই সে সমাজ জীবন্ত সমাজ বলে পরিচিত হবে। আর তখনই তার প্রয়োজন হবে একটি সমাজ সংগঠনের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার আর তখনই তার প্রয়োজন হবে নানা প্রকার আইন কানুনের আর একমাত্র এই সময়েই সংগঠন গড়ে তুলতে এবং আইন-কানুন চালু করতে এক রাষ্ট্র ব্যবস্থার। তবে এসব বিধানের কার্যকরিতা নির্ভর করবে যাদের জন্যে এসব বিধান নাযিল হয়েছে, তাদের এ সকল নিয়ম নীতি অনুযায়ী চলার ও মানুষের যাবতীয় নিয়ম নীতি পরিত্যাগ করার মানসিকতার ওপর এবং এরপর একথাও জানা দরকার যে, মোমেন জনসমষ্টি বা সমাজ যদি এই তাওহীদী বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চায়, তাহলে তাদের হাতে অবশ্যই ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া চালু হওয়া সম্ভব নয় এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কিত আইন চালু না হলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে সমাজ জীবনে শান্তি আসাও সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষমতা বলে শরীয়তের আইন চালু করতে না পারলে ইসলামী ব্যবস্থার উপযোগিতা ও উপকারিতা পাওয়াও সম্ভব নয়।

মক্কার মুসলমানদের হাতে বা মুসলিম সমাজের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিলো না এবং বাস্তবে তারা এমন অবস্থাতে ছিলো না যে, তারা নিজেরা আল্লাহর বিধান মতো চলতে পারে অথবা অপরকে চালাতে পারে। আর এই কারণেই মক্কী যিন্দেগীর তেরো বছর সময়ের মধ্যে নৈতিক বিধান ছাড়া জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে নিয়ন্ত্রণ বা শাস্তিমূলক কোনো বিধান নাযিল হয়নি। অবশ্য এ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের ব্যবহার ও নৈতিকতার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে সব সূরা ও আয়াত নাযিল হয়েছিলো সেগুলোর প্রভাবে একদল সোনার মানুষ গড়ে উঠেছিলো। এদের আচরণে এবং স্বভাব চরিত্রে সাধারণভাবে মানুষ ছিলো মুগ্ধ-- একমাত্র সেই স্বার্থপর ও নেতৃত্বলোভী মানব নামের অযোগ্য কিছু হিংস্র লোক বিরোধিতা করছিলো যাদের আশংকা ছিলো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর গঠিত এই নতুন দলটি অচিরেই তাদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেবে। এজন্যে তারা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এই নতুন বিপ্লবকে ঠেকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো। কিন্তু, এরপর মুসলমানদের হাতে যখন মদীনার নগর কেন্দ্রিক রাষ্ট্রটি এসে গেলো এবং তারা ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পেলো, তখনই তাদের ওপর শরীয়তের হুকুম-আহকাম নাযিল হতে শুরু হলো এবং স্থাপিত হলো সর্বত্র শাসন শৃংখলা, যার মাধ্যমে মুসলমানদের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান হতে থাকলো। নতুন এই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুন চালু হওয়া সম্ভব হলো এবং মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে লাগলো।

মক্কী যিন্দেগীর ওই স্তরে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের আইন কানুন ও শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো বিধান নাযিল করতে চাননি, চাননি প্রয়োজনের পূর্বেই আইনগুলো দিয়ে রাখতে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থাদি পাঠানো দ্বীন ইসলামের নিয়মের খেলাপ। বরং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই আইন কানুনের প্রয়োজন, যেহেতু মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানে তখনই তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। পূর্বে নাযিল করার অর্থ হতো অনাগত সমস্যাগুলো আন্দায অনুমান করে তার সমাধান দেয়া। এই অনুমান করা ইসলামী ব্যবস্থার মেযাজের খেলাফ

বরং যখন সমস্যা এসেছে তখনই সমস্যার গুরুত্ব ও গভীরতা বুঝে সেইভাবে তার সমাধান দেয়া হয়েছে।

আর আজকের দিনে যারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় এবং জীবনের সমস্ত কাজ কারবার ইসলামের আইন অনুযায়ী চালাতে চায়, তারা বর্তমান পৃথিবীর কোনো দেশেই এর নযির খুঁজে পায় না, দেখতে পায় না কোথাও এর বাস্তব রূপরেখা ও দৃষ্টান্ত এবং এমন কোনো দেশ তাদের নযরে পড়ে না যেখানে অন্য সকল আইন বাদ দিয়ে একমাত্র ইসলামের আইন কানুন ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে এবং সে মোতাবেক বিচার ফয়সালা করা হচ্ছে। যদিও বহু দেশে নামধারী মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা বর্তমান রয়েছে এবং ইচ্ছা করলে তারা আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুন চালু করতে পারে। এমতাবস্থায় তারা কি করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মেযাজ ও সুফল বুঝতে পারবে এবং কি করেই বা তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে কার্যকর করবে!

আজকের মুসলমানদের দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তারা আধুনিক জগতের বিভিন্ন চিন্তাধারার সাথে সমন্বয় সাধন করার জন্যে ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার করতে চায়, মনে করে মানব নির্মিত নিয়ম শৃংখলা ও আইন কানুন বুঝি বেশী উপযোগী। ব্যস্তবাগীশ মানুষ মনে করে মানব নির্মিত আইনের মাধ্যমে জীবন সমস্যার আশু সমাধান পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, এভাবে চিন্তা করে তারা নিজের অন্তরের কাছেই পরাজয় বরণ করে, পরাজয় বরণ করে সমাজের কাছে। তারা ভবিষ্যতের অবাস্তব কল্পনায় সময় ক্ষেপণ করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা চান যে, তাদের অন্তরে ঈমানের বাতি জ্বলে উঠুক এবং তাদের বিবেকের কাছে আল্লাহর ক্ষমতার কথা জেগে উঠুক। তাহলেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারও সামনে তাদের মাথা নত করতে হবে না এবং আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন দ্বারা তাদের জীবন পরিচালনা করতে হবে না। এই ভাবে মানুষ যখন নিজেদের আকীদা বিশ্বাসকে মযবুতির সাথে অন্তরে পোষণ করতে পারবে এবং সমাজের বুকে এই বিশ্বাসীরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে তখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে ইসলামের আইন কানুন চালু করা সম্ভব হবে এবং তাদের সকল সমস্যার সমাধান তারা এই আইন দ্বারাই করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী দাওয়াত দানকারীদের মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থার বাস্তব উপস্থিতি ও প্রতিষ্ঠিত করার চেতনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যখনই ইসলামী ব্যবস্থার পুনর্জাগরণের জন্যে তারা মানুষকে আহবান জানাবে, তখনই তারা যেন সর্ব প্রথম জনগণের মনে ঈমান-আকীদার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। এ জন্যে তাওহীদের দিকে সরাসরি আহবান জানানোই হবে মুসলমানের কর্তব্য– যদি ওই সব ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। কারণ জন্মগতভাবে মুসলমান হলেও তারা জেনে বুঝে আল্লাহকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মেনে নেয়নি। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম কালেমায় লা-ইলাহ ইল্লালাহর দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে চেতনা জাগাতে হবে, তাদের জানাতে হবে যে, বিচার ফয়সালা ও শাসন-কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা– আর কেউ নয়। তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, তাদের বিবেকের মধ্যে অবস্থিত সজাগ চেতনায় এবং তাদের বাস্তব কাজ-কর্ম ও ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভুত্বের অনুভূতি বিরাজ করাতে হবে।

ইসলামের দিকে মানুষকে যখনই আহবান জানানো হবে, তখনই আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও তাঁর নিরংকুশ মালিকানা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ঠিক সেইভাবে ধারণা ও চেতনা জন্মাতে হবে যেমন করে ইসলামের সূচনালগ্নে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। মক্কী জীবনের দীর্ঘ তেরোটি বছর ধরে আল কোরআন এই মূল্যবান কাজটিই করেছিলো।

সুতরাং, কোনো ব্যক্তি যখনই এই চেতনা সহকারে দ্বীন ইসলাম কবুল করবে, তখনই সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের

সামগ্রিক জীবনে যেহেতু ওই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তার জীবনকে এই তাওহীদের ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছিলো এবং তারা মেনে নিয়েছিলো যে, তাদের জীবনকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই পরিচালনা করবেন।

পরবর্তীকালে যখনই ইসলামী সমাজ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচুকরে দাঁড়াতে চাইবে, তখন তাকে এই বুনিয়াদের ওপরেই দাঁড়াতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। এটিই হচ্ছে ইসলামী জীবন যাপন করার ও ইসলামী পদ্ধতি চালু করার একমাত্র সঠিক পদ্ধতি।

কিছু সংখ্যক ব্যস্তবাগীশ ব্যক্তির কাছে মনে হয়েছে যে, ইসলামের জীবন ব্যবস্থা মানুষের সামনে পেশ করে দেয়া আর ইসলামী বিধান চালু করা একই কথা– যদিও এ লোকগুলো মনের দিক দিয়ে মোখলেস। এই সব ব্যক্তি খুব গভীর ভাবে দ্বীন ইসলামের প্রকৃতি ও আল্লাহর সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করেনি। মহাজ্ঞানী ও চির বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা এ মহান দ্বীনের ইমারত কেন যে স্থাপন করলেন তা ভালো ভাবে তারা বুঝতেও চেষ্টা করেনি। মানুষের স্বভাব চরিত্র ও তার জীবনের জন্যে কতো কি প্রয়োজন তাও তারা অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। হাঁ, যা বলছিলাম, ওরা ভাবে যে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে সহজ করে দিয়েছেন। সুতরাং শুধু দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিলেই মানুষ দ্বীন ইসলামকে ভালোবাসবে।

যেহেতু মেযাজের দিক দিয়ে এসব ব্যক্তি ব্যস্ততাপ্রিয়। এই জন্যেই তারা মনে করে এতে সহজভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। এদের মনের মধ্যে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা থাকলেও এরা ওই সব কল্পনা বিলাসী মানুষের মতো, যারা মনে করে যে, রসূল (স.) আরব জাতীয়তাবাদের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্যে মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন। অথবা তিনি সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করার বা নৈতিক জীবন যাপন করার জন্যে মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন এবং এইভাবে এ পথে চলা তিনি মানুষের জন্যে সহজ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের অবশ্যই প্রকৃত অবস্থাটি বুঝতে হবে। মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং সর্বান্তকরণে ও নিশর্তভাবে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার কথা ঘোষণা করা এবং এরপর অন্য সকল ক্ষমতার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই একমাত্র আল্লাহ্র বিধান কবুল করা যথার্থ বলে গন্য হবে। আর এই সাথে মানব নির্মিত যাবতীয় নিয়ম কানুন বর্জন করার কথা জানাতে হবে। এ কাজটিই হবে প্রথম, এরপর আসবে বিস্তারিতভাবে আল্লাহর বিধান জানা ও মানার পালা এবং মানুষকে দ্বীন ইসলামের ব্যাপক জ্ঞান দান করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার কাজ।

দ্বীন ইসলামের প্রতি আগ্রহ তো তখনই পয়দা হয়, যখন মানুষ একান্তভাবে নিজেকে আল্লাহর গোলাম বলে মেনে নেয় এবং তখনই সে অন্যদের ক্ষমতা অস্বীকার করতে পারে। এর জন্যে প্রথমেই তার মধ্যে ইসলামী সকল ব্যবস্থা চালু হতে হবে এবং এর জন্যে বিস্তারিত ভাবে সব কিছু জেনে বুঝে তবে গিয়ে সে ইসলাম কবুল করবে এটা মোটেই জরুরী নয়।

আল্লাহর ব্যবস্থা নিসন্দেহে সর্বোত্তম, যেহেতু এ ব্যবস্থা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন সুতরাং ভালো না হয়ে এর কোনো উপায় নেই। আর চাকরের তৈরি করা বিধান কিছুতেই মুনিবের তৈরি করা বিধানের মতো হতে পারে না– এটা অবশ্যই যে কোনো মানুষ বুঝবে। কিন্তু, তবু এইভাবে কথা বলা ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি নয়। দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে নেয়ার জন্যে সর্বসাধারণকে আহবান জানানো এবং অন্য সবাইকে এবং সবার নিয়ম বিধানকে অস্বীকার করার জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া, ইসলামের জন্যে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ নাই, অথবা পেশ

করারও কোন প্রয়োজন নাই। এইভাবে দাওয়াত পাওয়ায় যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে, সে-ই ইসলাম গ্রহণ করার ফয়সালা করবে এবং এরপর এই ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখার জন্যে ফিরে তাকাবে না। ঈমানের প্রথম বহিপ্রকাশ এটিই।

এরপর আমরা বলতে চাই, কেমন করে দীর্ঘ তেরটি বছর ধরে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলো এই আকীদা গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করেছে। সেখানে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, মানুষের আকীদাকে আল কোরআন কোনো মতবাদ হিসাবে পেশ করেনি, পেশ করেনি প্রচলিত কোনো ধর্মীয় তত্ত্ব হিসাবে অথবা কোনো তর্কশাস্ত্র বা বিতর্কও এটা নয়, যার নাম দেয়া যায় তাওহীদ-বিদ্যা অথবা তর্ক-বিদ্যা।

না, এসব কোনো বাজে তর্ক-বিতর্ক নয়, বরং মহান কোরআন মানুষের মধ্যে নিহিত মানবতাবোধকে সম্বোধন করে তার অস্তিত্ব ও আশপাশে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদির দিকে তাকাতে আহবান জানাচ্ছে, জাগিয়ে দিচ্ছে তার বিবেককে, যাতে সকল প্রকার জড়তা পরিহার করে সে প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে এবং তার মধ্যে মরচে ধরা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় বিবেক যেন আবার গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে, নিজ কর্তব্য সম্পাদনের ডাকে সাড়া দেয়। আর তার বিবেকের মূল উৎস সুপ্ত জ্ঞান ভান্ডারের বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তার সামনে অবারিত করে দেয় সৃষ্টি রহস্যের মাধুর্যকে, তখন স্বতস্ফূর্তভাবে সে সত্যের ডাকে সাড়া দেয়।

আলোচ্য সূরাটি এই মহান জীবন ব্যবস্থার এক মাত্র পূর্ণাংগ ও অনন্য দৃষ্টান্ত, যার কিছু বৈশিষ্ট্য ইনশাআল্লাহ আমরা এখানে একটু পরেই আলোচনা করবো ....।

ঈমানের সাধারণ ও বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরে......অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে কোরআনুল করীম আলোচনা পেশ করেছে যাতে করে জাহেলী যুগের বিবেক ও বুঝ শক্তির ওপর যে জগদ্দল পাথর চেপেছিলো তা অপসারিত হতে পারে, যেন তার সম্মুখে অবস্থিত জিনিসগুলো তার মানবতাবোধে সাড়া জাগায়। এইভাবে বিবেক জেগে উঠলে, চর্ম-চোখে যা দেখা যায় না তা কোনো না কোনো সময়ে তাদের মানস চোখে মূর্ত হয়ে উঠবেই। তাই, দেখা যায় ঈমান-আকীদা গ্রহণের দাওয়াত যিন্দা দিল মানুষের কাছে, সকল দুঃখ-দৈন্য, বাধা বিঘ্ন ও সর্বপ্রকার অন্তরায়ের মোকাবেলায় সাড়া জাগিয়েছিলো। তখন জাহেলিয়াতের হিংস্র ধ্বজাধারীরা শুধু মৌখিক বাধা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি আর এই সংঘর্ষের কারণে শুধু তারা মানসিক নির্যাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা চরম নিষ্ঠুরভাবে শারীরিক আক্রমণও করেছে। পরবর্তীকালে তাওহীদ বিজ্ঞান নামে এক শাস্ত্র গড়ে উঠেছে এবং এ প্রসংগে নানা কূটতর্কের অবতারণাও করা হয়েছে, যার মোকাবেলায় কোরআনুল কারীম দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং ওইসব ভ্রান্ত যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছে। এইভাবে ধর্মতত্ত্ব নামক আর এক শাস্ত্র তৈরি করে তার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা চালানো হয়েছে অথচ ইসলাম আকীদার তত্ত্ব পেশ করার সাথে সাথে বাস্তব কর্ম প্রণালীও পেশ করেছে এবং তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে মানুষকে রাখার পরিবর্তে তাকে জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছে।

ইসলাম মুসলিম জামায়াতের মন মগযের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাসের ভীত রচনা করেছে, তার ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অনমনীয় ঈমান মনোবল এবং এর ফলেই তারা সক্ষম হয়েছে একটি সুশৃংখল সমাজ গঠন করতে। আর এই বাস্তব কর্মপন্থার ঢাল দ্বারা তারা প্রতিহত করেছে জাহেলিয়াতের অলীক ও অন্ধ আবেগ প্রবণতাকে, এমনকি ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও জাহেলিয়াতের যে সব রসম রেওয়ায রয়ে গিয়েছিলো ইসলাম সেগুলোরও মোকাবেলা করেছে বজ্রকঠিনভাবে, মানুষের মন মগয থেকে, তার স্বভাব চরিত্র থেকে এবং বিভিন্ন বাস্তব অভ্যাস থেকে, সে সব কুসংস্কারকে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছে যা

সুদীর্ঘকাল থেকে তাদের মন মগয ও আচার আচরনের মধ্যে শেকড় গেড়েছিলো। এইভাবে ইসলামী আকীদার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে এবং মানুষ সুস্পষ্টভাবে জেনে নিয়েছে যে, ইসলামী আকীদা কোনো কল্প কুসুম স্বপ্ন নয় অথবা হাওয়ার ওপর কোন বেওকুফের প্রাসাদও নয়। এ আকীদা বাস্তব জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে এক মৌলিক বিশ্বাস, যার শেকড় রয়েছে মাটির সুদূর গভীরে এবং তার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে রয়েছে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে। এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ সংযোগ মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে। সুতরাং এই আকীদা যতো মযবুত হবে, ততোই তার প্রভাবে জীবন হবে আরও সুন্দর, আরও গোছালো, আরও সমৃদ্ধিশালী এবং আরও মধুর!

সুতরাং ইসলামী দাওয়াত দানকারী ব্যক্তিদের এই দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-এর প্রকৃতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতে ও বুঝতে হবে, এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে এবং ওপরে বর্ণিত সকল প্রকার কর্মপ্রণালী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা থাকতে হবে, যাতে করে তারা বুঝতে পারে, মক্কী জীবনে মুসলমানদের মধ্যে যে আকীদা বা যে মযবুত বিশ্বাস গড়ে উঠেছিলো পরবর্তী কালে কোনো সময়েই সে বিশ্বাসের ভীত নড়বড়ে হওয়া চলবে না। কোনো মুসলমান যেন ওই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে চুল পরিমাণে সরে না দাঁড়ায়। তবে, একথাও স্মরণ রাখতে হবে, এ বিশ্বাস শুধু মনের মধ্যে পুষে রাখলেই চলবে না, বরং এর ভিত্তিতে গড়ে উঠতে হবে এক সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন, এমন জীবন যা মানুষের জন্যে হবে কল্যাণকর এবং যা গড়ে তুলবে সংবেদনশীল ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও দরদী এক দল সোনার মানুষ, যারা গড়ে তুলবে একটি সত্যিকারে সোনালী সমাজ, যারা হবে বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক সুশৃংখল জামায়াত। এই দলটি বিশ্বাসে, কাজে, কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে সকল দিক দিয়ে হবে সবার সেরা। আর এ জন্যে বারবার তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বুনিয়াদকে ঝালাই করতে হবে।

এমনিভাবে আকীদার ভিত্তি গড়ার সময় শুধু তাত্বিকভাবে মানুষকে কিছু শিক্ষা দিলেই চলবে, তা হতে পারে না। বরং এই আকীদার ভিত্তিতে তাদের বাস্তব জীবনে অবশ্যই কিছু পরিবর্তনও আনতে হবে। ব্যবহারিক জীবনে এ বাস্তব পরিবর্তন থেকেই বুঝা যাবে যে, তাদের অন্তরের মধ্যে এক নতুন বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। এমনকি তাদের সামাজিক জীবনেও এ আকীদার কারণে অবশ্যই কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হবে, জাহেলী যামানায় তাদের যে স্বভাব-প্রকৃতি ছিলো এবং যে ভাবে তারা জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলো সে জীবনধারায় দেখা দিতে হবে আমূল পরিবর্তন। পূর্বেকার মন্দ অনেক কিছুর সাথে তাদের সংঘর্ষ বেধে যাবে। এ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মানবতার বিকাশ ঘটবে ও এমন সব সদগুণাবলী সৃষ্টি হবে, যা হবে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর।

কিন্তু মুসলমান সমাজের মধ্যে মারাত্মক যে ভুলটি সংক্রামিত হয়েছে তা হচ্ছে তাওহীদের মতবাদটি জমাট পাথরের মতো তাদের মধ্যে স্থির হয়ে রয়ে গেছে। এ বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ হিসাবে বাস্তব জীবনে যে পরিবর্তন আসা দরকার ছিলো তা আসেনি বা আসছে না। এর ফলে মুসলমান সমাজ নানা প্রকার সমস্যায় ভুগছে এবং এটা অবশ্যই একটি বড় বিপদ।

প্রথম বারে তাওহীদের আকীদা সম্পর্কে যে কথাগুলো নাযিল হয়েছিলো শুধু সেই কথাগুলো শেখানোর জন্যেই যে দীর্ঘ তেরোটি বছর কাটানো হয়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। আসলে আল্লাহ তায়ালা যে কথাগুলো শেখাতে চেয়েছিলেন এবং জীবনের সকল সমস্যার যে সমাধান দিতে চেয়েছিলেন সে সব বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশাবলী তো তিনি একই সাথে এবং একই সময়ে নাযিল করতে পারতেন, যা হয়তো মোহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এই তের বছর অথবা এর থেকে কম বেশী সময় ধরে গড়তে পারতেন এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে রপ্ত করতে পারতেন।

কিন্তু না, আল্লাহ তায়ালা তা চাননি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন ভিন্ন আর একটি জিনিস। তিনি একই সময়ে একটি দল গড়তে চেয়েছেন, চেয়েছেন একটি আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করতে

এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আকীদার সুদৃঢ় ভীত রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি সেই আকীদার ভিত্তিতেই একটি মযবুত দল ও আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছেন এবং সেই দল ও আন্দোলনের মাধ্যমে আকীদাকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। রসূল (স.) মুসলমানদের মধ্যে এমন আকীদার ইমারত গড়ে তুলতে চেয়েছেন যে ইমারত তাদের জীবরে সকল বিপদ আপদের সামনে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাড়াবে, কেননা বিশ্বের বুকে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন এমন একটি সংঘবদ্ধ দল, যার প্রতিটি সদস্য একটি শরীরের অংগ প্রত্যংগের মতো হবে এবং সেই সব অংগ প্রত্যংগের কোনো একটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে অপর অংগগুলোও ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠবে। এই আকীদা হবে জীবন্ত ও সৃজনশীল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন ব্যক্তি ও সমষ্টিকে এক দিনে গড়ে তোলা যায় না। তবে মানুষের মধ্যে ঈমান যখন পরিপক্কতা লাভ করে, তখন জামায়াতী জীবনে অবশ্যই তার কার্যকর প্রভাব পড়ে এবং তখনই সে জামায়াত আল্লাহ্র প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এর জন্যে যেমন প্রয়োজন দলীয় জীবনে সংহতি, তেমনি প্রয়োজন তাদের আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা, আবার জামায়াত বা ইসলামী দলকেও দেখতে হবে– তার প্রতিটি সদস্যের মধ্যে এই আকীদা ঠিকমত গড়ে উঠছে কিনা তার তদারকীও করতে হবে। তবেই গিয়ে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এটিই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের প্রকৃত স্বভাব এবং আল কোরআনের মক্কী সূরাগুলো আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। দ্বীন ইসলামের এই প্রকৃতিকে আমাদের জানতে হবে এবং এর উদ্দেশ্যকে ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে, আর সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা মানব রূপী শয়তানদের ফেরেবে পড়ে না যাই এবং মানুষের উপস্থাপিত বিভিন্ন দার্শনিক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে না পড়ি। কারণ ওই সব মতবাদ আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে দিবানিশি নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করে চলেছে এবং আমাদের মন মগযকে নানা প্রকার জটিল প্রশ্নের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলার চেষ্টা করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের আকীদা নষ্ট করে দিয়ে তাদের গোটা অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়া এবং তাদেরকে তাদের সেই জীবন লক্ষ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা, যার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের চেষ্টার মধ্যে যে সব ত্রুটি আছে তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে এবং এই ত্রুটির কারণে যে বিপদ আসতে পারে তা বুঝে সে ত্রুটিগুলোকে সংশোধনের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। এভাবে আমাদের আকীদাকে যদি আমরা আবার জীবন্ত রূপ দিতে পারি, এর ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি একটি সুসংঘবদ্ধ দল, তাহলেই বাতিল সকল মতবাদকে উৎখাত করে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েমের লক্ষ্যে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো। আর এভাবেই ইসলামী চিন্তাধারা পৃথিবীর বুকে প্রসার লাভ করবে এবং মানুষ জীবনের সঠিক গতিপথ ফিরে পাবে, যা এক সময়ে ইসলামই তাদেরকে দিয়েছিলো।

ইসলামী আকীদার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, যখন কারো অন্তরের মধ্যে এ আকীদা এসে যায়, তখন তার বহিপ্রকাশ অবশ্যই ঘটে তার কাজে, কথায়, ব্যবহারে। অর্থাৎ তার সব কিছুতে আকীদা জীবন্ত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। সুতরাং আজ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করবে, তাদের জীবনের সর্ব বিষয়ে এসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে হবে, ফুটে উঠতে হবে তার সাংগঠনিক তৎপরতায়, ইসলামী জামায়াত গড়ার সাধনায় এবং সেই সব আন্দোলন ধর্মী তৎপরতায় যা বলিষ্ঠভাবে তাকে যে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্রস্তুত করবে এবং তার চতুর্দিকের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে এবং সকল প্রকার রসম রেওয়ায ও সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তৈরী করবে, যা প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পরে এখনও বহু মুসলিম সমাজের মধ্যে বিষফোঁড়ার মতো বিরাজ করছে। এসব জাহেলী রীতি নীতি মানুষের অন্তর ও বুদ্ধিকে এমনভাবে

বিভ্রান্ত করে যে, তারা এর সুদূর প্রসারী গভীর ক্ষতির দিকে নিজেদের অজান্তেই এগিয়ে যায় এবং এইভাবে তারা জাড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্তির মায়াজালে।

ইসলামী চিন্তাধারা মানুষের মন মগযকে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের চেতনা দেয়, জ্ঞান দান করে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে, মানুষ ও তার জীবন সম্পর্কে। এ পূর্ণাংগ ধারণা বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কর্মযোগ। ইসলামী বিশ্বাস শুধু মন মগযে ও চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক, এ মহান জীবন ব্যবস্থার মালিক আল্লাহ তায়ালা তা কিছুতেই চান না। কারণ এহেন আচরণ মানুষের প্রকৃতি ও তার জীবন লক্ষ্য বিরোধ। ইসলামী বিশ্বাসের দাবী হচ্ছে, মানুষ যেন এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার সুপ্ত মানবতাকে জাগিয়ে তোলে, ফুটিয়ে তোলে এ মানবতাকে জীবন্ত সংগঠনের মাধ্যমে এবং বাস্তব আন্দোলনমুখী তৎপরতায়। এইভাবে এ আকীদা যেন তার বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাকে সঠিক অবদান রাখতে সাহস ও শক্তি যোগায়।

আর প্রতিটি উন্নত চিন্তাধারা বাতিলকে উৎখাত করে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে যেন আরো বেগবান করে। কারণ এ আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাতিলের অগ্রাভিযানকে এগিয়ে নেয়া যা রুখবার জন্যেই আল কোরআনের অবতারণা।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

'আর, আমি মহান আল্লাহ, কোরআনকে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করেছি যাতে করে (হে রসূল) তুমি মানুষকে পড়ে শোনাও থেমে থেমে এবং আমিও নাযিল করেছি এ মহান কেতাবকে ধীরে ধীরে।'

এতে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা চান পৃথক পৃথক করে প্রতিটি শব্দ এমনভাবে যেন পড়া হয়, যেন যে কোনো শ্রোতা তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। আবার তিনি আরও চান যেন প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া হয়, যেন পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে ওই কথাগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে। তাহলেই যে মত ও পথের সন্ধান আয়াতগুলোতে এসেছে তা মানুষ বুঝতে পারবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে পারবে।

আল্লাহ তায়ালা চান, এই দ্বীনের ধারক ও বাহকরা যেন জানতে পারে যে, এই জীবন ব্যবস্থা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং এর মধ্যে যে পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই দেয়া এবং তা মানুষের প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা সম্ভব নয় যে, মানুষের জীবনের জন্যে কোনো প্রয়োজনীয় কর্ম পদ্ধতির সাথে আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যবস্থার মিল থাকবে না।

এ জন্যে মানুষকে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ প্রদত্ত এ জীবন ব্যবস্থা যেমন মানুষের জীবনকে সুন্দর করতে এসেছে, এসেছে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সঠিক পথে পরিচালনা করতে, তেমনি এসেছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান নানা প্রকার ভুল চিন্তাধারা থেকে তাকে মুক্ত করতে এবং তার সেই সকল তৎপরতা থেকে তাকে বিরত রাখতে যা ওই সব ভুল চিন্তার কারণে তার মধ্যে গড়ে উঠেছে। বরং ইসলাম মানুষকে দিয়েছে এক নতুন চিন্তাধারা, যার আলোকে সে এক নতুন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। তারপর এ ব্যবস্থা এনেছে তার চিন্তাধারার মধ্যে এক অভিনব বিপ্লব, যার ফলে সে হয়েছে এক বিশেষ চিন্তার অধিকারী, যা দুনিয়াকেন্দ্রিক মানুষের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নতুন এ চিন্তাধারা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত, জীবন সঞ্চারী এবং বাস্তব মুখী। কাজেই তার চিন্তাধারা, ধারণা ও বিশ্বাস এবং এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জীবনধারা এগুলো কখনই পরস্পর ভিন্নমুখী নয়। বরং এসব কিছু এক রশিতে এমনভাবে গাঁথা যে, একটি বাদ দিলে আর একটির কোনো মূল্য থাকে না। সুতরাং ওপরে বর্ণিত মতে আমরা ইসলামের জীবন পদ্ধতি যখন জানতে পারলাম, তখন আমাদের এটা অবশ্যই বুঝা দরকার যে, আসলে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই মানুষের জীবনের জন্যে সত্যিকারে সঠিক ও কার্যকর ব্যবস্থা। এ

জীবন ব্যবস্থা শুধু প্রথম যুগের মুসলিম সমাজের জন্যে রচিত হয়েছিলো, তা নয়, বরং এ ব্যবস্থা সকল যুগের সকল মানুষের জন্যে এবং যে কোনো মানবগোষ্ঠীর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে এর থেকে ভালো আর কোনো ব্যবস্থাই হতে পারে না।

ইসলামের কাজ মোটেই এটা ছিলো না যে, কিছু লোকের ধর্মীয় বিশ্বাসকে পরিবর্তন করে দিয়েই থেমে যাবে, বরং ইসলাম মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করে, পরিবর্তিত চিন্তার সাথে বাস্তব জীবনের কাজের মিল দেখিয়ে দিতে চেয়েছে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যা প্রয়োজন তা যে একমাত্র ইসলামী চিন্তাধারার কারণে পূরণ হতে পারে তাই প্রমাণ করতে চেয়েছে এবং এ চিন্তাধারা যে মানব রচিত যে কোনো চিন্তাধারা থেকে অধিক বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের পরিকল্পনা যে কী তা বলার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং আল্লাহমুখী জীবন যে কী তাও আমরা ভালভাবে বুঝি না। তবে যে পদ্ধতিতে তিনি আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন এবং চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্যে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, আর যে সব জিনিসের ভিত্তিতে চিন্তা ভাবনা করে জীবনে কাজগুলো করতে বলেছেন তা অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য।

কিন্তু আমরা যখন ইসলামের কাছে আশা করবো যে, ইসলাম আমাদেরকে নতুন নতুন মতবাদ পড়াশুনা করার স্বাধীনতা দিক তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জীবন ব্যবস্থার শৃংখলা থেকে বেরিয়ে আসার পর্যায়েই চলে যাবো এবং এটা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি বহির্ভূত চিন্তা। এর অর্থ দাঁড়াবে ইসলামকে মানব নির্মিত মতবাদসমূহের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা অর্থাৎ ইসলামের বিধান যেন মানুষের দেয়া বিধান থেকে নিকৃষ্ট। অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবে চলার মতো নয়, এর কার্যক্রম তাবিজ তুমার করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, বাস্তব ব্যবস্থা এই মানুষ নামক ক্ষুদ্র দাসই দিতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের কদর্য চিন্তা করা অবশ্যই মারাত্মক অপরাধ এবং এ হচ্ছে এক বিপজ্জনক কাজ এবং মানুষের দেয়া বিধানের কাছে এইভাবে পরাজয় স্বীকার করার পরিণাম ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ প্রদত্ত কর্মপদ্ধতি আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা হচ্ছে আমরা সকলেই ইসলামী দাওয়াতদানকারী। আমাদের কাছে রয়েছে বিশেষ এক চিন্তাধারা। এ চিন্তাধারা বাস্তবায়ন করে আমরা সকলেই পৃথিবীতে প্রচলিত মানব নির্মিত বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হবো, যা প্রকৃতপক্ষে জাহেলী যামানার চিন্তাধারা অনুসারে গড়ে উঠেছে। এসব বাতিল চিন্তাধারা আমাদের মন মগযের ওপর অবিরত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে এবং এর প্রভাব পড়ছে আমাদের সাহিত্য সাংস্কৃতি দৈনন্দিন জীবনধারার প্রতিটি পদক্ষেপ। এমতাবস্থায় যখন সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান জাহেলী চিন্তাধারার আলোকে আমরা হীনমন্য মনোভাব নিয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যৌক্তিকতা ও প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে, মানবমন্ডলীর কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব থেকে আমরা সরে দাঁড়াই এবং আমরা নিজেরাই আমাদের দেশ থেকে এবং আমাদের মন মগয থেকে সেই বাতিল মতবাদকে উৎখাত করার সুযোগ হারাই, যা আজ সর্বত্র বিজয় কেতন উড়িয়ে চলেছে।

এই দিক দিয়ে যখন বর্তমান অবস্থার দিকে আমরা তাকাই, তখন আমাদের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে হয় এবং এর ক্ষতি যে কত ধ্বংসাত্মক তা চিন্তা করে শেষ করা যায় না।

চিন্তা ও কাজের পদ্ধতি ইসলাম যা দিয়েছে তার মূল্য একজন মুসলমানের কাছে কোনো অংশে কম মনে করার কোনো সুযোগ নেই এবং এর পাশাপাশি অন্য বিশ্বাসগত চিন্তা পদ্ধতিগুলো জীবন্ত এটা মনে করা হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তুলনামূলক অধ্যয়নের চিন্তায় যখন

ইসলামী ব্যবস্থার পাশাপাশি অন্যান্য মতবাদ অধ্যয়ন করতে চাই, তখন প্রকারান্তরে ধরেই নেই যে, বাস্তব জগতের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ইসলামী ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আসলে এই সময় মনের এই কুচিন্তাকে কিছুতেই আমরা একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারি না। এমতাবস্থায়, বাস্তবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে না থাকলে আমাদের মন থেকে এটা কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয় যে, 'সকল কাজে ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয়া বর্তমান জগতে কিছুতেই উপকারী হতে পারে না।' বাতিল ব্যবস্থার অসারতা অনুধাবন করার জন্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী ইসলামী ব্যবস্থা ও বাতিল ব্যবস্থাকে পাশাপাশি পড়াশুনা করা। যেহেতু তারা মনে-প্রাণে ইসলামী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। আবারও আমি একথার ওপর জোর দিতে চাই যে, ইসলামের মূল বিশ্বাসকে বিজয়ী বিশ্বাস হিসাবে ধরে রাখার জন্যে প্রয়োজন যথাশীঘ্র ইসলামী আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করা। কারণ পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা (বাস্তব জীবনের জন্যে প্রদত্ত ইসলামী সমস্ত আইন কানুন) কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনে শরীক হওয়ার মাধ্যমেই একমাত্র ইসলামী আকীদার প্রতি আস্থাবান হওয়ার প্রমাণ পেশ করা যায়।

এভাবে পুনরায় বলছি, একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাই মানুষের জন্যে প্রকৃতি সংগত। এই জীবন পদ্ধতিই সব থেকে বড়, সব থেকে মযবুত এবং মানুষের সকল সমস্যা সমাধানে সব থেকে বেশী কার্যকর এবং মানুষের প্রকৃতির জন্যেও সব থেকে উপযোগী– তার চিন্তাধারাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্যে যেমন, তেমনি মানুষের মন মগযে এর সুশীতল পরশ বুলানোর ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার পূর্বেই এ মহান 'দ্বীন'-এর আকীদা সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করা খুবই জরুরী। কারণ এই প্রশান্তিই তাকে ধাপে ধাপে কঠিন থেকে কঠিনতর দায়িত্ব পালনে সাহস ও উৎসাহ জোগাবে এবং তত্ত্বকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করবে।

আর, ইসলামী চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইভাবে মন যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তখনই বাস্তবে সকল কিছুর ওপর এই ব্যবস্থাই যে একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা তা প্রমাণ করার জন্যে মনের মধ্যে শক্তি পাওয়া যাবে এবং তখনই ইসলামী আইন কানুন চালু করার দিকে পা বাড়ানো সহজ হবে। আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো কোনো কর্মীর ধমনীতে খুবই চাপ সৃষ্টি করে চলেছে, যার কারণে তারা ইসলামী ব্যবস্থাকে বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে দেখার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ অনেক সময়ে তাদেরকে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে, 'যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমরা আহবান জানাচ্ছ, তার বিস্তারিত রূপরেখা কী? এ ব্যবস্থা চালু করার জন্যে তোমাদের কাছে কী কী যুক্তি আছে? কী আইন কানুন আছে? এ সূরার মধ্যে তার বর্ণনা রয়েছে এবং এগুলো জানার জন্যেই তারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাদের আকীদা মযবুত করার পূর্বেই তারা সেই আইনগুলো জানতে চায়। প্রকৃতপক্ষে মক্কার জীবনে ঈমানের এই স্তরে তারা আল্লাহ তায়ালার বিধান মানার জন্যে যোগ্য হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন, এই স্তরে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ঈমানকে মযবুত করবে এবং তাদের মেযাজের সংগে যখন ঈমান খাপ খেয়ে যাবে, তখনই তাদের জীবনের জন্যে উপযোগী বিভিন্ন আইন কানুন নাযিল করা হবে। যেহেতু, এই সব আইন কানুনের মধ্যে যে কঠোরতা আছে তখন তাদের পক্ষে তা বর্দাশত করা সম্ভব হবে।

ইসলামী দাওয়াত দানকারীদের কর্তব্য হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় কোনো জিনিসের দিকে যেন তারা না তাকায়, তাদের বিভিন্ন কাজ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মনীতি পরিত্যাগ করতে পেরেছে, তারা যেন তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং যারা দ্বীন ইসলামের নিয়ম কানুনগুলোকে সর্বান্তকরণে মেনে নিতে পারেনি,

তাদের মর্যাদাকে যেন তারা ক্ষুণ্ণ না করে। তাদের কর্তব্য হবে সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্নের মোকাবেলায় দ্বীন ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এবং এই দ্বীনের নিয়ম নীতিগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার মাধ্যমে তাদের আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করা। এই কার্যক্রমই হচ্ছে প্রত্যেক মুসলমানের শক্তির মূল কথা এবং গোটা মুসলিম সমাজের শক্তির উৎস।

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতিটি জিনিসই বাস্তব অবস্থার উপযোগী এবং কোনোক্রমেই এ ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করা হয় নাই। সত্য এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন জিনিস। এই দুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। সত্য বিরোধী কোনো নিয়মকেই ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর যতো ভালো মত ও পথই আছে তার সবগুলোকেই পাশ্চাত্য জগৎ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত বলে দাবী করে বটে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কোনো দলীল সত্যায়িত করেনি বা ভালো বলে গ্রহণ করেনি। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যেমন অবিচল হতে হবে, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত সকল আইন কানুনকে চূড়ান্ত ও সুন্দরতম ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়াই হবে ঈমানের পরিচায়ক। একইভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া ও দৃঢ়ভাবে টিকে থাকাও জরুরী। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, এ আন্দোলন অবিকল প্রথম যুগের আন্দোলনের মতোই হবে– যেমন অনেকে মনে করে থাকেন।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে এটিই আমার শেষ কথা। এখানে অবশ্য আমি এই কথাটি বলতে চাই যে, মক্কী যুগে অবতীর্ণ কোরআনুল কারীমের সূরা ও আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহর সত্ত্বা ও অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ক্ষমতা ও এখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস এবং তিনিই যে সকল ক্ষমতার মালিক একথার প্রতি দৃঢ় আস্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা এসে গেছে। অবশ্যই আমি হৃদয় মন দিয়ে বুঝতে পেরেছি এবং আমি সর্বান্তকরণে মনে করি যে, ইসলামী দাওয়াতের ধারক ও বাহক যারা তাদের বুঝতে হবে এ পথের রূপরেখা কি, তাদের অবশ্যই এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এটিই সব থেকে সুন্দর পথ এবং এ বিশ্বাসের ওপর তাদের অবিচল হয়ে যেতে হবে এবং জানতে হবে যে তাদের কাছে যা আছে তাই ভালো এবং তারাই সবার ওপরে সবদিক দিয়ে মর্যাদাবান। 'নিশ্চয়ই এ কোরআন সেই পথেই পরিচালনা করে, যা সব থেকে মযবুত এবং সব থেকে স্থায়ী।' সত্যই বলেছেন মহান আল্লাহ।

আসুন, এবার আমরা দেখি সূরাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে কী আলোচনা এসেছে।

এ হচ্ছে একটি বিস্ময়কর সূরা। এ সূরাটি মক্কী যুগে অবতীর্ণ সেই সূরাগুলোর অন্যতম, যা তুলে ধরেছে আল কোরআনের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং সেই জীবন পদ্ধতির রূপরেখা, যা ইতিমধ্যে অন্য মৌলিক সূরাগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং ফী যিলালিল কোরআনের এই তাফসীরে যার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা হয়েছে। কোরআনের সেই বিশেষ স্বাতন্ত্র্যকে সূরাটি সংরক্ষণ করেছে, যার বাহ্যিক রূপ প্রতিটি সূরার মধ্যে বিদ্যমান এবং কোনো ভাবে কারো নযর থেকেই এ বৈশিষ্ট্যটি বাদ পড়ে না। প্রত্যেক সূরারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আর প্রত্যেক সূরার মধ্যে কিছু কিছু সুন্দর দিক এবং এমন কিছু বিষয় আছে যাকে কেন্দ্র করেই সে সূরার অবতারণা, রয়েছে তার মধ্যে আলোচনার বিষয়টিকে উপস্থাপনের বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি, রয়েছে এমন কিছু প্রভাবপূর্ণ ও জীবন্ত চিত্র এবং এমন কিছু ছায়া এমন কিছু পরিবেশ যার জন্যে প্রত্যেকটি সূরাই সমগুরুত্ব সম্পন্ন। এতদসত্ত্বেও কিছু বিষয় বারবার আসে এবং বারবার সেগুলোর উল্লেখ দ্বারা সে বিষয়টিকে মানুষের মন মগযে অংকিত করে দেয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়কে যখন বারবার তুলে ধরা হয়, তখন দেখা যায় সব কিছু মিলে একটি মাত্র বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে আল-কোরআনের অবতারণা, আর তা হচ্ছে মানুষ ও তার জীবন।

এরপরও সূরাটি নিজ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে একটি মৌলিক বিষয় তুলে ধরেছে। কোরআনের প্রকৃতিই হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে এবং প্রত্যেক পরিবেশের মধ্যে যখনই যে সূরাটি নাযিল হয়েছে তা আপন সুষমায় সমৃদ্ধ এক চমৎকার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে। এ সৌন্দর্য মানুষের কোমল অনুভূতিকে নাড়া দিয়েছে এবং মানুষকেও বানিয়েছে সুন্দর, পরিবেশ ও পরিবেশের ঘটনাবলীকে এবং ওই ঘটনাবলীর মাধ্যমে মানুষের মন মগযকেও সুন্দর করে তুলেছে।

হাঁ, এইই হচ্ছে প্রকৃত সত্য। এ মহাসত্যকে আমি আমার অন্তরের এবং আমার অনুভূতিতে গভীরভাবে অনুভব করেছি এবং আমি সূরাটির প্রাসংগিক বিষয়, দৃশ্যাবলী ও সকল ঘটনাবলী গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করে সেই অনুসারে আমার আচরণ নির্ধারণ করি। আর আমি মনে করি পাক পবিত্র এ কালামে আমি যে মজা পাই তা যে কোনো হৃদয়বান দিলওয়ালা লোক এর থেকে পেয়ে থাকে এর রং, রস ও মাধুর্য যে কোনো সজীব প্রাণকেই নাড়া দেয়। এ প্রসংগে আখেরাত সম্পর্কে যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে পাঠকের সামনে তা এমনভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন পাঠক আযাবের দৃশ্যগুলো নিজ চোখে দেখতে পায়।

এ সব কিছু এক সাথে মিলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের সত্যতা ও সার্বজনীনতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর এ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং সকল জীব জন্তুর মধ্যে দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে, ফুটে উঠেছে মানুষের অস্তিত্ব ও তার বিবেকের মধ্যে, প্রকাশিত হয়েছে গোটা দৃশ্য জগতের জানা অজানা অভ্যন্তরে। মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন ফুটে রয়েছে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে, জীব জন্তু ও মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতিতে। একইভাবে তাঁর প্রভুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্ববর্তীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে ও তাদের পদাংক অনুসরণে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য মানুষে মানুষে হানাহানিতে। সারা পৃথিবী জুড়ে যে বিশাল প্রকৃতি রয়েছে তার প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদি, যে সব ঘটনাবলী নিয়ত সংঘটিত হচ্ছে এবং ঝরে পড়ছে নিশিদিন তাঁর করুণারাশি অথবা কোনো বিপর্যয় সে কিছুর মধ্যে। এইভাবে মানুষের জীবন ও তার স্থায়িত্ব, তার বাস্তব অবস্থা ও আশা আকাংখা, বিশ্বপালকের কুদরত ও সৃষ্টি নৈপুণ্য সব কিছু মিলে প্রতিনিয়ত জানাচ্ছে তার প্রভুত্ব ও প্রতিপালন ক্ষমতা সম্পর্কে। সবশেষে আল কোরআন তুলে ধরছে কেয়ামতের দৃশ্যাবলীকে এবং বর্ণনা করেছে সেখানে কিভাবে গোটা মানবমন্ডলী তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হবে সে সম্পর্কে।

সূরাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতো কিছু আলোচনা হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে আকীদা, অর্থাৎ যা প্রকাশ্যে আছে এবং যা রয়েছে রহস্যে ঢাকা সে সব কিছুই আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব, একাধিপত্য এবং সর্বময় মালিক হওয়ার কথা ঘোষণা করছে। গোটা মানবমন্ডলী তার অস্তিত্বের কথা অনুভব করে, যেহেতু সৃষ্টির সকল কিছু স্রষ্টাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে, সৃষ্টির প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান স্রষ্টার উপস্থিতির অসংখ্য প্রমাণ, এ বিশ্বাস রূপ নির্ঝরিণী থেকে এবং এ মহা সৃষ্টির মধ্যে বিধৃত সকল রহস্যাবৃত জিনিস থেকে তার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর যে ক্ষমতা বিরাজ করছে সূরাটি সে বিষয়েও বিশদভাবে আলোচনা করেছে। জানিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে আলো ও অন্ধকার উভয়ের অস্তিত্ব, বিরাজ করছে এই মহা সৃষ্টির মধ্যে চাঁদ, সূর্য ও তারকারাজি, রয়েছে এর মধ্যে সুউচ্চে স্থাপিত বাগ বাগিচা এবং নিম্ন ভূমিতে বিরাজিত সব্জি বাগান, মুষলধারে বৃষ্টিপাত হওয়া ও পৃথিবীর দিকে দিকে প্রবাহিত হওয়া, কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকায় এই পানির মজুদ হয়ে থাকা এবং কোনো এলাকা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হওয়া, স্থল ও পানি ভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার সব কিছুর মধ্য থেকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য দান, অনুপস্থিত ও উপস্থিত সব কিছুর রহস্য, মুর্দা থেকে যিন্দার আগমন এবং যিন্দা থেকে মৃত জিনিসের বের হয়ে আসা, মাটির নীচে অন্ধকারের মধ্যে বীজ

লুকিয়ে থাকা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মাতৃজঠরে শুক্রবীজের অবস্থান এবং দলে দলে মানুষ, জ্বিন, পক্ষীকুল, জীবজন্তু, প্রথম দিককার ও শেষের, সব মৃত ও জীবিত এবং রাত ও দিন সদা সর্বদা মানুষের হেফাযত করা সবই মহান আল্লাহর দান।

গোটা পৃথিবীর মানুষের মধ্য থেকে একদল মানুষ আজ প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে এবং প্রকৃতির মধ্যকার এসব কিছু তাদের অনুভূতি রাজ্যে সৃষ্টি করেছে প্রচন্ড আন্দোলন। এজন্যে এর গূঢ় রহস্য বুঝার জন্যে তারা তাদের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ নিয়োগ করে চলেছে। তারপর যে সব প্রাণ মাতানো নতুন জিনিস তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে সেইগুলো হাসিল করার জন্যে তাদের মনের মধ্যে পয়দা হচ্ছে তীব্র আকাংখা ও ব্যাকুলতা। এরপর যখন এই সব প্রিয় জিনিস তাদের হৃদয় দুয়ারে আঘাত হানতে থাকে জাগাতে থাকে তাদের হৃদয়পটে নব নব চেতনা, তখন তাদের কাছে মনে হয় সম্ভবত এহেন জিনিসের সংস্পর্শে তারাই প্রথম এলো এবং অন্য মানুষের অন্তর ইতিপূর্বে এর সন্ধান আর কখনও পায়নি।

তাদের মনের এ অবস্থাকে, তাদের আচরণকে এবং তাদের বাস্তব অবস্থাকে তুলনা করা যায় একটি শ্রোতস্বিনী নদীর সাথে যার উত্তাল তরংগাভিঘাতে দুকূল ছাপিয়ে উঠছে। একবার তরংগ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে পুনরায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন আর এক তরংগ। এই ভাবে একটির পর আর একটি তরংগ আসছে আর আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়ির ওপরে।

এইভাবে উপর্যুপরি আসা এই অশান্ত ঢেউ মনের ওপর সৃষ্টি করছে অভূতপূর্ব এক উন্মাদনা, যার মধ্যে রয়েছে যুগপৎ ভয় ও তীব্র আবেগ, যার প্রতি আমরা ওপরে ইংগিত করেছি। এর সাথে শীঘ্রই আমরা ইনশাআল্লাহ আরও বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণনা করবো, যার সাথে এই প্রসংগের গভীর সাম স্য রয়েছে, ভীতিজনক হলেও সেগুলোতে রয়েছে আরও সৌন্দর্যের বহু নিদর্শন, রয়েছে প্রাণোচ্ছলকারী সজীবতা এবং রয়েছে ছবির মতো ফুটে ওঠা ঘটনাবলী, যা হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা দেয় প্রতিটি জিনিসের আর এর মধ্যে মধুর এক সুর ধ্বনিত হয়, যা হৃদয়গুলোকে একত্রিত করে একটি দল গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রত্যেক সংকট ও প্রত্যেক কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করতে উৎসাহ যোগায়।

আর আমরা এ কথা পূবেই বলে রাখছি যে, আমরা কিছুতেই এ সূরার মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোকে কারো অন্তরের মধ্যে বসিয়ে দিতে পারবো না। তবে আমরা সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনা যেমন আছে, তেমনিই উপস্থাপন করতে পারি মাত্র, মানুষের সকল গুণ, শক্তি ও উপায়ও আমরা গ্রহণ করতে পারি না এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়ার জন্যে। বরং, আমরা শুধু এতোটুকু করতে পারি যে, মহান এ কোরআন থেকে যারা দূরে সরে গেছে, তাদের কাছে এ ভান্ডারের ইমারত গড়ে তোলার জন্যে সকল প্রকার যুক্তি তুলে ধরতে পারি, যাতে করে ইসলামী সমাজ কোরআনের পরিবেশে এবং কোরআনের নিয়ম নীতির মধ্যে থেকে পরবর্তী অবস্থার প্রয়োজন মতো জীবন গড়ে তুলতে পারে।

আল কোরআনের পরিবেশে জীবন গড়ার অর্থ শুধু কোরআন চর্চা, কোরআন পাঠ এবং অপরকে কোরআন শেখানোই নয়, কোরআনের পরিবেশে বাস করার দ্বারা আমরা শুধু এই কাজটুকু করার কথাই বুঝাতে চাইনি। আমরা চেয়েছি মানুষের জীবন ও জীবনের প্রতিটি বিষয় আল কোরআনের শিক্ষা অনুসারে গড়ে উঠুক। আমরা চেয়েছি, যে পরিবেশে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো, আজ যদি অনুরূপ পরিবেশ বিরাজ করে, তাহলে সেই পরিবেশকে যেন আল কোরআন সেই ভাবে ঢেলে সাজাতে পারে যেমন করে অতীতে সাজিয়েছিলো। যেন সেইভাবে মানুষের অন্তর, কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে যেমন করে অতীতে করেছিলো। সেই সামাজিক সংহতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে যেমন করে অতীতে

আল কোরআনের আলোকে মানুষ গড়তে সক্ষম হয়েছিলো এবং আল কোরআনের আলোকে মানুষ সেইভাবে আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করতে পারে যেমন করে অতীতে করেছিলো। কোরআন চায় যে পরিবর্তন আসুক তেমনি করে মানুষের অন্তরে, চিন্তায় ও কাজে যাতে 'ইসলাম' (ইসলামী জীবন) গড়ে উঠতে পারে তার নিজের অন্তরের মধ্যে এবং অপরের অন্তরের মধ্যে ও এর প্রতিফলন ঘটে তার নিজের জীবনে এবং মানুষের জীবনেও। আমরা চাই, আজকের জাহেলিয়াতের মোকাবেলায় আল কোরআন আর একবার রুখে দাঁড়াক, রুখে দাঁড়াক আধুনিক জাহেলিয়াতের সকল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে, এর সর্বপ্রকার প্রচারনার বিরুদ্ধে, সকল ভুল অনুকরণ এবং বাতিল কাজের বিরুদ্ধে, এমনি করে সর্বপ্রকার চাপ প্রয়োগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ওই চাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। কোরআন চায় রাব্বুল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলার পর তার পথেই চলতে হবে আর আল্লাহর প্রতি পূর্ণাংগভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার ডাকে সাড়া দিতে হবে এবং আল্লাহর পথে টিকে থাকার জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা, সংগ্রাম ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের পর তার পথেই চলতে হবে এবং অন্যদেরকে এই পথে আসার জন্যে আহবান জানাতে হবে। এইই হচ্ছে আল কোরআনের সেই পরিবেশ, যেখানে মানুষের পক্ষে সুখে-শান্তিতে বাস করা সম্ভব। অতপর এ ধরনের পরিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে মানুষ আল কোরআনের স্বাদ অনুভব করবে। এটিই হচ্ছে সেই পরিবেশ, যার মধ্যে আল কোরআন নাযিল হয়েছিলো এবং এই অবস্থার মধ্যেই ইসলাম কাজ করেছে। আজকে যারা এই ধরনের পরিবেশে বাস করে না, তারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনুল কারীম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, তা তারা যতই কোরআন চর্চা করুক, পড়ুক এবং অপরকে কোরআনের জ্ঞান দান করুক না কেন।

আর, এ ব্যাপারে যারা আগ্রহী হবে তাদের ও কোরআনের মাঝে প্রকৃত যোগসূত্র ততোদিন পর্যন্ত কায়েম হবে না যতদিন সত্য সত্যই ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তারা বাস্তবে এই চেষ্টাকে কার্যকর না করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের কাজ, অর্থাৎ কোরআন থেকে আহরিত জ্ঞান অনুযায়ী কাজ না করবে। এইভাবে যখন মহান এ কেতাবকে ব্যবহার করবে, তখনই তারা কেতাবের মধুর স্বাদ পাবে এবং সেই বাঞ্ছিত ফল পাবে যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন।

এ সূরাটি যে মৌলিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের বিষয়, আলোচনা করেছে মুনিব প্রতিপালকের সাথে বান্দাদের সম্পর্ক নিরূপনণ করাকে। কে তিনি? এ সৃষ্টির উৎস কি? এ সৃষ্টির উর্ধে রয়েছে কোন অজানা রহস্য? এই বান্দারাই বা কারা? কে তাদেরকে এই অস্তিত্ব দান করলেন? কোন সেই মহান স্রষ্টা যিনি সৃষ্টি তাদেরকে করেছেন? কে তাদেরকে খাওয়াচ্ছেন? কে তাদেরকে দেখাশুনা করছেন? কে তাদের কার্যাবলী পরিচালনা করছেন? কে তাদের অন্তর ও চোখগুলোকে চালাচ্ছেন? কে তাদের রাত ও দিনকে আবর্তিত করছেন? কে তাদেরকে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন এবং পুনরায় তাদেরকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেবেন? কোন উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? আর কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তাদেরকে যিন্দা রাখবেন এবং কোন সে ফিরে যাওয়ার জায়গায় তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন? এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা সৃষ্টি মল্লিকার বিভিন্ন ফুল, এ সকল মরণশীল সৃষ্টি দ্বারা কে সাজিয়ে রেখেছেন এ নশ্বর বিশ্বকে? এই যে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ, এই যে প্রাণ মাতানো ফুলকুঁড়ি, এই যে পরতে পরতে সাজানো খাদ্য শস্য, এই যে অন্ধকারের চাদর ভেদকারী তারকারাজির রশ্মি, এই যে স্নিগ্ধ প্রভাতের শুভাগমন, এই যে দীর্ঘ রজনী এবং এই যে সন্তরণশীল নৌযানগুলো– এ সব কিছু কার পরিচালনায় চলছে? কার অদৃশ্য হাত ক্রিয়াশীল হয়ে রয়েছে এ সবের পেছনে? রয়েছে এ সবের পেছনে কোন সে মহারহস্য? কোন সে অজানা খবর? এই যে জাতিসমূহ, এই যে যুগের পর যুগ

ধরে মানুষের আনা-গোনা, ধ্বংস ও পুনর্গঠন- কে আছে এ সব কিছুর পেছনে! কে এগুলো ধ্বংস করছেন, আবার গড়ছেন, অবশেষে কেনই বা তিনি সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবেন? মানুষকে এ সব কিছুর পরিচালনার দায়িত্ব দান করার এবং সে সঠিকভাবে পরিচালনা করছে কিনা, তার পরীক্ষা নেয়ার মধ্যে রয়েছে কোন রহস্য? পরিশেষে ধ্বংস করে দেয়ার পর কী হবে তার শেষ পরিণতি? কি হবে অবশেষে তার হিসাব-নিকাশ?

এ সব প্রশ্নকে এবং দিগন্তব্যাপী যতো প্রকার প্রশ্ন হতে পারে সেসব কিছুকে সূরাটি বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঠকের অন্তরে তুলে ধরেছে, তুলে ধরেছে অত্যন্ত গভীরভাবে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন মক্কার সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে গভীরভাবে জড়িত, যার প্রেক্ষাপটে আল কোরআন আলোচনা করেছে। এ বিষয়ে পেছনের পাতাগুলোতে কিছু আলোচনা ইতিমধ্যে এসে গেছে। সেখানে আমরা আল কোরআনের প্রদত্ত রূপরেখা অনুসারে বক্তব্য রাখতে প্রয়াস পেয়েছি। কখনও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিনি বা মনগড়া কোনো আকীদা পেশ করিনি। মন মগযকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলতে পারে এমন কোন দার্শনিক তর্কের অবতারণাও করিনি। সদা সর্বদা আমাদের লক্ষ্য থেকেছে মানুষকে তার প্রকৃত মালিকের সাথে পরিচিত করে দেয়া, যাতে করে এই পরিচিতি মানুষকে তার মনিবের গোলামীতে আবদ্ধ করতে পারে, তাদের বিবেক ও আত্মাকে নত করে দেয় রাব্বুল আলামীনের সামনে। যেন তাদের প্রচেষ্টা ও কাজকে আনুগত্যের বাঁধনে বেঁধে দেয়। যেন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে দেয় তাদের অনুসরণ, অনুকরণ ও চিন্তাধারাকে এবং একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতার সামনেই যেন তাদেরকে নত হতে শেখায়, যার ক্ষমতা ছাড়া যমীন ও আসমানে আর কারো কোনো ক্ষমতা নাই।

সূরাটির মধ্যে আলোচনার গতি পুরাপুরিভাবে এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত। সুতরাং একথা অকাট্য সত্য যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রেযেকদাতা, তিনিই মালিক মনিব, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম, তিনিই তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তিবলে তাই করেন যা তিনি করতে চান এবং যাবতীয় ক্ষমতার একমাত্র তিনিই মালিক। আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই চোখের অন্তরালে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, সে সব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। তিনিই তেমনি করে পরিবর্তন করেন সকল হৃদয় ও দৃষ্টিকে যেমন করে তিনি আবর্তিত করেন দিন ও রাত্রিকে। আর এইভাবেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বান্দার জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিচালক একমাত্র তিনি। কেউ নেই এ ধরাধামে যে মানা করতে পারে অথবা হুকুম দিতে পারে, কেউ নেই যে দিতে পারে কোনো বিধান অথবা ফয়সালা, আর কেউ নেই এমন যে কোনো কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারে। এই সব ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার নামই হচ্ছে উলূহীয়্যাত, বা 'সার্বভৌমত্ব' এবং এই হচ্ছে উক্ত শব্দটির বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই যে গোটা মানবমন্ডলীর জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে, কেউ নেই যে সৃষ্টি করতে পারে অথবা রেযেক দিতে পারে (সরবরাহ করতে মানুষকে তার জীবন সামগ্রী), এমন নেই কেউ যে যিন্দা করতে পারে বা মারতে পারে, ক্ষতি বা উপকার করতে পারে, দিতে পারে বা বন্ধ করতে পারে, না ইচ্ছামত দুনিয়া ও আখেরাতে নিজে কোনো কিছুর মালিক হতে পারে, না অপরকে মালিক বানাতে পারে। আর সূরাটির প্রাসংগিক আলোচনায় যে সব দৃশ্য ও ঘটনাবলীর উল্লেখ হয়েছে, রোজ-হাশরের যে চমৎকার বর্ণনা তাতে একাধারে পাঠকের মন চমৎকৃত হয়, আর তার প্রাণ ভয় ও ভীতিতে ভরে উঠে। এ জীবন্ত ও প্রাণস্পর্শী দৃশ্যাবলী মনকে ভক্তি শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে দেয় আর ঝুঁকিয়ে দেয় পাঠকের মাথাকে আনুগত্যের অনুভূতিতে এবং গুটিয়ে নিয়ে আসে তার মনকে সকল গিরি সংকট ও সকল আশা আকাংখার দুয়ার থেকে।

আর সব থেকে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এ সূরার মধ্যে বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র আধিপত্য ও মালিকানার বিষয়টি। এ আলোচনা যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি গভীর, তেমনি ব্যাপক এবং তেমন সুদূর প্রসারী।

কিন্তু তৎকালীন মুসলিম জামায়াতের জীবনে যেসব সমস্যা ছিলো সেগুলোর আলোকে এমন হৃদয়গ্রাহী আলোচনা হয়েছে যার আলোকে যে কোনো সময়ের সমস্যা সংকুল মানুষ সঠিক পথটি নিরূপণ করতে পারবে আর তা হচ্ছে, জাহেলী যামানায় মানুষের মনগড়া প্রথা অনুসারে 'কোনো খাদ্য বা জবাইকৃত পশুকে হালাল বা হারাম করা অথবা কোনো কিছুকে নাকচ করা এবং সেগুলোর মধ্যে মানুষের জন্যে যেগুলো ক্ষতিকর নয় সেই সব মানত করা এবং পশু জবাই করা, সন্তানাদি ও ফল-মূল সম্পর্কিত মানত– কথাগুলোকে সূরাটির একেবারে শেষের দিকে রাখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'সুতরাং, খাও সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো। কি হলো তোমাদের, কেন তোমরা খাচ্ছ না সেই সব পশুর গোশত যেগুলোকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে! আর, যে সব জিনিসকে তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করে দিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে তো তিনি বিস্তারিতভাবে জানিয়েই দিয়েছেন। তবে, সেগুলোর মধ্যে, কোনো মযবুরীর কারণে যদি কোনো কিছু তোমরা না খাও তো সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য অনেকে এমনও আছে যারা সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা প্রবৃত্তির তাড়নে চলে। নিশ্চই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সীমা লংঘনকারীদেরকে ভালো করেই জানেন। আর (হে মানবমন্ডলী) প্রকাশ্য ও গোপনের অপরাধমূলক কাজগুলো পরিত্যাগ করো। জেনে বুঝে যারা অপরাধ করছে, শীঘ্রই তাদের সেই সব অপরাধজনক কাজের প্রতিফল অবশ্যই তাদেরকে দেয়া হবে। আর খেয়ো না সে সব পশুর গোশত যাদের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, যদি ত খাও তাহলে অবশ্যই তা হবে মারাত্মক অপরাধ, আর শয়তানের গোষ্ঠী তো সদা সর্বদা তাদের সংগী সাথীদের প্ররোচিত করে চলেছে যেন তারা তোমাদের সাথে নানা প্রকার কূটতর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, তাদের কথামত যদি তোমরা চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরাও মোশরেক (শেরকের গুনাহের মধ্যে লিপ্ত) হয়ে যাবে (১২১-১১৮) ১৩৬-১৪০ পর্যন্ত আয়াতগুলোর তর্জমাও দেখুন)।...... তিনি নিশ্চয় অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

বর্তমান মুসলিম উম্মাহর এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা এবং তাদের চতুর্দিকে রয়েছে সেই জাহেলিয়াত, অর্থাৎ তারা আইন রচনার কাজের মধ্যে প্রাচীন জাহেলিয়াতের অনুরূপ ব্যবহার করে চলেছে। এ ছাড়াও অন্য যে বড় সমস্যাটি সর্বত্র বিরাজ করছে, তা হচ্ছে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সমস্যা, যা নিয়ে গোটা সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা এসেছে, আর এই বিষয়টিই মক্কী সূরাগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মাদানী সূরাগুলোর মধ্যে যেখানে সংগঠন ও আইন কানুনের কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেও এ বিষয়ের ওপর সঠিক ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

যে মুসলিম জামায়াত সূরাটির বর্ণনা ও প্রভাবপূর্ণ কথাগুলোকে মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করার জন্যে আগ্রহ সহকারে এগিয়ে এসেছে, সাথে সাথে জাহেলিয়াতের আমলে প্রচলিত গৃহপালিত পশু, যবাই ও মানতের জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে, তাদের প্রসংগেই এখানে বিশেষভাবে কথা বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে কিভাবে তারা ইসলামী আইন মেনে চলবে এবং ইসলামী আকীদাকে কিভাবে মনের মধ্যে দৃঢ়তার সাথে পোষণ করবে। আবারও বলছি, সে আকীদার মূল কথা হচ্ছে. প্রভুত্ব ও দাসত্ব। এই বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার ওপর নির্ভর করবে সে ঈমানের ওপর টিকে আছে, না কুফরীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ

করেছে, না জাহেলিয়াতের কুহেলিকার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। এই মুসলিম জনপদের কাছেই আমরা সেই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যা এই সূরার মধ্যে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। আর এরপর শীঘ্রই এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা আসছে যাতে করে এই দ্বীনের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তরে স্থির বিশ্বাস জন্মায় এবং দ্বীনের এ অর্থটি স্পষ্ট হয় যে, প্রত্যেকটি ছোট অংশের ব্যাপারেও সরাসরি আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে নিজেকে সোপর্দ করা দরকার এবং এই ব্যবহারই হবে আল্লাহর আইন মানার শামিল। এটা না করা হলে শুধু ওই ছোট জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর শাসন ক্ষমতাকে অমান্য করাই বুঝাবে, তা নয়, বরং সম্পূর্ণ দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়াই বুঝাবে।

এমনি করে মানুষের জীবনের যে কোন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র ফয়সালাদাতা তা জানতে হবে এবং জীবনের সকল কিছুর ওপরে তার পূর্ণাংগ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে– এ কথার ওপর গোটা মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে– জীবনে সকল বিষয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ ছোট বা বড়, সর্ব বিষয়ে দ্বীনের নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে– গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে নিজেদেরকে মূল মালিকের সাথে, যেহেতু সারা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরই নিরংকুশ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে এই উম্মতের দায়িত্ব যেমন করে সারা বিশ্বের ওপর তার সার্বভৌম ক্ষমতা অনিরুদ্ধভাবে চলছে। আর এ সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারে তাঁকে কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না বা তাকে সাহায্য করার জন্যেও কাউকে অংশীদার বানানো লাগে না।

সমস্ত সূরার মধ্যে, পশু ও ফসলাদি মানত সম্পর্কে জাহেলী যুগের রীতি নীতির সমালোচনা করা হয়েছে। এ গুলোর সমালোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন ভাবে। কোনোটির সামালোচনা করা হয়েছে সরাসরিভাবে যাতে করে এসব রীতি নীতির প্রতি আল্লাহর আক্রোশ প্রকাশ পায় এবং এগুলোকে চিরদিনের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয় এবং হালাল হারাম বিধান দেয়ার ব্যাপারেও বান্দার কোন এখতিয়ার খাটানোর অধিকার নাই অথবা আল্লাহর প্রতি আকীদার বিষয়েও কারো কোনো অংশীদারিত্ব নাই একথা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য যে আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে সরল সঠিক ও মযবুত পথ। যে এ পথ পরিহার করবে সে দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে। এর পূর্বের আয়াতগুলোতে ধর্মীয় প্রতীকসমূহ সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে পরিপূরক হিসাবে নীচে আরও কিছু বর্ণনা আসছে,

'আর তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সুউচ্চে অবস্থিত বাগ-বাগিচা গড়ে তুলেছেন আরও গড়ে তুলেছেন এমন বাগিচা যা মাটিতে অনুচ্চ অবস্থায় থেকে ফল দান করে। আরও ....এইগুলো সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে তোমরা ভয় করে চলতে পারো। (আয়া ১৪১-১৫৩)

আর এমনি করে আমরা দেখছি জীব জানোয়ারের গোশত হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে এবং পশু ও ফলমূল মানত করার ছোট-খাটো বিষয়ে ফয়সালা দেয়া হয়েছে এবং সন্তানাদি উৎসর্গ করার বিষয়ে পরিষ্কার বিধান দেয়া হয়েছে। যেহেতু তারা জাহেলী যামানার অনুসরণে ভুল পথে চলছিলো। বিস্তারিত আলোচনা এসেছে সঠিক পথ ও ভুল পথ সম্পর্কে এবং আল্লাহর পথে ও শয়তানের পথে চলার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে কিসে আসে আল্লাহর রহমত এবং কিসের কারণে মহান আল্লাহর অসন্তোষ নাযিল হয়, চিন্তা করতে বলা হয়েছে– আল্লাহর প্রভুত্ব কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দিতে হবে অথবা তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর দেখানো মযবুত ও সোজা পথে চলতে হবে, এপথ ছেড়ে অন্য কোন পথে চলার স্বাধীনতা নেই এবং সর্বোপরি আলোচনা এসেছে আল্লাহর অসীম করুণা ভরা পথ থেকে দুরে সরে যাওয়ার জন্যে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়ার মানসিকতার ওপর।

একই ভাবে আমরা দেখতে পাই, একই এলাকায় সমুন্নত স্থানে বাগিচা এবং নিম্নভূমির বাগিচার মধ্যে সৃষ্টি ও যিন্দা করার কাজের যে হৃদয়গ্রাহী সঞ্জীবনী দৃশ্যাবলী ফুটে উঠেছে তার বর্ণনার মধ্যে বর্ণনা এসেছে খেজুর ও বিভিন্ন রংয়ের ফসলের, যায়তুন ফলের এবং আমাদের জানা ডালিমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং সাদৃশ্যবিহীন বিভিন্ন ফলের। আরও দেখতে পাই এ সূরাতে যেমন সাক্ষ্য দান করার মতো কিছু জিনিস রয়েছে তেমনি রয়েছে, সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কিছু বিষয় বা বস্তুও। আরও দেখতে পাই মোশরেকদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা।

এইভাবে গোটা সূরাটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে রকমারি দৃশ্যাবলীর বর্ণনা, কিন্তু এর সাথেই দেখা যায় উদারহণ পেশ না করেই সরাসরি আকীদার বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা। এ সকল বর্ণনার প্রত্যেকটির মধ্যে রয়েছে দ্বীন ইসলামের প্রতি মানুষকে এগিয়ে দেয়ার প্রেরণামূলক কথা এবং সর্বোপরি আল্লাহর শাসন ক্ষমতা ও ছোট-বড় সব বিষয়ে আইন দানের অধিকার যে একমাত্র আল্লাহর এ বিষয়ে এসেছে বিশদ বর্ণনা।

এতোক্ষণে সম্ভবত আমরা সূরাটির প্রসংগ অনেকাংশে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা এর মধ্যে আলোচিত বিষয়ের ওপর কিছু কথা বলতে চাই, যার মধ্যে আকীদার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে জড়িত এবং এর মধ্যে আইন কানুন এবং শাসন ক্ষমতা কার হতে হবে সেই বিষয়েও কিছু ইংগিত রয়েছে। এ হচ্ছে সেই প্রসংগ, যার সম্পর্কে আমরা বলব না, এ সূরাটির বর্ণনা ও আলোচ্য বিষয়ের প্রভাবে বহু লোক দলে দলে ইসলামের দিকে এগিয়ে এসেছে এবং সারা বিশ্বে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে এ চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা এসেছে। বরং, আমরা বলবো যে, আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের বিষয়টিই সারা সূরা জুড়ে প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে রয়েছে, সুতরাং বুঝা গেলো এই দ্বীনের মূল কথাও এইটিই এবং ছোট-বড় সকল জনপদে এবং সকল জীবনের সকল বিষয়ে তারই আইন চালু করা এর লক্ষ্য যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং, এখন আমরা সূরাটির মধ্যে আলোচিত বিষয় ও বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে বিবরণ দেয়ার পূর্বে সংক্ষেপে কিছু কথা রাখতে চাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আসমা বিনতে ইয়াযেদ জাবির, আনাস ইবনে মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েতগুলো পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী যিন্দেগীতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং গোটা সূরাটি এক সাথেই নাযিল হয়েছে।

অবশ্য, এসব রেওয়ায়াতে সূরাটি নাযিল হওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখের কথা বলা হয়নি অথবা বর্ণনাধারার মধ্যেও এমন কোনো ইংগিত নাই যাতে করে মক্কী যুগের কোন সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যেতে পারে। তবে এটা বুঝা যায় যে, সূরায় আল হাজর-এর পর এটি নাযিল হয়েছে এবং সম্ভবত এটির ক্রমিক নম্বর হচ্ছে পঞ্চান্ন। কিন্তু, এটাও সত্য যে, সূরায় আল বাকারার অবতীর্ণ কাল সম্পর্কে যেভাবে বলা সম্ভব হয়েছে ঐ ভাবে অন্যান্য সূরা নাযিলের নির্দিষ্ট তারিখ বা সময় সুনির্দিষ্টভাবে বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে, সম্ভবত এই কথাটিই সঠিক যে, যে কোনো সূরার বর্ণনাক্রম অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা শুরু হওয়ার সময়টিই বলতে পেরেছি, সম্পূর্ণ সূরা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারিনি। এমনও অনেক সময়ে দেখা গেছে লেখার সময়ে প্রথম দিকে অবতীর্ণ কোনো কোনো অংশকে পরবর্তীতে অবতীর্ণ অন্য কোনো অংশের পরে রাখা হয়েছে, কারণ এটিই আল্লাহর ইচ্ছা এবং অর্থের দিক দিয়ে বেশী উপযোগী মনে করা হয়েছে। তবে, সূরায় আনয়াম সবটুকু একই সাথে নাযিল হয়েছে, যদিও নাযিল হওয়ার তারিখটি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না। আমরা এতোটুকু অবশ্য বলতে পারি যে, একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত এ সূরা নয়, সম্ভবত পঞ্চম বা ষষ্ঠ বছরে এ সূরা নাযিল হয়েছে। এইভাবে পূর্বে বা পরে নাযিল হওয়ার যে তথ্য এখানে পেশ করছি তাতে

ক্রমধারার বর্ণনার অধিক অন্য কোনো পার্থক্য এ সূরাগুলোর মধ্যে নাই, যেহেতু মক্কী এ সব সূরার লক্ষ্য একই, আর তা হচ্ছে ইসলামের দাওয়াত দান এবং মোশরেকদের সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হওয়া, এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় তাদের মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং রসূল (স.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার প্রয়াস। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটির ভূমিকা ছিলো যে হারে বিরোধীরা সত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো, আর তাকে মিথ্যাবাদী বানানোর জন্যে তারা যতো বেশী চেষ্টা করে যাচ্ছিলো, তিনিও ততো জোর দিয়ে ইসলামী আকীদার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন।

ইবনে আব্বাস এবং কাতাদা থেকে একটি রেওয়ায়াত পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, দুটি আয়াত ব্যতীত বাকি মক্কায় অবতীর্ণ। একমাত্র দুটি আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়েছে, আর সে দুটি হচ্ছে,

'তারা আল্লাহকে সেই সময়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেনি যখন ..... করার জন্যে ছেড়ে দাও।' (আয়াত ৯১)

এই আয়াতটি যা দু'জন ইহুদী মালেক ইবনে সয়েফ এবং কা'ব ইবনে আশরাফ-এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিলো। আবার আল্লাহর আর একটি বাণী,

'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা .....পছন্দ করেন না।' (আয়াত ১৪১)

এই আয়াতটি সাবেত ইবনে কায়েস শামস আল আনসারী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, অবশ্য ইবনে জুরায়েয এবং মাওয়ারদী বলেন, এ আয়াতটি মোয়ায ইবনে জাবাল সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আয়াতটির ব্যাপারে প্রথম রেওয়াতে এসেছে, সম্ভবত এই জন্যে যে, এর মধ্যে মূসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ কেতাবের উল্লেখ হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এ কেতাব গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও নূর অর্থাৎ পথ প্রদর্শক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলার জন্যে আলো এবং এ আয়াতটিতে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা এ কেতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছো যা তোমরা প্রকাশ্যভাবে দেখাচ্ছো।' আর যদি মোজাহেদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর থেকে বর্ণিত রেওয়াতগুলোর দিকে খেয়াল করা হতো, তাহলে ওরা আয়াতটিতে বুঝতে পারতো, 'মা আনযালাল্লাহু মিন শায়ইন' এর উদ্দেশ্য মক্কার মোশরেকরা। যেহেতু আয়াতটি পড়া হয়েছে এইভাবে,

'বলো, কে নাযিল করেছে সেই কেতাবটি যা, মূসা নিয়ে এসেছে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়াত ও মূল হিসাবে, তারা এ কেতাবকে কিছু কাগজের সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছে এবং এর কিছু অংশ তারা প্রকাশ করছে আর গোপন রাখছে অনেকাংশকে।' সুতরাং, এ কেরাতে বুঝা যায় যে, আয়াতটি দ্বারা ইহুদীদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাদেরকে সম্বোধন করা হয়নি। আর এই কারণেই আয়াতটি সম্ভবত মক্কায় অবতীর্ণ।

দ্বিতীয় আয়াতটির প্রসংগ বিচার করলে আয়াতটিকে মাদানী মনে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ এ আয়াতটিকে ছাড়া পূর্বের আয়াতটির অর্থ ও শব্দগুলো বাদ পড়ে যায়। আর হাদীসটিতে বলা হয়েছে ওপরে অবস্থিত বাগ বাগিচা ও পশুর মধ্য থেকে আরোহণের বস্তু এবং বিছানো জিনিস (শাকসব্জি) বানিয়েছেন তিনি। আয়াতটির মূল শব্দগুলো দ্রষ্টব্য। তারপর, দেখুন, প্রসংগ এগিয়ে চলেছে 'আনয়াম'সম্পকিত কথাটিকে পূর্ণাংগ করার দিকে। এই 'আনয়াম'(অর্থাৎ গৃহপালিত পশু) কথাটিকে 'ফলমূল'-এর উল্লেখের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কিছু মিলে আসলে বিষয় একটিই যা আমরা পূর্বের বিশেষ বাক্যে হালাল, হারাম ও মানত সম্পর্কিত কথায় উল্লেখ করেছি। আর যে সব ব্যক্তি এই সূরাটিকে মাদানী (অর্থাৎ মদীনায় অবতীর্ণ) মনে করেছেন তারা আল্লাহর এই বাণীকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন,

'খাও এর ফল থেকে যখন এ বৃক্ষ ফল দিতে শুরু করে এবং যে দিন এর ফল পাড়া হবে সেদিন এর হক আদায় করো।'

'হক' থেকে তারা 'যাকাত' বুঝেছেন। আর যেহেতু যাকাত মাদানী যিন্দেগীতে ফরয হয়েছিলো এবং তার পরিমাণও ওই সময় নির্ধারিত হয়েছিলো এই কারণে সূরাটি অবশ্যই মদীনার জীবনে নাযিল হয়েছিলো বলে বুঝা যায়। কিন্তু একমাত্র এ অর্থটিই এ আয়াতে বুঝতে হবে এটা জরুরী নয়, যেহেতু হাদীসে এর তাফসীর করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ আয়াতটিতে সদকার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফল পাড়ার সময় যারা সেখানে হাযির হবে বা ওই পথ দিয়ে যাবে অথবা আত্মীয়-স্বজন যারা আশেপাশে থাকবে, তাদেরকে ওই ফসল বা ফল থেকে খেতে দিতে হবে। আর, এরপর, যাকাতের সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ফল বা ফসলের এক-দশমাংশ বা বিশ ভাগের এক ভাগ (যদি সেচ দ্বারা ফল বা ফসল উৎপাদন করা হয়) যাকাত হিসাবে দিতে হবে। সুতরাং, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে আয়াতটি মক্কী যেহেতু এখানে দেয়ার জন্যে কোনো পরিমাণের কথা উল্লেখিত হয়নি।

সা'লাবী বলেন, ছয়টি আয়াত ব্যতীত সূরায় আনআমের বাকি সব অংশটুকু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ ছয়টি আয়াতের মধ্যে 'অমা ক্বাদারুল্লাহা হাক্বকা ক্বাদ্‌রিহী'– থেকে তিনটি আয়াত এবং 'কুল তা'আলাও আত্‌লু মা হার্‌রামা রব্বুকুম আলাইকুম'– থেকে তিনটি আয়াত।

প্রথম আয়াতগুলোকে আমরা মক্কী বলেছি, অথচ এই আয়াতগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতগুলোকে যতোটা মক্কী মনে হয় প্রথম আয়াতটিকে ততোটা মনে হয় না।

দ্বিতীয় আয়াতগুলো সম্পর্কে যতোটা জানা যায়, কোন সাহাবা বা তাবেঈ মাদানী বলেননি অথবা এগুলোর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেও এমন কিছু নাই যার কারণে এগুলোকে মাদানী বলা যায়। আয়াতগুলোতে জাহেলী যুগে প্রচলিত চিন্তাধারা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে যবায়ের পশু এবং মানতের হারাম-হালাল সম্পর্কিত কথাও রয়েছে যার বেশ কিছু বিবরণ ইতিপূর্বে এসে গেছে। সুতরাং আমরা এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলেই বুঝেছি।

দু'জন আমীরুল মোমেনীনের আমলে সম্পাদিত কোরআনের কপিগুলোতে নিম্নলিখিত আয়াতগুলোকে মাদানী বলা হয়েছে, ২০, ২৩, ৯১, ৯২, ১১৪, ১৪১, ১৫১, ১৫২, ১৫৩। আবার ৯১, ৯২, ১৪১ এবং ১৫১–১৫৩ আয়াতগুলোকেও মাদানী বলা হয়েছে। আর ২০, ২৩, ১১৪ আয়াতগুলোর কারণে ধারণা হয় সূরাটি মাদানী। তবে আহ্‌লে কেতাবদের কথা আসাতে আবার মক্কী বলেও মনে হতে চায়। কিন্তু এটাও সত্য, অনেক মক্কী সূরা এবং আয়াতের আহলে কেতাবদের কথা পাওয়া যায়।

এ সব কিছুকে সামনে রেখেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, গোটা সূরাটি একটি রাতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীসে এসেছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আসমা বিন্‌তে ইয়াযীদ, আর একটি রেওয়ায়েতে শুধু আসমা থেকে হাদীসটি পাওয়া গেছে যে, তিনি বলেছেন, একই সময়ে সূরায়ে আনয়াম নবী (স.)-এর ওপর নাযিল হয়, আর সে সময় আমি তার উঁটের লাগাম ধরে (দাঁড়িয়ে) ছিলাম এবং তখন আমার মনে হচ্ছিলো ওহীর চাপে উটের হাড়গুলো ভেংগে যাচ্ছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীসটি তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, সূরায় আনআম মক্কা শরীফে এক রাতে, একই সময়ে সম্পূর্ণ নাযিল হয়। এ সময়ে এই শহরের চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা জোরে জোরে তাসবীহ পড়ছিলেন।

ওপরের হাদীস দুটি ওই হাদীস থেকে বেশী জোরদার যার দ্বারা এ সূরার কোনো কোনো আয়াতকে মদানী বলা হয়। আর এর কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ওই সব জিনিস হালাল হওয়া সম্পর্কে কথা রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে দেয়া হয়েছে।

আর বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, সূরাটির বর্ণনাধারাতে গ্রহণ ও বর্জনের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাতে অন্তরের মধ্যে এক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়, অথবা মনে হয় এ যেন এক কুলু কুলু নদিনী স্রোতস্বিনী ছোট্ট একটি নদী, যার গতি পথে নাই কোন বাধা, অথবা মুহূর্তের জন্যেও তার স্রোত থেমে যায় না। সূরাটির আয়াতগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যায় যে মনে হয় একটি আর একটিকে সত্যায়িত করছে, অর্থাৎ প্রতিটি আয়াতের কথাগুলো অপর আয়াতের কথা দ্বারা আরও মযবুতভাবে প্রমাণিত হয়।

সূরাটির আলোচ্য মূল বিষয়বস্তু ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সূচনাতে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু ইংগিত দিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত আরও কিছু কথা বলা জরুরী বোধ করছি।

আবূ বকর ইবনে মারদাবিয়া আনাস ইবনে মালেকের বরাত দিয়ে একটি হাদীস পেশ করেছেন। এতে রসূল (স.) বলেছেন বলে জানা যায়, সূরায় আনয়াম নাযিল হওয়ার সময় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত প্লাবিত করে ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর তাসবীহ গাইতে গাইতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে নেমে এলেন, আর এখন তাদের এতো গুঞ্জরণে পৃথিবী মুহুর্মুহু প্রকম্পিত হচ্ছিলো। রসূল (স.)-ও এ সময়ে বারবার পড়ছিলেন, সোবহানাল্লাহিল আযীম, সোবহানাল্লাহিল আযীম।

ফেরেশতাদের সারিবদ্ধভাবে এই আগমনের বার্তা ও ধরা-পৃষ্ঠের এই ভাবে প্রকম্পিত হওয়ার কথা যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে সূরাটির মধ্যে সবখানে। ফেরেশতাদের সুশৃংখলভাবে এই আগমনের দৃশ্যটি মনকে কাঁপিয়ে তুলছিলো, প্রকম্পিত হচ্ছিলো গোটা বিশ্ব। এ মহান দৃশ্য, প্রাণ মাতানো এ ঘটনা এবং আশ্চর্য এ অবস্থাটি এতোই সুন্দর যার সাথে কোন কিছুর তুলনা করা মুশকিল। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, প্রাণ উজ্জীবনকারী এ অবস্থা ও এ দৃশ্যকে তুলনা করা যায় এক স্রোতস্বিনী নদীর সাথে যা কুলু কুলু নাদে বয়ে যায় দিবা-নিশি, আর নিয়ে যায় ভক্তের হৃদয়কে সুরময় এক জগতে। এ নদীতে জোয়ারের সময় উঠে আসে প্রচন্ড ঢেউ, যা উপর্যুপরিভাবে আছড়ে পড়তে থাকে অনিরুদ্ধ গতিতে বালিয়াড়ির ওপরে। এক ঢেউ শেষ হতে না হতে আবার উঠে আসে আর এক ঢেউ। এইভাবে এক ঢেউয়ের পানি অপর ঢেউ-এর সাথে মিলিত হয়ে অপর ঢেউটি হয়ে যায় বিলীন।

আর মূল যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সূরাটির আলোচনার ধারা এগিয়ে চলছে তা এমন শক্তিশালী যে যতো কথা বা পার্শ্ব বিষয় এর মধ্যে এসেছে সে সবগুলো এই মূল ধারার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। এ জন্যে, কোনো বিষয়কে মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এটা হচ্ছে এমন এক ঢেউ যা এসে কিনারায় আছড়ে পড়ার সাথে সাথেই উঠে আসে আর এক ঢেউ এবং পূর্বের ঢেউ পরের ঢেউয়ের সাথে মিশে আপন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এইভাবে সকল ঢেউ মিলে একে অপরকে পূর্ণাংগতা দান করে চলেছে।

আর এই জন্যেই আমরা সূরার মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা না করে এর সকল অংশকে এক সাগরের বিভিন্ন ঢেউয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে তুলনা করে বুঝতে চাই।

সূরাটি শুরু হয়েছে সেই মোশরেকদেরকে সম্বোধন করার মাধ্যমে, যারা আল্লাহর সাথে অন্য আরও অনেককে প্রভুত্ব কর্তৃত্বের মালিক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো। এজন্যে ওদেরকে সম্বোধন করে সর্ব প্রথম আল্লাহর একত্ব, সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র আধিপত্য ও সকল ক্ষমতার নিরংকুশ মালিকানা যে একমাত্র তাঁরই সে বিষয়ে ওদেরকে এবং ওদের বিবেককে আকর্ষণ করা হচ্ছে, আর তার জন্যে প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এমন কি তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে যে একই নিয়মের সুর ধ্বনিত হচ্ছে, সেই নিয়মটিকে তাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে

তাদেরকে চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে একই শক্তির এই যে ধারা এটাই তো পরিব্যাপ্ত সবখানে। তিনটি আয়াতের মাধ্যমে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে শুরু করা হয়েছে সেই সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা– যা আকাশে, বাতাসে, ধরিত্রির বুকে ও নভোমন্ডলের সবকিছুর সাথে জড়িত। এসব জিনিসের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনটি প্রধান জিনিসের ওপর আলোচনা করা হয়েছে গভীরভাবে এবং ব্যাপকভাবে এই মহাসৃষ্টির সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে।

'সকল প্রশংসা ও কৃতিত্ব মহান আল্লাহর, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে এবং বানিয়েছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্তেও কাফেররা তাদের মালিকের সাথে অন্য জিনিসকে সমান বানাতে চায়। তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাটি দ্বারা, তারপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমাদের জীবন কালের সময়টিকে। আর তাঁরই কাছে রয়েছে সেই নির্ধারিত সময়ের খবর। এরপরও তোমরা সন্দেহ করছো! আর আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত রয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবখানে। তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য খবর। আরও তিনি জানেন যা তোমরা রোজগার করো (সে বিষয়ে)।

খেয়াল করুন, ওপরের তিনটি আয়াতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টি জগতের সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁর গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা জানাচ্ছেন। প্রথম আয়াতটিতে গোটা সৃষ্টির সাথে মানুষের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াতটিতেও সব কিছুর সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে-এর পর তৃতীয় আয়াতটিতে দেখানো হয়েছে যে, মহান আকাশ ও পৃথিবীর সবখানে আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব ছড়িয়ে রয়েছে।

কী চমৎকার, কী সুন্দর, কী সামগ্রিক এবং কতো ব্যাপক কথা প্রকাশ করা হয়েছে এই আয়াত তিনটির মধ্যে।

আর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনেই রয়েছে গোটা সৃষ্টিজগত, সেই সৃষ্টিজগতের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁচার তাগিদে মানুষ নানা প্রকার চেষ্টা, তদ্বীর করে চলেছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রুজি রোজগারের চেষ্টায় রত যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সম্রাট, যার হাতে সকল প্রভুত্ব কর্তৃত্ব বর্তমান। যার হাতে গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু এবং যাবতীয় রুজি রোজগারের চাবিকাঠি, সেই মহান সত্ত্বার সামনেই অবারিত হয়ে রয়েছে মোশরেকদের শেরক। সন্দেহবাদীদের সন্দেহ পোষণ সত্তেও সর্বদা ঘটে চলেছে এমন কিছু কাজ যা যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্যে শিক্ষণীয়। সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে সেই ব্যক্তির কোনো স্থান বা মর্যাদা নাই, যে আল্লাহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, তার নিজের কাছেও তার কোনো সম্মান নাই এবং তার অন্তর ও বুদ্ধির কাছেও সে কোনো যুক্তি খুঁজে পায় না।

এহেন অবস্থায় অস্বীকারকারীদের জন্যে আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে চরম শাস্তি ও তাদের ভীষণ কদর্য অবস্থার কথা জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সৃষ্টির মধ্যে এবং তার কাছেও সে কোনো মূল্য পায় না। আর তার এই বিস্ময়কর ভূমিকার কারণে নেমে আসে তার প্রতি সব দিক থেকে শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার, সে ডুবে যায় বিস্মৃতির অতল তলে, কিন্তু মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতা ও মহিমা সমুজ্জ্বল হতেই থাকে। তার এই অস্বীকৃতির মনোভাব অস্বীকারকারীদের সত্যের সামনে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হতাশগ্রাস্ত হতে বাধ্য করে এবং তার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় কোনো যুক্তি বা দলীল-প্রমাণ দ্বারা সে তার অবস্থানকে মযবুত বানাতে পারেনি নাই, বরং নিছক তার খোশ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সে সত্যের বিরোধী হয়েছে, অথচ তার অন্তরও তাকে সমর্থন করে না। এরশাদ হচ্ছে,

'তাদের রব প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যের পক্ষে যে কোনো নিদর্শন এসেছে, তাকে তারা অস্বীকার করেছে, সত্য সমাগত হওয়ার পরেও তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে।

সুতরাং সত্যের-সাথে যে ঠাট্টা মস্কারি ও উপহাস বিদ্রূপ তারা করতে থেকেছে তার ফল ভোগ করার খবর শীঘ্রই আসছে .... বলে দাও (হে রসূল) পৃথিবীতে একটু ভ্রমণ করো এবং দেখো, সত্য বিরোধী ও সত্যকে অস্বীকারকারীদের কী করুণ পরিণতি হয়েছে অতীতে। (৪-১১) আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন।

এবারে দেখুন প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের মূল তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সেই তৃতীয় বিবৃতিটি পুনরায় উল্লেখিত হয়েছে যা হৃদয়ের মধ্যে এক তুফান সৃষ্টি করে, অন্তর-মনকে আলোকিত করে তোলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুর ওপর আল্লাহ পাকের মালিকানার তীব্র অনুভূতি এবং প্রশান্তিতে ভরে দেয় সত্য সন্ধিৎসু ব্যক্তিদের গোটা অস্তিত্বকে রাত ও দিনের শান্তিবহনকারী মুহূর্তগুলো। সে যেন দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায় মহান ও মহীয়ান রেযেকদাতাকে গভীরভাবে সে অনুভব করে যে একমাত্র তিনিই সরবরাহ করেন তাকে তার সকল প্রয়োজনীয় জিনিস এবং প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই তাঁকে দেয় না বা দিতে পারে না। একমাত্র তিনিই তার দরদী অভিভাবক। তিনি এমন অভিভাবক যিনি ছাড়া আর কেউ নাই, একমাত্র তাঁর কাছেই বান্দা আত্মসমর্পণ করতে পারে এবং শুধু তাঁর কাছেই নিজেকে সে সঁপে দিয়ে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করে। তাই, সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর কাছেই নিজেকে বিলিয়ে দেয়া বান্দার কর্তব্য। অস্বীকারকারী ও নাফরমানদেরকে পরপারে অবশ্যই তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন। তিনিই মন্দ ও ভালো সব কিছুর মালিক, তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম এবং তিনিই সর্বশক্তিমান তাঁর বান্দার ওপর, তিনিই বিজ্ঞানময়– খবরা রাখনে ওয়ালা।

রসূল (স.) দাওয়াতের সূচনা করার পর থেকে মোশরেকদের যে বিরোধিতা ও হঠকারিতা চলে আসছিলো তা এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, আত্মীয়তা ও প্রতিবেশের যে নৈকট্য ছিলো তা সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। রসূল (স.) একাধারে তাদেরকে তাদের হঠকারিতার জন্যে সতর্ক করে যাচ্ছিলেন, জানাচ্ছিলেন তিনি শেরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আল্লাহর একত্বের (তাওহীদ) ঘোষণাও করে চলেছিলেন পরম ঐকান্তিকতা ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা দ্বারা। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো কার? বলে দাও, এগুলো আল্লাহর .... তোমরা যে সব শেরক করে চলেছ এগুলো থেকে আমি সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত।' (১২-১৯ আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন)।

এরপর শুরু হচ্ছে ওই মোশরেকদের হঠকারিতার চতুর্থ পর্যায়। এই পর্যায়ে এসে তারা এই নতুন কেতাব সম্পর্কে আহলে কেতাবদের মন্তব্য তুলে ধরে এ কেতাবটিকে মিথ্যা বলে দাবী করছিলো। এই জন্যেই তাদের এই শেরককে সব থেকে বড় অন্ধকার বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, রোজ হাশরে সেই ভয়ংকর সমাবেশে মোশরেকদেরকে হাযির করা হবে এবং তাদেরকে তাদের সেই কল্পিত দেবতাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতো। কিন্তু তখন তারা শেরক করেছিলো বলে অস্বীকার করবে এবং তখন তারা বুঝতে পারবে তাদের মিথ্যা তৈরী করে বলার পরিণতি কতো কঠিন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না এবং কি ভাবে সেদিন তাদেরকে অভ্যর্থনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে সেটা খুব পরিষ্কার করেও বলা হয়নি। সেদিন তাদেরকে ঈমান আনার কথা বলাও হবে না এবং তারা ঈমান আনতেও পারবে না। তাদের অন্তরের ওপর পর্দা পড়ে থাকবে। ঈমান এনেছিলো বলে তারা কোনো প্রমাণও হাযির করতে পারবে না। কারণ আজকে তারা দাবী করে বলছে যে, এতো প্রাচীন কালের কাহিনী মাত্র। আর তুমি তাদের সম্পর্কে বেদনাহত হৃদয়ে বলছো, হায়! এই ভাবে কথা বলার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। তারা নিজেরা তো ঈমান আনবেই না, অপরকেও তারা ঈমান আনতে এবং হেদায়াতের পথে চলতে নিষেধ করছে। এরই

ফল স্বরূপ তাদেরকে যে দোযখের আগুনের কিনারাতে হাযির করে রাখা হবে তাদের এই অবস্থাটি কতো ভয়াবহ হবে তা একবার চিন্তা করে দেখুন। সে সময়ে তারা বলবে, হায় আফসোস! আমাদেরকে যদি একবার দুনিয়ার জীবনে ফিরিয়ে দেয়া হতো এবং সেখানে ফিরে গিয়ে যদি আমাদের রবের আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত না করে আমরা মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারতাম, তাহলে কতোই না ভালো হতো! কিন্তু, (আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন) দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে যদি ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে একই ভাবে তারা পুনরুত্থান ও আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার বিষয়টিকে অবশ্যই অস্বীকার করতো। তারপর, একইভাবে পুনরায় তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হতো এবং তাদের ওই অবস্থাটির ছবির পুনরাবৃত্তিই হতো। তখনও তাদেরকে এইভাবে সত্যকে অস্বীকার করা সম্পর্কে এমন অবস্থায় জিজ্ঞাসা করা হতো যে তাদের পিঠের ওপর তাদের গুনাহের বোঝা সওয়ার হয়ে থাকতো। এইভাবে তাদের হঠকারিতার ফলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত কালে তাদেরকে যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে তার বর্ণনা এখানে শেষ হচ্ছে, শেষ হচ্ছে এ বর্ণনাও যে আল্লাহভীরু লোকদের জন্যে দুনিয়ার জীবন আখেরাতের তুলনায় সম্পূর্ণ বে-মজা। এরশাদ হচ্ছে,

'যাদেরকে, আমি এই কেতাবটি দিয়েছে তারা অবশ্যই এ কেতাবকে সেইভাবে চেনে যেমন করে তাদের ছেলেদেরকে তারা চেনে .... আর, দুনিয়ার এই জীবন খেল-তামাশা ছাড়া তো আর কিছুই নয় এবং অবশ্যই আখেরাতের উত্তম ঘর তাদের জন্যে, যারা আল্লাহ ভয় করে চলে। তোমরা কি বুঝছো না– তোমাদের বুদ্ধিকে কি কাজে লাগাচ্ছ না?' (২০-৩২ পর্যন্ত ও তর্জমা দেখুন)।

এরপর আসছে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পঞ্চম তরংগের বর্ণনা। এই তরংগের মধ্যে রসূল (স.)-এর কর্ম প্রণালীর দিকে নজর দেয়া হয়েছে। এসময়ে কাফেরদের অত্যাচার চরম রূপ নেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাঁকে ও তাঁর কাছে অবতীর্ণ আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রমাণের জন্যে যে অপচেষ্টা চালানো হচ্ছিলো তার কারণে রসূলুল্লাহ (স.)-এর দুঃখ ভরা মনের ভারকে লাঘব করার জন্যে আলোচ্য আয়াতগুলোর অবতারণা হয়েছে। এসব আয়াতে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহর নিয়ম অমোঘ এবং অপরিবর্তনীয়– এজন্যে এ নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো ব্যস্ততার আশ্রয় নেয়া হয়নি। তাদের অস্বীকৃতির কারণে রসূলুল্লাহ (স.) যদি সবর করতে না পারেন, তাহলে মানুষের চেষ্টার মতো তিনিও অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর চেষ্টা করুন! এর ফলে, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে হেদায়াতের পথে একত্রিত করে দেবেন। এর জন্যে তো সৃষ্টির বুকে তাঁরই ইচ্ছার প্রধান্য ও বিজয় প্রয়োজন। কারণ একমাত্র তিনিই তো যে কোনো পরিবর্তন আনার জন্যে হুকুম বা ফায়সালা দানকারী। তাঁর ইচ্ছা বা মর্জি যদি হয়ে যায় তাহলে সেই সব ব্যক্তির বিরোধিতা স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। তখন তারা হয়তো হিসাব করবে যে তাদের কোনো প্রচেষ্টাই তাদেরকে মৃত্যু ও আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, আর মরণের পর হেদায়াতের পথ গ্রহণ করায় কোনো কাজও হবে না। অথচ অবশ্যই সেই হাশরের দিনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পুনরায় তুলবেন এবং তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি জানি যে কথাগুলো ওরা বলে চলেছে ....এরপর তাদেরকে (আল্লাহর কাছে) ফিরিয়ে নেয়া হবে। (দেখুন তরজমা আয়াত ৩৩ - ৩৬)

এইভাবে, সূরাটির আলোচ্য বিষয় এগিয়ে চলেছে মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো। যার এক ঢেউয়ের পেছনে আর এক ঢেউ আসে। কেউ সাগর তীরে দাঁড়ালে দেখতে পাবে উপর্যুপরি, ঢেউয়ের পর আর এক ঢেউ এসেই চলেছে। অর্থাৎ জীবন সম্পর্কে প্রাণে দোলা দেয়ার মতো

বাক্য-বাণ একটির পর আর একটি আসছেই আসছে। এইভাবে সূরাটির বক্তব্য ও তার বিষয়ের প্রকৃতির মতো সূরাটি নিজেও আমাদের মনে বারবার দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এসব দোলা দেয়ার মতো কথার মধ্যে কোনো কোনো কথা চূড়ান্তভাবে আমাদের মনকে আন্দোলিত করছে, যার ফলে অনেক সময় বহু কঠিন ঝুঁকি নিতেও আমাদের মন প্রস্তুত হয়ে যায় এবং বড় থেকে বড় দুর্ঘটনাও আমাদের কাছে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সূরাটির প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন আরবের যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এটি অবতরণকালে শ্রোতাদের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছে তার এই সব কিছু এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা সংক্ষেপে কিছু ইংগিত দিয়ে যাচ্ছি মাত্র। সামনের আয়াতে এ বিষয়ে যৎসামান্য কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো ....।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য সূরাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক পদ্ধতিতে তার মৌলিক বিষয়টিকে তুলে ধরেছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, ইসলামী দাওয়াতের এই কঠিন দুঃসময়ের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বিষয় এবং প্রতিটি দৃশ্যই ছিলো যেন এমন চরম অবস্থার বহিপ্রকাশ যা মনকে শক্তি যোগায়, অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং মন মগযকে সমুজ্জ্বল করে। সূরার বিষয়বস্তু, দৃশ্যাবলী ও ঘটনাগুলো যখন সামনে আসে, তখন অবশ্যই উদ্দীপিত হয় প্রাণ, নেচে উঠে ধমনী।

এবারে আমরা সূরার মধ্যে যে যুক্তিপূর্ণ কথা রয়েছে সেগুলোকে একটির পর একটি পেশ করছি, যা আল কোরআনের চমৎকার বর্ণনাভংগির সাক্ষ্য বহন করছে, আর তা হচ্ছে ঈমানী শক্তির হৃদয়স্পর্শী গুণ যা মানুষের মনে এমনভাবে দাগ কাটে যে তার কোনো তুলনা নেই।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের পক্ষে তাদের মুনিবকে জানা ও একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা– এইগুলো হচ্ছে সূরাটির মূল বক্তব্য বিষয়। সুতরাং এই সব বিষয় সূরাটির বিভিন্ন স্থানে কিভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আসুন তা দেখা যাক,

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দান এবং যারা এ কথার বিরোধী তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা–এ কাজ যারা করতে পারবে, তাদের অন্তরের মধ্যে ঈমান এসেছে মনে করতে হবে এবং তারা ঈমানের পথে টিকে আছে বলে বুঝা যাবে। এই বলিষ্ঠ ঈমানের দ্বারাতেই মোমেনরা বিরোধীদের মোকাবেলা করে এবং সমস্ত শক্তি ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তারা প্রকাশ্যভাবে এর দাওয়াত দেয়। দেখুন এ বিষয়ে আল্লাহর বাণী।'

'বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার অলী বা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবো? .... বলো, একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আর আমি সম্পর্ক-মুক্ত ওই সব জিনিস থেকে, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করো।' (১৪-১৯ এই আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন)

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, সূরার মধ্যে বেশ কয়েক স্থানে ধমক দেয়া হয়েছে, ওই সব ধমক থেকে বান্দাদের ওপর সার্বিকভাবে আল্লাহর ক্ষমতার কথা প্রকাশ পায়, তাদের সামনে বিশ্ব প্রকৃতি উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অজ্ঞানতার যে অন্ধকার তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে তা দূরীভূত হয়। তারা তাদের প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রুজু করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহমুখী হয়ে যায়, আর যেসব বাতিল মুনিব তাদের জীবনে আখড়া গেড়ে বসতে চায় তাদেরকে তারা ভুলে যায়, তাতে যতো বিপদ আসুক না কেন এবং মিথ্যাবাদীরা যতোই তাদের বাধ্য করার চেষ্টা করুক না কেন, তাতে তাদের কোনো পরওয়া থাকে না। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যদি তোমাদের ওপর হঠাৎ করে আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা কেয়ামতই যদি সংঘটিত হয়ে যায়, সে অবস্থায় তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবে কি? বলো, জওয়াব দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো?....... বলো, তোমরা কি চিন্তা করেছো, যদি হঠাৎ করে তোমাদের ওপর আযাব এসে যায়

অথবা সামগ্রিকভাবে যদি সকল না-ফরমানদের ওপর প্রকাশ্যভাবে গযব নেমে আসে, তা হলে কী হবে? সে অবস্থায় যালেমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবে না?' (৪০-৪৭ আয়াতগুলোর তর্জমা দেখুন)।

সূরাটির তৃতীয় দৃশ্য, আল্লাহর ক্ষমতার বর্ণনা, তিনি গায়েবের খবর ও গোপন সকল তথ্য সম্পর্কে জানেন। সকল মানুষের সকল অবস্থা তিনি জানেন এবং তাদের সবার বয়স সম্পর্কেও একমাত্র তিনিই ওয়াকেফহাল। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সব কিছু করার অধিকারী এবং স্থল ও পানি ভাগের সব কিছুর ওপর তাঁরই ক্ষমতা পরিব্যাপ্ত রাত-দিন, দুনিয়া আখেরাত এবং জীবন মৃত্যু সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ...... শোনো, হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনিই, আর তিনিই সব থেকে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (আয়াত ৫৯-৬২)

সূরাটির ৪র্থ দৃশ্য প্রকৃতির বিষয়াবলী দ্বারা সাক্ষ্যদান এবং এ জিনিসগুলো আল্লাহর দিকে মানুষকে পথ দেখায়– তাদের সামনে স্পষ্ট করে সঠিক পথের দিশা তুলে ধরে এবং জানায় সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কথা। এসব নিদর্শন সৃষ্টির গোপন রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে যেন আহ্বান জানায়,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, আপনি কি মূর্তিগুলোকে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক মনে করেন? .... যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (অর্থাৎ শেরেকের) কালিমার দ্বারা কলুষিত করেনি। তাদের জন্যেই রয়েছে (জাহান্নামের আগুন থেকে) সম্পূর্ণ নিরাপত্তা এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত। (আয়াত ৭৪-৮২)

সূরাটির পঞ্চম ভূমিকা হচ্ছে, সারা বিশ্বে পৃথক পৃথকভাবে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রকার রহস্য ভরা জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করা যা ধমনীতে কম্পন জাগায়। এ দৃশ্যের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রভাত বেলার মৃদু সমীরণ ও গোধূলি বেলার স্নিগ্ধতা বয়ে আনে সৃষ্টিকর্তার স্নেহের পরশ, সুদূর নীল আকাশে তারকারাজির লুকোচুরি খেলা এবং স্থল ও পানি ভাগের অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন রহস্য, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ এবং মুষলধারে বৃষ্টি সিঞ্চিত ফসলের সমারোহ, গাছ-গাছালি ও পাকা পাকা ফলের দৃশ্য এসব কিছু লা শরীক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দেয়, জানায় নিসন্দেহে তিনিই এগুলোর সৃষ্টিকারী। সাথে সাথে প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহর ক্ষমতায় যারা অন্য কাউকে শরীক বানাতে চায়, বানাতে চায় পুত্র, তাদের দাবীর অসারতা, যা বুদ্ধি ও অন্তরসমূহ ধিক্কারের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকারী দানা ও আঁঠিযুক্ত ফসল ও ফলমূলের....... চোখসমূহ তাঁকে দেখতে পায় না, অবশ্য তিনি চোখগুলোকে দেখেন, আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্রব্যাদির সবকিছুর খবর তিনি রাখেন। (৯৫-১০৩ নং আয়াতগুলোর অনুবাদ দেখুন)।

সূরাটির পরিশেষে বলা হয়েছে, এসব দৃশ্যের ছবি বিদগ্ধ হৃদয়ে জাগায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও নম্রতা আর সব কিছু থেকে মুক্ত করে তার মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় লা-শরীক আল্লাহর দিকে এবং তখনই সে সঁপে দেয় নিজেকে নামাযের মধ্যে। বলে, 'আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আপনারই জন্যে হে আমার মালিক'। এ সময়ে ঘৃণা জন্মায় তার হৃদয়ে অন্য কাউকে রব হিসাবে গ্রহণ করতে, যেহেতু একমাত্র তিনিই সকল কিছুর প্রতিপালক। এরপর, তার মনে প্রতীতি জন্মায় যে দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন ও তৎসংশ্লিষ্ট পরীক্ষা এবং আখেরাতে হিসাব গ্রহণ ও প্রতিদানপ্রাপ্তির বিষয়গুলো সব কিছুকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পেশ করা হবে। এই ভাবে সূরাটির উপসংহারে ভেসে ওঠে নিবেদিত চিত্তের একাগ্রতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং চূড়ান্ত বিনয় নম্রতার এক প্রশান্ত ছবি। এরশাদ হচ্ছে,

'(হে রসূল) বলো, অবশ্যই আমার রব তোমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন সরল সঠিক ও মযবুত পথ, সে পথ হচ্ছে পরম নিষ্ঠাবান ইবরাহীমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা, আর কিছুতেই সে মোশরেক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না .... নিশ্চয়ই তোমার রব দ্রুত শাস্তি-দানকারী, আবার তিনিই মাফ করনেওয়ালা- মেহেরবান। (আয়াত ১৬১-১৬৫) উপরে আমরা যে ছয়টি উদাহরণ-এর দিকে ইংগিত করেছি এগুলো সবই সূরাটির মধ্যে বর্ণিত প্রসংগের অতি চমৎকার, চূড়ান্ত এবং অত্যাশ্চর্য চিত্র, যার প্রতিটি উপস্থাপনা, প্রতিটি ঘটনা এবং প্রত্যেকটি সঞ্জীবনী কথা মনকে নিয়ে যায় কোন্ সুদূরে ....।

এইভাবে শেষ হলো সেই সব প্রাণবন্ত কথা, যা আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটির মধ্যে বিশেষভাবে বলতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ সূরাটির মধ্যে বক্তব্য বিষয়াবলীর ওপর বর্ণিত কথাগুলোকে এমন চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে, প্রত্যেকটি দৃশ্য এবং ঘটনাকে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, প্রতিটি বিষয় যে পরস্পর সম্পৃক্ত তা অতি সহজেই ধরা পড়ে এবং সব কিছু মিলেই আল্লাহর উদ্দেশ্যকে সূরাটি পূর্ণাংগতা দান করেছে। এবারে আমরা যে ওয়াদা করেছিলাম যে, 'আল-কোরআনের বর্ণনাভংগিতে 'গোছালো ভাব'-এর অর্থ আমরা কি বুঝেছি তা আপনাদেরকে জানাব সে বিষয়ে কিছু কথা পেশ করছি,

তবে এক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করার পর অল্প কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই, যাতে করে আল কোরআন থেকেই একথাগুলোকে বিস্তারিত ভাবে বুঝার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে থাকে। আর এই বিন্যাস পর্যায়ে তিনটি বিষয় এখানে আনতে চাই যা সূরাটির মধ্যে আলোচ্য বিষয়ের সংগে প্রাসংগিক ও সামঞ্জস্যশীল হবে,

সূরাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা-ধারা রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর লক্ষ্য একটি উদ্দেশ্যকে জোরালো ভাবে পেশ করা এবং প্রতিটি দৃশ্য এবং প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে করে যে কোনো ব্যক্তি এ সূরাটি শুনবে সেও যেন এর উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যায় এবং তার জন্যে চিন্তা ভাবনা করে। এ সূরার শব্দগুলোর মধ্যে ব্যক্ত কথাগুলোকে যে কোনো শ্রোতার কাছে মনে হবে ওই কথাগুলো যেন তাকে সম্বোধন করেই উচ্চারিত হচ্ছে, যেন পর্দার আড়াল থেকে একদল লোক হাঁক-ডাক দিয়ে এর শ্রোতাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে।

সুতরাং আয়াতগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মনে হয় যে কেয়ামত ও হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার দৃশ্যগুলো পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তুমি যদি সেই সময়ের অবস্থা দেখতে পেতে যখন দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে, তখন তারা বলতে থাকবে, হায় আফসোস, আমাদেরকে যদি আর একবারের মতো ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে কিছুতেই আমরা আমাদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করতাম না আর অবশ্যই আমরা মোমেনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।'

'আর যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে.......তোমরা দুনিয়ার বুকে করে এসেছো।' (আয়াত ২৭)

'আর যদি তুমি যালেমদেরকে মৃত্যুর বিভীষিকার .... অনেক দূরে চলে গেছে।' (আয়াত ৯৩)

'আর সেই দিনের কথা একবার ভেবে দেখো যখন মহান আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তারপর মোশরেকদেরকে বলবেন, কোথায় তোমাদের সেই শরীকরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার মনে করতে। এই পরীক্ষার জবাবে তখন তারা বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব, না, না আমরা কিছুতেই মোশরেক ছিলাম না। দ্যাখো, তারা

কেমন করে নিজেদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা কথা বলবে, আর যে সব মনগড়া কথা তারা বলতো, সে সব কিছু আজকে তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।'

আবার খেয়াল করুন আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার কথা অস্বীকার করার কারণে তাঁর শাস্তি ও পাকড়াও করার কথা বলে তিনি কতো কঠিনভাবে ধমক দিচ্ছেন। এই শাস্তির সামনে তাদেরকে এমনভাবে দাঁড় করানো হবে যেন তাদের কাছে মনে হবে যে তারা পরস্পরকে সাহায্য করার সুযোগ পেয়ে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যদি আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর এসে যায় অথবা যদি এসে যায় কেয়ামত, সে অবস্থায় কি আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকবে, বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো .... ।

'বলো, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের শোনার শক্তি ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরের ওপর যদি সীল মেরে দিয়ে তোমাদের বুঝার ক্ষমতাও শেষ করে দেন, সে অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া কে আছে এমন যে এসব ক্ষমতা তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে? দেখো, কেমন করে আমি, আমার নিদর্শনগুলোকে বর্ণনা করছি। এর পরেও কি তারা বাধা সৃষ্টি করতে থাকবে এবং নিজেরাও আল্লাহ থেকে ফিরে থাকবে! বলো, তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছো, যদি হঠাৎ করেই আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা একেবারে প্রকাশ্যভাবে ধীর গতিতে আসে (সে অবস্থায় কে তোমাদেরকে সে আযাব থেকে বাঁচাবে?) সেদিন সকল যালেম জাতিই কি ধ্বংস হয়ে যাবে না?'

হেদায়াতের পর গোমরাহী এবং সঠিক পথ পেয়ে যাওয়ার পর সে পথ থেকে ফিরে যাওয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে এমন কিছু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যার সামনে দাঁড়িয়ে যে কোনো শ্রোতা অবশ্যই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবে, যদিও এহেন দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানোর জন্যে কাউকে সরাসরি কোনো কথার মাধ্যমে চিন্তা করার হুকুম দেয়া হয় নাই, অথবা থামতে ইশারাও করা হয় নাই। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো (হে শ্রোতা), আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে (সাহায্যের জন্যে) ডাকবো ....এসো আমাদের কাছে।' (আয়াত ৭১)

এমনি করে সূরাটির বর্ণনাধারার মধ্যে ফুলে ফলে সুশোভিত যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সে সব দৃশ্যের সামনে যখন কেউ দাঁড়ায়, তখন তার সামনে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের ভান্ডারের বর্ণনা এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং তার রং-বেরং-এর ফলের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করতে থাকে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই বর্ষণ করেছেন আকাশ থেকে (বৃষ্টির) পানি........ সেই জাতির জন্যে যারা ঈমান আনে। (আয়াত ৯৯)

এইভাবে সূরাটির সকল দৃশ্য ও তার বক্তব্য বিষয় পর্যায়ক্রমে এই ভাবে ফুটে উঠেছে এবং এগুলোর প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীরাও তাদের যথাযথ ভূমিকা রেখেছে।

এই পর্যায়ক্রমিক বিবরণের তাৎপর্যগুলোর মধ্যে আর একটি হচ্ছে এটি একইভাবে সাক্ষ্য দান করার বিষয়গুলো দেখিয়ে দিয়েছে।

সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কেয়ামতের দৃশ্যগুলোকে এমন কঠিনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, মোশরেক ও মিথ্যা দাবীকারীদের ওপর ওই কঠিন শাস্তিগুলো যে অবশ্যই আসবে তার মধ্যে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না এবং স্পষ্টভাবে তাদেরকে ওই ভয় দেখানোর কারণগুলোও বুঝা যায়। ইতিপূর্বে এর কিছু উদাহরণও পেশ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিতে ব্যবহার করা হয়েছে, 'অ-লাও তারা'– আর তুমি যদি দেখতে!'

প্রত্যেকটি উদাহরণের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসকে মযবুত বানানোর জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং শরীয়তের আইনের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে এ দু'টি বিষয় একই প্রকার।

সূরাটির শুরুতে আকীদা সম্পর্কে কথা বলার সময়ে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'বলো, সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে এর থেকে বড় জিনিস আর কি হতে পারে? বলো, আমার ও তোমার মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই সাক্ষী। আর আমার কাছে একথাগুলো এই জন্যে নাযিল হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ বাণী পৌঁছুবে, তাদের সবাইকে যথাযথভাবে সতর্ক করে দিতে পারি। আল্লাহর সাথে প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের মালিক হওয়ার ব্যাপারে আরও কেউ ক্ষমতাধর আছে বলে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? বলে দাও, না, আমি এমন কাউকে দেখছি না। বলো, একমাত্র তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আর যে সব জিনিসকে তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক কর ওই সব জিনিসের কারও মধ্যে কণামাত্র ক্ষমতা আছে বলে আমি মনে করি না।' (আয়াত ১৯)

অবশেষে সূরাটির মধ্যে হালাল হারামের বিধানকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করার পর অন্য আর একটি প্রমাণ পেশ করা হলো, আর আহ্বান জানানো হলো এই বিশেষ বিষয়ের সাক্ষ্যের প্রতি, যেমন ওই সাধারণ বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে এর গতি ফিরিয়ে দেয়া যায় এবং কোরআনুল করীমের সাধারণ ব্যাখ্যার সাথে তা পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হয়, (১)

'বলো, নিয়ে এসো তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে, যারা (আজকে) সাক্ষ্য দিচ্ছে এই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলো হারাম করেছেন। যদি ওরা সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে মিলে এই সাক্ষ্য দিয়ো না। আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তুমি তাদের সাথে মিলে তাদের ওই খামখেয়ালীপনার অসুসরণ করো না।

এ প্রসংগের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে তৃতীয় যে চমক লাগানো কথাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, প্রাসংগিক যে ব্যাখ্যা এসেছে তা মূল বক্তব্য বিষয়ের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। আর বক্তব্যগুলোর বারবার উল্লেখ হওয়ার মাধ্যমে এ কথাটিই দৃষ্টান্ত হিসাবে ফুটে উঠেছে যে, একটি মাত্র সত্যকেই বিভিন্ন ভাবে পেশ করা হয়েছে।

কাফেররা যখন তাদের রবের সাথে অন্য অনেককে সমান মনে করে চলেছিলো সেই কাফেরদের সম্পর্কে সূরার শুরুতে যে ভাবে বর্ণনা এসেছে সেই ভাবেই এখানে ব্যাখ্যাটি এসেছে। তারপর, সুরাটির শেষের দিকেও এসেছে এই রকমই আর এক ব্যাখ্যা সেই সব লোকের জন্যে যারা নিজেরাই নিজেদের জন্যে আইন তৈরী করে এবং এইভাবে, আইন তৈরীর কাছে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাতে চায়। নিম্ন-বর্ণিত আয়াতটিতে এই কথাটিই বলা হয়েছে,

'আল্লাহরই সমস্ত কৃতিত্ব ও প্রশংসা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং বানিয়েছেন অন্ধকার এবং আলো। এরপরও যারা কুফরী করে তারা অন্য কাউকে তার সমান বানাতে চায়।'

বলো, নিয়ে এসো তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি (ওই ভাবে) সাক্ষ্য দিয়ো না। আর, ওই সব ব্যক্তির প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছে। আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না, তারাই তাদের রবের সাথে অন্য কিছুকে সমান বানাতে চায়।'

(১) দেখুনঃ আত্তাসবীরুল ফান্নিউ ফিল কুরআন– আত্তানাসুক্ব–অধ্যায়

প্রথম আয়াতে দেখা গেছে যে, তারা তাদের রবের সাথে অন্য কিছুকে সমান বানায় যেহেতু তারা আল্লাহর ক্ষমতায় ওদেরকে শরীক মনে করে। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাদের রবের সমকক্ষ অন্য কাউকে বানানোর কারণ হচ্ছে এমনি আরও অনেককে তারা তাঁর সাথে শরীক করে। এই শেরকের উদাহরণ হচ্ছে, আইন কানুন তৈরী করার ব্যাপারে তাদের শাসকদের নিরংকুশ অধিকার আছে বলে তারা মনে করে, মনে করে তাদের নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও প্রশ্নের উর্ধে এবং যে কোনো কাজের জন্যে তাদের ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।

এইভাবে জীবনের প্রধান প্রধান গতিপথকে বর্ণনা করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে তিনি তুলে ধরেছেন। আর এইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন কানুন রচনার গুরুত্ব তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন,

'অতপর যাকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করতে চাইবেন তার বুককে তিনি খুলে দেবেন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বুঝার ও গ্রহণের জন্যে, আর যাকে তিনি গুমরাহ করতে চাইবেন তার বুককে তিনি এমনভাবে সঙ্কুচিত ও সংকীর্ণ করে দেবেন যে, সে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সৌন্দর্য বুঝতে সক্ষম হবে না। ইসলামকে বুঝা ও মানা তার কাছে আকাশে চড়ার মতো কঠিন হয়ে যায়। এমনিভাবে, যারা ঈমান আনে না তাদের জন্যে অপরাধ করাটা সহজ হয়ে যাবে। আর, এটা নিশ্চিত সত্য যে, এটিই হচ্ছে তোমার রবের সরল সঠিক ও মযবুত পথ। আমি তাদের জন্যে (আমার ক্ষমতার) নিদর্শনগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি যারা শিক্ষা গ্রহণ করে'।

এরপর আসছে গৃহপালিত পশু ও ফসলাদির বর্ণনা। শেষের দিকে আরও আসছে হালাল হারাম সম্পর্কিত বিস্তারিত কথা– যার ইংগিত সূরাটির সূচনাতেই এসে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এই হচ্ছে আমার সরল সঠিক মযবুত পথ; অতএব তোমরা তা অনুসরণ করো; আর বিভিন্ন পথের দিকে যেয়ো না, তাহলে তোমরা তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ভাবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে চূড়ান্তভাবে উপদেশ দিয়েছেন, আশা করা যায়, তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) বাছ বিচার করে চলবে।

ওপরে বর্ণিত সকল কথার সার হচ্ছে যে, এ সূরাটির মূল বক্তব্য বিষয় 'আকীদা' অর্থাৎ, আল্লাহ ও অন্যান্য বিশ্বাসগত বিষয়গুলো সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও মনে প্রাণে গ্রহণ করা এবং দৃঢ়তার সাথে এ পথে জীবনভর টিকে থাকার অর্থই হচ্ছে সেরাতুল মোসতাকীমের ওপর চলা। আর এই পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর নামই হচ্ছে সঠিক পথ থেকে বেরিয়ে আসা। আর এটিই হচ্ছে ঈমান ও কুফর এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামের বিষয়াবলী, যার বিস্তারিত বিবরণ আমরা ওপরে দিয়েছি।

আর এখানেই আমরা এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাকে শেষ করতে চাই, যাতে আল্লাহর মেহেরবানীক্রমে আল কোরআনের অন্যান্য সূরাগুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারি, আর প্রত্যেক সূরার প্রকৃতি অনুসারে সেগুলোর মধ্যে উপস্থাপিত বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পেশ করতে পারি। একটি পাঠ শেষে আর একটি পাঠ– এভাবে বক্তব্য পেশ করা হয়নি যেমন মাদানী সূরার বর্ণনাতে সাধারণত দেখা যায়। আসলে এইভাবে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে সূরার মধ্যে উত্থাপিত বিষয়াবলীর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলোকে এমনভাবে পেশ করা যাতে পাঠকের মনে তা কার্যকর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যে প্রাসংগিক কথাগুলো পর্যায়ক্রমে প্রভাবপূর্ণভাবে তুলে ধরার পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যথাযথভাবে এই খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সূরা আল আনয়াম

আয়াত ১৬৫ রুকু ২০

মক্কায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ① هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

রুকু ১

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে—

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যিনি আকাশমালা ও ভূমন্ডল পয়দা করেছেন। তিনি অন্ধকারসমূহ ও আলো সৃষ্টি করেছেন; অতপর যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তারা (প্রকারান্তরে এর দ্বারা অন্য কিছুকেই) তাদের মালিকের সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করায়। ২. তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (প্রত্যেকের জন্যে বাঁচার একটি) মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, (তেমনি তাদের মৃত্যুর জন্যেও) তাঁর কাছে একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে, তারপরও তোমরা সন্দেহে লিপ্ত আছো! ৩. আসমানসমূহের এবং যমীনের (সর্বত্র) তিনিই তো হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ; তিনি (যেমনি) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন, (তেমনি) তিনি জানেন তোমরা কে (পাপ-পুণ্যের) কতোটুকু উপার্জন করছো তাও।

তাফসীর

আয়াত ১-৩

সূরার সূচনাতে এ আয়াতগুলোর উল্লেখ কিছু বাস্তব সত্য এবং দীর্ঘ স্বরপ্রবাহের বিশাল কিছু উপলব্ধির দিকে ইংগিত করে। এগুলো এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রকৃত আকীদা বিশ্বাসের মূল বুনিয়াদ ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। (আয়াত ১)

সৃষ্টিকুলের একচ্ছত্র অধিপতি

নিসন্দেহে এটা প্রথম উপলব্ধি। সূরার সূচনা করা হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ' সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে) এর মাধ্যমে। এ বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ বাক্যের মাঝে এ কথার স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতির মালিক। কারণ সৃষ্টি জগতে তাঁর খোদায়ী ও সার্বভৌমত্ব সুস্পষ্ট। এ প্রশংসার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসিত খোদায়ী ও তার 'সৃষ্টি'-র মাঝে একটা যোগসূত্র তৈরী করা হয়েছে। প্রথমেই এ অস্তিত্বের দুই বিশাল সৃষ্টির আলোচনা করা

হয়েছে। আর তা হচ্ছে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি। তারপর আল্লাহর পরিচালনা মোতাবেক নভমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি থেকে উৎপন্ন বিশাল সৃষ্টির বর্ণনা শুরু করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে, অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টি। এটা বিশাল একটা উপলব্ধি– যা দৃশ্যমান অস্তিত্বে তার বিশাল দেহসমূহ এবং এ সমস্ত দেহ এবং আকাশে তার আবর্তন থেকে উৎপন্ন ব্যাপক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যকার বিরাট দূরত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এর মাধ্যমে ওই সম্প্রদায়ের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা হচ্ছে, যারা এ ব্যাপক ও বিশাল সৃষ্টি– যা মহান স্রষ্টার কুদরত এবং তাঁর প্রজ্ঞাময় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য চোখের সামনে এমন অকাট্য প্রমান দেখার পরও আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছে না, তার একত্ববাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে না এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করছে না। বরং তারা আল্লাহর জন্যে অংশীদার নির্ধারণ করছে। তারা আল্লাহর সমকক্ষ ও সমতুল্য দাঁড় করাচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তবু সত্যের দাওয়াত অস্বীকারকারীরা অন্যদেরকে তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে।'

এ অস্তিত্বের জীবন্ত প্রমাণাদি এবং অন্তরে তার বিলুপ্ত প্রভাবের মাঝে কি এক অদ্ভুত ব্যবধান! এ ব্যবধান বিরাট বস্তু, ব্যাপক দূরত্ব এবং বিশাল দৃশ্যময় জগতের সমকক্ষ– বরং তার চেয়েও বড়।

দ্বিতীয় উপলব্ধি বর্ণিত হয়েছে নিম্নের আয়াতে। (আয়াত ২)

নিসন্দেহে এটা মানব অস্তিত্বের উপলব্ধি, যার আগমন হয়েছে সৃষ্টি জগত এবং অন্ধকার ও আলো নামক দুটি বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্বের পর। এটা এ স্থবির পৃথিবীতে মানব জীবনের উপলব্ধি, এটা অন্ধকার মাটির কুঠরী থেকে জীবনের উজ্জ্বল আলোর দিকে বিস্ময়কর অভিযাত্রার উপলব্ধি। এ জীবন আলো ও আঁধারের সাথে সুন্দর শৈল্পিক সমন্বয়ে সমন্বিত। অধিকন্তু রয়েছে এর কিছু প্রাসংগিক বিষয়, আর তা হচ্ছে, মৃত্যুর জন্যে অনিবার্য প্রথম জীবন এবং পুনরুত্থান নামক দ্বিতীয় চিরন্তন জীবনের আগমন। নিসন্দেহে এ দুটি হচ্ছে স্থবিরতা ও গতি সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়। এটা হচ্ছে স্থবির মাটি এবং জীবনোন্মেষ সৃষ্টির মধ্যকার বৈপরীত্য। আর এ দুই পরস্পর বিরোধী বস্তুর মাঝে সময় এবং অস্তিত্বের দিক থেকে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। এর মাধ্যমে মানব অন্তরে আল্লাহর পরিচালনার প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং পরকালে তাঁর সাথে সাক্ষাতের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ সূরা নাযিল হয়েছে, তাদের অধিকাংশই এ ব্যাপারে সন্দিহান, বিশ্বাসী নয়। এরশাদ হচ্ছে,

'তথাপি তোমরা সন্দেহ করো।'

তৃতীয় উপলব্ধি– যা উপরোক্ত দুই উপলব্ধিকে একীভূত করে এবং সৃষ্টি জগত এবং মানব জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিসন্দেহে যে আল্লাহ তায়ালা আকাশ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এ দুয়ের মাঝে অবস্থান করছেন। এ দুয়ের মাঝে সার্বভৌমত্বের দিক থেকে তিনি একক। আল্লাহর ক্ষমতার যাবতীয় চাহিদা এ দু'য়ের মধ্যে পূর্ণাংগরূপে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করা এবং একমাত্র তাঁরই নির্দেশের তাবেদারী করা। সত্যিকার অর্থে মানব জীবনের অবস্থানও এই হওয়া উচিত। যেমন ভাবে আল্লাহ তায়ালা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানব জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন, মানুষের প্রথম গঠন এ মাটি থেকেই হয়েছে। অতপর তা থেকেই একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে সে এ ধরাতে প্রেরিত হয়েছে। সুতরাং সে মানুষ শারীরিক অস্তিত্বের দিক থেকে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার বা তার পিতা মাতার

মরযী মোতাবেকই মানুষ হিসাবে এ পৃথিবীতে সে আসতে পারে না। পিতা মাতা শুধু এ উদ্দেশ্যে মিলিত হতে পারে। কিন্তু তারা ভ্রূণকে অস্তিত্ব দানে সক্ষম নয়। সে নির্দিষ্ট সময় মাতৃগর্ভে থাকার পর আল্লাহর বিধান মোতাবেক পৃথিবীতে আসে, আল্লাহ তায়ালা যে পরিমাণ শ্বাস-প্রশ্বাস তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাই সে গ্রহণ করতে পারবে। তার বেশী বা কম নয়। তার সুখ দুঃখ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি, খাবার দাবার গ্রহণ এমনকি বেঁচে থাকা সবকিছুই আল্লাহর বিধানানুসারে হয়ে থাকে, এতে তাঁর ইচ্ছা বা স্বাধীনতা কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে মানুষ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের মতোই।

তিনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন, তিনি জীবনের প্রকাশ্যে ও গোপনে মানুষ কখন কী করবে সবকিছু ভালো করেই জানেন।

আকীদাগত চিন্তা বিবেচনামূলক মূল্যবোধ এবং একটা অবস্থান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষকে তার ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন, যাতে আল্লাহর বিধান শাসিত তার প্রাকৃতিক জীবন তার অর্জনকৃত জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং যাতে উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ সৃষ্টি না হয়। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব রচিত দুই বিধান সংঘর্ষ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে না।

সূরার সূচনায় এ বিশাল প্রারম্ভিক বক্তব্য মানব অন্তর ও মানব বিবেককে সম্বোধন করে। তর্কের ভাষা, পুরোহিতদের ভাষা অথবা দার্শনিকদের ভাষায় কোরআন শরীফ মানুষকে সম্বোধন করে না। বরং এমন ভাষায় তাকে আহবান করছে, যা তার হৃদয়কে নাড়া দেয় ও তার অনুভূতিকে জাগ্রত করে। এখানে সৃষ্টি ও জীবন দ্বারা নিখিল বিশ্ব ও সৃষ্টি জগতের মধ্যে বিরাজমান জীবন ও সৃষ্টির দুটো প্রমাণ উত্থাপন করে মানুষকে আহবান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহর দক্ষ পরিচালনা ও কর্তৃত্বকেও এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অস্তিত্ব ও আল্লাহর বিধান মোতাবেক তাদের পরিচালনা, মানব জীবনের উৎপত্তি ও গতি এ সবই প্রকৃতপক্ষে এক সময় মানব প্রকৃতির মুখোমুখি হয় এবং এ মুখোমুখি হওয়াটাই মানব অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে দেয়। গোটা কোরআনে করীম বিশেষ করে এ সূরাতে আল্লাহর একত্ববাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। একত্ববাদ এবং আল্লাহর অস্তিত্ব উভয় এক বস্তু নয়। গোটা মানব ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে যে সমস্যাটি প্রথম থেকে এখনাবধি দৃশ্যমান হচ্ছে তা হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলী সহকারে না জানার সমস্যা। এ সমস্যা কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান না আনার সমস্যা নয়।

যে সমস্ত মোশরেককে সম্বোধন করে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, তারা আল্লাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করতো না। বরং তারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো। তারা এটাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা, সারা বিশ্বের মালিক, জীবনদাতা এবং মৃত্যুদানকারী ইত্যাদি– যা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে তাদের আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যে বিচ্যুতির জন্যে তাদেরকে মোশরেক হিসাবে কোরআনে হাকীম আখ্যায়িত করেছে, তা হচ্ছে তারা স্বীকৃতি মোতাবেক কাজ করতো না, যেমন তাদের যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহকে বিচারক মানা, জীবনের যাবতীয় কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করা, তাঁর বিধানকে একমাত্র বিধান হিসাবে গ্রহণ করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে বিচারক মানার মানদন্ডকে অস্বীকার করা।

এটাই একমাত্র কারণ যার দরুন কোরআনে হাকীম তাদেরকে মোশরেক ও কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে। যদিও তারা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিতো এবং তারা আল্লাহকে এমন কিছু বিশেষণের মাধ্যমে বিশেষিত করেছিলো, যার দাবী হচ্ছে, তাদের যাবতীয় বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হুকুমদাতা এবং তাদের স্বীকৃতি অনুসারে তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রেযেকদাতা এবং রাজাধিরাজ। সূরার সূচনাতে তারা আল্লাহর বিভিন্ন বিশেষণের মুখোমুখি হয়েছে, যেমন তিনি সারা জাহান এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টিজগত এবং মানব জাতির সকল বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তিনি তাদের প্রকাশ্য-গোপন কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন। নিসন্দেহে ওপরের এই বাক্যগুলো হচ্ছে ভূমিকা স্বরূপ– যার ফল এই দাঁড়ায় যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সর্ব বিষয়ে হুকুমদাতা ও বিধানদাতা। সূরার প্রারম্ভে ভূমিকায় সংক্ষিপ্তভাবে আমি এগুলো বর্ণনা করেছি।

সৃষ্টি এবং জীবন, দুই প্রমাণ যেমনিভাবে আল্লাহর একত্ববাদ ও ক্ষমতা-শক্তির প্রমাণের লক্ষ্যে মোশরেকদের মোকাবেলা করার যোগ্য, ঠিক তেমনি আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারে তুচ্ছ ও নব্য জাহেলিয়াতের নির্বুদ্ধিতার মোকাবেলা করতেও সক্ষম।

বাস্তব সত্য এই যে, যদি ওই নাস্তিকরা নিজেদের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে– যাতে সন্দেহ রয়েছে যে, (তারা এ কাজ কখনো করবে না)– এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা এই যে, উল্লেখিত বাস্তব সত্যটির সূচনা হয়েছে গীর্জার সামনে মহড়ার মাধ্যমে অতপর ইহুদীরা তাকে মৌলিক মানব জীবনের নিয়ম শৃংখলা বিনষ্ট করার একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছে। যাতে তারা ছাড়া অন্য কেউ এ নিয়মের ওপর এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পারে। একে তারা ইহুদী পন্ডিতদের লিখিত নিয়ম কানুনের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকে।

মিশনারীর আড়ালে ইসলামকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত যে পর্যায়ে পৌছুক না কেন, তারা মানব প্রকৃতির ওপর কখনো বিজয়ী হতে সক্ষম নয়। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা মানব প্রকৃতির মজ্জার সাথে মিশে আছে। যদিও সে প্রকৃতি যথাযথ গুণাবলী সহকারে হক উপাস্যকে চিনতে গিয়ে গোমরাহ হয়ে পড়ে। যেমনি তা স্বীয় জীবনে আল্লাহর কর্তৃত্বের একত্ববাদের অস্বীকৃতির মাধ্যম থেকেও বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অতএব, তারই ভিত্তিতে ওই প্রকৃতিকে শেরক এবং কুফরের ধারা অংকিত করা হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে আত্মার প্রকৃতি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন কিছু গ্রহণ করা এবং তার ডাকে সাড়া দেয়ার যন্ত্র বিকলাংগ হয়ে পড়ে। একমাত্র এ সমস্ত আত্মার সাথেই ইহুদীদের চক্রান্ত কৃতকার্য হয়, যার লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি। এ সমস্ত বিকলাঙ্গ প্রকৃতির অধিকারী আত্মার সংখ্যা সর্বযুগে এবং সর্বকালেই মানব সমাজে থাকে নগণ্য। এ ধরাতে বর্তমানে প্রকৃত নাস্তিকের সংখ্যা চীন এবং রাশিয়ার অগণিত জনগণের মধ্যে মাত্র কয়েক কোটি। যাদেরকে নাস্তিকরা লোহার ডান্ডা দ্বারা শাসন করছে। বিভিন্ন প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যম ব্যবহার করে মানুষের অন্তর থেকে ঈমান মুছে ফেলার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টা সত্তেও তারা কামিয়াব হতে সক্ষম হয়নি।(১)

নিসন্দেহে ইহুদীরা অন্য ক্ষেত্রে কামিয়াব হয়েছে। আর তা হচ্ছে দ্বীনকে শুধু আবেগ অনুভুতি এবং আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত করা, দ্বীনকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং দ্বীনের

---

(১) এটি ১৯৫৭ সালের লেখা, সম্প্রতি চেচনিয়ার মুসলমানদের ঈমানী চেতনা প্রমাণ করেছে যে, ৭০ বসরের কমিউনিস্ট শাসনও তাদের নাস্তিক বানাতে পারেনি।–সম্পাদক

অনুসারী এবং বিশ্বাসীকে এ ধারণায় নিক্ষেপ করা যে, উপরোক্ত আচরণ সত্তেও তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হিসাবে বিদ্যমান থাকবে। যদিও তাদের সেখানে প্রকৃত আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অসংখ্য প্রভু রয়েছে, যারা তাদের জীবনে বিধানদাতা, আর এর মাধ্যমে তারা আসলে মানবতাকে বিনষ্ট করে দেয়।

তারা সকল দ্বীন (বিধান)-এর পূর্বে ইসলামকেই লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত করে। কারণ তারা এটা ভালো করেই জানে যে, একমাত্র দ্বীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত তাদেরকে পরাভূত করতে পারেনি। আর এটা তখনই সংঘটিত হয়েছে, যখন মুসলমানরা ইসলাম অনুসারে তাদের জীবনকে পরিচালনা করেছে। ইসলামের অনুসারীরা নিজেদেরকে মুসলমান এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ধারণা করা সত্তেও যখনই তারা ইসলামকে তাদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করাকে ছেড়ে দিয়েছে, তখনই ইহুদীরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে। বিকৃত দ্বীনের সাথে মুসলমানদেরকে তারা মাতিয়ে রাখে– অদৃশ্যবান এই ইহুদীদের ষড়যন্ত্র কামিয়াব হওয়ার এটা হচ্ছে পূর্বশর্ত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। যাতে তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে।

সমগ্র বিশ্বের ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বিশাল ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চলে নাস্তিতাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। তারা এ এলাকায় জড়বাদী মতবাদ এবং মতাদর্শের মাধ্যমে মানুষকে নাস্তিকতার দিকে প্রত্যাবর্তন করার ক্ষেত্রেও নিরাশ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে তারা খৃষ্টান মিশনারী অথবা উপনিবেশবাদের মাধ্যমে মানুষকে অন্যান্য দ্বীনের অনুসারী বানাতেও ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মানব প্রকৃতি স্বয়ং এমনকি পৌত্তলিকরাও নাস্তিকতাকে ঘৃণা করে এবং অস্বীকার করে। এখানে মুসলমান প্রকৃতির তো প্রশ্নই ওঠে না। অপরাপর দ্বীন ওই অন্তরে প্রবেশ করতে কখনো সাহসী হবে না যে অন্তর একবার ইসলামকে চিনেছে অথবা ইসলামের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

আমি মনে করি, তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার কারণে ইহুদী এবং খৃষ্টানরা সাম্যবাদ অথবা খৃষ্টান মিশনারীর মাধ্যমে প্রকাশ্যে ইসলামের মুখোমুখি হওয়ার পথ প্রত্যাহার করে ঘৃণ্য এবং চক্রান্তপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করেছে। তারা সমগ্র অঞ্চলে এমন কতক সংগঠন, সংস্থা এবং কেন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছে– যা ইসলামের রঙ্গে রংগীন আকীদা বিশ্বাস দেখায় এবং যা ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকারও করে না। অতপর এ সমস্ত সংস্থা ও কেন্দ্র পর্দার আড়াল থেকে যাবতীয় নোংরা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে, যার প্রতি খৃষ্টান মিশনারীর সভা এবং ইহুদীদের কাউন্সিলসমূহ ইংগিত করে।

নিসন্দেহে উপরোক্ত সংগঠন, সংস্থা ও কেন্দ্রসমূহ বাহ্যিকভাবে ইসলামের ঝান্ডাকে উঁচু করে দেখায় অথবা ন্যূনপক্ষে দ্বীন ইসলামের প্রতি তার সম্মান ঘোষণা করে– পক্ষান্তরে তারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ছাড়া বিচার ফয়সালা করে থাকে, মানব জীবন থেকে আল্লাহর বিধানকে বিচ্ছিন্ন করে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক ঘোষিত হারামকে তারা হালাল নির্ধারণ করে। তারা জীবন, নীতি নৈতিকতা এবং চরিত্র সম্পর্কে এমন জড়বাদী চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ প্রচার করে– যা ইসলামী চিন্তা চেতনা ও মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে দেয়। ইসলামী নৈতিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রচার, সংবাদ এবং দিক নির্দেশনার মাধ্যমগুলোকে তারা ব্যবহার করে। ইসলামী দিক নির্দেশনা ও চিন্তা-ধারা তারা বিলুপ্ত করে দেয় এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকারীদের বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও ইহুদীবাদের মৌলনীতির বিষয়বস্তুকে তারা বাস্তবায়িত করে। যেমন উন্নতি,

অগ্রগতি, প্রগতি, কাজ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির নামে মুসলামান নারীদের রাস্তায় নামানো এবং তার দ্বারা সমাজে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা, যদিও এ সমস্ত অঞ্চলে কোটি কোটি কর্মক্ষম পুরুষ ব্যক্তি বেকার– যারা দুমুঠো ভাত খাবার পয়সা জোগাড় করতে পারছে না। অনুরূপভাবে তা বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার মাধ্যমগুলোকে মুসলমানদের জন্যে সহজতর করে দেয় এবং তা মুসলিম নর ও নারী উভয়কেই কাজ এবং দিক নির্দেশনার বাহানায় সেই বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতার মাধ্যমগুলোর প্রতি আকৃষ্ট করায়। এসব কিছুর পেছনে খৃষ্টান মিশনারী এবং ইহুদী সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তারা মনে করে সে মুসলমান নারীরা ইসলামী আকীদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। সাধারণ মানুষ ধারণা করে যে, তারা মুসলিম সমাজে বসবাস করে এবং তারা নিজেরাও মুসলমান। কারণ, তাদের মধ্যে যারা ভালো, তারা কি নামায রোযা করে না? কিন্তু সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যে হবে? না বিভিন্ন প্রভু ও কর্তার জন্যে উৎসর্গিত হবে? এ ক্ষেত্রে তাদেরকে খৃষ্টান ও ইহুদী মিশনারী, উপনিবেশবাদ, এবং পরিকল্পিত প্রচার মাধ্যমগুলো প্রতারণায় নিক্ষেপ করে এবং তাদেরকে একথা বুঝাতে চায় যে, এ সকল বিষয়ের সাথে দ্বীনের কোনো বিরোধ নেই। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের গোটা জীবন যদি দ্বীন বহির্ভূত চিন্তা-ধারা, মূল্যবোধ, বিধি বিধান ও নিয়ম কানুনের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও তারা মুসলমান থেকে যাবে এবং আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী থাকবে।

প্রতারণা ও পথভ্রষ্ট তার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে এবং বিশ্বজোড়া ইহুদীচক্র ও খৃষ্টান মিশনারীর আত্মগোপনের মাধ্যমে এ সমস্ত সংগঠনগুলো কৃত্রিম একটা যুদ্ধ পরিচালনা করে। অনুরূপভাবে বিশ্বজোড়া ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় নিজেদের ও নিজেদের তৈরী বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে কৃত্রিম শত্রুতা সৃষ্টি করে, যেগুলোকে তারা নানা প্রকারের আর্থিক ও সাহিত্যিক সহযোগিতা প্রদান করে। প্রকাশ্য এবং গোপন শক্তির মাধ্যমে তারা এদের পাহারা দেয়। অনুরূপভাবে তারা গুপ্তচরবৃত্তির কলম সমূহকে তাদের খেদমত এবং সরাসরি তাদের পাহারাদারীর কাজে নিয়োজিত করে রাখে।

তারা কৃত্রিম যুদ্ধ পরিচালনা করে এবং কৃত্রিম শত্রুতাও সৃষ্টি করে। তার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রতারণার গভীরতা বৃদ্ধি করা এবং উপরোক্ত কাজে তাদের নিয়োজিত প্রতিনিধিদের সামনে ওই সন্দেহ অপনোদন করা যে, তারা তাদের কাধে অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতি নৈতিকতা বিনষ্ট করা, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনাকে ধূলিস্মাত করে দেয়া এবং এই বিশাল অঞ্চলের মুসলমানদেরকে তাদের শক্তির মূল উৎস দ্বীন ও শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা। অধিকন্তু খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকারীদের বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং ইহুদীবাদের মৌলনীতির বিষয়বস্তু সম্বলিত ভয়ংকর পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করা।

এ বিশাল এলাকার যদি কোনো স্থান অবশিষ্ট থাকে যেখানে প্রতারণা কাজে আসে না এবং যে স্থানের অধিবাসীরা বিকৃত দ্বীনের সামনে আত্মসমর্পণ করে না এবং ওই সমস্ত ধর্মীয় প্রচার মাধ্যমের সামনে মাথা নত না করে না যার লক্ষ্য হয় কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয়া, কুফরকে ইসলাম বলে আখ্যায়িত করা এবং ফাসেকী বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে উন্নতি, প্রগতি এবং আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করা, এধরনের এলাকার ওপর ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যাপক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। সেখানকার অধিবাসীদের ওপর মিথ্যা অশ্লীল অপবাদ চাপিয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। অথচ সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমগুলো মূক, বধির ও অন্ধের ভূমিকা পালন করে যায়।

সরল সোজা সৎ মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে ধারণা করে থাকে যে, এটা হচ্ছে একটা ব্যক্তিগত বা গোত্রীয় যুদ্ধ, এই দ্বীন (ইসলাম)-এর সাথে এই চক্রান্ত যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নেই।

তাদের মধ্যে যাদের মাঝে দ্বীন ও নীতি নৈতিকতার প্রতি আগ্রহ বিদ্যমান, তারা নির্বোধ সরলতার মাঝে মগ্ন হয়ে তাদেরকে ছোট-খাটো বিরুদ্ধাচরণ এবং অতি নগণ্য গর্হিত কাজ থেকে সতর্ক করে দেয়ার মাধ্যমে তারা মনে করে যে, তারা এ দুর্বল ও ক্ষীণ চিৎকারের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পুরোপুরি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে পুরো দ্বীনকেই ধূলিসাৎ করা হচ্ছে, মূল থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে আল্লাহর শত্রুরা লুণ্ঠন করে চলছে এবং যেই তাগূতকে অস্বীকার করার জন্যে তারা আদিষ্ট হয়েছে, সেই তাগূতই মানুষের গোটা জীবনকে পরিচালনা করছে, এই মূল ব্যাপারে তারা বিলকুল বেখবর।

নাস্তিকতার নামে দ্বীনকে নিশেষ করার কাজে এবং দীর্ঘ দিন যাবত খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের নামে মানুষকে হক দ্বীন থেকে বিচ্যুৎ করতে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে গোটা বিশ্বের ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় বর্তমানে তাদের পরিকল্পনা সফল করার ভিন্ন পথ দেখছে।

এতো সব কিছুর পরও তাদের আল্লাহর কাছে আশা অনেক এবং এ দ্বীনে তাদের আস্থাও গভীর। এরা আল্লাহ তায়ালা ও মুসলমানদের সাথে প্রতারণাই করছে। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জবাব দানকারী ও প্রতিদানদাতা। তিনিই তো এরশাদ করছেন, 'তারা নিজেদের মধ্যে চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহর সামনে তাদের কু-চক্রান্ত রক্ষিত আছে, তাদের কূটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেবার মতো হবে না। অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলদের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৪৬ - ৪৭)·

নাস্তিকতার ভ্রান্ত বেড়াজাল

সৃষ্টি ও জীবন এই দুই প্রমাণ অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালীভাবে নাস্তিকতার নির্বুদ্ধিতার মোকাবেলা করছে। নাস্তিকদের এ ক্ষেত্রে বক্রতা ও কঠোরতার আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ এই বিশেষ নিয়মে এ বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব ও অবস্থানই বুঝায় যে, নিশ্চয়ই তার পশ্চাতে পরিচালনাকারী স্রষ্টা বিদ্যমান। আর এটা প্রকৃতি ও বিবেকের দিক থেকে সম্পূর্ণ যৌক্তিক ব্যাপার।

অতএব, অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার ব্যবধান এতো বেশী যে, আল্লাহর অস্তিত্বের কল্পনা ছাড়া মানব অনুভূতি তাকে অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। যিনি এই অস্তিত্ব ও বিশ্ব জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও আবিষ্কারক।

নাস্তিকরা হঠকারিতা এবং গোয়ার্তুমির মাধ্যমে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতার ব্যাপক ব্যবধান ও শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চায় এবং বলে যে, অস্তিত্বের পূর্বে অস্তিত্বহীনতা ছিলো। তাদের মধ্যে জনৈক দার্শনিক যিনি আধ্যাত্মিকতার দার্শনিক হিসাবে পরিচিত, তিনি বস্তুবাদের সামনে আধ্যাত্মিকতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন, এর ওপর ভিত্তি করে কতক নাম সর্বস্ব প্রতারিত মুসলমান তাঁর ভূয়সী প্রশংসাও করেছে এবং তারা তাদের দ্বীনের জন্যে তার বক্তব্যকে পছন্দ করেছে। ভাবখানা যেন তারা জনৈক ব্যক্তির কথার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করছে। আর সেই দার্শনিক ব্যক্তি হচ্ছে ইহুদী বরসুন।

সে বলে এই জাগতিক অস্তিত্বের পূর্বে অস্তিত্বহীনতা নেই। আর অস্তিত্বহীনতার অনস্তিত্বের অস্তিত্বকে মেনে নেয়া মানব বিবেক থেকে উৎপন্ন। উপরোল্লিখিত পন্থা ছাড়া যার কল্পনা করা সম্ভব নয়। অতএব, দার্শনিক বরসুন 'জাগতিক অস্তিত্বের পূর্বে কোনো অস্তিত্ব নেই'– এ কথাটি প্রমাণ করার জন্যে কোন যুক্তির শরণাপন্ন হবেন?

বিবেকের? না এটা সম্ভব নয়। কারণ বিবেকের পক্ষে সম্ভব নয় অস্তিত্বহীনতা ছাড়া অস্তিত্বের কল্পনা করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী বাণীর? তিনিতো এটা দাবী করেননি, যদিও তিনি বলতেন, মরমীদের (সুফীদের) কল্পনা সর্বদা ইলাহ (উপাস্য)-এর অস্তিত্ব খুঁজে পায়। আমাদের উচিত সেই স্থায়ী কল্পনাকে বিশ্বাস করা, (বরসুন যেই ইলাহের আলোচনা করেছেন সেই 'ইলাহ' আর 'আল্লাহ' এক নয়, বরং সেই ইলাহ হচ্ছে জীবন) এতদ্ভিন্ন তৃতীয় উৎস আর কী হতে পারে? যার ওপর ভিত্তি করে দার্শনিক বরসুন বলেছেন, জাগতিক অস্তিত্বের পূর্বে অস্তিত্বহীনতা বিদ্যমান ছিলো তা আমার বুঝে আসেনি।

সুতরাং স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, যিনি এই বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্ব জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে এই ধারণার শরণাপন্ন অবশ্যই হতে হবে। আর কেবলমাত্র নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের কারণ বর্ণনার জন্যে যদি স্রষ্টার অস্তিত্বের কল্পনার শরণাপন্ন হতে হয়, তাহলে যেখানে কেবল অস্তিত্বেরই প্রশ্ন নয় বরং তার সাথে এমন সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক বিধান ও নিয়ম-নীতি জড়িত, যার মাঝে কোনোরূপ ত্রুটি নেই, যেখানে প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাপ ও সীমারেখার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার সামান্যতম অংশও সীমাবদ্ধ মানবীয় বিচার বুদ্ধি দীর্ঘ চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা উপলব্ধি করা যাবে না। সেখানে অবশ্য অবশ্যই স্রষ্টার অস্তিত্বের শরণাপন্ন হওয়া এবং তার অস্তিত্ব মেনে নেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না।

তদ্রূপ এই জীবনের উৎপত্তির বিষয়টি। জীবন এবং যে কোনো বস্তুর মাঝে ব্যবধান নিরূপণ করা একমাত্র পরিচালনাকারী সৃষ্টিকর্তা– উপাস্যের অস্তিত্বের কল্পনার মাধ্যমেই সম্ভব। যিনি এই নিখিল বিশ্বকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেন, যা তার মধ্যে জীবনের উৎপত্তিকে গ্রহণ করে এবং তা তার সৃষ্টির পর জীবনের নিরাপত্তাও বিধান করে। অপরূপ বৈশিষ্ট্য সমেত মানব জীবন কেবল জীবনের স্তরের ওপরেই অবস্থান করে। মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ মানুষ এই যমীনের বস্তু থেকে উৎপন্ন, সুতরাং তাতে জীবন দানের জন্যে সুপরিকল্পিত ইচ্ছার প্রয়েজন, যা তাতে স্বেচ্ছায় মানব জাতির বৈশিষ্ট্যসমূহ দান করে।

জীবন উৎপন্নের কারণ বর্ণনা করার জন্যে নাস্তিকরা যে সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তার সবগুলোই মানব বিবেকের সামনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সর্বশেষ যে প্রচেষ্টাটি সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি, তা হচ্ছে মার্কিন দার্শনিক দিউরনাথের প্রচেষ্টা, যিনি অণুতে অবস্থিত গতির প্রকার (যাকে তিনি জীবনের একটি স্তর হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন) এবং জীবিতদের মাঝে অবস্থিত জীবনের পরিচিত ধরনের মাঝে নৈকট্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। আর তাদের এই আপ্রাণ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু স্থবির ও স্পন্দনশীল জীবনের মাঝে ব্যবধান দূর করার এবং ওই উপাস্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার– যিনি মৃতের মাঝে জীবন দান করে থাকেন।

কিন্তু এই মরণপণ প্রচেষ্টা না তার উপকারে আসে আর না তা বস্তুবাদীদের কোনো কাজে আসে। কারণ যদি জীবন বলতে বস্তুতে লুপ্ত বিশেষণকে বুঝায়, যার পেছনে ক্ষমতাধর অপর কোনো শক্তি নেই, তবে কোন শক্তি জাগতিক বস্তুতে অবস্থিত জীবনকে বিভিন্ন স্তরে উন্নীত করবে?– যার একটি অপরটির চেয়ে জটিল। সুতরাং অনুতে জীবন একথা শুধু যান্ত্রিক অচেতন গতি হিসাবেই প্রকাশ পায়। অতপর তা উদ্ভিদে এসে দৈহিক আকৃতিতে প্রকাশ পায়। আর জীবন পরিচিত জীবিতদের মাঝে দৈহিক আকৃতিতে প্রকাশ পায়। এটাকে অধিক সুসংহত ও সুশৃংখলকে করে।

সুপরিকল্পিত এই ইচ্ছাবিহীন জীবন সম্বলিত কোনো বস্তুর কিছু অংশকে জীবনের উপাদান থেকে অন্য অংশের তুলনায় বেশী গ্রহণ করতে কোন শক্তি তাকে বাধ্য করলো? অনুরূপভাবে কোন শক্তি বস্তুতে লুপ্ত জীবনকে ঊর্ধমুখী বিভিন্ন স্তরে আরোহণ করতে বাধ্য করলো?

নিসন্দেহে আমরা এই দূরত্ব ও ব্যবধান তখনই বুঝতে সক্ষম হবো, যখন আমরা ধরে নেবো যে, তার পেছনে এমন সুপরিকল্পিত ইচ্ছা বিদ্যমান– যা স্বেচ্ছায় কাজ করে। আর যদি আমরা বস্তুকে জীবন্ত হিসাবে ধরে নেই, তবে মানব বিবেক এই ব্যবধান বুঝতে এবং তার কারণ বর্ণনা করতে কখনো সক্ষম হবে না।

ইসলাম মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা। ঘৃণ্য বস্তুবাদী মতাদর্শ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে কিছুতেই সক্ষম নয়।

আমাদের ওপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কোরআনে করীমের লক্ষ্য ভিত্তিক। সৃষ্টি রহস্য, এর পরিকল্পনা এবং জীবনের বিভিন্ন সুক্ষ্য তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে নাস্তিকদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির যে জবাব ওপরে দেয়া হয়েছে তাই এখানে যথেষ্ট, তার চেয়ে অতিরিক্ত যুক্তি প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। (আয়াত ৪-১১)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾ فَقَدْ
كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ط فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٥﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي
الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا
الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ
قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ
لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ
مَلَكٌ ط وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا
لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ

৪. তাদের মালিকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন একটি নিদর্শনও নেই, যা তাদের কাছে আসার পর তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। ৫. তাদের কাছে যতোবারই (আমার পক্ষ থেকে) সত্য (দ্বীন) এসেছে; ততোবারই তারা তা অস্বীকার করেছে; অচিরেই তাদের কাছে সে খবরগুলো এসে হাযির হবে যা নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করছিলো। ৬. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে আমি এমন বহু জাতিকে বিনাশ করে দিয়েছি যাদের আমি পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম, যা তোমাদেরও করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, আবার তাদের (মাটির) নীচ থেকে আমি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিয়েছি, অতপর পাপের কারণে আমি তাদের (চিরতরে) ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তাদের পর (তাদের জায়গায় আবার) আমি এক নতুন জাতির উত্থান ঘটিয়েছি। ৭. (হে নবী,) আমি যদি তোমার কাছে কাগজে লেখা কোনো কেতাব নাযিল করতাম এবং তারা যদি তাদের হাত দিয়ে তা স্পর্শও করতো, তাহলেও কাফেররা বলতো, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়! ৮. তারা বলে, এ (নবী)-র প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হলো না কেন (যে তার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের বলে দিতো)? যদি সত্যিই আমি কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতাম তাহলে (তাদের) ফয়সালা (তো তখনি) হয়ে যেতো, এরপর তো আর কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হতো না। ৯. (তা ছাড়া) আমি যদি (সত্যিই) ফেরেশতা পাঠাতাম, তাকেও তো মানুষের আকৃতিতেই পাঠাতাম, তখনও তো তারা এমনিভাবে আজকের মতো সন্দেহেই নিমজ্জিত থাকতো। ১০. (হে রসূল,) তোমার আগেও বহু নবী-রসূলকে এভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিলো,

قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ قُلْ

سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

(অনন্তর) তাদের মধ্যে যারা নবীর সাথে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তাই (তাদের আযাবের আকারে) পরিবেষ্টন করে ফেলেছে!

রুকু ২

১১. (হে নবী,) তুমি তাদের বলো, তোমরা এ পৃথিবীতে ঘুরে-ফিরে দেখো, দেখো যারা (নবী-রসূলদের) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের কী (ভয়াবহ) পরিণাম হয়েছে।

তাফসীর
আয়াত ৪-১১

ব্যাপক জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রথম বক্তব্যের পর এটা হচ্ছে সূরার দ্বিতীয় বক্তব্য। এ বক্তব্য খোদায়ী অস্তিত্বের মাধ্যমে পুরো সৃষ্টিজগতকে বেষ্টন করে আছে। যে সত্য প্রতিভাত হয়েছে আকাশ পাতালের সৃষ্টিতে, অন্ধকার এবং আলোর উদ্ভাবনে, মাটি থেকে মানব জাতির সৃষ্টিতে, যার সমাপ্তি ও যবনিকা হবে মৃত্যুর মাধ্যমে, পুনরুত্থানের সাথে যার আয়ুষ্কালের গোপনীয়তা এবং প্রকাশ্য সহ সব কিছু জানা যাবে।

আল্লাহর এই অস্তিত্ব সৃষ্টিজগতের পাতায় পাতায় এবং মানব অন্তরে পরিস্ফুটিত হয়। তাঁর অস্তিত্ব এমন একক, যার নযীর অদৃশ্যমান। এ ধরনের অস্তিত্ব সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারোরই হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ অস্তিত্ব পরিপূর্ণ, দৃশ্যমান ও পরাক্রমশালী। যেই অস্তিত্বের ছায়াতলে বিরাট নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করা এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা গর্হিত ও অপরাধ বৈ আর কিছুই নয়। যে এ কাজ করবে, তার কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

অতপর মোশরেকদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। যারা মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ও কর্তৃত্বাধীন থেকে ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধাচরণ করে। অথচ কোরআনে হাকীম তাদের সামনে তাদের ন্যক্কারজনক চিত্র নানা আকর্ষণীয় বক্তব্যের মাধ্যমে পেশ করেছে। তাদের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন কোরআন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাদের এ চিত্র কতই না বীভৎস ও বিশ্রী!

অবিশ্বাসী জাতিসমূহের পরিণতি

আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতসমূহে মোশরেকদের হঠকারিতা ও দাম্ভিকতার চিত্র উপস্থাপন করেছেন, একই সাথে সাথে তিনি তাদের কৃতকর্মের পরিণাম সম্পর্কে ও তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের পরিণাম ও পরিণতি কী হয়েছিলো, তাও তিনি বর্ণনা করেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালা কিছু ঘটনা, কারণ এবং ইংগিতকে এক জায়গায় সন্নিবেশিত করেছেন। (আয়াত ৪-৬)

মোশরেকরা হঠকারিতা ও গোঁড়ামিবশত দ্বীন বিমুখীতার পথ অবলম্বন করে। এক্ষেত্রে ঈমানের প্রতি আহবানকারীর নিদর্শনের কোনো তাদের অভাব ছিলো না, দাওয়াত এবং

আহবানকারীর সত্যতার পরিচায়ক আলামতেরও ঘাটতি ছিলো না এবং দাওয়াত ও 'দায়ীর' পেছনে যে সত্য নিহিত আছে তার প্রতি সাক্ষ্য প্রমাণেরও কমতি ছিলো না। আর এ সমস্ত প্রমাণাদি এবং মাবুদের প্রতি ঈমান আনার জন্যেই 'দায়ীরা' সর্বদা তাদেরকে আহবান করতো, কিন্তু মোশরেকদের মধ্যে যার ঘাটতি ছিলো তা হচ্ছে, আহবানকারীদের আহবানের প্রতি সাড়া দেয়ার আগ্রহ। হঠকারিতা, গোয়ার্তুমি ও বাড়াবাড়ি তাদের পেয়ে বসেছিলো। আর এটাই তাদেরকে চিন্তা ভাবনা এবং বিচার বিবেচনা থেকে বিমুখ করে রেখেছিলো। (আয়াত ৪)

আল্লাহর একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হেদায়াতের জন্যে যে কোনো নিদর্শন পাঠানো হয়, তারা তা থেকে ইচ্ছাকৃত মুখ ফিরিয়ে নেয়। যখন মোশরেকদের বাস্তব চিত্র এই, তখন পাকড়াও এর ধমকি ও সতর্কীকরণ তাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করবে। যার মাধ্যমে প্রকৃতির সকল জানালা খুলে যাবে এবং অহংকার ও হঠকারিতার পর্দা তাদের অন্তর থেকে খসে পড়বে। (আয়াত ৫)

নিসন্দেহে এটা সত্য, যা নভোমন্ডল এবং ভূমন্ডলের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে। যিনি অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবনকারী। মাটি থেকে মানুষকে সৃষ্টিকারী এবং যিনি আকাশ যমীনের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি তাদের প্রকাশ্য গোপন সকল কৃতকর্ম ভালো করেই জানেন। এ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হলো, তখন তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করে আল্লাহর একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ ও নিদর্শন থেকে বিমুখ হয়ে ঈমানের প্রতি আহবানকে বিদ্রূপ করে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। সুতরাং তাদের ওই বিষয়ের সংবাদের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত, যার সাথে তারা উপহাস করতো।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন সংক্ষিপ্ত সতর্কীকরণের সামনে নিয়ে এসেছেন। যার প্রকার এবং সময় তারা জানে না। তাদেরকে এমন অবস্থায় রাখা হবে যে তারা সর্বদা ওই বিষয়ের সংবাদের অপেক্ষা করতে থাকবে– যার সাথে তারা উপহাস করতো। যেখানে অজানা আপেক্ষমাণ শাস্তি তাদের সামনে সদা প্রতিভাত হবে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃষ্টি, অন্তকরণ ও পেশীগুলোকে পূর্ববর্তী মিথ্যাবাদীদের পরিণামের দিকে নিদ্ধ করেছেন। বালুকাময় উচঁ উপত্যকায় 'আদ' সম্প্রদায়কে প্রচন্ড বায়ুর মাধ্যমে কি শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। অনুরূপভাবে সামুদ সম্প্রদায়কে বিকট ধ্বনির মাধ্যমে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছিলো, সে ইতিহাসও তাদের জানা ছিলো। তাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। আরবরা শীতকালীন দক্ষিণের ভ্রমণে এবং গ্রীষ্মকালীন উত্তরের ভ্রমণে তাদের ওপর দিয়েই অতিক্রম করতো। অনুরূপভাবে তারা বিধ্বস্ত লূত জনপদের ওপর দিয়ে ও আসা যাওয়া করতো এবং এ এলাকার অধিবাসীরা এ ব্যাপারে যা বলাবলি করতো, তাও তারা জানতো। এখানে যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করছে তাদের পরিণাম ও পরিণতির একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। (আয়াত ৬)

তারা কি অতীত প্রজন্মের পরিণাম ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখেনি এবং সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেনি, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ যমীনে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। তিনি তদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী আরব উপদ্বীপের কোরায়শ বংশের মোশরেকদের ভাগ্যেও জোটেনি। তিনি আকাশ থেকে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ

করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদের জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেছেন এবং বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকা দান করেছেন। এতো কিছু সত্তেও তাদের কী হলো? তারা তাদের প্রভুর না-ফরমানী করলো, পয়গাম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করলো। অতপর তিনি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিলেন। প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ প্রতিপত্তি ও অর্থ সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারলো না। অতপর তিনি আরেক প্রজন্মকে সৃষ্টি করলেন, যারা এ যমীনের উত্তরাধিকারী হলো। তারপর তারাও এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। যমীন তাদেরকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলো না। অতপর নতুন জাতির আগমন ঘটলো। সুতরাং শক্তিধর প্রভাব প্রতিপত্তিশালী অবিশ্বাসী ও আল্লাহর একত্ববাদের নিদর্শনাবলীর প্রতি বিমুখদের ধ্বংস করা আল্লাহ তায়ালা এবং এ যমীনের সৃষ্টি কর্তার কাছে কতই না সহজতর! তাদেরকে এ ধরা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো কিন্তু এ ধরা শূন্যতা এবং নিসংগতা অনুভব করেনি। আবারো এ পৃথিবীতে নতুন জাতির আগমন ঘটলো এভাবে যেন ইতিপূর্বে এখানে কেউ ছিলো না। তারা এসে এ জগতকে নতুন করে আবাদ করতে শুরু করলো।

এটা বাস্তব সত্য। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যখনই এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখনই তারা এ বাস্তব সত্যকে ভুলে বসেছে। তারা এটাও ভুলে বসেছে যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও শান শওকত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর তিনি শুধু এটা পরীক্ষা করার নিমিত্তই করেছিলেন যে, তারা তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা ও শর্ত মেনে একমাত্র তাঁর এবাদাত করে কিনা এবং তারা একথা গ্রহণ করে কিনা যে, তিনিই একমাত্র রাজাধিরাজ এবং তারা তাঁর প্রতিনিধি বৈ আর কিছুই নয়। না, তারা নিজেদের মধ্য থেকে তাগূতী শক্তি নির্ধারণ করবে, যারা নিজেরা উপাস্য হওয়া এবং উপাস্যের বৈশিষ্ট্য দাবী করবে। তারা তাদের উত্তরাধিকারীদের সাথে প্রভুর মতো আচরণ করবে।

নিসন্দেহে এটা এক বাস্তব সত্য যে, যারা একমাত্র আল্লাহকে প্রভু হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে, তারা ছাড়া সকল মানব গোষ্ঠী এ বাস্তবতাকে ভুলে যায়। আর এভাবে তারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং প্রতিনিধিত্বের শর্ত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। আল্লাহর দেয়া সঠিক পথ ছাড়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়। প্রথমেই তাদের সামনে এ বিচ্যুতির পরিণাম প্রতিভাত হয় না। অতপর তারা তাদের অজান্তেই বিভিন্ন ফাসাদ ও বিচ্যুতিতে জড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবেই একদিন তাদের জীবন শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে প্রমাণিত হয়। তাদের পরিণতি বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়। কখনো আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর থেকে অথবা নিচ থেকে এমন আযাব নাযিল করেন, যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, তিনি অনেক জাতিকে এভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আবার কখনো তিনি কিছু সম্প্রদায়ের ওপর দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং ফসল নষ্টের মাধ্যমে শাস্তি অবতরণ করেন। আবার কখনো এক জাতিকে অন্য জাতির সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে শাস্তি দেন। এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়কে কষ্ট দেন। অতপর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, একদল অন্য দলকে নিরাপদ মনে করে না। পরিশেষে তাদের শান শওকত ও শৌর্য বীর্য দুর্বল হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত বা অবাধ্য বান্দাদেরকে তাদের ওপর চড়াও করে দেন যে তারা তাদের সৌর্য বীর্যকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত অবস্থা থেকে তাদের শেকড় উপড়ে ফেলে। এরপর আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করার নিমিত্ত নতুন জাতিকে প্রেরণ করেন। এমনিভাবেই আল্লাহর বিধান চলতে থাকে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে, যে আল্লাহর চিরাচরিত বিধান বুঝতে সক্ষম হয় এবং এটা যে,

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা– তাও উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুসারে খেলাফতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। আর দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে এই বাস্তবতা থেকে গাফেল ও বেখবর থাকে। সে মনে করে যে, দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও কলা কৌশল বা তদবীরবিহীন এমনিতেই দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে যে বিষয়টি মানুষকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করে, তা হচ্ছে তারা দেখে, যারা উচ্ছৃংখল, পাপে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও কাফের নাস্তিকরা তারাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোনো প্রকার শাস্তি দিচ্ছেন না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, মানুষ স্বভাবত তাড়াহুড়া প্রিয়। তাই তারা পরিণামের অপেক্ষা না করে কোনো বস্তুর সূচনা ও মাঝামাঝি অবস্থা দেখেই মন্তব্য করে বসে। শেষ অবস্থা দেখার জন্যে অপেক্ষা করে না। আর শেষ পরিণাম তো না আসা পর্যন্ত বলা যায় না কী হবে? অতীতের বিভিন্ন উত্থান পতন এবং শাস্তির ঘটনাবলীর দিকে যদি তাকাই, তাহলে আমরা এটা অতি সহজেই বুঝতে পারি যে, এ সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এবং অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তা মানুষের ইতিহাস রূপান্তরিত হওয়ার আগে আমরা কিছুই জানতাম না। দুনিয়ার ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত জীবনে পরিণামকে না দেখে যারা শুধু এ প্রাথমিক অবস্থাকেই পরিণাম হিসাবে ধরে নেয়, তারাই প্রতারিত হয়, কোরআনে হাকীম তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছে যেন তারা এমনভাবে প্রতারিত না হয় বরং পরিণাম পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

নৈতিক অবক্ষয় সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে

'অতপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি।'

নিসন্দেহে এ বাক্যটি এবং তার সদৃশ অন্যান্য বাক্য কোরআনে করীমে বারবার আসছে। এগুলো একটি বাস্তব সত্য, বাস্তব বিধান এবং ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ইসলামী ব্যাখ্যার একটি দিককে প্রতিষ্ঠিত করছে।

নিসন্দেহে কোরআনের উপরোক্ত ভাষ্যটি একথাটিই প্রতিষ্ঠিত করছে যে, পাপ পাপিকে ধ্বংস করে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অপরাধের জন্যে অপরাধী চক্রকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এটা হচ্ছে চিরাচরিত বিধান, যদিও কোনো ব্যক্তি তার সংক্ষিপ্ত জীবনে অথবা কোনো প্রজন্ম তার নির্ধারিত আয়ুষ্কালে তা দেখতে সক্ষম না হয়। এটাই সত্যিকারের বিধান, যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতিতে চলে এসেছে, যখনই কোনো জাতিতে অপরাধের প্রসার ঘটে এবং তাদের জীবন অপরাধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হয়। অনুরূপভাবে এটা ইতিহাসের ইসলামী ব্যাখ্যার একটি দিকও বটে। কারণ, বিভিন্ন প্রজন্মের ধ্বংস ও স্থলাভিসিক্ত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, জাতিতে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়া এবং তা এমন সমাজে প্রভাব বিস্তার করা, যার পরিণতি ধ্বংস বৈ আর কিছুই নয়। আর এ ধ্বংস কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্রুত বিপর্যয় ও প্রলয়ের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, অতীত ইতিহাসে কখনো তা সংঘটিত হয়েছে প্রাকৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে, যা কালের বিবর্তনে জাতিসত্ত্বার মাঝে প্রবাহিত হয়। আর হচ্ছে অপরাধ চক্রের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়া।

নৈতিক অবক্ষয়, ব্যাপক পতিতাবৃত্তি, নারীকে ফেতনা, সৌন্দর্য ও উপভোগের সামগ্রী হিসাবে গ্রহণ করা, সচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ এবং ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দেয়ার ওপর নিকট ইতিহাসে যথেষ্ট ঘটনাবলী ও প্রমাণাদি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে গ্রীক ও রোমান জাতি উপরোক্ত কার্যাদিতে নিমজ্জিত হওয়ার দরুন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ওপরও অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে। এখন

তাদের ঘটনাবলী আমাদের সামনে কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে আছে। অনুরূপভাবে বাহ্যিক শক্তি ও বিশাল ধন সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডসহ বহু পশ্চিমী উন্নত দেশের পতন অবশ্যম্ভাবী। যে পতনের প্রাথমিক আলামত পরিস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। আর এই পতনের শেষ অবস্থা উর্ধাকাশে বিদ্যুতের ন্যায় চমকাচ্ছে।

জাতিসমূহের বিভিন্ন স্তর এবং ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা থেকে নৈতিক অবক্ষয়ের অংশটুকুকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা সর্বদাই উহ্য রাখে। কারণ, তার দৃষ্টিকোণ হচ্ছে জীবন থেকে নৈতিক উপাদানকে দূরে রাখা এবং আকীদাগত বুনিয়াদকে দূরে রাখা, যার ওপর নৈতিক উপাদান প্রতিষ্ঠিত। এটা হাস্যজনক অবস্থা বৈ আর কিছুই নয়– কারণ মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায় স্তর এবং ঘটনার ব্যাখ্যা একমাত্র আকীদাগত বুনিয়াদের ভিত্তিতেই সম্ভব।

ব্যাপকতা, সততা ও বাস্তবতাসমেত ইসলামী ব্যাখ্যা বস্তুবাদী উপাদানের প্রভাবকে উপেক্ষা করে না। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এ সমস্ত উপাদানকে প্রধান বস্তু হিসাবে নির্ধারণ করে। বরং তা এ সকল উপাদানকে ব্যাপক জীবন পরিসরে উপযোগী স্থান দান করে। একইসাথে তা অপরাপর কার্যকরী উপাদানকে স্পষ্ট করে, উপস্থাপন করে, যাকে হঠধর্মীরা ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করে না। অনুরূপভাবে ইসলামী ব্যাখ্যা প্রত্যেক বস্তুর মূল নিয়ামক আল্লাহর নির্ধারণকে প্রকাশ করে, অন্তর, অনুভূতি, আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে খুলে ধরে, বাস্তব আচরণ এবং নৈতিক উপাদানকেও প্রকাশ করে দেয়। তা কোনো উপাদানকে উপেক্ষা করে না– যার মাধ্যমে মানব জীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির একটি প্রকৃতি চিত্রায়িত করেছেন। যার থেকে নানা ধরনের বিমুখতা সৃষ্টি হয়। তাই তিনি মানব মনের এক আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যার পুনরাবৃত্তি সর্বযুগে, সর্বপরিবেশে এবং সর্ব প্রজন্মে পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে। সে আর অন্য কিছুরই নয়; সে হচ্ছে হঠকারী অন্তরের দৃষ্টান্ত। কোরআনে করীম তা স্বল্প কথায় তার সুনিপুণ বর্ণনাভংগির মাধ্যমে মানব জাতির সামনে পেশ করেছে। (আয়াত ৭)

আল্লাহর বিভিন্ন আয়াত ও নিদর্শনাবলী থেকে তাদের বিমুখতার কারণ এই নয় যে, তার সত্যতার প্রমাণাদি দুর্বল ও অস্পষ্ট অথবা তাতে বিবেকের মতদ্বৈধতা রয়েছে। বরং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রচন্ড গোয়ার্তুমি ও নির্লজ হঠকারিতা। আর তা হচ্ছে কোরআনে করীমের আয়াতকে না মানা এবং অস্বীকারের ওপর প্রচন্ড জেদ, তাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ না করা অথবা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। যদি রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রসূল (স.)-এর প্রতি ঐশী বাণীর মাধ্যমে নাযিল না করতেন, যা তারা দেখতে পাচ্ছে না– যদি তিনি দৃশ্যমান এক অনুভব্য কাগজে লিখিত কেতাবাকারে ও নাযিল করতেন এবং তারা তা সহস্তে স্পর্শ করতো, শুধু অন্য থেকে শোনা অথবা দূর থেকে দেখার ওপরই নির্ভর না করতো, তথাপিও আজ যারা সত্যকে অস্বীকার করছে তারা তখন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতো, 'এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।'

এটা নিসন্দেহে গর্হিত নির্লজ্জ চিত্র– যা হৃদয়-কম্পনকে বৃদ্ধি করে এবং যে এ গর্হিত চিত্র অবলোকন করে তার ওপর চড়াও হতে আগ্রহী হয়। এটা এমন চিত্র, যা মানব অন্তরের ওপর প্রচন্ড আঘাত করে,। উৎসাহিত করে। যেখানে যুক্তি প্রমাণ ও বিবাদের কোনো স্থান নেই।

তাদের অবস্থাকে এভাবে অংকন করা যে, এটা এমন চিত্র, যা বারবার বলা দৃষ্টান্তসমূহের চিত্রকে মানবতার সামনে উন্মোচন করে। তার পেছনে দুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যও লুক্কায়িত থাকতে পারে।

এ চিত্র কোরআনের নিদর্শনাবলীর অস্বীকারকারীদের সামনে তাদের ঘৃণিত এবং কুৎসিত চেহারাকে অংকন করে দেয়। এটা এমন যেন কোনো ব্যক্তি কুৎসিত ও বিশ্রী চেহারার অধিকারী ব্যক্তির সামনে একটি আয়না তুলে ধরলো যাতে সে তার বিশ্রী অবয়ব দেখে লজ্জিত হলো।

সাথে সাথে এ চিত্র মোশরেকদের বিমুখতা এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকারের প্রতি মোমেনদের অন্তকরণকে আরো উদ্বেলিত করে তুলে এবং তাদের অন্তরকে হকের ওপর অবিচল করে তুলে সুতরাং তারা মিথ্যাচার, অস্বীকার, ফেতনা ফাসাদের দ্বারা পরিবেশে প্রভাবিত হয় না। অনুরূপভাবে এ চিত্র মহান আল্লাহর অপার সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের প্রতি ইংগিত বহন করে যে, তিনি হঠকারিতা, ধৃষ্টতা ও অস্বীকার সত্তেও মোশরেকদের ওপর দ্রুত শাস্তি অবতরণ করে না।

এসব কিছু হচ্ছে মূলত ওই যুদ্ধের হাতিয়ার যা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা মোশরেকদের বিরুদ্ধে কোরআনে হাকীমের মাধ্যমে ব্যবহার করবে।

মোশরেকদের অলিক ধারনা ও অবান্তর দাবী দাওয়া

অতপর আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদের হঠকারিতাপূর্ণ এবং অজ্ঞতাপূর্ণ দাবী দাওয়া ও প্রস্তাবাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে একজন ফেরেশতা কেন পাঠাচ্ছেন না– যে দাওয়াতের প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে তার সাহায্য সহযোগিতা করবে এবং তার রেসালাতের সত্যতা মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে, এবং সে ফেরেশতাদের প্রকৃতি এবং তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাবার আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা তাদের সামনে উপস্থাপন করবে। সর্বশেষে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভ্রান্ত দাবী দাওয়া ও প্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার মাঝে কী রহমত লুক্কায়িত আছে তাও বর্ণনা করবে। (আয়াত ৮-৯)

মোশরেকদের ভ্রান্ত এ দাবী এবং এ সাদৃশ্য পূর্বেকার দাবী-দাওয়া– যার বর্ণনা কোরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে এসেছে এবং তার কোরআনী জবাব কয়েকটি বাস্তব সত্যের দিকে ইংগিত করে, যার বর্ণনা আমি যথাসম্ভব এখানে উপস্থাপন করবো।

প্রথমত, আরবের মোশরেকরা আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, বরং তারা মোহাম্মদ (স.) যে আল্লাহর রসূল তার প্রমাণ চাইতো এবং তারা একথারও প্রমাণ চাইতো যে কোরআনে করীম আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত সত্য গ্রন্থ কিনা। তারা একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও পেশ করতো। তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (স.)-এর কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান না কেন? যে তার সাথে থাকবে এবং সাহায্য সহযোগিতা করবে। অধিকন্তু সে তাঁর রেসালাতের সত্যতা প্রমাণ করবে। এটা মোশকরেকদের এ সাদৃশ্য অসংখ্য প্রস্তাবের একটি। যার উল্লেখ কোরআনে করীমের অসংখ্য স্থানে এসেছে। উল্লেখিত আয়াতের প্রস্তাব সদৃশ অসংখ্য প্রস্তাব সূরা আল ইসরায় বর্ণিত হয়েছে যাতে তাদের হঠকারিতা, ধৃষ্টতা এবং জাগতিক তথ্য এবং অসংখ্য প্রকৃত মূল্যবোধের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপমা দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি এবং তারা বলে, আমরা কখনো আপনাকে বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরনা প্রবাহিত করে দিবেন। কিংবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আংগুরের একটি বাগান হবে, অতপর আপনি তার মধ্যে

ঝরনাসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। অথবা আপনার কোনো সোনার তৈরী ঘর হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনো বিশ্বাস করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করবো। বলুন, পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? 'আল্লাহ কি মানুষকে পয়গাম্বর করে পাঠিয়েছেন'? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের কাছে হেদায়াত। আসে বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করতো, তবে আমি আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকেই তাদের কাছে পয়গাম্বর করে প্রেরণ করতাম।' (সূরা আল ইসরা ৮৯-৯৫)

এ ধরনের ভ্রান্ত দাবী দাওয়া ও প্রস্তাবের মাধ্যমে তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। অন্যথায় তারা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার নিরিখে নবী মোহাম্মদ (স.)-এর চরিত্র সম্পর্কে ভালো করেই অবগত ছিলো। তারা রসূলের সততা ও আমানতদারী সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল ছিলো। তারা তাকে 'আল আমীন' (বিশ্বাসী) হিসেবে ডাকতো এবং আদর্শগত প্রচন্ড বিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকা সত্তেও তারা তার কাছে ধন সম্পদ গচ্ছিত রাখতো। এমনকি আদর্শ নবী মোহাম্মদ (স.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন, তখন চাচাত ভাই আলী (রা.)-কে তাঁর স্থলে রেখে গিয়েছিলেন কোরায়শদের গচ্ছিত সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। রসূল (স.) এবং কোরায়শদের মাঝে আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্তেও রসূল (স.) এ কাজটি করেছিলেন। এমনকি তারা রসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিলো। রসূল (স.)-এর সততা আমানতের ন্যায় তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো। যখন রসূল (স.) আল্লাহর নির্দেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আরব নেতৃবৃন্দকে সাফা পর্বত প্রান্তরে সমবেত হওয়ার জন্যে আহবান জানিয়েছিলেন, তখন তারা সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে সমবেত হয়েছিলো। তিনি তাদেরকে তখন প্রশ্ন করে বলেছিলেন, যদি আমি তোমাদেরকে কোনো বিশেষ বিষয়ে অবহিত করি, তা কি তোমরা বিশ্বাস করবে? তখন তারা সমস্বরে বলেছিলো, তুমি আমাদের কাছে পরীক্ষিত সত্যবাদী। কারণ তারা যদি তার সততা সম্পর্কে জানতে চাইতো, তবে তাদের কাছে তার উপায়-উপকরণ ও দৃষ্টান্ত অসংখ্য ছিলো। তারা তাঁকে সত্যবাদী হিসেবেই জানতো। সামনে নবী সম্পর্কে আল্লাহর সত্য সংবাদ আসছে যে, তারা (মোশরেকরা) তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেনি। এরশাদ হচ্ছে,

আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে, এর দ্বারা তারা তো শুধু আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং যালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (সূরা আল আনয়াম-৩৩) এটা হচ্ছে অস্বীকার এবং বিমুখতার ব্যাধী। এটা গোয়ার্তুমী এবং দাম্ভিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটা একথারই প্রমাণ নয় যে, তারা রসূল (স.)-এর সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

তারা যেসব জড়বাদী যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণ করছে, সেগুলোর চেয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ খোদ কোরআনে হাকীমেই বিদ্যমান রয়েছে। কোরআনে করীম স্বয়ং এবং তার বর্ণনা এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য যে, এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, তারা এটা ভালো করেই জানতো এবং অনুভব করতো যে, কোরআন আল্লাহরই নাযিলকৃত গ্রন্থ। ভাষা সাহিত্য এবং শৈল্পিক অনুভূতির মাধ্যমে মানব শক্তির

দৌরাত্ম্য কত তা তারা ভালো করেই জানতো। তারা এটাও জানতো যে, এ কোরআন তাদের দৌরাত্ম্যের ঊর্ধে। যারা কথা শিল্প ও অলংকার শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করে না, তাদের চেয়ে যারা কথা শিল্প নিয়ে চর্চা করে তাদের উপরোক্ত উপলব্ধি অনেক বেশী। যারা কথা শিল্প ও অলংকার শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করে, তারা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারে যে, এ কোরআন রচনা তাদের সাধ্যের ঊর্ধে। এ বাস্তবতাকে অবাধ্য ও জেদী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, নিজের মাঝে সত্যকে পেয়েও গোপন রাখে। কোরআনের বিষয়বস্তু অর্থাৎ আকীদাগত চিন্তা ধারা ওই পন্থা যাকে কোরআনে হাকীম আকীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এবং ফলাফল ও অনুপ্রেরণাদানকারী উপলব্ধিসমূহের প্রকাশে গ্রহণ করেছে তার সব কিছুই মানব চিন্তা চেতনা এবং বর্ণনাভংগির বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতির কাছে অপরিচিত। এ অনুভূতি আরববাসীর অন্তরের অন্তস্তলে অস্পষ্ট ছিলো না, এমনকি তাদের বক্তব্য ও অবস্থা এ কথাই প্রমাণ করতো যে, তারা আল কোরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়া ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করে না।

এমনিভাবেই প্রতিভাত হয় যে, এ সমস্ত দাবী দাওয়া ও প্রস্তাবাবলী যুক্তি আসলে সত্য অন্বেষণের লক্ষ্যে নয়, বরং তা ছিলো অবাধ্যতার বিভিন্ন মাধ্যম দাম্ভিকতার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং বাক বিতন্ডা ও হঠকারিতা ও গোয়ার্তুমির একটি পরিকল্পনা মাত্র। তাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। 'যদি আমি কাগজে লিখিত কোনো বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করতো, তবু অবিশ্বাসীরা একথাই বলতো যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়।'

দ্বিতীয়ত, আরবরা পূর্ব থেকেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলো। তাদের দাবী ছিলো যেন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের কাছে জনৈক ফেরেশতা পাঠান যে তাঁর সত্যতা প্রমাণ করবে এবং তার সাথে সাহায্যকারী হিসাবে মানুষদেরকে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা এই সৃষ্টি (ফেরেশতা)-এর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলো না, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। তারা এই সৃষ্টি, তার প্রভুর সাথে সম্পর্কের প্রকার নিয়ে প্রমাণহীন চিন্তা করতে গিয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলো। কোরআনে করীম ফেরেশতা সংক্রান্ত আরববাসীর অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা এবং পৌত্তলিক কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছে এবং এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ ধারণা তাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। যাতে করে তাদের মধ্য হতে ওই সমস্ত লোকের চিন্তা চেতনা পরিশুদ্ধ হতে পারে যারা এ দ্বীনের মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে এ সৃষ্টির সাথে তাদের পরিচয়টাও একটা বিশুদ্ধ হবে। এ দিক থেকে ইসলাম যেমন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং পরিবেশ পরিস্থিতির সংস্কার সংশোধন এবং পরিবর্তনের মাধ্যম, তেমনি বিবেক বুদ্ধি এবং অনুভূতির বিশুদ্ধকরণের মাপকাঠিও বটে।

কোরআনে হাকীম আরববাসীদের ভ্রান্ত ধারণা ও চিন্তা চেতনা এবং তাদের অজ্ঞতার কিছু নিদর্শন উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করে যে, তারা ধারণা করতো ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের ধারণা মতে ফেরেশতাদের সুপারিশ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে কোরআনে করীম রসূল (স.)-এর কাছে ফেরেশতা পাঠাবার তাদের দাবীও উল্লেখ করেছে যে, ফেরেশতা এসে তার মিশনের সত্যতার স্বীকৃতি দিবে।

কোরআনে করীম অসংখ্য স্থানে তাদের প্রথম ভ্রান্ত ধারণা (ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান) পরিশুদ্ধ করেছে। যেমন সূরা আন নাজমে এসেছে,

'তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও ওযযা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? পুত্র সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর জন্যে? এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। এতো কতো গুলো নাম বৈ কিছু নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা নিজেরাই রেখেছো। এর সমর্থনে আল্লাহ তায়ালা কোনো দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে। মানুষ যা চায় তা কি পায়? অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মংগলই আল্লাহর হাতে। আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতোক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, সে অনুমতি না দেন। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের ওপর চলে, সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়।'

ফেরেশতা সম্পর্কিত ধারণা

কোরআনে হাকীম এ সূরার এ দু' আয়াত এবং অন্যান্য সূরার অসংখ্য আয়াতে ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটিও তাদের জন্যে পরিস্কার করে দিয়েছে এরশাদ হচ্ছে,

'তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হলো না? যদি আমি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, (তাদের) ফায়সালা তো এখনই শেষ হয়ে যেতো। অতপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেয়া হতো না। (আল আনয়াম ৮)

এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকেই এবং এ সৃষ্টির পরিচয়ের একটি দিক। তারা দাবী করতো, আল্লাহ তায়ালা যেন রসূলের সাহায্যার্থে ফেরেশতা পাঠান। কিন্তু ফেরেশতা পাঠাবার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, যখনই কোনো সম্প্রদায় তাঁর প্রেরিত রসূলকে অস্বীকার করতো তখনই তিনি সেই জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন ধ্বংস যদি আল্লাহ তায়ালা আরবের মোশরেকদের ডাকে সাড়া দিয়ে ফেরেশতা পাঠাতেন, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেতো, একটা ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতো। ফেরেশতা অবতরণের পর তাদেরকে আর সামান্যতম সুযোগ দেয়া হতো না। এটাই কি তারা কামনা করতো? তাদের দাবীতে সাড়া না দেয়ার মাঝে তাদের জন্যেই কল্যাণ নিহিত ছিলো। পক্ষান্তরে তাদের দাবীতে সাড়া দেয়ার মাঝে যে ধ্বংস ও বিনষ্ট লুক্কায়িত আছে, তারা এটা কেন বুঝে না? এমনিভাবে কোরআনী বক্তব্য তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের করুণা এবং ধৈর্য প্রমাণ করে, অনুরূপভাবে তা তাদের স্বার্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ফেরেশতা নাযিলের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের কথাও বর্ণনা করে। তারা তাদের জীবনবিধ্বংসী অজ্ঞতার দরুন হেদায়াতকে অস্বীকার করে, আল্লাহর করুণাকে অস্বীকার করে এবং যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণে বাড়াবাড়ি করে। এটা সৃষ্টির পরিচয়ের দ্বিতীয় দিক, যা দ্বিতীয় আয়াতটিতে রয়েছে,

'যদি আমি কোনো ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হতো। এতেও ওই সন্দেহই করতো, যা তারা এখন করছে।' (আনআম ৯)

তাদের দাবী ছিলো, আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁর রসূলের কাছে ফেরেশতা পাঠান, যে তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণ করবে। কিন্তু ফেরেশতা হচ্ছে ভিন্ন আরেক সৃষ্টি। বিশেষ স্বভাবের অধিকারী যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই ভালো করে জানেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে যা বলেছেন তা ছাড়া আমাদের তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের আকৃতিতে বিচরণ করতে তারা সক্ষম নয়। কারণ তারা এই মর্তের অধিবাসী নয়। তথাপি তাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে

যার বদৌলতে তারা মানব জীবনে কোনো দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের আকৃতি গ্রহণ করতে সক্ষম। যেমন রেসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া, আল্লাহর রসূলদের অস্বীকারকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, মোমেনদেরকে অটল রাখা অথবা মুসলমানদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে হত্যা করা। এছাড়াও আরও অসংখ্য দায়িত্ব যা তাদের কাঁধে অর্পণ করা হয়েছে, যার বর্ণনা কোরআনে হাকীমের মাঝে এসেছে। তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশের অমান্য করে না এবং তারা যে কাজের প্রতি আদিষ্ট হয়েছে, তা পুরোপুরি আঞ্জাম দিয়ে থাকে।

যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের সত্যতার জন্যে কোনো ফেরেশতা পাঠাতেন, তবে সে ফেরেশতার আকৃতিতে না হয়ে মানুষের আকৃতিতেই আত্মপ্রকাশ করতো। গোটা ব্যাপারটা আবারও তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত থেকে যেতো। যখন বাস্তব সত্য বস্তুই তাদের কাছে সংশয়যুক্ত। অথচ মোহাম্মদ (স.) তাদেরকে বলে, আমি মোহাম্মদ যাকে তোমরা ভালো করেই চিনো– তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সুসংবাদ দান করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাদের সংশয় ও সন্দেহের মাত্রা কতোই না বৃদ্ধি পেতো, যখন তাদের কাছে মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আসতো, যাকে তারা চিনে না এবং বলতো, আমি ফেরেশতা, আমাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের সত্যতার জন্যে পাঠিয়েছেন তাহলে তারা তাকেও অমান্য করার ওজুহাত পেতো। অর্থাৎ যেখানে তারা মৌলিক সত্য বস্তুর ক্ষেত্রেই সন্দেহে লিপ্ত। যদি আল্লাহ তায়ালা মানুষের আকারে ফেরেশতাকে পাঠাতেন, তবে তিনি তাদেরকে ঠিক তেমনি সংশয়ে লিপ্ত করতেন যেমন তারা এখন লিপ্ত রয়েছে। আর তারা কখনও সঠিক পথের সন্ধান পেতো না।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতাকে উন্মোচন করেন। অধিকন্তু তিনি যুক্তি প্রমাণ বিহীন তাদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতাকেও উন্মোচন করেছেন।

তৃতীয়ত, ওই বাস্তব সত্য যাকে কোরআনী ভাষ্য চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছে তা হচ্ছে, ইসলামী চিন্তা ধারা প্রকৃতি এবং তার উপাদানসমূহ। তন্মধ্যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতসমূহ, যাদের ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলমানকে অবহিত করেছে যে, প্রথমত এগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে অতপর তার কাছাকাছি যেতে হবে। অদৃশ্যমান জগতের মধ্যে একটি হচ্ছে ফেরেশতা জগত। ইসলাম তার প্রতি ঈমান আনাকে ঈমানের অন্যতম বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছে, এ ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর এই ঈমান হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতাকুল, আসমানী কেতাবসমূহ, রসূলরা, পরকাল, মওতের পর পুনরুত্থান এবং ভালো মন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।

সূরা আল ফাতেহার আলোচনা করতে গিয়ে আমি এ জাতীয় কিছু বক্তব্য পেশ করেছি। যার সার হচ্ছে এই যে, অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা মানব জীবনে একটি বিশাল পদক্ষেপ। কারণ তার মাধ্যমে মানুষ সংকীর্ণ গন্ডি থেকে পার ওই জিনিস অনুভব করে যে, এমন এক অজানা অদৃশ্য জগত রয়েছে যার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার অনুভব সম্ভব। এটা নিসন্দেহে জৈব অনুভূতির বেষ্টনী থেকে মানব অনুভূতির স্তরে স্থানান্তর। মানব অনুভূতি ছাড়া এ ক্ষেত্রকে বন্ধ করার চেষ্টা– পেছনে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুবাদী মতাদর্শসমূহ তার জন্যেই চেষ্টা চালায় এবং তাকে প্রগতি হিসাবে আখ্যায়িত করে।

'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না'– এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় আমি 'গায়ব'– অদৃশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। অদৃশ্য জগতের মধ্য থেকে আমি এখানে শুধু ফেরেশতা জগত সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

অদৃশ্য জগত সম্পর্কে ইসলামী চিন্তা ধারা ও উপলব্ধিসমূহ নির্দেশ করে যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন এক সৃষ্টি রয়েছে, যার নাম ফেরেশতা। কোরআনে করীম তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদেরকে যা অবহিত করেছে, তা তাদেরকে বুঝা এবং তাদের সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণার জন্যে যথেষ্ট। তারা আল্লাহর সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি, যারা দাসত্ব এবং নিরংকুশ আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত। তারা আল্লাহর কাছে; কিন্তু কিভাবে এবং কোন ধরনের নৈকট্য, তা আমি নির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না। এরশাদ হচ্ছে,

'তারা বলেন, দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তার জন্যে কখনও এটা যোগ্য নয়, বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করে। তাদের সামনে ও পেছনে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা সদা তাঁর ভয়েই ভীত। 'আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর এবাদাতে অংহকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে এবং ক্লান্ত হয় না।'

তারা (ফেরেশতারা) আল্লাহর আরশ বহন করে এবং কেয়ামত দিবসে অনুরূপভাবে তাঁর আরশকে বেষ্টন করে রাখবে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হবে? সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যে পরিমাণ অবহিত করেছেন, তার অধিক আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, কেননা এটা এক অদৃশ্য বস্তু। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।'

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

'আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায়বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর।'

ফেরেশতারা জান্নাত এবং জাহান্নামের রক্ষী। তারা জান্নাতবাসীকে সালাম ও দোয়ার মাধ্যমে স্বাগত জানাবে এবং তারা জাহান্নামবাসীকে তিরস্কার এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ডাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।'

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে,

'আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি।'

ফেরেশতারা পৃথিবীবাসীদের সাথে বিভিন্নভাবে আচরণ করে, যা নিম্নে বর্ণিত হলো,

ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে পৃথিবীবাসীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়, তারা তাদের অনুসরণ করে, তাদের যাবতীয় কার্যাদিকে লিপিবদ্ধ করে। আর যখন তাদের মৃত্যু আসে, তখন তারা আত্মা হস্তগত করে।

'তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর ক্ষমতাশালী। তিনি তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী প্রেরণ করেন। এমনকি, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু আসে, তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় এবং নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা সামান্যতম শৈথিল্যও দেখায় না।'

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

'তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফাযত করে।'

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে,

'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।'

ফেরেশতারা রসূলদের কাছে আল্লাহর ঐশীবাণী পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে অবহিত করেছেন যে, জিবরাঈল (আ.) এ কাজের জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এরশাদ হচ্ছে, 'তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন, যে 'হুশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ভয় করো।'

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে,

'আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়– যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।'

আল্লাহ তায়ালা তাকে (জিবরাঈল (আ.)-কে) শক্তিশালী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর রসূল (স.) তাকে মাত্র দুইবার ফেরেশতার আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন। অথচ সে অসংখ্য বার রসূল (স.)-এর কাছে এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তমিত হয়। তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কোরআন ওহী যা প্রত্যাদেশ হয় তা-ই তিনি বলেন। তাকে শিক্ষাদান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, সহজাত শক্তি সম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলো। উর্ধ দিগন্তে অতপর নিকটবর্তী হলো ও ঝুলে গেলো। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিলো অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন রসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিলো, সিদরাতুল মোনতাহার কাছে। যার কাছে অবস্থিত রয়েছে বসবাসের জান্নাত। যখন বৃক্ষটি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো, তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেনি।'

ফেরেশতারা বাতিল অসত্য ও তাগূতের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় মোমেনদের কাছে দৃঢ়তা, মনোবল ও সাহায্য নিয়ে অবতরণ করে। এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো।'

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে,

'আপনি যখন বলতে লাগলেন মোমেনদেরকে– তোমাদের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর করো এবং বিরত থাকো, আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বস্তুত এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে।'

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন,

'যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখো। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেবো। কাজেই গর্দানের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানো।'

ফেরেশতারা মোমেনদের কাজে নিয়োজিত। তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং মোমেনদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করে। এরশাদ হচ্ছে,

যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মোমেনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ দাদা, পতি পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকেও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় এবং আপনি তাদেরকে অমংগল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমংগল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন, এটাই মহা সাফল্য।'

তারা মোমেনদের রূহ (জান) কবযের সময় তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, পরকালে সুসংবাদের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং জান্নাতে তাদেরকে সালাম দেয়। এরশাদ হচ্ছে,

'ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করে তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ করো।'

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ দাদা, স্বামী স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যক্ষ দরজা দিয়ে। বলবে, তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতোই না চমৎকার।'

ফেরেশতারা কাফেরদেরকে জাহান্নামে তিরস্কার, ধিক্কার ও শাস্তির মাধ্যমে ডাকবে যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা সত্যের যুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং মৃত্যুর সময় তারা তাদের রূহ শাস্তি, তিরস্কার, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মাধ্যমে কবজ করবে। এরশাদ হচ্ছে, 'যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, তোর আত্মা বের করে দেয়। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে।'

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?'

মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টিলগ্ন থেকে শুরু করে মানব জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক চলে আসছে। এমনিভাবে এ সম্পর্ক বিভিন্ন যুগে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে, যার দিকে কোরআনে হাকীমের বাছাইকৃত আয়াতে আমি ইতিপূর্বে ইংগিত করেছি। মানব উৎপত্তির সাথে ফেরেশতাকুলের সম্পর্কের আলোচনা আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এসেছে। তন্মধ্যে সূরা আল বাকারার আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা বললো, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাংগা-হাংগামা সৃষ্টি করবে এবং যমীনে রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি বললেন, নিসন্দেহে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আর আল্লাহ তায়ালা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন, অতপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। তারা বললো, তুমি পবিত্র। আমরা কোনো কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভালো করেই অবগত রয়েছি এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ করো, আর যা তোমরা গোপন করো এবং যখন আমি আদম (আ.)-কে সেজদা করার জন্যে ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সেজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করলো এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।'

এ প্রশস্ত ক্ষেত্র যা মানব জীবন এ উর্ধজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা হচ্ছে চিন্তা ধারার প্রশস্ততা, এ অস্তিত্বের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করার প্রশস্ততা, অনুভূতির প্রশস্ততা এবং মানসিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক গতি ও আন্দোলনের প্রশস্ততা। ইসলামী চিন্তা চেতনা ও উপলব্ধিই মুসলমানকে এ সকল প্রশস্ততা দান করেছে। কোরআনে হাকীম মুসলমানদের সামনে এ প্রশস্ত ক্ষেত্রটি এবং অদৃশ্য জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট অদৃশ্য জগতকে উপস্থাপন করেছে।

যারা মানব জাতির সামনে এ প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং পুরো অদৃশ্য জগতকেই রুদ্ধ করে রাখতে চায়, তারা নিসন্দেহে মানব জাতির ঘৃণ্যতম অনিষ্টতা করছে। তারা সীমিত অনুভূতি গন্ডির মাঝে মানব জাতির জগতকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তার মাধ্যমে তারা মানব জাতিকে প্রাণী জগতের অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে চিন্তা ধারা, বুদ্ধি-বিবেক এবং উপলব্ধির শক্তিদানে সম্মানিত করেছেন। তার বদৌলতে মানুষ ওই সমস্ত বস্তু অনুভব করতে সক্ষম- যা চতুষ্পদ জন্তু করতে সক্ষম নয়। অনুরূপভাবে মানুষ তার মাধ্যমে জ্ঞান ও অনুভূতির প্রশস্ত মহাসাগরে জীবন যাপন করতে সক্ষম এবং বিবেক বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে এ অদৃশ্য জগত সাদৃশ্য জগতে যাত্রা করতে সক্ষম।

আরববাসীরা তাদের চিন্তা চেতনায় বহু ত্রুটি সত্ত্বেও জাহেলিয়াতের উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক (বৈজ্ঞানিক!) জাহেলিয়াতের থেকে উন্নত ছিলো, যারা গোটা (গায়ব) অদৃশ্যকেই বিদ্রূপ করে। যারা এ ধরনের অদৃশ্য জগতের প্রতি বিশ্বাসকে সাধারণ এবং অবৈজ্ঞানিক বিষয় হিসাবে গণ্য করে এবং যারা অদৃশ্য জগত সংক্রান্ত বিষয়কে এক পাল্লায় আর বিজ্ঞানকে অপর পাল্লায় রাখে। 'অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতে, তিনি ব্যতীত কেউ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না।' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি তাদের যুক্তিহীন দাবী সম্পর্কে আলোচনা করবো, যার সাথে বিজ্ঞান এবং দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে ফেরেশতা সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাঝেই আমি সীমাবদ্ধ থাকবো।

এখানে আমি প্রশ্নাকারে বলতে চাই যে, যারা অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করে, তাদের কাছে এমন কি বৈজ্ঞানিক যৌক্তিক দলীল প্রমাণাদি রয়েছে, যার ভিত্তিতে তারা ফেরেশতা নামক সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারে এবং তাকে চিন্তা এবং উপলব্ধির গন্ডি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে? সর্বোপরি তাদের কাছে এমন কী জ্ঞান লুক্কায়িত রয়েছে, যার কারণে তারা ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে?

অপর কোনো দেহে পরিচিত জীবন ছাড়া অন্য প্রকার জীবনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে তাদের জ্ঞান সক্ষম নয়। যে দেহের পরিবেশের বিন্যাস, প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিকতা, পৃথিবীর পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে তারা অদৃশ্য জগতের অস্তিত্বের অস্বীকারের একটি যুক্তি প্রমাণও উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়, সেখানে তারা এ জগতকে অস্বীকার করতে কিভাবে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করতে পারে?

বিচারের জন্যে তাদেরকে আমি আমাদের আকীদা বিশ্বাস বা আল্লাহর উক্তির শরণাপন্ন করতে চাই না, বরং আমি তাদেরকে তাদের জ্ঞানেরই শরণাপন্ন করতে চাই– যাকে তারা নিজেদের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে। আসলে আমি জ্ঞান থেকে উৎসারিত কোনো দলীল প্রমাণাদি ছাড়া তাদের মাঝে শুধু দাম্ভিকতা ও হঠকারিতাই দেখতে পাই এটাই তাদেরকে ফেরেশতা নামক সৃষ্টির অযৌক্তিক অস্বীকারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শুধু এই অপবাদে যে, এটা অদৃশ্য জগতের একটি সৃষ্টি। এ বিষয়টি যখন পর্যালোচনা করি, তখন আমি দেখতে পাই যে, তারা যে অদৃশ্য গোয়ব)-কে অস্বীকার করছে তা এমন বাস্তব সত্য যার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বর্তমানে তাদের নিজেদের জ্ঞান বিজ্ঞানই।

আল্লাহর নিদর্শন দেখার জন্যে দেশ দেশান্তরের সফর

এ অধ্যায়ের যবনিকা টানা হয়েছে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরদের সাথে উপহাসকারীদের পরিণাম উল্লেখ করে। রসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীও তাদের পূর্বসূরীদের পরিণতির প্রতি চিন্তা গবেষণা করা এবং সেই পরিণতি ও ধ্বংসযজ্ঞ অবলোকন করার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে ভ্রমণ করার এখানে আহবান জানানো হয়েছে, সকল পরিণতি মিথ্যা প্রতিপন্নকারী উপহাসকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানই উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য। (আয়াত ১০- ১১)

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা তাদের হঠকারিতা ও দাম্ভিকতাপূর্ণ বিমুখতার উল্লেখের পর তাদের এটা অজ্ঞতা এবং দাম্ভিকতাপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ এবং তার ডাকে সাড়া না দেয়ার মাঝে আল্লাহর যে করুণা ও ধৈর্য রয়েছে সে বর্ণনাও করা হয়েছে। এর মাঝে দুটি বাহ্যিক উদ্দেশ্য নিহিত।

এক. বিরোধীদের গোঁড়ামি-হঠকারিতা এবং মিথ্যারোপকারীদের অবাধ্যতা থেকে রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাঁর মনবেদনা দূর করা, রসূলদের সাথে উপহাসকারী এবং তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্তকারীদেরকে পাকড়াও করার আল্লাহর বিধানের প্রতি রসূল (স.)-এর অন্তরকে আশ্বস্ত করা এবং এ মর্মে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া যে, এ বিমুখতা, বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হক এ ন্যায়ের পথে দাওয়াত দেয়ার ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। তাঁর পূর্বেকার রসূলরাও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। উপহাসকারীরাও– প্রতিফল পেয়েছে এবং যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিলো তাদেরকে ওই শাস্তি বেষ্টন করে নিয়েছে যা নিয়ে তারা উপহাস করতো। পরিশেষে বাতিলের ওপর হকই বিজয়ী হলো।

দুই, আরব জাতির উপহাসকারী ও মিথ্যারোপকারীদের অন্তর যেন তাদের পূর্বসূরী উপহাসকারী ও মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি উপলব্ধি করে এবং তাদের নিজেদের জন্যে আপেক্ষমান পরিণতি সম্পর্কেও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদি তারা বিদ্রূপ, উপহাস এবং মিথ্যারোপের মাঝে নিমজ্জিত থাকে তাহলে তাদেরও একই পরিণতি হবে। আল্লাহ তায়ালা নবী রসূলদের অবাধ্যতা, তাদের সাথে বিদ্রূপ করা এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে পূর্ববর্তী যুগের লোকদেরকে পাকড়াও করেছেন, যারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী, প্রভাব প্রতিপত্তিশীল এবং ধন সম্পদের অধিকারী ছিলো। এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যার শুরুতে এ সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে নবী! আপনি বলে দিন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে?

উপদেশ গ্রহণ করা, চিন্তা গবেষণা করা এবং জানার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করা এবং বিভিন্ন ঘটনায় অংকিত, চাক্ষুষ কীর্তি ও নিদর্শনাবলী এবং এ সম্পর্কিত সুদূরপ্রসারী আলোচনায় বর্ণিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আল্লাহর বিধান জানার লক্ষ্যে ভ্রমণ করা– সত্যিকারার্থে আরববাসীদের কাছে ছিলো একেবারেই নতুন।

প্রাচীনকালে আরববাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা নির্বাহ, শিকার এবং মেষ চরাবার লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতো এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তারা স্থানান্তরিত হতো। কিন্তু শিক্ষামূলক ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং জানার লক্ষ্যে ভ্রমণ করা তাদের কাছে ছিলো বিলকুল নতুন। আর এ নতুন পন্থাই তাদেরকে জাহেলিয়াতের গহব্বর থেকে টেনে তুলে উন্নতির উচ্চ শৃংগে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

মানব ইতিহাসের ব্যাখ্যা এটার সাথে সংগতি পূর্ণ ও ছিলো, যার প্রতি কোরআনে হাকীম আরব সমাজকে দিকনির্দেশনা দিতো। অনুরূপভাবে সে ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ও প্রচলিত নিয়ম-মাফিক ছিলো, যার প্রভাব ও ফলাফল বাস্তবায়িত হতো যখনই তার কারণসমূহ পাওয়া যেতো, ইতিহাসের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত পদ্ধতিটি সে যুগের মানব বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিলো, কেননা যে ইতিহাস থেকে তখন ঘটনা বর্ণনা করা হতো, তা ছিলো শুধু প্রত্যক্ষ দর্শন অথবা বিভিন্ন ঘটনাবলী, রীতি-নীতি ও মানুষের বর্ণনা বিশেষ। এটা বিশ্লেষণমূলক বা গঠনমূলক কোনো পদ্ধতি ছিলো না, যা বিভিন্ন ঘটনার মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সর্বোপরি যা এবং বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ের মাঝে সম্পর্ক ও সংযোগ নির্ধারণ করতে পারে।

তারা অবাক ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ে ওই ব্যাপক পরিবর্তন দেখে যা আরব সমাজ নবুওতে মোহাম্মদীর সিকি শতাব্দীতে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ এটা এমন একটা ক্ষুদ্র সময় যা অর্থনৈতিক অবস্থার তড়িৎ উন্নতি সাধনের জন্যে মোটেও যথেষ্ট নয়। তাদের এ বিস্ময় অতিদ্রুত দূরীভূত হয়ে যাবে যদি তারা অর্থনৈতিক উন্নতির কারণসমূহের অন্বেষণে তাদের মনোযোগকে নিবদ্ধ করে। এতে তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নতুন বিধানে তাঁর রহস্য অনুসন্ধান করতে পারবে যে বিধান বিশ্বনবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.) মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। এ বিধানে সুপ্ত রয়েছে মোজেযা আর এ বিধানেই লুক্কায়িত আছে ওই রহস্য যা তারা দীর্ঘদিন যাবত ওই মিথ্যা উপাস্যের কাছে অন্বেষণ করে আসছিলো। আধুনিক বস্তুবাদীরাও আজ একে অর্থনীতির উপাস্য হিসাবে মিনে নিয়েছে।

অন্যথায় আরব উপদ্বীপের দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিভাবে হলো, এটা আকীদাগত চিন্তা ধারা, শাসন ব্যবস্থা, চিন্তা গবেষণার পদ্ধতি, চারিত্রিক মূল্যবোধ, জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং সমাজের বিভিন্ন অবস্থা থেকে উৎপন্ন বিষয়। এসব কিছু কি অন্য কিছুর মাধ্যমে সিকি শতাব্দীতেই অর্জিত হতে পেরেছে?

(ষষ্ঠ আয়াত) এ আয়াতে প্রদত্ত ইংগিতের পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে নিম্নের আয়াতের ইংগিত (১১ আয়াত)। এ সূরা এবং গোটা কোরআনে করীমের অসংখ্য আয়াতের ইংগিত সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি পেশ করে– যা মান চিন্তা ধারার কাছে নতুন এবং অপরিচিত। অথচ এটাই হচ্ছে স্থায়ী একক বিধান।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

১২. (হে নবী!) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা সব কার? তুমি বলো, (এর সবকিছুই) আল্লাহ তায়ালার জন্যে; (মানুষদের ওপর) দয়া করাটা তিনি তাঁর নিজের ওপর (কর্তব্য বলে) স্থির করে নিয়েছেন। কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের অবশ্যই জড়ো করবেন, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; (সত্য অস্বীকার করে) যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে, তারা (এমন একটি দিনের আগমনকে কখনো) বিশ্বাস করে না। ১৩. রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি (এদের সবার কথা) শোনেন এবং (সবার অবস্থা) দেখেন। ১৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমি কিভাবে আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেবো, অথচ তিনিই (সৃষ্টিলোকের সবাইকে) আহার যোগান, তাঁকে কোনো রকমের আহার যোগানো যায় না; (তুমি) বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন সবার আগে আমি মুসলমান হয়ে যাই এবং (আমাকে এই মর্মে আরো) আদেশ দেয়া হয়েছে, 'তুমি কখনো মোশরেকদের দলে শামিল হয়ো না।' ১৫. (তুমি আরো) বলো, আমি যদি আমার মালিকের কথা না শুনি, তাহলে আমি এক মহাদিবসের আযাব (আমার ওপর আপতিত হওয়ার) ভয় করি। ১৬. সে (কেয়ামতের) দিন যাকে তা (শাস্তি) থেকে রেহাই দেয়া হবে, তার ওপর (নিসন্দেহে) আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করবেন, আর এটিই (হবে সেদিনের) সুস্পষ্ট সাফল্য। ১৭. (জেনে রেখো,) যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোনো দুঃখ পৌঁছাতে চান তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউই (তোমার থেকে) তা দূর করতে পারবে না; অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন তাহলে (কেউ তাতে বাধাও দিতে পারে না,) তিনি সব কিছুর ওপর একক

قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

ক্ষমতাবান! ১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী; তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সম্যক ওয়াকেফহাল। ১৯. তুমি (তাদের) বলো, সাক্ষী হিসেবে কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী বড়ো? তুমি বলো, (হাঁ) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি তোমাদের এবং আমার মাঝে (সর্বোত্তম) সাক্ষী হয়ে থাকবেন। এ কোরআন (তাঁর কাছ থেকেই) আমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, যেন তা দিয়ে তোমাদের এবং (তোমাদের পর) যাদের কাছে এ গ্রন্থ পৌঁছবে (তাদের সকলকে) আমি (আযাবের) ভয় দেখাই; তোমরা কি (সত্যিই) একথার সাক্ষ্য দিতে পারবে যে, আল্লাহর সাথে আরো কোনো ইলাহ রয়েছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) জানিয়ে দাও, আমি (জেনে-বুঝে) কখনো এ ধরনের (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিতে পারবো না, তুমি বলো, তিনি তো একক, তোমরা (আল্লাহ তায়ালার সাথে) যে শেরেক করে যাচ্ছো, তার থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাফসীর

আয়াত ১২-১৯

প্রবল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ ও গুরুগম্ভীর আলোচনার এই পর্বটির শুরু হয়েছে ইসলামের দাওয়াতের প্রতি কাফেরদের অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান, বিদ্রূপ ও উপহাসের বিবরণ দেয়ার মাধ্যমে। এই বিবরণের মাঝখানে ও শেষভাগে প্রচন্ড হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যানকারী ও বিদ্রূপকারী কাফেরদের ধ্বংস ও অপমৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে শ্রোতাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। এর আগে সূরার শুরুতে সুবিশাল প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিমন্ডলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য পরিমন্ডলেও নতুন তেজ ও নতুন ভংগিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এভাবে দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও অস্বীকার করার বিষয়টি সূরার সূচনাপর্ব ও বর্তমান পর্বের মাঝখানে এসেছে এবং এ দ্বারা বিষয়টিকে চরম অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সূরার সূচনা পর্বে আকাশ ও পৃথিবীর নির্মাণ কাজ, আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টি, মানুষকে কাদা মাটি থেকে বানানো, মানুষের পার্থিব জীবনের অবসান এবং দ্বিতীয়বার তার পনুরুত্থানের উল্লেখের মধ্য দিয়ে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ও সর্বময় খোদা এবং মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থা ও এই উভয় অবস্থায় মানুষের কৃত কাজ সম্পর্কে তিনি যে পুরো মাত্রায় অবহিত, সে বিষয়টি শুধু ধর্মীয় ও নেতিবাচক তাত্ত্বিক বক্তব্য দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি, বরং মানব জীবনে এই সব সত্যের দাবী কী? সে কথা বলাই এর উদ্দেশ্য। এই সব দাবীর মধ্যে রয়েছে মানুষের

মধ্যে গোটা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা সমর্পণ করার সময় আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে না করা এবং আল্লাহর একত্বে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ না করা। বিশ্ব প্রকৃতির ও মানব জীবনের যাবাতীয় গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিরাজ করে, সে কথা স্বীকার করা এবং ওই সব সত্যের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই যাবতীয় পার্থিব কর্মকান্ডে ও যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া।

এই সব সত্যের দাবী কী, সে কথা বলাই এর উদ্দেশ্য। এই সব দাবীর'মধ্যে রয়েছে মানুষের গোটা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা এবং আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মনে না করা এবং আল্লাহর একত্বে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ না করা, বিশ্ব-প্রকৃতির ও মানব জীবনের যাবতীয় গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব বিরাজ করে, সে কথা স্বীকার করা এবং ওই সব সত্যের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই যাবতীয় পার্থিব কর্মকান্ডে ও যাবতীয় প্রাকৃতিক বিষয়ে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া।

আবেগোদ্বেল আলোচনার এই পর্বটি (যা আয়াত ১২ থেকে ১৯ পর্যন্ত বিস্তৃত) এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে, আল্লাহর ইলাহত্বের প্রকৃত তাৎপর্য কী। বিশ্বজগতের ওপর তার সর্বময় আধিপত্য ও কর্তৃত্ব, জীবিকা ও নিরাপত্তা দানের নিরংকুশ ক্ষমতা, সীমাহীন শক্তি ও পরাক্রম এবং উপকার ও ক্ষতি করার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা এবং অনুরূপ আরো বহু বিষয়ে সর্বাত্মক ও দুর্বার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সমষ্টিকেই যে আল্লাহর ইলাহত্ব বুঝায় এবং এই সব অতুলনীয় গুণের কারণেই যে তিনি সারা বিশ্বজগতের ইলাহ, মা'বুদ ও প্রভু, সে কথাই এ আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে। আর আল্লাহর ইলাহত্বের এই সব বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ক্ষমতার বিবরণ নিছক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়নি, বরং এগুলোর দাবী কী তা তুলে ধরার জন্যেই এ আলোচনার অবতারণা। এর দাবী এটাই তুলে ধরা হয়েছে যে, মানুষকে এই সীমাহীন ক্ষমতাধর প্রভুর একক প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে, একমাত্র তাঁর দিকেই মনোযোগ দিতে হবে, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে এবং এই একক প্রভুর আনুগত্য করাই তার আনুগত্য ও দাসত্বের প্রমাণ ও আলামত মনে করতে হবে। সুতরাং আল্লাহর রসূলকে যেখানে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সকলের প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্বকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করো, সেখানে এই প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি এই যে, প্রথমত, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে খাদ্য দেন, তাকে কারো খাদ্য দিতে হয় না, এবং দ্বিতীয়ত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নেয়া, একমাত্র আল্লাহর কাছে করতে ও তার সাথে অন্য কাউকে শরীক না করতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার পরিপন্থী।

উল্লেখিত পন্থায় ও উদ্দেশ্যে ইলাহত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে মানুষের মনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও অভিভূত করে এমন কিছু বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে শুরুতেই রয়েছে সকল জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানার বিষয়টি। তারপর রয়েছে তিনি সবাইকে খাদ্য দেন এবং নিজে কারো কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না। তিনিই সেই কঠিনতম শাস্তির মালিক, যে শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভই আল্লাহর বিরাট দয়া ও বান্দার বিরাট সাফল্য হিসাবে বিবেচিত, ক্ষতি ও উপকার করার একক ও সর্বাত্মক ক্ষমতা কেবল তাঁরই, তিনি সর্বোচ্চ ও সবার চেয়ে প্রতাপশালী, তিনিই একমাত্র মহাজ্ঞানী ও মহা কুশলী। এ সব কথা বলার পর অত্যন্ত গুরুগম্ভীর কন্ঠে পর পর 'বলো', 'বলো','বলো', বলে আদেশ দিয়ে বক্তব্য দেয়া হয়েছে।

সার্বভৌমত্ব দাবীদারদের বিরুদ্ধে কোরআনের জেহাদ

সুগভীর প্রভাব বিস্তারকারী এ সব বক্তব্য রাখার পর পরিশেষে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের ও শেরককে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই দুয়ের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বক্তব্যে 'বলো' শব্দটি দ্বারা আদেশ দেয়া হয়েছে বলো সবচেয়ে বড় সাক্ষী কে? বলো, আল্লাহ .... বলো, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। এভাবে গোটা পরিবেশে আল্লাহর ভীতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? বলো, সব কিছুই আল্লাহর।...... (আয়াত ১২ - ১৩)

এখানে সত্যের বর্ণনা দান ও তার পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্যে কাফেরদের মুখাপেক্ষী হওয়া অতপর তাদের সাথে মোমেনদের চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্যে রসূল (স.) কে মোশরেকদের মুখোমুখি হবার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই মোশরেকরা জানে যে, আল্লাহ তায়ালাই স্রষ্টা। কিন্তু যারা সৃষ্টি করে না তাদের কে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়। এই সমকক্ষদেরকে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনার কাজেও আল্লাহর অংশীদার ও কৃর্তত্বশীল বানায়। রসূল (স.)-কে আল্লাহ এই মোশরেকদের মুখোমুখি হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুর স্রষ্টা যখন আল্লাহ তায়ালা, তখন তার মালিক কে, তা জিজ্ঞাসা করতে বলা হয়েছে। এই প্রশ্ন দ্বারা আল্লাহর মালিকানাভক্ত স্থানের সীমানা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সেই সীমানা হলো 'আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে। কোরআনের অন্যান্য জায়গায় আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, কাফের ও মোশরেকরা এ কথা অস্বীকার করতো না এবং এই নিয়ে তর্কও করতো না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহরই মালিকানাভুক্ত সম্পদ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তুমি বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, এ সব কার? তুমি বলে দাও, আল্লাহর।'

আরবরা যতোই জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাক না কেন, তারা বর্তমান যুগের 'বৈজ্ঞানিক' জাহেলিয়াতের তুলনায় কিছুটা উন্নত ছিলো। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াত চিন্তার দিক থেকে সেই প্রাচীন জাহেলিয়াতের চেয়ে নিকৃষ্টতর। কেননা এ জাহেলিয়াত এমন একটি মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এ সম্পর্কে নিজের বিবেক বুদ্ধিকে স্বেচ্ছায় না দেখে শুনেই রুদ্ধ করে রেখেছে, যে মহাসত্যকে আরবরা জানতো ও স্বীকার করতো। তারা জানতো ও স্বীকার করতো যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু এই সত্যের ভিত্তিতে যে স্বাভাবিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত উপনীত হবার কথা, সে সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হতো না। আল্লাহ তায়ালা একাই যে সব জিনিসের স্রষ্টা ও মালিক, সে সব জিনিসের সার্বভৌম কর্তৃত্ব তথা শাসন ও আইন প্রণয়নের এখতিয়ারও যে তাঁর একারই এবং একমাত্র তাঁর অনুমতি ও বিধান ছাড়া যে সে সব জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়, সেই কথাটাই তারা বুঝতো না। এ কারণেই তাদেরকে মোশরেক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের জীবনকে বলা হয়েছে জাহেলিয়াতের জীবন। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, যারা নিজেদের জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড থেকেই আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে নির্বাসিত করে এবং নিজেরাই সার্বভৌমত্ব ভোগ করে, তাহলে তাদেরকে ও তাদের জীবনকে কী নামে আখ্যায়িত করা হবে? তাদেরকে অবশ্যই মোশরেক ব্যতীত অন্য কোনো নামে আখ্যায়িত করার উপায় নেই। আল্লাহ স্বয়ং তাদেরকে কাফের, যালেম ও ফাসেক নামে আখ্যায়িত করেছেন, তাই তারা নিজেদেরকে যতোই মুসলমান বলে আখ্যায়িত করুক এবং তাদের জন্ম সংক্রান্ত সার্টিফিকেটে তাদেরকে যে উপাধিতেই ভূষিত করা হোক না কেন।

বান্দার প্রতি আল্লাহর সীমাহীন করুনা

আসুন, আবার আয়াতটির দিকে ফিরে যাই এবং দেখি, আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুর মলিকানা আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করার পর সেখানে আর কী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে,

'তিনি দয়াশীলতাকে নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।'

অর্থাৎ তিনি সব কিছুর মালিক এবং এ ব্যাপারে তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই, কিন্তু নেহায়েৎ দয়াপরবশ হয়ে তিনি দয়াশীলতাকে নিজের কর্তব্যরূপে স্থির করেছেন এবং তা করেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে। কেউ তাঁর ওপর এটাকে চাপিয়ে দেয়নি, কেউ তাঁর কাছে দাবী জানায়নি, এমনকি প্রস্তাব আকারে কেউ তাঁর কাছে এটা পেশও করেনি। নিছক নিজের ইচ্ছা ও অনুগ্রহের বশে তিনি দয়া ও করুণাকে তাঁর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতি হিসাবে ধার্য করেছেন। তাই এই মূলনীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য। বিশ্বাস করতে হবে যে, বান্দাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহই মূল কথা। এমনকি তাদের ওপর যখন তিনি বিপদ-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন তার মাধ্যমেও তিনি প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহই করেন। একটি দল যাতে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, জ্ঞান, সচেতনতা, যোগ্যতা, ও প্রস্তুতির গুণাবলী অর্জন করো, আল্লাহর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে, যাতে মুসলিম জাতির ভেতর থেকে ভেজাল, ভন্ড ও কপট লোকজন বেরিয়ে গিয়ে শুধুএকনিষ্ঠ ও সুযোগ্য লোকেরা অবশিষ্ট থাকে। কারা রসূলের অনুসারী এবং কারা নয় তা যাতে জানা যায় এবং যাতে লোকেরা যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতেই বাঁচে এবং যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই মরে, সে জন্যেই তিনি বিপদ মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এ সব পরীক্ষার মধ্যে দয়া ও করুণা সুস্পষ্ট।

এ ছাড়া আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ মানুষের সমগ্র আয়ুষ্কাল ও সকল প্রজন্ম জুড়েই বিস্তৃত। মানুষের জীবনের একটি মুহূর্তও আল্লাহর অনুগ্রহের বাইরে নয়।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ কোথায় কোথায় ও কী কী আকারে আসে, তার সবটা গুণে গুণে উল্লেখ করার চেষ্টা আমি করবো না। তবে তার কিছু কিছু সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। তার আগে আয়াতের এ অংশটি নিয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

'তিনি দয়াশীলতাকে নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।' এই বক্তব্যটি সূরার অন্য এক জায়গায় এভাবে এসেছে,

'তোমাদের প্রতিপালক দয়াশীলতাকে নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।' এখানে যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবী রাখে, তার দিকে ইতিপূর্বেই আভাস দিয়েছি। সেটি এই যে, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, মহাশক্তি ও পরাক্রমশালী হওয়া সত্তেও নিজের বান্দাদের ওপর দয়া ও করুণা বর্ষণকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজের কর্তব্যরূপে স্থির করেছেন। এটি এত বড় একটি বিষয় যে, মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

এখানে আরো একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তায়ালা যে নিজের জন্যে দয়া ও অনুগ্রহ করাকে একটা কর্তব্যরূপে স্থির করেছেন, সেটা বান্দাদেরকে জানানোও তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিরাট অনুগ্রহ। প্রথম অনুগ্রহের চেয়ে এটা কোনোক্রমেই কম নয়।

আল্লাহর সামনে বান্দার এমন কী গুরুত্ব যে, তিনি তাকে নিজের মনোভাব জানাবেন এবং তিনি যে দয়াশীলতাকে স্বেচ্ছায় নিজের কর্তব্যরূপে স্থির করেছেন, তা জানাতে রসূলকে নির্দেশ দেবেন? বস্তুত, এটাও তাঁর এক বিরাট অনুগ্রহ। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। সেই সাথে মহান আল্লাহর প্রতি এমন ভালোবাসা ও আশাবাদের সৃষ্টি হয় যে, তা

ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এ ধরনের বিষয়গুলো মানুষ নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে পারে না বা কাউকে জানাতে পারে না। তবে মন দিয়ে অনুভব করতে ও আস্বাদন করতে পারে।

ইসলামী মতাদর্শে এ বিষয়টি আল্লাহর ইলাহত্ব ও তাঁর সাথে বান্দার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্বের একটি মৌলিক দিক। আর এ তত্ত্বটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, চমকপ্রদ, ভালোবাসা উদ্দীপক আশ্বাসদায়ক। এ তত্ত্বটি জানতে পেরে মানুষের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের এই দিকটি নিয়ে নানা করীমের অপপ্রচারে লিপ্ত। কারণ ইসলাম আল্লাহর বান্দাদের কাউকে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, যেমনটি বলে থাকে বিকৃত খৃষ্ট মতবাদের লোকেরা। ইসলামী মতাদর্শ এই সব মুর্খতাসুলভ ধ্যান ধারণার অনেক উর্ধে। তথাপি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়া ও করুণার সম্পর্ক তার দৃষ্টিতে এতো গভীর যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কেবল মন দিয়ে তার স্বাদ উপভোগ করতে পারে।

আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা তাঁর সকল বান্দার ওপর বর্ষিত হয়ে থাকে। আল্লাহর রহমত ও কৃপার ওপর তাদের জীবন ও অস্তিত্ব নির্ভরশীল। প্রতিটি প্রাণী, বস্তু ও বিশ্ব জগতের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রকাশ ঘটছে। বিশেষত মানুষের জীবনে এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। তবে এর কয়েকটি প্রধান ক্ষেত্রের উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব লাভই আল্লাহর একটি বিরাট রহমত। মানুষ আদৌ জানে না কোথা থেকে তার উদ্ভব ঘটলো। বিশ্বের অন্য সকল সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যে পৃথিবীতে তার আবির্ভাব ঘটলো, এটাই তার এক দুর্লভ করুণা।

আল্লাহ তায়ালা যে প্রকৃতির বহু জিনিস ও বহু শক্তিকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত করে সৃষ্টি করেছেন, এটাও তাঁর এক বিরাট অনুগ্রহ। আর এটাই ব্যাপকতর অর্থে আল্লাহর রেযেক বা জীবিকা। এই জীবিকার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষকে বিদ্যা শিক্ষা দানের মাধ্যমেও তাঁর রহমতের অভিব্যক্তি ঘটে। প্রথমে তো তাকে জ্ঞানার্জনের যোগ্যতা দান করেন। অতপর সেই যোগ্যতার সাথে প্রকৃতির যে সব জ্ঞান দিতে চান, তার সমন্বয় ঘটান। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আল্লাহর দেয়া এই জ্ঞানের জোরেই কোনো কোনো হতভাগা এত দম্ভে মেতে ওঠে যে, আল্লাহকে ও তাঁর বিধানকে অস্বীকার করতে চায়। বলা বাহুল্য, আল্লাহর দেয়া জ্ঞান বা বিদ্যাও ব্যাপকতর অর্থে এক ধরনের জীবিকা।

আল্লাহ তায়ালা যে পৃথিবীতে মানুষকে নিজের প্রতিনিধি বা খলীফা করে পাঠিয়েছেন, অতপর তাকে সর্বক্ষণ তদারক করেছেন, যখনই সে আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গেছে, অমনি তাকে হেদায়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে ক্রমাগত নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন, এটাও তাঁর এক দুর্লভ করুণা ও অনুগ্রহ। শুধু তাই নয়, যখনই মানুষ গোমরাহীর অতল তলে ডুবে গেছে এবং কোনো সতর্ককারীর সতর্কবাণীতে ভ্রূক্ষেপ করেনি, তখন তার প্রতি যে সহিষ্ণুতার আচরণ করেছেন, সেটাও আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ। আল্লাহর পক্ষে তাকে পাকড়াও করে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেয়া সহজ। কিন্তু তাঁর দয়া ও সহিষ্ণুতাই তাকে অবকাশ দিয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি না জেনে গুনাহর কাজ করে, অতপর তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার ওপর দয়া করেন, সেই ব্যক্তির বেলায়ও আল্লাহর রহমত তথা করুণা প্রকাশ পায়। খারাপ কাজ করলে তিনি যে একটি খারাপ কাজের বদলায় একটি গুনাহ এবং ভালো কাজ করলে তিনি যে একটি ভালো কাজের বদলায় দশটি সওয়াব দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন দ্বিগুণ প্রতিদান দেন এবং ভালো কাজ দ্বারা মন্দ কাজ নষ্ট করে দেন, এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা। রসূল (স.) নিজের সম্পর্কে পর্যন্ত বলেছেন যে, আল্লাহর রহমত তাঁকে আপাদমস্তক

আচ্ছাদিত না করলে তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না। এ সব থেকে পুরোপুরিভাবে জানা যায় যে, মানুষ কতো অক্ষম এবং আল্লাহর অনুগ্রহ কতো বিপুল ও ব্যাপক।

বস্তুত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের পূর্ণ বিবরণ দেয়ার মতো ভাষা আমাদের জানা নেই। এমনকি মোমেন বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের এমন একটি মুহূর্তের অনুভূতিও সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না, যখন সে তাঁর অনুগ্রহের ফলে আল্লাহকে চিনতে পারে। তাঁর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাঁর কাছে আশ্রয় লাভ করে সে নিশ্চিন্ত হয়।

আল্লাহর এই রহমত, দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে রসূল (স.) যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরছি।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেন, তখন একটি পুস্তকে লিখে রাখেন যে, 'আমার দয়া আমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়েছে।' অতপর এই পুস্তকটি তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর দয়াকে একশো ভাগ করে এক ভাগ তাঁর সৃষ্টি জগতের মধ্যে বিতরণ করেন, যা দিয়ে সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও দয়া বিনিময় করে, আর বাকী ৯৯ ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। যে এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠান, তার প্রভাবেই একটি পশু তার নখরগুলোকে নিজের বাচ্চার কাছ থেকে দূর রাখে, যাতে সে আঘাত না পায়।'

মুসলিম শরীফে সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্নিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, আল্লাহর একশোটা রহমত রয়েছে। এর একটির প্রভাবে তার গোটা সৃষ্টিজগত পরস্পরের প্রতি দয়া বিনিময় করে। আর বাকী ৯৯টি কেয়ামতের দিনের জন্যে রাখা হয়েছে।

মুসলিম শরীফের অপর হাদীসে রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন, সেদিন একশ'টি রহমত সৃষ্টি করেন। এর প্রত্যেকটি আকাশ ও পৃথিবীর সমান। এর মধ্যে একটি রহমত তিনি পৃথিবীতে পাঠান। এরই প্রভাবে জননী তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং পশু ও পাখি পরস্পরকে ভালোবাসে। যেদিন কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে এই রহমত দিয়ে পূর্ণতা দান করবো।

রসূল (স.)-এর এই ওহীভিত্তিক উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ও বিশালত্বকে উপলব্ধি করা মানুষের বোধশক্তির পক্ষে সহজ হয়ে যায়। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জননীকুল শিশু সন্তানদের প্রতি কিরূপ মমতাময়ী ও স্নেহশীল হয়ে থাকে, বিশেষত মানুষের হৃদয় শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল, রোগী, আত্মীয়স্বজন, সাথী, বন্ধুবান্ধবের প্রতি কিরূপ দয়ার্দ্র, করুণাময় ও প্রেমময় হয়ে থাকে এবং পশু পাখি পরস্পরকে কিরূপ ভালোবাসে, তা দেখে মানুষ মাত্রেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। অতপর চিন্তা করে যে, এত সব স্নেহমমতা ও ভালোবাসা যখন আল্লাহর অসংখ্য দয়া ও করুণার মধ্য থেকে একটি মাত্র দয়া ও করুণা থেকে উৎসারিত, তখন আল্লাহর সমস্ত দয়া একত্রিত হয়ে যে বৃহত্তম ও বিশালতম দয়ার সাগর তৈরি হয়, তা কতো বড়। এভাবে আল্লাহর দয়া ও রহমতের গোটা ভান্ডারকে কল্পনা করা তার পক্ষে কিছুটা সহজ হয়ে যায়।

রসূল (স.) আল্লাহর রহমত তথা দয়ার এই ভান্ডারের কথা তাঁর সাহাবীদেরকে প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.)-এর কাছে একবার একদল যুদ্ধবন্দীকে হাযির করা হলো। এই দলটির মধ্যে একটি মহিলার স্তন দুধে

পরিপূর্ণ ছিলো এবং সে দৌড়াচ্ছিলো। সহসা একটি শিশুকে সামনে পেয়েই সে নিজের পেটের সাথে জাপটে ধরলো ও দুধ খাওয়ালো। এই দৃশ্য দেখে রসূল (স.) বললেন, এই মহিলাটি তার এই শিশুকে কি আগুনে ফেলে দিতে পারে বলে তোমরা মনে করো? আমরা বললাম, আল্লাহর কসম, সে কখনো তা পারে না। রসূল (স.) বললেন, তাহলে জেনে রাখো, এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতোটা দয়ালু, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও বেশী দয়ালু। (বোখারী ও মুসলিম)

কেনইবা হবে না? এই মহিলার স্নেহ-মমতা আল্লাহর সীমাহীন দয়া ও মমতার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

দয়াশীলতা মোমেন চরিত্রের অবিচ্ছেদ্ধ অধ্যায়

কোরআনের এই তত্ত্বটি এই ওহীভিত্তিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষা দিয়ে রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে আরো এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তিনি তাদেরকে শেখাতেন যে, আল্লাহর দয়া ও করুণার এই গুণটি যেন তারা আয়ত্ত করে এবং সকল মানুষ ও যাবতীয় প্রাণীর প্রতি সদয় আচরণ করে। আল্লাহ তায়ালা যেমন ইতিপূর্বে তাদেরকে দয়া ও করুণায় সিক্ত করেছেন, তেমনি তারাও যেন পরস্পরকে করুণায় সিক্ত করে।

ইবনে আমর ইবনুল আ'স বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) বলেছেন, দয়ালু লোকদের প্রতি আল্লাহও দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, আকাশের অধিবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন না। রসূল (স.) বলেছেন, কেবল হতভাগা মানুষই দয়া ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) একবার আলী তনয় হাসান (রা.)-কে চুমু খেলেন। সেখানে উপস্থিত সাহাবী আকরা' বিন হাবিস বললেন, আমার দশটা সন্তান রয়েছে। তাদের কাউকে আমি কখনো চুমু খাইনি। তখন রসূল (স.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে স্নেহ করে না, সে স্নেহ পায় না। (বোখারী, মুসলিম)

রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে শুধু মানুষের প্রতি দয়া, মমতা, স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকতে শিক্ষা দেননি, বরং সকল প্রাণীকেই করুণা প্রদর্শন করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে, আল্লাহর দয়া সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত। মোমেনদেরকে আল্লাহর মহৎ গুণাবলী অর্জন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে কেবল তখনই পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারবে, যখন সে মহান আল্লাহর অনুকরণে প্রত্যেক প্রাণীকে দয়া করবে। তিনি যে তাদেরকে ওহী থেকে প্রাপ্ত পন্থায় এই শিক্ষা দিতেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এর আরো কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, একবার জনৈক পথিক পিপাসায় কাতর হয়ে পানি খুঁজতে খুঁজতে একটি পুকুর পেলো। সে তৎক্ষণাত পুকুরটিতে নেমে পড়লো এবং পানি খেয়ে উঠে এলো। হঠাৎ দেখতে পেলো যে, একটা কুকুর পিপাসায় ছটফট করছে এবং পানি না পেয়ে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটা মনে মনে বললো, কুকুরটি নিশ্চয়ই আমার মতো তীব্র পিপাসায় ভুগছে।' সে পুকুরে নেমে পড়লো এবং নিজের মোজায় পানি ভরে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ওপরে উঠলো। তারপর সেই পানি কুকুরকে পান করালো, আল্লাহ তায়ালা তার এই

কাজে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রসূল (স.), চতুষ্পদ জন্তুকে খাওয়ালেও কি আমরা প্রতিদান পাবো? তিনি বললেন, হাঁ, যে কোনো আর্দ্র কলীজাকে (অর্থাৎ যে কোনো প্রাণীকে) তৃপ্ত করলেই প্রতিদান।' (বোখারী, মুসলিম, মোয়াত্তায়ে মালেক)

অপর এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, জনৈকা ব্যভিচারী মহিলা একবার এক রৌদ্রতপ্ত দিনে দেখলো যে, একটা কুকুর পিপাসায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ও একটা কুয়ার চার পাশ দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। তখন সেই মহিলা নিজের পায়ের মোজা ভরে পানি তুলে তাকে খাওয়ালো। এতে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় একটা পাখির সাথে তার দুটো বাচ্চাকে দেখতে পেলাম। আমরা বাচ্চা দুটোকে ধরলাম। সংগে সংগে তার মা এলো এবং নীচু হয়ে মাটির নিকট দিয়ে উড়তে লাগলো। এই সময় রসূল (স.) এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কে এই পাখি মাতাকে তার সন্তানদের ধরে কষ্ট দিলো? তোমরা ওর বাচ্চাকে ওর কাছে ফিরিয়ে দাও। অন্য একদিন আমরা একটা পিপঁড়ের গর্তকে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা দেখে বললেন, কে এদেরকে পুড়িয়েছে? আমরা বললাম, আমরা পুড়িয়েছি। রসূল (স.) বললেন, যিনি আগুনের প্রভু, তিনি ছাড়া আর কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দেবে– এটা সমীচীন নয়। (আবু দাউদ)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, জনৈক নবীকে একটা পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছিলো। তিনি ঐ পিঁপড়ের গর্তটাকেই জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা জ্বালানো হলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ওহী পাঠালেন। 'একটা পিঁপড়ে তোমাকে কামড় দিয়েছিলো। তাই বলে তুমি আল্লাহর গুণগানরত একদল পিঁপড়েকেই পুড়িয়ে দিলে? (বোখারী ও মসলিম)

এভাবেই রসূল (স.) তাঁর সাহাবীদেরকে কোরআনের নির্দেশাবলী শিখিয়েছেন, যাতে তারা অন্যের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভে সক্ষম হয়। আল্লাহর অগণিত দয়া থেকে একটা মাত্র দয়া ও করুণার প্রভাবেই তারা পরস্পরে প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকে। মোমেনের মনে এই শিক্ষা বদ্ধমূল হলে তার চিন্তায়, চরিত্রে ও কর্মে তার এতো ব্যাপক ও গভীর প্রভাব পড়ে যে, তা পুরোপুরি বর্ণনা করা কঠিন। তবে সংক্ষেপে এর কিছুটা উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনা করলে তা তাফসীরের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনার রূপ ধারণ করবে।

আল্লাহর দয়া ও করুণা সংক্রান্ত এই তত্ত্ব এভাবে অবহিত হওয়ার ফলে মোমেনের অন্তরে আপন প্রতিপালক সম্পর্কে এমন আস্থা, নির্ভরশীল, নিশ্চিন্ততা ও তৃপ্তি লাভ হয় যে, গোমরাহীতে লিপ্ত করার মতো কঠিন বিপদ মুসিবতের সময়েও তার সেই আস্থা ও নির্ভরশীলতায় ছেদ পড়ে না। সে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রতিটি অবস্থায় বান্দার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। সে বিশ্বাস করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে যে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তার অর্থ এ নয় যে, তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছেন এবং নিজের রহমত থেকে তাকে বিতাড়িত করেছেন। আল্লাহর দয়া ও কৃপার আশা পোষণ করে এমন কাউকে তিনি তাঁর দয়া থেকে বিতাড়িত বা বঞ্চিত করেন না। মানুষ যখন আল্লাহর প্রতি কুফরী করে, তাঁর দয়া ও কৃপাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তা থেকে দূরে সরে যায়, কেবল তখনই সে নিজেই নিজেকে আল্লাহর কৃপা থেকে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করে।

আল্লাহর রহমত ও কৃপার ওপর এই নির্ভরশীলতা ও আস্থা তার হৃদয়কে ধৈর্য, স্থিরতা, আশা শান্তি ও নিরাপত্তা বোধ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়। সে এক পরম দয়াময়ের নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করে। যতক্ষণ সে নিজে তা থেকে দূরে সরে না যায়, ততোক্ষণ তাঁর সুশীতল ছায়া তাকে আড়াল করে রাখে।

এ তত্ত্বটি সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান লাভের ফলে মোমেনের মন আল্লাহর প্রতি লজ্জাবনত থাকে। আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা লাভের আশা তার মনে পাপ কাজ করার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস জন্মাতে পারে না, বরং মহামহিম ক্ষমাশীল ও দয়াময় আল্লাহর প্রতি লজ্জা শরমে পরিপূর্ণ করে। আর যার হৃদয়ে আল্লাহর রহমতের আশা থাকে না তাকে পাপকাজে দুঃসাহসী করে তোলে, তার হৃদয় ঈমানের স্বাদ পায় না। তাই আমি এক শ্রেণীর তাসাওফপন্থীদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত এই কথাটা বুঝতেও পারি না, মানতেও পারি না, যে, তারা আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতার স্বাদ উপভোগ করার জন্যেই গুনাহর কাজে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। আল্লাহর দয়া ও কৃপার মোকাবেলায় এ বক্তব্য মোটেই সুস্থ বিবেকের যুক্তির পরিচায়ক নয়।

অনুরূপভাবে এই তত্ত্ব হৃদয়ে বদ্ধমূল হলে তা মোমেনের চরিত্রে অটুট প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে সে অনেক গুনাহগার হওয়া সত্তেও নিজকে আল্লাহর দয়া, কৃপা ও করুণার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে দেখে, অপরদিকে সে আল্লাহর মহৎ গুণাবলী অর্জনের নির্দেশ প্রত্যেক মোমেনকে দেয়া হয়েছে, একথাও সে জানে। এতে করে সে শিখবার সুযোগ পায় কিভাবে মানুষকে দয়া ও ক্ষমা করতে হয়, যেমন এই মহান তত্ত্বের আলোকে সাহাবীদের শিক্ষা দিতে স্বয়ং রসূল (স.)-কেও দেখেছি।

এ আয়াত থেকে এ কথাও জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করাও আল্লাহর সেই দয়া ও কৃপার ফল, যা তিনি নিজের কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। এটা বান্দাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে একত্রিত করবেন। কেননা তিনি তাদেরকে একটা কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তাদেরকে নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। তাদেরকে নিরর্থকও সৃষ্টি করেননি এবং উদ্দেশ্যহীনভাবেও ছেড়ে দেননি। তাদেরকে বরং কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এদিন তাদের জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি লাভের দিন ও দুনিয়ার কৃতকর্মের ফল লাভের দিন। কাজেই তাদের কোনো কর্ম বা কর্মফল বৃথা যাবে না। কেবল কেয়ামতের দিন তার পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। এতেও আল্লাহর দয়া ও কৃপার প্রকাশ ঘটেছে, যেমন ঘটেছে এক অপরাধের এক শাস্তি ও এক সৎকাজের দশ পুরস্কার দেয়ার মধ্য দিয়ে এবং যাকে ইচ্ছা আরো বেশী প্রতিদান দেয়া ও যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে। বস্তুত এ সবই আল্লাহর অসীম দয়ার স্বাক্ষর।

জাহেলী যুগে, যখন আল্লাহ তায়ালা আরবদেরকে ইসলামের ন্যায় অমূল্য সম্পদ দিয়ে অনুগ্রহীত করেননি, তখন তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো। এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে এ যুগের 'বৈজ্ঞানিক' জাহেলিয়াতের চমৎকার মিল রয়েছে। এ জন্যেই সর্বোচ্চ তাকীদ বা নিশ্চয়তাসূচক ভাষায় বলা হয়েছে যে,

'তিনি তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'

আর এই কেয়ামতের দিনে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা পৃথিবীতে ঈমান আনেনি। তারা যে কিছু হারাবে ও কিছু পাবে তা নয়। বরং তারা সব কিছুই হারাবে। যেহেতু তারা স্বয়ং নিজেদেরকেই হারিয়েছে, তাই তারা আর কিছুই অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

মানুষ তো নিজের জন্যেই কিছু অর্জন করে থাকে। সেই নিজকেই যখন তারা হারালো, তখন কী আর অর্জন করবে, কার জন্যে করবে? এ কথাই আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষাংশে বলেছেন,

'যারা নিজেদেরকে হারিয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।'

বস্তুত, তারা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলেছিলো বলেই তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। এটি একটি বাস্তব অবস্থার নিখুঁত বিবরণ। ইসলামের সুগভীর ও অকাট্য প্রমাণসহ আহ্বান সত্তেও যারা ঈমান আনেনি, তারা এই আহ্বান শোনার আগেই যে তাদের ঈমান আনার জন্মগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলো, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কোনো আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং গ্রহণ করার জন্যে মানব সত্ত্বায় যে সব জন্মগত সরঞ্জাম বিদ্যমান থাকে, তা হয় নষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলো, নচেত চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এভাবেই তারা তাদের সেই মানবীয় সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলেছিলো, যাতে গ্রহণ ও সাড়া দেয়ার জন্মগত যোগ্যতা নিহিত ছিলো। এ জন্যেই তারা ঈমান আনে না। কেননা, যে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা ঈমান আনতে হয় তার ওপর তারা আর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়নি। তাদের চার পাশে ঈমানের সপক্ষে এতো বিপুল সংখ্যক অকাট্য প্রমাণাদি থাকা সত্তেও তাদের ঈমান না আনার এটাই যথার্থ ব্যাখ্যা। আর এরই ভিত্তিতে সেদিন তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিলো। আর এটাই তাদের সবচেয়ে বড় ভাগ্য বিপর্যয়, যা আগে ভাগেই নিজের জন্মগত যোগ্যতাকে হারিয়ে ফেলার আকারে সংঘটিত হয়েছিলো।

সৃষ্টিকুলের একমাত্র অভিভাবক ও আইনদাতা

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই সব সৃষ্টির উল্লেখ করেছেন যা স্থান সংক্রান্ত। আর এ আয়াতে সময় সংক্রান্ত সৃষ্টির উল্লেখ করেছেন। এভাবে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এসব সৃষ্টিরও তিনিই একক মালিক এবং একমাত্র তিনিই এগুলো সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে জানেন ও শোনেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'রাত ও দিনে যা কিছু অবস্থান করেছে তিনিই সে সবের মালিক এবং তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'

যামাখশারী তার তাফসীর গ্রন্থ 'কাশশাফে' এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, 'রাত ও দিনে যা কিছু অবস্থান করেছে' এর অর্থ হলো যা কিছু দিন ও রাতকে নিজের বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ এ দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই বুঝানো হয়েছে এবং আল্লাহকে এসব কিছুর একক মালিক ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যও ছিলো সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তবে পূর্ববর্তী আয়াতে 'বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা কার? বলো, আল্লাহর', এ কথা দ্বারা স্থান সংক্রান্ত সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। আর এ আয়াত 'দিন ও রাতে যা কিছু অবস্থান করে.....' বলে কাল সংক্রান্ত সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের বাচন-ভংগি কোরআনে বহুল পরিচিত এবং এ দুটি আয়াতের বহুবিধ ব্যাখ্যার মধ্য থেকে এই ব্যাখ্যাকেই আমরা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারি।

আয়াতের শেষে 'আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' বলে যে উপসংহার টানা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বুঝানো যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহর কঠোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সেই সাথে মোশরেকরা আল্লাহর বিভিন্ন সৃষ্টির (পূজা করার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্যে তাদের) সম্পর্কে যে রকমারি কথা বলতো, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও এর উদ্দেশ্য। মোশরেকরা আল্লাহকে সৃষ্টিজগতের একক স্রষ্টা ও মালিক স্বীকার করা সত্তেও তাদের কল্পিত দেব-দেবীর নামে জমির ফসল, বাগানের ফলমূল, গৃহপালিত পশু ও সন্তানদের একাংশকে উৎসর্গ করতো। সূরার শেষ ভাগে এ সম্পর্কে

আলোচনা আসছে। এজন্যে এখানে তাদের কাছ থেকে পৃথিবীর সকল জিনিসে আল্লাহর মালিকানার স্বীকৃতি আদায় করা হচ্ছে, যাতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই তারা তাদের দেব দেবীর নামে যে সব জিনিস বরাদ্দ করে, তার যৌক্তিকতা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, আল্লাহর একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা দ্বারা পরবর্তী আয়াতে যে আল্লাহকে একক অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, তার ভূমিকা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি যখন সব কিছুর মালিক, স্থান-কাল নির্বিশেষে সকল জিনিসের ওপর যখন তার আধিপত্য বিরাজমান, তিনি যখন সব কিছুই জানেন ও শোনেন, এমনকি তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাও জানেন, তখন বিশ্ব জগতের অভিভাবক তিনি ছাড়া আর কে হতে পারে?

আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র স্রষ্টা ও মালিক– এই মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ের পর এখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো সাহায্য চাওয়া, অন্য কারো দাসত্ব করা অন্য কারো অভিভাকত্ব মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, এটা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ তত্ত্বের পরিপন্থী এবং এটা সুস্পষ্ট শেরক, যা আত্মসমর্পণের সাথে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এই সাথে আল্লাহর কয়েকটি গুণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, জীবিকাদাতা ও খাদ্যদাতা ক্ষতি ও উপকারকারী, মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী। এর পাশাপাশি আল্লাহর ভয়ংকর আযাবেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে গোটা পরিবেশকে ভয়াল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

বলো, আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবো? ....(আয়াত ১৪ - ১৮)

বস্তুত এ দ্বন্দ্বটা হলো একমাত্র আল্লাহকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা সংক্রান্ত। ওলী শব্দটার সকল অর্থই এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে প্রভু ও মনিব হিসাবে এবং সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করা। অতপর একনিষ্ঠ ভাবে শুধু তাঁরই হুকুমের আনুগত্য করা, সকল আনুষ্ঠানিক এবাদাত-উপাসনা কেবল তাঁর কাছেই নিবেদন করা, শুধুমাত্র তাঁকেই একক সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করা। শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া, তাঁর সাহায্যের ওপর নির্ভর করা এবং বিপদ মুসীবতে শুধু তাঁর কাছেই আত্মনিবেদন করা। বস্তুত এ সমস্যাটা আসলে আকীদা ও বিশ্বাসগত সমস্যা। উল্লেখিত সকল অর্থে একমাত্র আল্লাহকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করার নামই ইসলাম। আর এর কোনো একটিতেও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করার নামই শেরক, যা কোনো মুসলমানের অন্তরে একই সাথে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না।

এ আয়াতগুলোতে এই বিষয়টি আরো শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ভংগিতে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ১৪ নং আয়াতটিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করবো, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা?........'

এখানে সৃষ্টি সংক্রান্ত অকাট্য যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। একক ভাবে কাকে ওলী বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা হবে? আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি সৃষ্টি করলেন তাকে যদি অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা না হয়, তবে আর কাকে করা হবে? আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের যিনি খাদ্য ও জীবিকা দেন এবং কারো কাছে খাদ্য চান না, তাকে নয় তো কাকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা হবে?

বলো, যে আল্লাহ তায়ালা এই গুণাবলীর অধিকারী, তাকে বাদ দিয়ে কি অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবো? কোনো যুক্তি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেয়? কাউকে যদি সাহায্যের জন্যে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালাই সে ব্যাপারে শ্রেয়। কেননা তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা বিধায় সারা বিশ্বজগতে তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রয়েছে। আর যদি খাদ্য ও জীবিকার জন্যে কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে হয়, তবে সে দিক দিয়েও আল্লাহ তায়ালাই শ্রেয়। কেননা তিনি আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জীবিকা ও খাদ্য সরবরাহকারী। তাহলে আর কোন জিনিস পাওয়ার জন্যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যার না আছে সাহায্য করার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আর না আছে জীবিকা ও খাদ্য দেয়ার মুরোদ?

'বলো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী হই এবং কখনো মোশরেক হয়ো না।'

বস্তুত আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা ও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা উভয়ের সুনির্দিষ্ট অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক না মানা, তা সে যে অর্থেই হোক না কেন, সুস্পষ্ট শেরক। আর শেরক কখনো ইসলাম হতে পারে না।

বিষয়টি সুস্পষ্ট ও অকাট্য। এতে কোনো নমনীয়তা বা আপোষের অবকাশ নেই। হয় এককভাবে শুধু আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে, একমাত্র তাঁর আদেশ ও নিষেধ শুনতে ও মানতে হবে, একমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হবে, এই সব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে আল্লাহর একক ও নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে। অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করার আহবান কেউ জানালে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং আনুষ্ঠানিক এবাদাতে ও আইন কানুনে মনের ও বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগের মনিব, প্রভু ও অভিভাবক একমাত্র আল্লাহকে বানাতে হবে এবং এটাই প্রকৃত ইসলাম, অন্যথায় আল্লাহর কোনো বান্দাকে তাঁর সাথে শরীক করতে হবে (নাউযু বিল্লাহ) এবং এটাই শেরক। এই শেরক কারো মনে ইসলামের সাথে একত্রে বাস করতে পারে না।

রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন শেরকের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ ও অসন্তোষকে মোশরেকদের মুখের ওপরই প্রকাশ করেন। তারা তাকে আপোষ ও নমনীয়তার নীতি অবলম্বনের দাওয়াত দিচ্ছিলো। তারা চেয়েছিলো, তিনি যেন ইসলামে তাদের দেব দেবীর একটা সম্মানজনক স্থান সংরক্ষণ করেন। তাহলে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তারা তাকে অনুরোধ করেছিলো যেন তিনি ওই সব দেব-দেবীর কিছু কিছু খোদা সুলভ গুণ আছে বলে স্বীকৃতি দেন, যাতে তাদের সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে। তন্মধ্যে প্রথম খোদায়ী গুণটি হলো, কিছু জিনিসকে হালাল, কিছু জিনিসকে হারাম ঘোষণা করার প্রচলিত রেওয়ায। এটা তিনি মেনে নিলে তারা আর তাঁর বিরোধিতা করবে না। তাঁকে তাদের নেতা বানাবে, তার জন্যে বিপুল সহায় সম্পদ সংগ্রহ করবে এবং তাকে সবচেয়ে সুন্দরী স্ত্রী এনে দেবে। একদিকে তারা তাকে কষ্ট দিতো, তাঁর সাথে যুদ্ধ করা ও তাকে লাঞ্ছিত করার হুমকি দিতো। আবার অপরদিকে আপোষ ও নমনীয়তার প্রস্তাব এবং প্রলোভনও দিতো। এরূপ দ্বিমুখী অভিযানের মুখেই রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হলো যে, তিনি যেন তাদের বাতিল আকীদা বিশ্বাসকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাতে কোনো রকম আপোষের অবকাশ না রাখেন।

এই সাথে তাঁকে এ আদেশও দেয়া হয় যে, তিনি যেন তার দায়িত্বের কঠোরতা, তার প্রতিপালকের শাস্তির ভয় এবং ইসলাম ও তাওহীদের আদেশ লংঘনের শোচনীয় পরিণতির উল্লেখ করে তাদের মনে ভীতির সৃষ্টি করেন,

'বলো, আমি আমার প্রতিপালকের আদেশ যদি অমান্য করি, তাহলে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি। সেদিন যে ব্যক্তি সেই আযাব থেকে রেহাই পাবে সে অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে। আর ওটা হলো সুস্পষ্ট সাফল্য।'

আপন প্রতিপালকের আদেশের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর মনোভাব কিরূপ এবং তাঁর আযাবকে তিনি কেমন ভয় করেন, সেটা এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে আযাব এতই ভয়ংকর যে, তা থেকে কেবল নিস্তার পাওয়াকেই আল্লাহর মস্ত বড় অনুগ্রহ ও বান্দার বিরাট সাফল্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। সেই সাথে এটা সর্বকালের মোশরেকদের মনে ত্রাস সৃষ্টিকারী এক প্রচারাভিযানও বটে। এখানে কেয়ামতের ভয়াল দিনের আযাবকে এমন ভাবে অংকন করা হয়েছে যেন তা একটা শিকারী প্রাণী, সে যেন শিকারের সন্ধানে থাকে এবং তাকে ধরার জন্যে ও হামলা করার জন্যে ওৎ পেতে থাকে। এই শিকারী আযাব থেকে একমাত্র মহাশক্তিধর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারে না। এই দৃশ্যের কল্পনা করতে গিয়ে পাঠকের শ্বাস প্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে।

আপোষহীন তাওহীদ বিশ্বাস

পরের আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, বান্দা কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু ও অভিভাবক মানবে? কী কারণে সে শেরকের মতো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবে এবং ইসলামের বিরোধিতা করবে? কেনইবা সে এতো বড় আযাবের ঝুঁকি গ্রহণ করবে? এর পেছনে কি দুনিয়ার জীবনের কোনো ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা ও কোনো উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্য সক্রিয় রয়েছে? এই ক্ষতি ও উপকার সবই তো আল্লাহর হাতে। সারা বিশ্বের সকল উপায় উপকরণ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। বান্দাদের ওপর তিনিই পরাক্রান্ত এবং কোনো জিনিস দেয়া বা না দেয়ায় কী যুক্তি ও কল্যাণ রয়েছে, তা তিনিই ভালো জানেন।

'আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করেন তবে তিনি ছাড়া আর কেউ তা থেকে, উদ্ধার করতে পারে না। আর তিনি যদি কোনো কল্যাণ দেন তবে আল্লাহ সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।'

এ আয়াত দুটির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তরে যে গোপন শয়তানী প্ররোচনা লুকিয়ে থাকে যে সুপ্ত লোভ, লালসা, ভীতি, ধারণা বা সন্দেহ-সংশয় বিরাজ করে, সেগুলোর প্রতিকার করা হয়েছে। আকীদার আলো, ঈমানের কষ্টি পাথর, বিশ্বাসের স্বচ্ছতা ও আদর্শের বিশুদ্ধতা দ্বারা এ সবের নিরসন করা হয়েছে। কেননা যে বিষয়টি এখানে ও কোরআনের সর্বত্র আলোচিত হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে এই পর্বের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বক্তব্য এসেছে সাক্ষী রাখা, সতর্ক করা এবং শেরকে অংশগ্রহণে বিরত থাকার গুরুগম্ভীর ঘোষণার মাধ্যমে,

'বলো, কে সবচেয়ে বড় সাক্ষী? বলো, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী। আর এই কোরআন আমার কাছে নাযিল হয়েছে যাতে আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে এবং আর যাদের কাছে তা পৌছে, তাদেরকে সতর্ক করি।........ আর তোমাদের কৃত শেরকের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।' (আয়াত ১৯)

এখানে একই আয়াতে ছোট ছোট বাক্যে যেভাবে রকমারি ভংগিতে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা বড়ই বিস্ময়কর। যেন প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি দৃশ্যের ছবি তোলা হচ্ছে এবং শ্রোতাদের মুখমন্ডলের হাবভাব ও মনের ভাবান্তরগুলোর তালে তালে কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইনিই সেই রসূল (স.) যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ আদেশ দেয়া হচ্ছে যেন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক না রাখেন। আবার পরক্ষণে এই রসূলই সেই মোশরেকদের মুখোমুখি হচ্ছেন, যারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক মানে, সেই অন্যদের মধ্যে আল্লাহর এমন কিছু কিছু গুণাগুণ আছে বলে বিশ্বাস করে যা আল্লাহর একক গুণাগুণ। তারা রসূল (স.)-কে অনুরোধ করে যেন তিনি তাদের উক্ত বিশ্বাস ও নীতিকে মেনে নেন এবং তার বিনিময়ে তারা রসূলের আনীত দ্বীনে প্রবেশ করবে। তারা ভেবে নিয়েছিলো, ইসলাম ও শেরক যেন একই সাথে একই অন্তরে সহাবস্থান করতে পারে। এ যুগেও কিছু লোকে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, একজন মানুষ একাধারে মুসলমান তথা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারীও হতে পারে। আবার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে জীবন যাপনের নীতিমালাও গ্রহণ করতে পারে, অন্যদের অনুগতও হতে পারে, অন্যদের সাহায্যও চাইতে পারে এবং অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবেও গ্রহণ করতে পারে।

ইনিই সে রসূল (স.), যিনি মোশরেকদের ধর্ম ও তাঁর ধর্মের মধ্যে, তাদের শেরক ও তাঁর আনীত তাওহীদের মধ্যে এবং তাদের জাহেলী ব্যবস্থা ও তাঁর আনীত ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক বৈপরীত্য ঘোষণা করার জন্যে তাদের মুখোমুখি হন। মুখোমুখি হন কথাও জানানোর জন্যে যে, তাঁর ও মোশরেকদের মাঝে আপোষ রফার এক মাত্র উপায় হলো, তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামের শাশ্বত ও নির্ভুল ধর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ে আপোষের কোনো অবকাশই নেই। কেননা হক ও বাতিলের মাঝে প্রথম থেকেই বিরোধ, বয়কট ও ছাড়াছাড়ি সংঘটিত হয়ে রয়েছে।

ইনিই সেই রসূল, যিনি মোশরেকদের সাথে প্রকাশ্য সাক্ষী অনুসন্ধানের সূচনা করছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, কে সবচেয়ে বড় সাক্ষী?'

অর্থাৎ এই বিশ্বজগতে কোন সাক্ষী সবচেয়ে বড়? কোন সাক্ষী এমন রয়েছে যার সাক্ষ্য আর সব সাক্ষ্যের ঊর্ধে? কোনো সাক্ষী এমন রয়েছে, যার সাক্ষ্য সব দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করে দেয়, ফলে তার সাক্ষ্যের পর আর কোন সাক্ষ্য থাকে না।

সকল জিনিস যাতে প্রশ্নটির আওতায় চলে আসে এবং গোটা বিশ্ব-প্রকৃতিতে আর কোনো জিনিস অবশিষ্ট না থাকে, সে জন্যে প্রশ্নটি এভাবে করা হয়েছে, 'বলো, কোন জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী?' রসূল (স.)-কে যেমন প্রশ্ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি তাঁকে প্রশ্নের জবাব দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা শ্রোতাদের স্বীকারোক্তির আলোকেই হোক বা বাস্তবতার আলোকেই হোক, এখানে যে জবাব দিতে বলা হয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো জবাব হতেই পারে না। জবাবটি হলো,

'বলো, আল্লাহ!'

বস্তুত, আল্লাহই সবচেয়ে বড় সাক্ষী। তিনিই সত্যকে বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম নিষ্পত্তিকারী। তিনি হচ্ছেন সেই সত্ত্বা, যার সাক্ষ্যের পর আর কোনো সাক্ষ্য নেই এবং তার কথার পর আর কোনো কথাও নেই। তাই তিনি যখন কিছু বলেন, তখন তা হয় সমস্ত কথার শেষ কথা। তখন সব কিছুর ফয়সালা চুকে যায়।

তিনি যখন এই সত্য ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তায়ালাই শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী তখন তিনিই এ কথাও ঘোষণা করলে যে, তিনি রসূল (স.) ও মোশরেকদের মধ্যকার বিতর্কের সাক্ষী আছেন।

'তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।'

যখন এই নীতি স্থির হলো যে, এই বিতর্কে আল্লাহকে সালিস মানা হবে, তখন ঘোষণা দিলেন যে, তার সাক্ষ্য কোরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কোরআন তিনি নাযিল করেছেন মোশরেকদেরকে এবং অন্য যাদের কাছে এই কোরআন রসূলের জীবদ্দশায় বা তার পরে পৌঁছবে, তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, কোরআন তার নাযিল হবার সময়কার মানব জাতির জন্যে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে, তাদের জন্যে কার্যকর দলীল। কেননা এতে আল্লাহর এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বা ফয়সালা রয়েছে। এটি এমন জিনিস, যার ওপর দুনিয়া ও আখেরাত দাঁড়িয়ে আছে, যার ওপর গোটা বিশ্ব ও মানব জাতি টিকে আছে।

'আর আমার কাছে এই কোরআন নাযিল হয়েছে যাতে আমি তা দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে কোরআন পৌঁছবে, তাদেরকে সতর্ক করি।'

বস্তুত, যাদের কাছে এই কোরআন কোনো বোধগম্য ভাষায় পৌছে, তাদের ওপর এর আনুগত্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তার কাছে সতর্কবাণী পৌঁছে যায় এবং এর পরও তা কেউ অস্বীকার করলে তার জন্য আযাব অবধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহর সাক্ষ্য এই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এ কথা যখন ঘোষণা করা হয়েছে, তখন সেই সাক্ষ্যের বক্তব্যটাও এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তার মধ্য দিয়ে মোশরেকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও ক্ষোভ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর সাক্ষ্যের ঠিক বিপরীত সাক্ষ্য দিয়েছে। এই পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রসূল (স.) তাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি আল্লাহর একত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাদের শেরক ভিত্তিক ধ্যান-ধারণা থেকে তিনি সম্পূর্ণ সংস্রবহীন।

'তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদ রয়েছে? বলো, আমি এ সাক্ষ্য দেই না। বলো, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ইলাহ এবং তোমাদের শেরকের সাথে আমার কোনো সংস্রব নেই।'

কোরআনের এই বাক্যগুলো হৃদয়কে এমনভাবে প্রকম্পিত করে যে, মানুষের ভাষায় উচ্চারিত কোনো বাক্য তেমন করে না। পাঠকের হৃদয়ে এই বাক্যগুলোর যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হবে, তাকে আমি আমার আর কোনো মন্তব্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত করতে চাই না।

কালেমায়ে তাইয়েবার মর্মার্থ

কিন্তু এই আয়াত কয়টিতে যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তা নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই। এ আয়াতগুলোর আলোচ্য বিষয় হলো অভিভাবক গ্রহণ, তাওহীদ ও শেরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। এটা ইসলামী আদর্শের মূল কথা এবং সর্বোচ্চ তত্ত্ব। মহান আল্লাহর এ বক্তব্যগুলোকে আজকের যুগের মুসলমানদের একটু দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

এ যুগের মুসলমানরা সারা পৃথিবীতে বিরাজমান এমন এক সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী জাহেলিয়াতের সম্মুখীন, যা কোরআন নাযিল হবার সময়ে তৎকালীন মুসলমানদের সামনেও বিরাজমান ছিলো। এ আয়াতগুলোর নিরিখে তারা যাতে নিজেদের নীতি নির্ধারণ করতে পারে এবং এর আলোকে নিজ নিজ পথে চলতে পারে, সে জন্যেই তা নাযিল হয়েছিলো। এ জন্যেই এ আয়াতগুলোকে নিয়ে একটা দীর্ঘ সময় চিন্তা-গবেষণা করা এবং এর আলোকে নিজেদের পথ খুঁজে নেয়া এ যুগের মুসলমানদেরও কর্তব্য।

ইসলাম যে দিন পৃথিবীতে এসেছিলো, কালের আবর্তনে সেই দিন আবার ফিরে এসেছে। রসূল (স.)-এর কাছে কোরআন নাযিল হবার দিন যে ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো, আজও সেই একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সেদিন মানব জাতির কাছে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটেছিলো তার সর্ববৃহৎ মূলনীতি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই এই সাক্ষ্য দানের ভিত্তিতে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এই সাক্ষ্য দানের মর্ম কী, পারসিক বাহিনীর সেনাপতি রুস্তমের কাছে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দূত রাব্য়ী ইবনে আমের (রা.) তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। রুস্তম তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তোমাদের নবী তোমাদের কাছে কী দাওয়াত নিয়ে এসেছেন? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমরা মুসলিম জাতিকে আল্লাহ পৃথিবীতে আবির্ভূত করেছেন এ জন্যে যে, যাকে যাকে তিনি চাইবেন, তাকে আমরা বান্দার গোলামী থেকে বের করে এনে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকে ফিরিয়ে আনবো, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশস্ততায় ফিরিয়ে আনবো এবং অন্যান্য ব্যবস্থার যুলুম-নিপীড়ন থেকে ইসলামের সুবিচারের দিকে ফিরিয়ে আনবো।' তিনি জানতেন যে, রুস্তম ও তার জাতি পারস্য সম্রাটকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মনে করে পূজা করতো না এবং তার সামনে আনুষ্ঠানিক এবাদাত করতো না। কিন্তু তার কাছ থেকে আইন গ্রহণ করতো ও তার হুকুম পালন করতো। এই অর্থেই তারা তার এবাদাত ও গোলামী করতো। আর এটাই ইসলামের পরিপন্থী। তাই তিনি তাকে জানালেন যে, যে সব মানব রচিত মতবাদ ও ব্যবস্থার অধীন মানুষ মানুষের বা অন্য কোনো সৃষ্টির গোলামী ও আনুগত্য করে এবং তাদের জন্য খোদায়ী গুণাবলী তথা সার্বভৌমত্ব, আইন রচনা ও এই আইন ও সার্বভৌমত্বের আনুগত্য করা (বিভিন্ন ধর্ম ও ব্যবস্থা) থেকে বের করে এনে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যে ও ইসলামের ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনাই মুসলমানদের উদ্দেশ্য।

ইসলাম যেদিন প্রথম 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণী ঘোষণা করে মানব জাতির কাছে এসেছিলো, সেদিনকার মত পরিস্থিতি আবার দেখা দিয়েছে। মানুষ আবার মানুষের গোলামীতে নিয়োজিত হয়েছে এবং হরেক রকমের মানব রচিত বিধি ব্যবস্থার আওতায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রকৃত মর্মবাণী তারা ভুলে গেছে। কিছু লোক যদিও মসজিদের মিনার থেকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা করে চলেছে, কিন্তু তারা তার মর্মার্থ জানে না, বোঝে না এবং সেই অর্থে তা ঘোষণা করেও না। সার্বভৌমত্ব দাবী করা আর খোদায়ী দাবী করা একই কথা। অথচ এক দল বান্দা সার্বভৌমত্ব দাবী করছে এবং অন্যরা তা মেনে চলছে। যারা এ দাবী করছে, তারা ব্যক্তি, সংস্থা বা জাতি– যাই হোক, মাবুদ নয়, মাবুদ যখন নয় তখন তাদের সার্বভৌমত্ব তথা আইন রচনার অধিকার থাকতে পারে না। আসলে মানব জাতি জাহেলিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেছে। 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই বান্দাদেরকে খোদার আসনে বসিয়েছে এবং তাওহীদ থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে। যারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' মিনার থেকে ঘোষণা করছে, তারা কেয়ামতের দিন আরো বেশী গুনাহগার ও আরো বেশী আযাব ভোগকারী হবে। কেননা তাদের কাছে হেদায়াতের পথ স্পষ্টভাবে জানা থাকা সত্তেও তারা বান্দার গোলামীতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে গেছে।

তাই আজকের মুসলমানদের এ আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আরো বেশী দরকার। বিশেষত এ আয়াতটি নিয়ে,

'বলো, আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কাউকে আমি অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবো.....?

' আমাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল আয়াতে যে 'ওলী' শব্দটি রয়েছে তার অর্থ হলো, যার আনুগত্য করা হয়, যার সাহায্য চাওয়া হয় ইত্যাদি। এসব অর্থে কাউকে 'ওলী' বা অভিভাবক মানা সম্পূর্ণ শেরক, যা উৎখাত করতে ইসলাম এসেছিলো। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করার পয়লা আলামত হলো তার সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া বা তদনুসারে কার্যত জীবন পরিচালনা করা। অথচ আজকের যুগের গোটা বিশ্বেই এই গায়রুল্লাহর পূজা চলছে। আমাদের জানা দরকার যে, মুসলমানদের আজকের লক্ষ্য হওয়া উচিত সারা বিশ্বের মানুষকে বান্দার গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর গোলামীতে প্রতিষ্ঠিত করা। মনে রাখতে হবে, আজ আমাদের সামনে অবিকল সেই জাহেলিয়াত ফিরে এসেছে, যা রসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলে এই আয়াত নাযিল হবার সময় বিরাজমান ছিলো। তাই এ জাহেলিয়াতের মোকাবেলা করার জন্যে আমাদের নিম্নের আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু অন্তরে বদ্ধমূল করার প্রয়োজন অপরিসীম।

'বলো, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করলে এক কঠিন দিনের আযাবের আশংকা করি.........। (আয়াত ১৬-১৯)

তাই যে ব্যক্তি সমকালীন জাহেলিয়াতের সীমাহীন স্বৈরাচার, আগ্রাসন, অত্যাচার, একগুঁয়েমি, অবজ্ঞা, অবহেলা, দুর্নীতি, অরাজকতা ও চক্রান্তের মোকাবেলা করে, তার হৃদয়ে যে সমস্ত তত্ত্ব, তথ্য ও অনুভূতি বদ্ধমূল ও জাগরূক রাখা অত্যন্ত জরুরী, তাহলো, আল্লাহর নাফরমানী, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ ও অবাধ্য লোকদের জন্যে নির্ধারিত ভয়াবহ আযাবের ভয় ও শংকা, আর এই বিশ্বাস যে, ক্ষতি বা উপকার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত, তাই তাঁর সিদ্ধান্তকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তাঁর ফায়সালাকে রদ করারও কেউ নেই। যার অন্তরে এই সমস্ত তত্ত্ব ও এই সমস্ত অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকে না, সে আগ্রাসী জাহেলিয়াতের সামনে নতুন করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না। এ দায়িত্ব এত কঠিন যে, পাহাড়ও এর ভারে নুয়ে পড়তে চায়।

আজকের পৃথিবীতে প্রকৃত মোমেনদের করণীয় ও দায়িত্ব কী তা উপলব্ধি করতে হবে এবং যে আদর্শের প্রতি তারা মানব জাতিকে দাওয়াত দেয়, সে আদর্শের প্রকৃত দাবী ও চাহিদা যে একমাত্র আল্লাহকেই নিজেদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ, সেটা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে। উল্লেখিত দায়িত্ব ও দায়িত্বের চাহিদা বুঝে নেয়ার পর এবং এই উপলব্ধি ও অনুভূতিকে অন্তরে জাগরূক রাখার পর মোমেনদের যে কাজটা করা অত্যাবশ্যক তা হলো প্রাচীন জাহেলিয়াতের ন্যায় এ যুগের জাহেলিয়াতের অনুসৃত, শেরকের বিরুদ্ধে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। অতপর রসূল (স.)-কে যে কথা বলার আদেশ দেয়া হয়েছিলো, জাহেলিয়াতের মুখের ওপর তিনি যেভাবে তাদের আদর্শকে আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, সেভাবে ফেলে দিতে হবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে ও বর্জন করতে হবে। কেননা এটাই করার আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে ১৯ নং আয়াতে: 'বলো, সবচেয়ে বড় সাক্ষী কে?......'

আজকের পৃথিবীকে জাহেলিয়াতের যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, তার মোকাবেলায় মুসলমানদের উপরোক্ত ভূমিকা অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এই জাহেলিয়াতের মুখের ওপর প্রকৃত সত্য কথা আপোষহীন ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিতে হবে এবং বলে দিয়ে জাহেলিয়াতকে কাঁপিয়ে দিতে ও প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিতে হবে। তারপর সর্বশক্তিমান ও পরাক্রান্ত আল্লাহর শরণাপন্ন হতে

হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে যে জাহেলিয়াতের অনুসারী যতো বড় প্রভাবশালী ও আগ্রাসী হোক না কেন, তারা মশা-মাছির চেয়েও দুর্বল এবং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তা উদ্ধার করার ক্ষমতাও তাদের নেই। মনে রাখতে হবে যে তারা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কারো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যা করতে চান, তা তিনি করেই ছাড়েন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

মুসলমানদের এ ব্যাপারেও দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে, তারা যতোক্ষণ সমকালীন জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে ও সত্যের পক্ষে আপোষহীন অবস্থান গ্রহণ না করবে, বাতিল শক্তির মুখের ওপর সত্য কথা না বলবে, জাহেলিয়াতকে চূড়ান্তভাবে বয়কট না করবে এবং তাকে ভীতি প্রদর্শন না করবে, ততোক্ষণ তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে না এবং পৃথিবীতে তাদেরকে বিজয়ী ও আধিপত্যশীল বানানোর যে ওয়াদা আল্লাহ তায়ালা করেছেন, তা কখনো পূরণ হবে না।

ইতিহাসের কোনো বিশেষ যুগে বিরাজমান কোনো অবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে কোরআন আসেনি। সে এসেছে এমন একটা বিধান নিয়ে যা স্থান ও কালের বন্ধন থেকে মুক্ত। যে পরিস্থিতিতে কোরআন নাযিল হয়েছিলো সেই ধরনের পরিস্থিতিতে পতিত হলে মুসলমানরা এই বিধানকে পুরোপুরি ভাবে মেনে চলবে। আজকে তারা ঠিক সেই ধরনের পরিস্থিতিতেই পতিত। কোরআন নাযিল হবার সময় যে অবস্থা বিরাজ করছিলো সেই অবস্থা আজও বিরাজিত। সে এসেছে পুনরায় পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কাজেই ইসলামের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে তাকে যথাযথ উপলব্ধি, আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ও বাতিলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটিয়ে আল্লাহর সাহায্যের শর্ত পূর্ণ করতে হবে।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ

خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ

كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا

ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ

تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿٢٣﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ

كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ

اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ

يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٥﴾

২০. (তোমার আগে) যাদের আমি কেতাব দান করেছি তারা নবীকে ঠিক সেভাবেই চেনে, যেভাবে চেনে তারা তাদের আপন ছেলেদের, কিন্তু যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে তারা তো (কখনো) ঈমান আনবে না।

রুকু ৩

২১. তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে, যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো মিথ্যা কথা রচনা করে কিংবা তাঁর কোনো আয়াতকে অস্বীকার করে, এ (ধরনের) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না। ২২. একদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো, অতপর মোশরেকদের আমি বলবো, তারা সবাই আজ কোথায় যাদের তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) আমার সাথে শরীক মনে করতে! ২৩. অতপর তাদের (সেদিন) একথা (বলা) ছাড়া কোনো যুক্তিই থাকবে না যে, আল্লাহ তায়ালার কসম, যিনি আমাদের মালিক, আমরা কখনো মোশরেক ছিলাম না। ২৪. (হে নবী,) তুমি চেয়ে দেখো, কিভাবে (আজ) লোকগুলো (আযাব থেকে বাঁচার জন্যে) নিজেরাই নিজেদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং (এও দেখো,) তাদের নিজেদের রচনা করা মিথ্যা (কিভাবে আজ) নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে! ২৫. তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়) তোমার কথা সে কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের মনের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, আমি তাদের কানেও ছিপি এঁটে দিয়েছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহর) সব নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না; এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কোরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফেররা বলবে, এতো পুরনো দিনের গল্পকথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُوا۟ يَـٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ

২৬. তারা (যেমন) নিজেদের তা (শোনা) থেকে বিরত রাখে, (তেমনি) অন্যদেরও তা থেকে দূরে রাখে, (মূলত এ আচরণে) তারা নিজেদেরই ধ্বংস সাধন করছে, অথচ তারা কোনো খবরই রাখে না। ২৭. তুমি যদি (সত্যিই তাদের) দেখতে পেতে যখন এই (হতভাগ্য) ব্যক্তিদের (জ্বলন্ত) আগুনের পাশে এনে দাঁড় করানো হবে, তখন তারা (চীৎকার করে) বলবে, হায়! যদি আমাদের আবার (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা (আর কখনো) আমাদের মালিকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা (অবশ্যই) ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে যেতাম। ২৮. এর আগে যা কিছু তারা গোপন করে আসছিলো (আজ) তা তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেলো; (আসলে) যদি তাদের আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোও হয়, তবু তারা তাই করে বেড়াবে যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিলো, তারা (আসলেই) মিথ্যাবাদী। ২৯. (এ) লোকগুলো আরও বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই হচ্ছে একমাত্র জীবন, আমরা কখনোই পুনর্জীবিত হবো না। ৩০. হায়! তুমি যদি সত্যিই (সে দৃশ্য) দেখতে পেতে যখন তাদেরকে তাদের মালিকের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি তাদের জিজ্ঞেস করবেন (আজ বলো), এ দিনটি কি সত্য নয়? তারা বলবে, হাঁ, আমাদের মালিকের শপথ (এটা সত্য); তিনি বলবেন, তাহলে (আজ) সে (কঠিন) আযাব ভোগ করো, যাকে তোমরা সব সময় অবিশ্বাস করতে।

রুকু ৪

৩১. অবশ্যই তারা (ভীষণভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যারা আল্লাহর সামনা সামনি হওয়াকে মিথ্যা বলেছে; আর একদিন যখন (সত্যি সত্যিই) কেয়ামতের ঘন্টা হঠাৎ করে তাদের সামনে এসে হাযির হবে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, (দুনিয়ায়) এ দিনটিকে আমরা কতোই না অবহেলা করেছি, সেদিন তারা নিজেদের পাপের বোঝা

يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۖ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

নিজেদের পিঠেই বয়ে বেড়াবে; কতো (ভারী ও) নিকৃষ্ট বোঝা হবে সেটি! ৩২. আর (এ) বৈষয়িক জীবন, এ তো নিছক কিছু খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়; (মূলত) পরকালের বাড়িঘরই তাদের জন্যে উৎকৃষ্ট যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে; তোমরা কি (মোটেই) অনুধাবন করো না?

তাফসীর
আয়াত ২০-৩২

এই পর্বটিতেও কোরআনকে ও আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মোশরেকদের বক্তব্য খন্ডন করা হয়েছে। তবে এখানে তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা বা তাদের পূর্ববর্তী অস্বীকারকারীদের ধ্বংসের বিবরণ দিয়ে খন্ডন করা হয়নি। বরঞ্চ যে আখেরাত ও কেয়ামতকে তারা অস্বীকার করে সেই কেয়ামতে ও আখেরাতে তাদের পরিণতি কী হবে তার বিবরণ দিয়েই খন্ডন করা হয়েছে। তাদের এই পরিণতি ও শাস্তির জীবন্ত লোমহর্ষক দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাদেরকে কেয়ামতের মাঠে জমায়েত করা এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমাদের কথিত সেই সব অংশীদাররা কোথায় গেলো?' এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে আসলে তাদেরকে লা-জওয়াব করে দেয়া। সেই দিন তারা ভয়ংকর আতংক ও ত্রাসে দিশাহারা হয়ে কসম খেয়ে খেয়ে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করবে। তারা বলবে, আল্লাহর কসম. আমরা মোশরেক ছিলাম না।'

দোযখের কাছেই আটক থাকা অবস্থায় প্রচন্ড ভীতি, শংকা ও অনুশোচনার সাথে তারা বলবে,

'হায় আফসোস! আমাদেরকে যদি আবার ফেরত পাঠানো হতো........'

তারা তখন আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানো থাকবে এবং অনুশোচনায় ও ভয়ে তারা দিশাহারা থাকবে। আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন, কী হে, আখেরাতটা কি সত্য নয়? তারা বলবে আমাদের প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই সত্য।' কিন্তু এই স্বীকৃতিতে তাদের কোনো কাজ হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, বেশ, এখন নিজেদের কুফরীর বদলায় শাস্তির মজা ভোগ কর।' তারা সেদিন সব কিছু হারিয়ে নিজেদের ঘাড়ে রাশি রাশি গুনাহ নিয়ে হাযির হবে।

আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন ও ক্ষতিকর ব্যবসা করার জন্যে তারা বিলাপ করতে থাকবে। দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়েছে, প্রতিটি দৃশ্য হৃদয়কে প্রকম্পিত করে সমগ্র সত্ত্বাকে ঝাঁকুনি দেয় ও নাড়া দেয়। হৃদয় ও চোখ খুলে দেয়। আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে দেখাতে চান তাদের দেখিয়ে দেন কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা। যে সত্য নিয়ে রসূল (স.) তাদের সাথে লড়াই করছিলেন, সেই সত্য দেখান। যে কেতাবকে তারা অস্বীকার করছিলো তার সত্যতা উপলব্ধি করান। আর আহলে কেতাবের কাছে যে রসূল (স.) তাদের ছেলের মতোই পরিচিত ছিলো সে কথা তো সুবিদিত।

ইহুদী নাসারাদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র

এরশাদ হচ্ছে,

'যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি, তারা তাকে নিজেদের ছেলের মতোই চিনে................

আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে কোরআনের সত্যতা, মোহাম্মদ (স.)-এর রসূল হয়ে আসার সত্যতা এবং তাঁর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকেই কোরআন নাযিল হওয়ার সত্যতা ও অকাট্যতা সম্পর্কে অবহিত, সে বিষয়টা কোরআনে একাধিকবার বলা হয়েছে। আহলে কেতাব গোষ্ঠী যখন রসূল (স.) ও ইসলামের ঘোরতর বিরোধিতা ও শত্রুতা করতো, যখন তাঁর সাথে যুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত হতো, তখন তাদের মোকাবেলা করার জন্যে এ বিষয়টার উল্লেখ করা হতো। আবার মোশরেকদের মোকাবেলা করার জন্যেও একথা বলা হতো। এর মাধ্যমে তাদেরকে জানানো হতো যে, ওহী ও আসমানী কেতাবের প্রকৃতি সম্পর্কে যারা ভালো জানে, সেই আহলে কেতাব কোরআনকে চিনে। আর এ কোরআন যে রসূল (স.)-এর ওপর আল্লাহর নাযিল করা ওহী, এই মর্মে রসূল (স.)-এর দাবীর সত্যতা সম্পর্কেও তারা নিশ্চিত।

আমার মতে এ আয়াতটির মক্কী হওয়াই অগ্রগণ্য। আর এতে আহলে কেতাবের কথা এভাবে উল্লেখ করা দ্বারা বুঝা যায় যে, এ দ্বারা মোশরেকদের মোকাবেলা করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তো অজ্ঞতা বশতই কোরআনকে অস্বীকার করছো। অথচ আহলে কেতাব একে নিজের সন্তানের মতোই চিনে। তবে তাদের অধিকাংশ যে এর ওপর ঈমান আনেনি, সেটা তাদের দুর্ভাগ্য। তারা ক্ষতিগ্রস্ত বলেই তারা ঈমান আনেনি। আর এ ব্যাপারে তাদের অবস্থা মোশরেকদের অবস্থার মতোই। তারাও ক্ষতিগ্রস্ত ও হতভাগা বিধায় ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ আয়াতের আগের ও পরের সমস্ত আয়াতই মোশরেকদের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এটি মক্কী বলেই প্রতীয়মান হয়। সূরার পরিচিতিতে আমি এ কথা বলে এসেছি।

'যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি তারা তাকে নিজের ছেলের মতই চিনে'

এই আয়াতটির তাফসীর মোফাসসেররা এভাবেই করে আসছেন যে, তারা কোরআনকে আল্লাহর নাযিল করা কেতাব হিসাবে সুনিশ্চিত ভাবেই চিনে অথবা রসূল (স.) সুনিশ্চিত ভাবেই যে আল্লাহর প্রেরিত নবী এবং কোরআন তাঁর কাছেই যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়, এটা তারা জানে।

এটা আয়াতের ব্যাখ্যার একটা দিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও ইসলামের ব্যাপারে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর এ যাবতকার নীতি ও আচরণ যদি বিবেচনায় রাখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, আয়াতটার ব্যাখ্যার আরো একটা দিক রয়েছে। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে সেই দিকটা অবহিত করতে চান, যাতে করে ইসলামের প্রতি আহলে কেতাবের নীতি ও আচরণের মোকাবেলা করার সময় তাদের চেতনায় এই দিকটা জাগরূক থাকে।

আহলে কেতাব জানে যে, কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া অকাট্য সত্য গ্রন্থ। আর এটা জানে বলেই এই কেতাবে বর্ণিত আকীদা ও আদর্শের অনুসারীদের শক্তি, প্রতাপ, সততা ও কল্যাণধর্মিতা কতো বেশী সে সম্পর্কেও তারা ওয়াকেফহাল। আর এই আদর্শ অনুসরণের ফলে তাদের মধ্যে যে সুন্দর নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে এবং যে জীবন পদ্ধতিতে তারা অভ্যস্ত হয়, সেটাও তারা জানে। তারা এই কেতাবের ও তার অনুসারীদের ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে। তারা জানে যে, পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত আহলে কেতাবের ঠাই হবে না, বরং মুসলমানদেরই ঠাই

হবে। ইসলাম যে আগাগোড়াই সত্য আর তাদের ধর্ম যে আপাদ মস্তক বাতিল, তা তাদের কাছে সুবিদিত। তারা এও জানে যে, যে জাহেলী সভ্যতাকে তারা আপন করে নিয়েছে এবং যার মধ্যে তাদের জাতির চরিত্র ও সামগ্রিক জীবন পদ্ধতি বিলীন হয়ে গেছে, তার সাথে ইসলাম কখনো আপোষ করতে পারে না কিংবা তার অধীনতা স্বীকার করতে পারে না। তাই জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের যে লড়াই তার কোনো শেষ নেই। জাহেলিয়াত পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এ লড়াই থামবে না। ইসলাম যতোদিন সকল ধর্ম ও ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী না হবে, পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম না হবে অর্থাৎ যতদিন পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব ও আধিপত্য শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হবে এবং আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের ওপর যারা আগ্রাসন চালায় ও কর্তৃত্ব ফলায় তাদের পরাভূত হওয়ার মধ্য দিয়েই সকল আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হবে, ততোদিন এ লড়াই বন্ধ হবে না।

ইসলামের এই অনমনীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা আহলে কেতাব ভালোভাবেই জানে। তারা তাদের ছেলেকে যেমন চিনে, ঠিক তেমনি নির্ভুলভাবে ইসলামকে চিনে। তারা পুরুষানুক্রমিকভাবে অত্যন্ত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে ইসলামকে অধ্যয়ন করে এসেছে। ইসলামের শক্তির উৎস ও রহস্য কী, কিভাবে ও কোন পথ দিয়ে তা মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে ও মনমগজকে দখল করে, তারা তার অনুসন্ধান চালায়। এভাবে তারা জানতে চেষ্টা করে, কিভাবে ইসলামের শক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও ধ্বংস করা যায়, কিভাবে মুসলমানদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ ঢুকিয়ে দেয়া যায়, কিভাবে এর প্রধান উৎস কোরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত করা যায় এবং কিভাবে মুসলমানদেরকে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখা যায়। তারা সর্বাত্মক চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, কিভাবে বাতিল ও জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ ও ধ্বংসকারী, পৃথিবীতে আল্লাহর শাসন ও কর্তৃত্বকে পুন প্রতিষ্ঠাকারী, খোদাদ্রোহীদেরকে বিতাড়নকারী ও আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য বহালকারী বিপ্লবী আদর্শ ইসলামকে একটা আপোষকামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে, একটা নির্জীব তাত্ত্বিক গবেষণায় এবং একটা অসার ধর্মতাত্ত্বিক, ফেকাহ তাত্ত্বিক ও সাম্প্রদায়িক দর্শনে পরিণত করা যায়! তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কিভাবে ইসলামের মহান নীতিমালাকে ইসলামের অপরিচিত ও ইসলামের জন্যে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শের সাথে সমন্বিত করা যায়, আবার মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারেও আশ্বাস দেয়া যায় যে, তাদের আকীদা ও আদর্শ সম্মানিত ও সুরক্ষিত। অতপর সর্বশেষে আদর্শিক শূন্যতাকে অন্যান্য আদর্শ দ্বারা এবং বিভিন্ন মানব রচিত মতবাদ দ্বারা পূর্ণ করে কিভাবে ইসলামী আদর্শের অবশিষ্ট চিহ্নগুলোকেও খতম করা যায়, সেই চিন্তায় তারা অস্থির থাকে।

আহলে কেতাব যে ইসলামকে নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর গবেষণামূলক অধ্যয়ন চালিয়ে থাকে, সেটা ইসলামের জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে নয় কিংবা ইসলাম ও তার মূলনীতির প্রতি সুবিচার ও ন্যায়সংগত আচরণ করার উদ্দেশ্যেও নয়। কিছু কিছু সরলমনা বা প্রতারিত মুসলমান যখন কোনো প্রাচ্যবাদী গবেষকের মুখ থেকে ইসলামের কোনো মহৎ নীতি বা বিধির প্রশংসা শুনতে পায় তখন তারা মনে করে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা সত্যিই ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। ইসলাম সম্পর্কে তাদের এতো গবেষণা ও অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে ধ্বংস করার উপায় উদ্ভাবন করা, ইসলামকে নমনীয় ও আপোষকামী আদর্শ হিসাবে প্রমাণ করা। তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্যে তার শক্তির গোপন রহস্য অবগত হওয়া। তারা জানতে চায় কিভাবে ইসলাম মানুষের মন

মগযকে দখল করে। এটা জানতে চায় এ জন্য যে, তারাও তাদের বাতিল মতাদর্শ দিয়ে জনগণের মন জয় করতে চায় এবং এর উপায়টা তারা ইসলামের কাছ থেকেই শিখতে চায়।

বস্তুত এই সব উদ্দেশ্য ও এই সব অবস্থার প্রেক্ষাপটেই তারা ইসলামকে নিজেদের ছেলের মতো চিনে। আমাদেরও কর্তব্য আমরাও যেন আমাদের দ্বীন সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপ জ্ঞান অর্জন করি, যেরূপ আমাদের সন্তানদের সম্পর্কে করে থাকি। বিগত চৌদ্দশত শতাব্দী জুড়ে যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে একটা সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সত্যটি কোরআনের উপরোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে যে আহলে কেতাব তথা খৃষ্টান ও ইহুদীরা ইসলামকে নিজেদের সন্তানের মতোই চিনে। তবে এ সত্যটি ইদানীং আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে। আজকাল ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে প্রতি সপ্তাহে একটি করে গবেষণামূলক পুস্তক বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই সব গবেষণা থেকে বুঝা যায় ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকরা ইসলাম ও তার ইতিহাস সম্পর্কে, ইসলামের শক্তির উৎস সম্পর্কে, তার প্রতিরোধ সরঞ্জাম ও তার দিক নির্দেশনা বিনষ্ট করার উপায় সম্পর্কে কতো বিস্তারিত খুঁটিনাটি জ্ঞান রাখে। এই সব লেখকের অধিকাংশ তাদের উক্ত কু-মতলবটি প্রকাশ করে না। কেননা তারা জানে যে, ইসলামের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালানো হলে তা মুসলমানদের মধ্যে প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার প্রচন্ড জোয়ার সৃষ্টি করে। তারা এটাও জানে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত সশস্ত্র আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য গঠিত আন্দোলনগুলো ছিলো পুরোপুরি ইসলামী ধর্মীয় চেতনা ভিত্তিক অথবা কমের পক্ষে ধর্মীয় আবেগ ভিত্তিক আন্দোলন। ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর এই ধারা যদি তাত্ত্বিক পর্যায়েও অব্যাহত থাকে, তাহলে তা ক্রমাগত প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জযবা সৃষ্টি করতেই থাকবে। এ জন্যে এই লেখকদের অধিকাংশ আরো ঘৃণ্য পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে, সেই পন্থাটা হলো ইসলামের প্রশংসা করা। এর প্রভাবে একদিকে যেমন আবেগ ও উদ্দীপনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অপরদিকে তেমনি লেখকের ওপর পাঠকের আস্থা জন্মে যায়। এই আস্থার সুযোগ নিয়েই সে পরক্ষণে তাকে বিষ খাইয়ে দেয়। বিষটা এ ধরনের: ইসলাম একটা মহান ধর্ম ঠিকই, তবে তাকে আধুনিক মানবতাবাদী সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য আরো প্রগতিশীল বানানো দরকার, যাতে সামাজিক চালচলনে, শাসন ব্যবস্থায় ও নৈতিক মূল্যবোধে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সে কোনো ফতোয়া না দেয়। বরঞ্চ সে যেন নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাসের আকারে থেকে যাওয়াতেই সন্তুষ্ট থাকে। আধুনিক মতবাদ ও মতাদর্শসমূহ, সর্বাধুনিক অভিজ্ঞতা ও মানবিক সভ্যতার সর্বাধুনিক রীতিনীতি মানব সমাজকে যেভাবে গড়ে তুলছে, তুলুক, তাতে তার নাক গলানো অনুচিত। মানব সমাজের দিকপালগণ সর্বশেষ অভিজ্ঞতা ও রীতিনীতির আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে যেভাবে পরিচালিত করে, তাকে সে শুধু অভিনন্দন জানাতে থাকুক। এভাবেই সে মহান ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে!

আর ইসলামের অতুলনীয় সামাজিক ন্যায়বিচারকে তার শক্তির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে প্রতারণামূলক ও ঘুম পাড়ানী প্রশংসা করে এই লেখক নিজ জাতিকে সতর্ক করে দেয় যে, তারা যেন ইসলামের বিপদজনক পুনরুত্থান সম্পর্কে সাবধান হয়, তার শক্তির রহস্য কোথায় নিহিত রয়েছে তা যেন উপলব্ধি করে এবং এই নির্ভুল উপলব্ধির আলোকে তারা যেন এর ওপর অব্যর্থ মারণাঘাত হানে। ইসলামের অগ্রগতি কার্যকরভাবে রোধ করতে হলে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে, ঠিক যেমন নিজের সন্তান সম্পর্কে পিতামাতার নির্ভুল জ্ঞান থাকে।

কোরআনের প্রতিটি বক্তব্য নিয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা-গবেষণা ও অধ্যয়ন সেই সাথে কোরআনের আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রামে অংশগ্রহণ, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীর সচেতন পর্যবেক্ষণ ও আল্লাহর সত্যানুগ ও আলোকোজ্জ্বল মানদন্ড অনুসারে পর্যালোচনা করলে কোরআনের গবেষকদের কাছে প্রতিনিয়ত এ ধরনের বহু নতুন ও অভিনব তত্ত্ব উদঘাটিত হতে থাকবে।

শেরেকের প্রকারভেদ ও অভিন্ন পরিণতি

এবারে ২১, ২২, ২৩, ও ২৪ নং আয়াত কটির বিস্তারিত আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবো

এ আয়াতগুলোতে মোশরেকদের কার্যকলাপ ও নীতি সম্পর্কে আল্লাহর মূল্যায়ন ও এর মাধ্যমে তাদের সমালোচনা ও প্রতিরোধের ধারা অব্যাহত রাখা হয়েছে। প্রথমেই প্রশ্নের আকারে তাদের যুলুম– যা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপের মাধ্যমে তারা করতো– তুলে ধরা হয়েছে। তাদের মিথ্যাচার ছিলো এই যে, তারা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবী করতো, তারা মনগড়াভাবে যে সব জীব-জন্তু, খাদ্যদ্রব্য ও পুঁজা-উপাসনাকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতো, তাকে তারা আল্লাহরই নির্ধারিত হালাল ও হারাম বলে দাবী করতো। অথচ আসলে তা আল্লাহর নির্ধারিত হালাল হারাম ছিলো না– এগুলো ছিলো ওদেরই মনগড়া হালাল-হারাম। আজকের যুগেও কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা নিজেদেরকে মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বীনের অনুসারী 'মুসলমান' বলে দাবী করে, অথচ এ দাবী আল্লাহর ওপর আরোপিত নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা তারা মনগড়া আইন রচনা করে, মনগড়া প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়ে তোলে এবং মনগড়া মূল্যবোধ রচনা করে। আর এ সব কাজ করার মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে গায়ের জোরে দখল করে ও নিজের ক্ষমতা ও এখতিয়ার বলে দাবী করে। সেই সাথে মনে করে যে, এটাই আল্লাহর বিধান। তাদের সাংগ-পাংগরা, যারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে জাহান্নাম খরিদ করে নিয়েছে, তারাও দাবী করে যে, এটাই তো আল্লাহর বিধান। এ আয়াতগুলোতে তাদের আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করারও কঠোর প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা বলতো, মোহাম্মদ (স.) যা এনেছে, তা আল্লাহর কাছ থেকে আগত বিধান বা নির্দেশ নয়, বরং তারা জাহেলীয়াত যুগে যা যা করতো, সেগুলোই আল্লাহর কাছ থেকে আগত বিধান। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মিথ্যা দাবী এ যুগের জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরাও করে থাকে।

এ আচরণের প্রতি কঠোর ক্ষোভ প্রকাশ করে ও একে জঘন্যতম যুলুম বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে বা তার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় যুলুমবাজ আর কে আছে?'

এখানে যুলুম দ্বারা শেরককে বুঝানো হয়েছে। শেরককে খুবই ঘৃণ্য ও ভয়ংকর জিনিস হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যই শুধু এখানে নয় বরং কোরআনের বহু জায়গায় একে যুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা শেরক একাধারে সত্যের ওপর, নিজ ব্যক্তিসত্ত্বার ওপর এবং অন্যান্য মানুষের ওপর যুলুম ও আগ্রাসন চালানোর নামান্তর। আল্লাহর নিরংকুশ অধিকার রয়েছে যে, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্ব করা হবে, এতে আর কাউকে অংশীদার করা হবে না। আল্লাহর এই অধিকার হরণ করা হয় শেরকের মাধ্যমে। শেরকের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে ইহ পরকালে ধ্বংস ও আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সুতরাং শেরক তার নিজের ওপর যুলুম ও অত্যাচারের নামান্তর। শেরকের মাধ্যমে জনসাধারণের ওপরও অত্যাচার করা হয়। কেননা এ

দ্বারা তাদেরকে অন্যায় ও অবৈধভাবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য সত্ত্বার ও বস্তুর দাসে পরিণত করা হয় এবং এই অন্যায় দাসত্বের কারণে মানব রচিত আইন ও শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট করে তাদের জীবনকে দুর্বিসহ করা হয়। এ সব কারণেই শেরক হচ্ছে এক ভয়াবহ যুলুম, অত্যাচার ও আগ্রাসন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ কথাই বলেছেন। এখানেও বলছেন যে, শেরক ও মোশরেকেরা সফল হয় না।

'অত্যাচারীরা সফল হয় না।'

আল্লাহ তায়ালা এখানে প্রকৃত সত্যকে ও চূড়ান্ত পরিণতিকে তুলে ধরেছেন। চূড়ান্ত বিচারে মোশরেক তথা অত্যাচারীরা ব্যর্থ। সাময়িকভাবে আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যে সাফল্য দেখা যায়, তার কোনো মূল্য নেই।

এই সাময়িক সাফল্য তাদেরকে সর্বনাশা এক স্তরে পৌঁছে দেবে। আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই।

এরপর তাদের ব্যর্থতা ও অসফলতার দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে। কেয়ামতের মাঠে তাদের অবমাননাকর অবস্থানের দৃশ্যই তাদের ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ,

'যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো' .... (আয়াত ২২, ২৩, ও ২৪)

মনে রাখতে হবে যে, শেরক অনেক রকমের এবং মোশরেকও অনেক রকমের। যাদেরকে শরীক গণ্য করা হয়, তাদেরও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। শেরক, মোশরেক ও শরীক– এই শব্দগুলো শোনা মাত্রই যে সাধারণ দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে অর্থাৎ মাটি বা পাথরের মূর্তি, গাছ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র, আগুন ইত্যাদির পূজা করা– এটাই শেরকের একমাত্র রূপ নয়।

শেরক মূলত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো বা অন্য কিছুর জন্যে এমন গুণ বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দেয়ার নাম, যে গুণ বৈশিষ্ট্য বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই এবং থাকতেও পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো বস্তু বা প্রাণী সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস করে যে, সে এই বিশ্ব চরাচরে আপন ইচ্ছা মোতাবেক কোনো ঘটনা ঘটাতে পারে বা বিশ্বপ্রকৃতির ওপর নিজের যে কোনো ইচ্ছা কিংবা কোনো কিছু পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারে, অথবা কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো সামনে রুকু সেজদা প্রার্থনা ইত্যাকার দাসসুলভ আনুষ্ঠানিকতা পালন করে, পূজা উপাসনা করে ও মান্নত মানে, অথবা কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো রচিত আইন কানুন বা বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে তা দ্বারা পার্থিব জীবনকে পরিচালিত করার মাধ্যমে আল্লাহর হাকিমিয়্যাতকে অন্য হাতে তুলে দেয়, তাহলে উল্লেখিত সব কয়টিই শেরকের প্রকারভেদ বা রকমফের মাত্র। বিভিন্ন প্রকারের মোশরেকেরা বিভিন্ন রকমের শেরকে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, তাদেরও প্রকারভেদ রয়েছে।

কোরআনের সব কয়টিকেই শেরক বলে আখ্যায়িত করে এবং কেয়ামতের দৃশ্যাবলী দেখিয়ে বুঝাতে চায় যে, উল্লেখিত তিন প্রকারের শেরকের প্রত্যেকটিরই পরিণতি হচ্ছে বিনা হিসেবে চিরকালীন জাহান্নাম। সে দুনিয়া ও আখেরাতে এই তিন প্রকারের শেরকের পরস্পরের মধ্যে শাস্তির দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য করে না।

আরবরা এই তিন প্রকারের শেরকের সব কয়টিতেই লিপ্ত ছিলো। তারা বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কতক সৃষ্টি এমনও আছে যারা বিশ্বের ঘটনাবলীতে ও ভাগ্য নির্ধারণে আল্লাহর কর্তৃত্বের অংশীদার, এদেরকে তারা সুপারিশের মাধ্যমে ফলিয়ে থাকে। তারা মনে

করতো এদের সুপারিশ গ্রহণ করতে আল্লাহ তায়ালা বাধ্য। এ ধরনের সৃষ্টির মধ্যে ফেরেশতা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিছু সৃষ্টি এমনও আছে যারা সুপারিশের মাধ্যম নয় বরং ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে কর্তৃত্বে অংশীদার হয়ে থাকে, যেমন জ্বিন। তারা পৃথকভাবেও এটা করতে পারে, আবার জাদুকর ও জ্যোতিষীদের অধীনে এবং তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েও করতে পারে। কখনো বা মৃত বাপ দাদার আত্মার নাম ধারণ করেও করতে পারে। কিছু সংখ্যক মূর্তি এ সবের প্রতীক হয়ে কাজ করে এবং মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টির আত্মা এ সবের ওপর ক্রিয়াশীল থাকে। এই সব কল্পিত আত্মার সাথে জ্যোতিষীরা কথা বলে এবং তারা যা কিছুকে হালাল করে তা হালাল এবং যা কিছুকে হারাম করে তাকে হারাম ঘোষণা করে। তারা কিন্তু আসলে জ্যোতিষী ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ তারাই কিনা আল্লাহর কর্তৃত্বে অংশীদার হয়ে থাকে।

মূর্তিগুলোর সামনে আনুষ্ঠানিক উপাসনা, মান্নত ও উৎসর্গ– যা কার্যত পুরোহিতদের জন্যেই নিদৃষ্ট থাকে– এবং অনুরূপভাবে, প্রাচীন পারসিকদের অনুকরণে, বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে নক্ষত্রপুঞ্জের অংশীদারীত্বে বিশ্বাস স্থাপন এবং এর দ্বারা নক্ষত্রপুঞ্জের উপাসনাও (এখান থেকেই সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথে এ সূরায় আলোচিত হযরত ইবরাহীমের ঘটনার সংশ্লিষ্টতা স্পষ্ট হয়ে যায়।) আরবের জাহেলী সমাজের রীতি ছিলো।

শেরকের তৃতীয় প্রকারটিতেও তারা লিপ্ত ছিলো। তা ছিলো পুরোহিতদের মধ্যস্থতায়। এটি ছিলো এ রকম যে, তারা এমন ধরনের রীতি প্রথা ও রসম রেওয়ায চালু করতো যা আল্লাহ তায়ালা আদৌ অনুমোদন করেননি আর বলতো যে, এটা আল্লাহর বিধান, যেমনটি আজকালকার কিছু লোকে করে থাকে।

হাশরের ময়দানে মোশরেকদের অবস্থা

কেয়ামতের এই দৃশ্যটিতে উক্ত সকল প্রকারের মোশরেকদের কাছে তাদের সকল রকমের শেরক ও সকল রকমের উপাস্য সম্পর্কে এই মর্মে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আজকে তোমাদের সেই সব উপাস্য কোথায় গেলো, তাদের কোনো হদিস নেই কেন এবং কেনইবা তারা আজ তোমাদেরকে এই ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে না?

'যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো' .....(২২ নং আয়াত)

এখানে ভীতির স্বাভাবিক ক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষের বিবেকের ওপর যে মরিচা পড়ে যায়, কেয়ামতের মাঠের ভীতির প্রভাবে তা তার স্মৃতি ও মন থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যেন আসলেও তার কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে মোশরেকরা সেদিন অনুধাবন করবে যে, শেরক বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না, আল্লাহরও কোনো শরীক ছিলো না। সেদিন তাদের কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না। তাদের পাপপ্রবণতা ও মরিচা দূর হয়ে যাবে। আগুনের পরীক্ষায় স্বর্ণ যেমন পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি সেদিন তারাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

'অতপর তাদের আর কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না'..... (২৩ নং আয়াত)

বস্তুত সেদিন সত্য দেদীপ্যমান হয়ে তাদেরকে অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেবে, তাদেরকে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে নিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং দুনিয়ার জীবনে তারা যে শেরকে লিপ্ত ছিলো তা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চাইবে। কিন্তু তখন তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না। তারা মুক্তি পাবে না। কেননা সময় ততোক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। সেদিন কোনো কাজের সুযোগ থাকবে না। সেদিন শুধু দুনিয়ার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। দুনিয়ার জীবনে যা ঘটেছে, সেটাই সেদিন বহাল থাকবে, তা প্রত্যাহার বা বাতিল করার সুযোগ থাকবে না।

এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, দেখো, তারা এই সব দেব দেবীকে শরীক হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেদের ওপর কী সাংঘাতিক মিথ্যাচার করেছে। কেননা বাস্তবেই যখন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, তখন কাউকে শরীক মানা মিথ্যাচার ছাড়া আর কী? আর আজ তাদের সেই সব মনগড়া খোদাগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেলো! আর উধাও হয়ে যাওয়ার পরই তারা সত্যকে স্বীকার করলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তুমি দেখো, তারা কিভাবে নিজেদের ওপর মিথ্যা আরোপ করছে'.... (২৪ নং আয়াত)

বস্তুত তাদের মিথ্যা আরোপ তাদের নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। তারা আল্লাহর সাথে মনগড়া শরীক মেনে নিজেদেরকেই প্রতারণা করেছে এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলেছে। কেয়ামতের দিন এই সব মিথ্যা অপসৃত ও তিরোহিত হয়ে যাবে।

২৩ নং আয়াতে যে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে মোশরেকরা কসম খেয়ে বলবে যে, আমরা মোশরেক ছিলাম না। এর ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, সেদিন তারা স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলার ঔদ্ধত্য তো দেখাতেই পারবে না। কেননা সেদিন তারা কোনো সত্য যে গোপন করতে পারবে না, তা কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের 'আমরা মোশরেক ছিলাম না' বলার ব্যাখ্যা এটাই হতে পারে যে, কেয়ামতের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তাদের বিবেক শেরকমুক্ত হয়ে যাবে, ফলে তাদের অনুভূতিতে সেই শেরকের কোনো প্রভাব থাকবে না। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা বিস্ময় প্রকাশ করবেন যে, দুনিয়াতে তারা এমন মিথ্যাচারে লিপ্ত ছিলো যে, কেয়ামতের দিন তাদের অনুভূতিতে তার কোনো প্রভাব অবশিষ্ট নেই। তবে এটা একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হবে, তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মোশরেকদের একাংশের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিন তাদের পরিণাম কী হবে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা এই যে, তারা কোরআন শোনে, কিন্তু বিবেক বুদ্ধিকে তালাবদ্ধ ও স্বভাব প্রকৃতিকে বিকৃত করে এবং দম্ভ ও অহংকারে দিশাহারা হয়ে শোনে। শোনার সাথে সাথে রসূল (স.)-এর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়। অথচ তর্ক করার সময় বিবেক বুদ্ধিকে এতো বেশী অর্গলবদ্ধ ও একগুঁয়ে করে রাখে যে, বিপক্ষের কোনো যুক্তি তারা শুনতে চায় না। তারা দাবী করে যে, কোরআন হলো প্রাচীনকালের রূপকথা ও কিংবদন্তী। অথচ তর্কের সময় বিপক্ষীয় বক্তব্য শোনা থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও শুনতে নিষেধ করে। এভাবে একদিকে তাদের দুনিয়ার অবস্থা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং অপরদিকে কেয়ামতের দিন তাদের যে মারাত্মক দুঃখজনক অবস্থা হবে তারও বিবরণ দেয়া হচ্ছে। সেখানে তারা আগুনের কাছে আটক থাকবে। আগুন তাদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতির আভাস দিতে থাকবে। আর তারা কেবল অনুশোচনা করতে থাকবে এবং আক্ষেপ করে বলতে থাকবে যে, তাদেরকে আর একবার দুনিয়ায় পাঠানো হলে তারা একেবারেই ভিন্ন রকমের কাজ করে দেখাতে পারতো। কিন্তু তাদের এই আক্ষেপের জবাবে তাদেরকে প্রচন্ডভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং মিথ্যুক বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের কেউ কেউ তোমার কথা শোনে। আর আমি তাদের মনের ওপর আবরণ রেখে দিয়েছি, ফলে তারা বুঝতে পারে না....' (আয়াত ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮)

একটি অবান্তর বিতর্কের অপনোদন

এখানে তাদের অবস্থার দুইটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চিত্র দুটি পরস্পরের ঠিক বিপরীত। একটি হচ্ছে দুনিয়ার চিত্র, যেখানে তারা অহংকারে মেতে থাকবে, অপরটি আখেরাতের চিত্র, যাতে তাদের আক্ষেপ ও অনুশোচনা প্রতিফলিত হয়েছে। কোরআনের এ আয়াতগুলোতে এই দুটি

চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে ও বিবেক বুদ্ধিকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে তার মরিচা দূর করা, তার অর্গলবদ্ধ মন ও বিবেক উন্মুক্ত করে দেয়া এবং সময় থাকতে কোরআন বুঝতে আগ্রহী করে তোলা। ২৫ নং আয়াতে 'আকেন্নাতুন' শব্দটির অর্থ হলো মনের উপলব্ধির অন্তরায় এবং 'ওয়াকরুন'-এর অর্থ কানের শ্রবণের অন্তরায়।

আর এখানে যে বিশেষ ধরনের মানুষের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শোনে কিন্তু বোঝে না, যেন তাদের বুঝবার মতো মন এবং শুনবার মতো কান নেই। এ ধরনের মানুষ সবযুগে, সকল প্রজন্মে ও সকল স্থানে পাওয়া যায়। এরা আদম সন্তান বটে। তবে তারা শুনেও শোনে না এবং বুঝেও বোঝে না– এ ধরনের এক বিশেষ শ্রেণীর মানব সন্তান সবসময়ই সমাজে থাকে। তাদের কান ও মন নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য হয়ে যায়। তাদের কান যা শোনে, তার অর্থ তাদের অন্তরে পৌঁছতে পারে না।

'তারা যদি প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখতে পায় তবু তার প্রতি ঈমান আনে না। অবশেষে তোমার কাছে এসে তর্ক শুরু করে দেয়। কাফেররা বলে, এটা তো প্রাচীনকালের কিংবদন্তী ছাড়া কিছু নয়।'

অর্থাৎ কানের মতো তাদের চোখও অকর্মণ্য, যা দেখে তা যেন দেখেও দেখে না, অথবা যা দেখে, তা তাদের অন্তরে ও বিবেকে পৌঁছে না।

প্রশ্ন এই যে, এই শ্রেণীটির অসুবিধা কোথায়? আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করার পথে তাদের অন্তরায়টা কী? তাদের যখন চোখ, কান ও বিবেক বুদ্ধি সবই আছে, তখন বাধা কিসের? আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন,

'আমি তাদের অন্তরে উপলব্ধির অন্তরায় ও কানে শ্রবণের অন্তরায় আরোপ করেছি। ফলে তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও দেখতে পায়, তবু তার প্রতি ঈমান আনবে না।'

এ আয়াত থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তই রয়েছে যে, এই সত্য দ্বীনের সপক্ষে তারা যতো দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনই দেখুক বা শুনুক, তাদের চোখ ও কান যা দেখবে ও শুনবে তা তাদের বিবেকবুদ্ধি বা বোধশক্তির কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করবে না, ফলে তারা বুঝবে না এবং ঈমানও আনবে না।

তবে এখানে আমরা অনুসন্ধান চালাতে পারি যে, আল্লাহর এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে কিনা এবং থাকলে তা কী?

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আমার পথে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করবে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখাবো।' (সূরা আনকাবুত)। তিনি আরো বলেন, 'কসম বিবেকের এবং যিনি বিবেককে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবং যিনি মনকে কোনটা খারাপ কাজ ও কোনটা সৎ কাজ, তা জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর। সেই ব্যক্তি সফল, যে মনকে পবিত্র করে এবং সেই ব্যক্তি ব্যর্থ যে মনকে কলংকিত করে।' (সূরা আশ শাম্‌স) এ কটি আয়াত থেকে জানা গেলো যে, যারা সৎ পথের সন্ধান লাভের চেষ্টা করবে, তাদেরকে সৎ পথের সন্ধান দেয়াই আল্লাহর নীতি এবং এও জানা গেলো যে, যে ব্যক্তি নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করে, সে সফল হয়। কিন্তু যে মোশরেকদের কথা আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, তারা সঠিক পথের সন্ধানই নেয়নি যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন। তারা তাদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে বিদ্যমান গ্রহণযন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করারই চেষ্টা করেনি যে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে সত্যকে গ্রহণ করা সহজ করে দেবেন। তারা প্রথম থেকেই তাদের সহজাত গ্রহণযন্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

তাই আল্লাহ তায়ালা তাদের ও হেদায়াতের মাঝখানে পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন। তাই তাদের প্রথম কৃতকর্ম ও প্রথম ইচ্ছার ফল হিসাবেই আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। সব কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তক্রমে হয়ে থাকে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, যে চেষ্টা সাধনা করে, তাকে তিনি সুপথ দেখাবেন, যে নিজেকে পবিত্র করে ও সংশোধন করে তাকে সফল করবেন। আর এও তাঁর সিদ্ধান্ত যে, যারা হেদায়াতকে এড়িয়ে চলবে ও উপেক্ষা করবে, তাদের অন্তরে ও কানে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন এবং সত্যকে বুঝতে দেবেন না। ফলে সকল দলীল প্রমাণ দেখলেও তারা ঈমান আনবে না। যারা বলে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কারণেই আমরা গোমরাহ হয়েছি, মোশরেক হয়েছি বা পাপী হয়েছি, তারা ভুল কারণ দর্শায়। আল্লাহ তায়ালা অন্য এক সূরায় তাদের এই সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, এর জবাব দিয়েছেন এবং যারা এ সব কথা বলে তাদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সূরা নাহলে বলেন,

'মোশরেকরা বলে, আল্লাহর যদি ইচ্ছা থাকতো, তাহলে আমরা ও আমাদের বাপ দাদারা আল্লাহকে ছাড়া আর কারো এবাদাত করতাম না এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছুকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এ রকমই করতো। সুস্পষ্ট প্রচারের কাজ করা ছাড়া রসূলদের কি আর কোনো দায়িত্ব আছে? আমি প্রত্যেক জাতির কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, (এই নির্দেশ দিয়ে) যে, আল্লাহর এবাদাত করো এবং তাগুতকে এড়িয়ে চলো। এরপর তাদের কতককে আল্লাহ সুপথে চালিয়েছেন, কতকের ওপর গোমরাহী কার্যকর হয়েছে। কাজেই তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কী পরিণতি হয়েছিলো।'

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাদেরকে সতর্ক করার পরও তারা গোমরাহীর পথ আঁকড়ে ধরে রাখার কারণেই তারা গোমরাহ হয়েছে।

যারা অদৃষ্ট, মানুষের ক্ষমতা ও অক্ষমতা, মানুষের স্বাধীনতা ও অধীনতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিতর্ক উত্থাপনের মাধ্যমে যতো সব অনুমান সর্বস্ব জটিল ধর্মীয় তত্ত্বের উদ্ভব ঘটায়, তারা এ সম্পর্কে কোরআনের উপস্থাপিত সহজ সরল ও বাস্তব বিশ্লেষণ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কোরআনের বর্ণিত সেই সরল ও সহজ বিশ্লেষণটি হলো, পৃথিবীতে যা কিছুই সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত অনুসারেই সংঘটিত হয়। মানুষ কোনো কাজের প্রতি যেভাবেই মনোনিবেশ করুক না কেন, আপন স্বভাবের চৌহদ্দীর মধ্যেই তা করে। এই স্বভাব আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তা আল্লাহর সিদ্ধান্তেরই অধীন। তাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত যেমন ছিলো, স্বভাবের কার্যকারিতাও তেমনই থাকতে বাধ্য। অপরদিকে তার তৎপরতা যেমনই হোক, দুনিয়া ও আখেরাতে তার অনিবার্য কিছু ফলাফল দেখা দেয় এবং সেই ফলাফলও আল্লাহর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের আওতাধীন। সুতরাং এ পর্যায়েও সে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অধীন। এভাবে যাবতীয় কর্মকান্ড আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেটা হয় এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন সেই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সে আল্লাহর পরিকল্পিত কাজটি করে। এই হলো মোটামুটিভাবে অদৃষ্ট তত্ত্বের সঠিক ব্যাখ্যা। এর অতিরিক্ত যা কিছু বলা হবে, তা এক সীমাহীন বিতর্কের উদ্ভব ঘটাবে।

কোরআন থেকে মানুষকে দূরে রাখার ষড়যন্ত্র

কোরআনে মোশরেকদের কাছে সত্য ও হেদায়াতের অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছিলো এবং ঈমান আনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছিলো। বিশ্ব প্রকৃতিতে

ও মানব সত্ত্বার মধ্যে যে অগণিত নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর দিকে কোরআন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যদি এগুলোর দিকে আন্তরিকতার সাথে দৃষ্টি দেয়, তাহলে তার ঈমান আনার জন্যে এগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু মোশরেকেরা হেদায়াত লাভের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেনি। বরঞ্চ তারা তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও সহজাত শক্তিগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলো। এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াত লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। তাই তারা যখন রসূল (স.)-এর কাছে আসতো, তখন তাদের চোখ, কান ও অন্তর থাকতো তালাবদ্ধ। তাই রসূল (স.) তাদেরকে যে সত্য ও সঠিক কথা বলতেন, তা বুঝা ও সরল মনে মেনে নেয়ার পরিবর্তে তা নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হতো এবং কিভাবে ও কোন ওজুহাতে তা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করবে, তাই ভাবতো। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এভাবে,

'অবশেষে তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমার সাথে তর্ক ও বাদানুবাদ করতে আরম্ভ করে.....'

'আসাতীর' শব্দটি 'উসতূরার' বহুবচন। দেবদেবীর অলৌকিক কর্মকান্ড সম্বলিত কিংবদন্তী ও কল্পকাহিনীগুলোকেই তারা আসাতীর বলতো। বিশেষভাবে পারসিকদের কিংবদন্তীগুলো ছিলো তাদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তারা ভালোভাবেই জানতো যে, কোরআনে কোনো কল্পকাহিনীর অস্তিত্বই নেই। তবু তারা তর্কে লিপ্ত হতো শুধু কোরআনকে অস্বীকার করার বাহানা খুঁজে পাওয়ার জন্যে এবং সন্দেহ সংশয়ের খোঁড়া ওজুহাত বের করার জন্যে। আর এই বাহানা ও ওজুহাত তারা পূর্বতন নবী রসূলদের জীবন ও তাদের জাতিগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির কাহিনীগুলোর মধ্যে খুঁজে পেতো। তারা এই সব ও এই অজুহাতে পুরো কোরআনকে আসাতীর তথা কল্পকাহিনী বলে আখ্যায়িত করতো।

কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখা ও কোরআনকে কল্পকাহিনী প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে মালেক বিন নাযার নামক জনৈক মোশরেক নেতা পারসিক কাহিনীকারদের কাছ থেকে রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের গল্প শিখে এসেছিলো। কা'বা শরীফের চত্ত্বরে যেখানে রসূল (স.) বসতেন, তাঁর কাছেই সে গল্পের আসর জমিয়ে বসতো এবং বলতো, মোহাম্মদ যদি তোমাদেরকে প্রাচীনকালের কাহিনী শোনায়, তাহলে এসো, আমি তোমাদেরকে আরো সুন্দর মজার কাহিনী শোনাবো। অতপর সে তার ঝুলি থেকে বের করে এক এক করে কাহিনী শোনাতো। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে কোরআন শ্রবণ থেকে ফিরিয়ে রাখা। তারা অন্যদেরকে কোরআন শুনতে নিষেধ করতো আর নিজেরাও কোরআন শ্রবণ থেকে বিরত থাকতো। তারা ভয় পেতো পাছে কোরআন শুনতে গিয়ে নিজেরাই তার প্রভাবে পড়ে যায় কিনা। আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন নিম্নের আয়াতটিতে,

'তারা কোরআন শ্রবণ থেকে অন্যদেরকেও নিষেধ করে, নিজেরাও বিরত থাকে .....'

তাদের ভালো করেই জানতো যে, কোরআন 'আসাতীর' বা কল্পকাহিনী নয় এবং মানুষকে যদি কোরআন শুনতে বাধা না দেয়া হয়, তবে কেবল একে কল্পকাহিনী বলে প্রচার চালালে কোনো লাভ হবে না। বড় বড় কোরায়শ নেতারা পর্যন্ত শুধু তাদের অনুসারীদেরকে নিয়ে নয় বরং নিজেদেরকে নিয়েও সর্বদা ভীত থাকতো যে, কখন না জানি কোরআনের বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাই। নাযার ইবনুল হারেস মক্কার জনগণকে প্রাচীন পারসিক ও অন্যান্য কল্পকাহিনী শুনিয়েও নিশ্চিন্ত থাকতে পারতো না যে, মহাশক্তিধর হক ও দুর্বল বাতিলের মধ্যকার লড়াইতে এই কৌশল কোনো সাফল্য এনে দিতে পারবে। তাই তারা মানুষকে কোরআন শুনতে সরাসরি নিষেধ করতো এবং নিজেরাও বিরত থাকতো।

এ পর্যায়ে আখনাস বিন শুরাইক, আবু সুফিয়ান বিন হারব ও আমর বিন হিশাম (আবু জাহল)-এর লুকিয়ে কোরআন শোনার ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে বিবৃতি হয়েছে। এই তিন মোশরেক নেতা কোরআনের দুর্নিবার আকর্ষণে স্থির থাকতে না পেরে গভীর রাতে সংগোপনে রসূল (স.)-এর তেলাওয়াত শুনতে গিয়ে কিভাবে পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলো, তার বিবরণ রয়েছে ওই ঘটনায়। (দেখুন, সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড ও ফি যিলালিল কোরআনের সংশ্লিষ্ট অংশ)

ষড়যন্ত্রকারীদের নির্মম পরিণতি

২৬ নং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, তাদের নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে কোরআন শ্রবণ থেকে বিরত রাখার এই চেষ্টা আসলে তাদের আত্মঘাতী চেষ্টা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। 'তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে মাত্র। অথচ তা বুঝতেই পারে না।'

বস্তুত যে ব্যক্তি নিজেকে ও অন্যদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি, শান্তি ও সুপথপ্রাপ্তি থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে কোনোরকম চেষ্টা করে, সে নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কীই বা করতে পারে। যারা নিজেদেরকে ও জনগণকে ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে, তাদেরকে কিছুদিনের জন্যে যতোই সফলকাম, লাভবান মনে হোক, তারা নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনছে। তাদেরকে যতোই প্রতাপশালী মনে হোক না কেন, আসলে তারা বড়ই অসহায়।

যদি কেউ তাদের আসল চেহারা দেখতে চায়, তবে তাদের ইহকালীন চেহারার পরিবর্তে পরকালীন চেহারাটা দেখে নেয়া উচিত, যা ২৭ নং আয়াতে দেখানো হয়েছে,

'তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, যখন জাহান্নামের সামনে তাদেরকে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায় আফসোস, আমাদেরকে যদি ফেরত পাঠানো হতো, তাহলে আমরা আর আমাদের প্রতিপালকের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতাম না এবং মোমেনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।'

এটা তাদের দুনিয়ার অবস্থার ঠিক বিপরীত অবস্থা। সেখানে তাদের আক্ষেপ, অনুতাপ ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। এখানে অবশ্য তারা আল্লাহর দ্বীনকে যতো খুশী উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করতে পারছে, যতো খুশী দূরে থাকতে ও অন্যদেরকে দূরে ঠেলতে পারছে এবং লম্বা লম্বা বুলি আওড়াতে পারছে।

'যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের সামনে দাঁড়া করানো হবে.....'

অর্থাৎ সেই দৃশ্যটা যদি দেখতে, যখন দোযখের সামনে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হবে, তখন আর কোনো কিছুকেই উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না, তখন আর কারো সাথে তর্ক বসাস করার স্পর্ধা থাকবে না এবং কাউকে বিভ্রান্ত করারও আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

যদি দেখতে, তবে দেখতে সেই ভয়াবহ দৃশ্য। দেখতে, তারা বলছে, হায় আফসোস, যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হতো। ....'

অর্থাৎ কেয়ামতের মাঠে পৌঁছেই তাদের বোধোদয় হবে যে, কোরআন কোনো জ্বিন ভুতের কথা ছিলো না বরং আমাদের 'প্রতিপালকের আয়াত' ছিলো। তখনই তাদের আফসোস হবে যে, দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারলে আর এই সব আয়াতকে অস্বীকার করতো না এবং তারা মোমেন বান্দা হয়ে যেতো। কিন্তু ওই সব আফসোস থেকেই যাবে, কখনো তা দূর হবে না।

কিন্তু নিজেদের স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুনই তারা এসব অসার কথা বলবে। আসলে বেঈমানী তাদের মজ্জগত স্বভাব। তাদেরকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানোর কোনো উপায় যদি হয়েও যেতো, তবু তাদের এ কথা কখনো সত্য হতো না যে, তারা ঈমান আনতো, তারা তাদের অনুসারীদের সামনে নিজেদেরকে সত্যবাদী, মুক্তিলাভকারী ও সফলকাম বলে যে সব বুলি আওড়াতো, তাদের সেই বুলির অসারতা প্রকাশিত হওয়ার আশংকায়ই এসব কথা বলবে। এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'বরঞ্চ তারা যা কিছু ইতিপূর্বে লুকিয়ে রাখতো, সে সবই তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হতো, তবে তারা আবারো সেই কাজ করতো যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো। আর তারা বাস্তবিক পক্ষেই মিথ্যুক।" (আয়াত নং ২৮)। তাদের মজ্জাগত স্বভাব আল্লাহ তায়ালা জানেন। তিনি জানেন যে, বাতিলকে তারা কখনো ত্যাগ করবে না। কেবল দোযখের সামনে আটকে থাকা অবস্থায় ভয়ে দিশাহারা হয়ে তারা এ ধরনের অভিলাষ প্রকাশ করবে এবং এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেবে। আসলে দুনিয়ায় ফেরত পাঠালেও তারা পুনরায় সেই সব নিষিদ্ধ কাজই করবে, যা আগে করতো। তাদের সমস্ত ওয়াদা ও মিথ্যা ও অসার।

এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে মোশরেকদেরকে রেখে সূরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই জবাব তাদের মুখমন্ডলে প্রচন্ড চপেটাঘাত হেনে তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করছে এবং লাঞ্ছিত করছে।

দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে একজন মোমেনের দৃষ্টিভংগী

পরবর্তী আয়াতে আবার দুটো দৃশ্যের অবতারণা করা হচ্ছে, একটি দৃশ্য দুনিয়ার। দুনিয়ায় বসে তারা বলতো, আমাদের কখনো পুনরুজ্জীবিত হতে, হিসাব নিকাশ দিতে ও কর্মফল ভোগ করতে হবে না। অপর দৃশ্যটি আখেরাতের। তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন,

'এটা (পরকাল) সত্য নয় কি?'

প্রশ্নটা তাদেরকে কাঁপিয়ে তুলবে ও বিনয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে দেবে। চরম লাঞ্ছিত ও বিনীত কণ্ঠে তারা বলবে,

'হাঁ, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।'

অতপর তারা তাদের কুফরীর কষ্টদায়ক ফল ভোগ করবে। এরপর কোরআন তাদের সামনে আর একটি দৃশ্যের অবতারণা করছে, যখন কেয়ামত তাদের সামনে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টা মোশরেকরা অস্বীকার করার পর তাদের ওপর যখন কেয়ামত এসে পড়বে, তখন অনুশোচনা করা ছাড়া তাদের আর কিছু করণীয় থাকবে না। তারা পিঠের ওপর বয়ে বেড়াবে নিজেদের পাপের বোঝা। আর আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মূল্য কী, সেটা যাচাই করা হয়েছে এই পর্বের শেষ আয়াতটিতে। (আয়াত ২০, ২১, ও ২২)

মৃত্যুর পর আখেরাতে পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হওয়া ও কর্মফল ভোগ করার বিষয়গুলো ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর একত্বের পরই এ আকীদার স্থান। এ আকীদা ছাড়া ইসলাম চিন্তাগত ও তাত্ত্বিক, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক এবং আইনগত ও রাষ্ট্রীয় কোনো পর্যায়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, মানব জাতির জন্যে তাঁর মনোপূত ও মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা এবং মোমেনদের ওপর তাঁর নেয়ামতের পরিপূর্ণতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বস্তুত এ জীবন ব্যবস্থার আকীদাগত দিক, নৈতিক মূল্যবোধ ও আইনগত দিকের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিদ্যমান। এই পুরো ব্যবস্থাটা আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব এবং আখেরাতের জীবন সংক্রান্ত বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ ব্যক্তিগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং গোটা বিশ্বের অধিবাসী হিসাবে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে যে আয়ুষ্কালটা উপভোগ করে, সেই সীমিত সময়কালটাই ইসলামের দৃষ্টিতে তার সমগ্র জীবন নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন কালের হিসাবে আরো অনেক দীর্ঘ। মানুষের জীবন এই দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবনের সমষ্টি। আখেরাতের জীবনটি কতো দীর্ঘ, সেটা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। শুধু এতোটুকু জানা যায় যে, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একটি দিনের একটি ঘন্টার সমান।

মানব জীবন শুধু কালের দিক দিয়েই বিরাট ও বিশাল নয়, বরং স্থানের বিচারেও বিশাল। যে পৃথিবীতে মানব জাতি বাস করে, তার সাথে আখেরাতের বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিশালতাও যুক্ত। বেহেশ্‌ত কত বড় সে সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, তা সাত আকাশ ও পৃথিবীর আয়তনের সমষ্টির সমান। আর দোযখ এতো বড় যে, তাতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যতো মানুষ পৃথিবীতে বাস করেছে, তাদের স্থান সংকুলান সম্ভব।

মানুষের জীবন আমাদের দৃষ্টিগোচর জগতের বাইরে অদৃশ্য জগতেও প্রসারিত। সেই অদৃশ্য জগতের সঠিক পরিচয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু জানান ততোটুকুই আমরা জানি। সেই জগতের শুরু মৃত্যুর সময় থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি আখেরাতে। মৃত্যু ও আখেরাতের জগত আল্লাহর অদৃশ্য জগতেরই অংগীভূত। এই উভয় জগতে মানুষের জীবন সম্প্রসারিত। তবে কিভাবে কিভাবে সম্প্রসারিত, তা শুধু আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

মানব জীবন পার্থিব জগতে যে মানে বিরাজমান, সেটা তো আমাদের জানা। কিন্তু পরকালীন জীবনে বেহেশতে ও দোযখেও তা বিভিন্ন মানে বিরাজ করবে। সে জীবনের স্বাদ ও প্রকৃতি দুনিয়ার জীবন থেকে একেবারেই ভিন্ন। সে জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের মানব সত্ত্বাও এক সুবিস্তৃত ও সুবিশাল সত্ত্বা। মহাবিশ্বে যতো স্থান ও কাল আছে এবং জগত ও জীবনের যতো স্তর আছে, সব কিছুতেই তার অস্তিত্ব প্রসারিত। গোটা সৃষ্টিজগত ও মানব জগত সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও কল্পনা ঠিক ততোখানিই ব্যাপক, জীবন সম্পর্কে তার অনুভূতি ও উপলব্ধি ঠিক ততোখানি গভীর এবং তার গুরুত্ববোধ, মূল্যবোধ ও সম্পর্ক ঠিক ততোখানি প্রশস্ত, যতোখানি ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত মহাকাল, মহাবিশ্ব, ও তার বিভিন্ন স্তর। অথচ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে বিশ্ব জগত ও মানব জগত খুবই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ। তারা তাদের নিজেদেরকে, তাদের ধ্যান ধারণা ও মতাদর্শকে, তাদের মূল্যবোধকে ও তাদের সংঘাত সংঘর্ষকে এই পার্থিব জীবনের অতি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে ফেলে।

চিন্তা ও ধ্যান ধারণার এই বিভিন্নতা থেকেই সূচনা হয় মূল্যবোধের বিভিন্নতার ও সামষ্টিক জীবন পদ্ধতির বিভিন্নতার। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় কিভাবে ইসলাম একটা পরিপূর্ণ ও সুসমন্বিত

জীবন ব্যবস্থায় পরিণত হতে পেরেছে, কিভাবে আখেরাতের জীবনের গুরুত্ব ও মূল্য ইসলামকে একাধারে একটা ধারণা ও বিশ্বাসে, চরিত্র ও জীবনাচারে এবং আইন ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় পরিণত করেছে।

স্থান, কাল, জগত ও রুচির এই সুবিশাল পরিসরে জীবন যাপনকারী মানুষের সাথে সেই সংকীর্ণ পরিসরে জীবন যাপনকারী মানুষটির অনেক পাথর্ক্য, যে এই সংকীর্ণ জীবনের স্বার্থের জন্যে লড়াই করে বেড়ায়। যার হারিয়ে যাওয়া জিনিসের কোনো ক্ষতিপূরণ, নিজের কৃতকর্মের কোনো ফল এবং তার সাথে করা অন্যের কোনো আচরণের প্রতিফল, এই পৃথিবীতে এবং এই মানুষদের ছাড়া আর কোথাও বা আর কারো কাছ থেকে আসবে বলে সে আশা করতে পারে না।

ধ্যান ধারণা ও চিন্তার ব্যাপকতা, গভীরতা ও বৈচিত্র্য মানষিকতায়ও প্রশস্ততা আনে, গুরুত্ববোধেও বিশালত্বের উদ্ভব ঘটায় এবং অনুভূতিতেও উচ্চতা ও মহত্ত্বের জন্ম দেয়। আর এই মহত্ত্ব, প্রশস্ততা ও গভীরতা থেকে একটা স্বতন্ত্র ধরনের চরিত্র ও আচরণ পদ্ধতি গড়ে ওঠে, যা সংকীর্ণ ধ্যান ধারণার অধিকারী মানুষ ও তাদের আচরণ পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। সুতরাং চিন্তার প্রশস্ততা, গভীরতা ও বিভিন্নতার সাথে যদি ইসলামী আদর্শের প্রকৃতি ও আখেরাতে সুবিচার পাওয়া এবং দুনিয়ার বঞ্চনার বিনিময়ে উৎকৃষ্টতর ও বৃহত্তর ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় যুক্ত হয়। তাহলে মানুষের মনে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের সাথে ত্যাগের উদ্দীপনা ও প্রস্তুতি জন্মে। কেননা সে জানে এই সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্যে কাজ করা ও ত্যাগ স্বীকার করা আল্লাহর নির্দেশের আওতাভুক্ত এবং আখেরাতই বিনিময় ও কর্মফল লাভের প্রকৃত স্থান। উক্ত প্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মানোর পর শুধু যে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে ত্যাগের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা নয়, বরং সেই সাথে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণও পরিশুদ্ধ হয়, দুনিয়ার জীবনের পরিবেশ ও সামষ্টিক জীবন ব্যবস্থাও সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। যেহেতু একজন মুসলমান ভালোভাবেই জানে যে, দুনিয়ায় নৈরাজ্য ও অসততার বিস্তৃতি ঘটতে দেখেও নীরবতা অবলম্বন করলে তাকে দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি থেকেই শুধু বঞ্চিত হতে হবে না, বরং আখেরাতের কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হতে হবে এবং এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে, তাই কোনো মুসলমান দুনিয়ার জীবনকে বিকারগ্রস্ত ও নৈরাজ্য পীড়িত হতে দেখে তা নীরবে বরদাশত করে না।

আখেরাত অবিশ্বাসীদের পরিণতি

পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে এবং বলে যে, আখেরাত বিশ্বাস পার্থিব জীবনে নেতিবাচক প্রবণতা অবলম্বনের আহবান জানায়, দুনিয়ার জীবনকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা দেয়, দুনিয়ার জীবনকে শোধরানো ও উন্নয়নের চেষ্টা না করেই পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেয় এবং আখেরাতের নেয়ামত লাভের আশায় দুনিয়াকে বলদর্পী ও অসৎ লোকদের হাতে ছেড়ে দেয়ার শিক্ষা দেয়, তারা শুধু নিজেদের মিথ্যাবাদী হওয়ারই প্রমাণ দেয় না, বরং নিজেদের অজ্ঞতারও প্রমাণ দেয়। আখেরাত সম্পর্কে খৃষ্টধর্মে যে ধারণা প্রচলিত এবং আল্লাহর নির্ভুল বিধান ইসলামে যে ধারণা প্রচলিত, এই দুই ধারণাকে তারা জগাখিচুড়ি করে ফেলে। ইসলামী জীবনাদর্শ মোতাবেক দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। আর ইহকালীন জীবনের বিশুদ্ধতা অর্জন, দুষ্কৃতি ও অপরাধের উচ্ছেদ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একাধিপত্যকে আগ্রাসনমুক্ত করা, পৃথিবী থেকে খোদাদ্রোহীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য উৎখাত করা এবং সকল মানুষের জন্যে ন্যায়বিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জেহাদ পরিচালনা করা আখেরাতেরই সম্বল। এ সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত জেহাদকারীদের জন্যে জান্নাতের পথ উন্মুক্ত করে এবং বাতিলের সাথে তারা যা কিছু ক্ষয়ক্ষতি ও কষ্ট স্বীকার করেছে, তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়।

সুতরাং যারা উপরোক্ত আকীদা ও ধ্যান ধারণা পোষণ করে, তারা কেমন করে পার্থিব জীবনের কর্মকান্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলতে পারে? জীবনটা ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে যাক, যুলুম, শোষণ, উৎপীড়ন ও নৈরাজ্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হোক, কিংবা উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে পিছিয়ে থাক– এটা কেমন করে বরদাশত করতে পারে? যারা আখেরাতে বিশ্বাসী এবং সেখানে আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিদান প্রত্যাশী, তারা কেমন করে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে?

মুসলমান হবার দাবীদার হয়েও যারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক ভূমিকা অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতি, অপরাধ, অত্যাচার, আগ্রাসন, মুর্খতা, অজ্ঞতা, ও পশ্চাৎপদতা তাদের দুনিয়ার জীবনকে চতুর্দিক থেকে গ্রাস করা সত্তেও যারা সে সব কিছুকে চোখ বুজে হজম করে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা বিকৃত এবং আখেরাতের প্রতি তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে বলেই তারা এরূপ করে। তাদের যদি আখেরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর চেতনা ও ইসলামের ব্যাপারে সঠিক উপলব্ধি থাকতো, তাহলে তারা পৃথিবীতে বৈরাগ্যবাদী ও সংসার বিমুখ বা পশ্চাদমুখী জীবন যাপন করতে পারতো না কিংবা চারপাশে অত্যাচার, অনাচার, দুর্নীতি ও অরাজকতা দেখেও তাকে বরদাশত করতে পারতো না।

একজন মুসলমান দুনিয়ার জীবন যাপন করে এই প্রত্যয় ও অনুভূতি নিয়ে যে, সে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জীব ও সৃষ্টির সেরা। সে দুনিয়ার পবিত্র জিনিসগুলোকে কখনো উপভোগ করে কখনো কৃচ্ছতা বশত পরিহার করে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই তাকে ইহকালে হালাল ও পরকালে দায়মুক্ত বলে জানে। সে পার্থিব জীবনের মানোন্নয়ন ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে করায়ত্ব করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। কেননা সে পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে এটাকে সে নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে। সে অন্যায়, অত্যাচার, দুষ্কৃতি ও অরাজকতাকে অনেক ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে এমনকি শাহাদাত লাভের বিনিময়েও প্রতিরোধ করে। এসব কিছু সে শুধু আখেরাতে প্রতিদান পাওয়ার আশায়ই করে। কেননা ইসলাম থেকেই সে এই শিক্ষা পেয়েছে, যে, দুনিয়া আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র স্বরূপ। বস্তুত, আখেরাতে পৌঁছার এমন কোনো পথই নেই যা দুনিয়ার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে না। দুনিয়া যতো ছোট ও নগণ্য হোক না কেন, তা আল্লাহর সেই নেয়ামত, যার মাধ্যমে আল্লাহর বৃহত্তর নেয়ামতের কাছে পৌঁছা যায়।

ইসলামী বিধানের প্রতিটি খুটিনাটি বিধি প্রধানত, আখেরাতের কল্যাণের লক্ষ্যেই নিবেদিত। সেই সাথে চিন্তার ক্ষেত্রে প্রশস্ততা, সৌন্দর্য ও মহত্ব, নৈতিকতার ক্ষেত্রে ঔদার্য, পবিত্রতা ও বদান্যতা, হকের ব্যাপারে কঠোরতা, অনমনীয়তা ও আত্মসংযম এবং মানবিক কর্মকান্ডে বিশ্বস্ততা, সততা ও সংকল্পের দৃঢ়তা সৃষ্টি করাও এর লক্ষ্য।

এসব কারণেই আখেরাতের প্রতি অটুট বিশ্বাস ছাড়া কারো ইসলামী জীবন নিখুঁতভাবে গড়ে উঠতে পারে না। আর এ কারণেই কোরআনে আখেরাত সম্পর্কে এত তাগিদ দেয়া হয়েছে।

জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতার যুগে আরবদের কল্পনা শক্তি, অনুভব শক্তি ও চিন্তাশক্তি অজ্ঞতা ও মুর্খতাবশতই এতো সংকীর্ণ ছিলো যে, তারা দৃশ্যমান এই পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন এবং এই জগত ছাড়া আর কোনো জগত থাকার কথা ভাবতেই পারতো না, চিন্তা করতে পারতো না মানব সত্ত্বার আয়ুষ্কাল এই পৃথিবীর জীবনকালের বাইরে কিভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে। বলতে গেলে, এদিক দিয়ে তাদের আবেগ অনুভুতি ও কল্পনা ইতর পশু পাখীর সমপর্যায়ের। অনুরূপভাবে, তাদের মান ও বর্তমান 'বৈজ্ঞানিক' জাহেলিয়াতের ধারক বাহকদের মান একই পর্যায়ের।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা বলে দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং আমাদের পুনরুত্থিত হবার কোনোই অবকাশ নেই।'

আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, এ ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো উন্নত ও মহৎ মানবোচিত জীবন তৈরী হতে পারে না। তিনি জানতেন যে, মানুষের কল্পনাশক্তি ও অনুভবশক্তির এই সংকীর্ণতা তাকে দুনিয়ার দাসানুদাস বানিয়ে দেবে এবং ইতর প্রাণীর ন্যায় তার চিন্তাশক্তিকে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের অধীন করে দেবে। স্থান ও কালের এই সংকীর্ণ পরিসর মানুষকে কেবল প্রবৃত্তির লালসা ও ত্যাগের সামগ্রী নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে থাকতে প্ররোচিত করবে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ বস্তু অর্জনের পাশবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দাসত্বের অক্টোপাসে আবদ্ধ করবে। প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও লালসাকে সীমাহীন ও সংযমহীন বানিয়ে দেবে এবং এগুলোর পেছনে পশুর ন্যায় উদ্দাম ও উন্মত্ত হয়ে ছোটাকে অনিবার্য করে তুলবে। আর আখেরাতে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে পৃথিবীতে যে সংকীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তাতে কোনো ন্যায় বিচার, কোনো দয়া-সহানুভূতির অস্তিত্ব থাকবে না। অস্তিত্ব থাকবে শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যুদ্ধ, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত এবং জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও কলহের। সেই সমাজটা হবে একটা জংলী সমাজের মতো এবং তাতে বসবাসকারীরা হিংস্র হায়েনার মতো জীবন যাপন করবে যেমনটি আজকালকার 'সভ্যতায়' আমরা সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুই জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, যে জাতিকে তিনি সমগ্র মানব জাতির তত্ত্বাবধায়ক ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করেছেন শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, মানবীয় মহত্ত্ব ও মহানুভবতা যেন বাস্তব আকারে আত্মপ্রকাশ করে, সে জাতি তার এই সুমহান দায়িত্ব কখনো পালন করতে পারবে না, যদি না তার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকে উক্ত সংকীর্ণ পরিসর থেকে বের করে এনে বিশালতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যদি না শুধু দুনিয়ার জীবনের সংকীর্ণ পরিসর থেকে বের করে এনে দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মিলিত সুবিশাল প্রান্তরে এনে দাড় করানো হয়। এ কারণেই আখেরাতের বিষয়টির ওপর এতো গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমত এ কারণে যে, আখেরাত একটি চরম সত্য ও অকাট্য বাস্তবতা। আর আল্লাহ তায়ালা সত্য ও বাস্তবতা নিয়েই আলোচনা করে থাকেন। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধনের জন্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন নয়। বরং নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ হিসাবেও এবং আইন ও বিধান হিসাবেও।

এজন্যেই সূরার এই অংশটিতে এমন তীব্র আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও মানবহৃদয়ে শিহরণ আনয়নকারী তরংগমালার সাক্ষাত পাই, যা তার বিবেকে প্রবল ঝাঁকুনি দেয় ও জাগরণ সৃষ্টি করে। যেমন,

'যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। তিনি বলবেন, কি হে, 'এটা সত্য নয় কি?' তারা বলবে, 'হাঁ, সত্য, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।' তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে, তোমাদের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের ফল স্বরূপ এখন আযাবের মজা ভোগ করো।'

বস্তুত, এ হচ্ছে ওই সব লোকের পরিণতি, যারা বলেছিলো, 'দুনিয়ার জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই এবং আমাদের পুনরুত্থিত হতে হবে না।'

এ হচ্ছে তাদের চরম অবমাননাকর অবস্থা। যে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার কথা তারা স্বীকারই করতো না, সেই আল্লাহর সামনে তাদেরকে অবরোধ করে রাখা হবে। যেন ওই অবস্থায় তাদের ঘাড় ধরে জিজ্ঞাসা করা হবে,

'কিহে, এটা সত্য কিনা?'

এই প্রশ্নটাই যে কত বড় অপমানজনক, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

তারা বলবে, 'হাঁ, সত্য, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।'

অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়েই তারা এভাবে তাঁর স্বীকৃতি দেবে। অতপর আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে যে, 'ঠিক আছে, তোমরা নিজেদের কুফরীর ফল স্বরূপ শাস্তির মজা ভোগ করো।'

এ হচ্ছে সেই সব সৃষ্ট জীবের পরিণতি, যারা প্রশস্ততর মানবীয় চিন্তাধারাকে অস্বীকার করেছিলো এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য চিন্তার সংকীর্ণ গর্তে আটকা পড়েছিলো, যারা মানবতার উচ্চতর শিখরে আরোহণ করার পরিবর্তে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো এবং সেই হীন ও নীচ চিন্তাধারার ভিত্তিতে আপন জীবন গড়েছিলো ও জীবন যাপন করেছিলো। এই সব মানুষের হীন মানসিকতাই তাদের জন্যে আযাবকে অনিবার্য করে তুলেছিলো এবং এটাই আখেরাতে কাফেরদের সমুচিত পরিণতি। নীচ চিন্তার পরিণতিতে নিকৃষ্ট মানের জীবন আখেরাত অস্বীকারকারীদের জন্যেই মানানসই বটে!

ওপরে বর্ণিত দৃশ্যটির বর্ণনা সম্পূর্ণ করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে আসছে ত্রাস সঞ্চারকারী আরেকটি বিবরণ,

'সর্বনাশ হয়ে গেছে তাদের, যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের বিষয়টা অস্বীকার করেছিলো। অবশেষে যখন আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা বলবে, হায় আফসোস, কেন যে এতো অবহেলা করতাম।'

এটা যথার্থই চরম সর্বনাশ। দুনিয়ার সর্বনাশ এই হিসাবে যে, সেখানে কুফরীজনিত এতো নিম্নমানের জীবন যাপন করে এসেছে। আর আখেরাতের সর্বনাশ কি রকম, তাতো একটু আগেই দেখে এলাম। বিশেষত, কেয়ামতের এমন আকস্মিক আগমন যে, এই উদাসীনেরা তা ধারণাই করেনি!

অবশেষে যখন কেয়ামত তাদের ওপর আকস্মিকভাবে এসে পড়বে, তারা বলবে, হায় আফসোস, কেন আমরা অবজ্ঞা করেছিলাম...........'

এরপর তাদেরকে ভারবাহী পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

'তারা তাদের পিঠের ওপর বোঝা বহন করে আসবে।'

পশুরা বরঞ্চ তাদের চেয়ে ভালো। পশুরা তো বিভিন্ন মালপত্রের বোঝা বহন করে। কিন্তু এরা বহন করবে পাপের বোঝা। পশুরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর তাদের বোঝা নামিয়ে নেয়া হয়। অতপর তারা বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু কাফেররা পাপের বোঝা নিয়ে জাহান্নামে চলে যাবে, আর পেছন থেকে তাদেরকে তাদের গুনাহর জন্যে ধিক্কার দেয়া হতে থাকবে।

'তারা বড়ই খারাপ বোঝা বহন করবে।'

এই বিপুল ক্ষতিকর ও সর্বনাশা দৃশ্যের পর আসছে আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় দুনিয়া ও আখেরাতের সত্যিকার মূল্যায়ন সম্বলিত মন্তব্য।

'দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছু নয়............।'

এ হচ্ছে আল্লাহর মানদন্ডে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের চূড়ান্ত ও সার্বিক মূল্যায়ন। এই গ্রহের একটি ঘন্টাকে যদি সেই অনন্তকালীন অসীম জগতের অফুরন্ত জীবনের সাথে তুলনা করতে হয়, তবে এভাবেই করা সম্ভব। এই জগতের একটি মুহূর্তের তৎপরতাকে যখন সেই অনন্তকালের গুরুগম্ভীর মহাকালের সাথে তুলনা করা হয়, তখন এটিকে একটি খেলা বা তামাশা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

এটা একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন। কিন্তু এ দ্বারা একথা বুঝায় না যে, ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে দুনিয়ার এই জীবনের কোনোই গুরুত্ব নেই এবং তাকে একবারেই পরিত্যাগ করে সংসার বিরাগী হতে হবে।

'যুহদ' (দুনিয়া বর্জন) ও 'তাসাওউফ' পন্থীদের কোনো কোনো আন্দোলনসহ যে সব বৈরাগ্যবাদী, নেতিবাচক ও কর্মবিমুখ তৎপরতা বিভিন্ন সময় চলেছে, তা আদৌ ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালা থেকে উৎসারিত নয়। ওগুলো নিছক খৃষ্টীয়, পার্সিক ও গ্রীক ধর্মতত্ত্ব থেকে উদগত মতবাদ, যা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে।

ইসলামী নীতিমালার পূর্ণাংগ প্রতিফলন যে মহৎ দৃষ্টান্তগুলোতে দেখতে পাই, তার কোনোটাই নেতিবাচক, বৈরাগ্যবাদী বা দুনিয়া বর্জনমূলক নয়। সাহাবায়ে কেরামের গোটা প্রজন্মই ছিলো এ রকম। তাঁরা আশেপাশের পৃথিবীর জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা থেকে যেমন শয়তানের দোর্দন্ড প্রতাপকে উৎখাত করেছিলেন, তেমনি শয়তানী প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করেছিলেন তাদের মনমগজ ও প্রবৃত্তি থেকেও। তৎকালীন সাম্রাজ্যগুলোতে আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহর বান্দাদের সার্বভৌমত্ব বিরাজ করার কারণেই ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবন শয়তানের এই নোংরা প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলো। সেই নোংরা প্রভাব উচ্ছেদকারী সাহাবায়ে কেরামের এই মহান প্রজন্মটি একদিকে যেমন আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় নির্ণীয় ইহকালীন জীবনের যথার্থ ও প্রকৃত মূল্য কী, তা উপলব্ধি করতেন, তেমনি দুনিয়ার কর্মময় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা আখেরাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিরাট বিরাট কাজ সম্পন্ন করতেন।

দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে আল্লাহর এই মূল্যায়ন দ্বারা তারা বুঝেছিলেন যে, তারা দুনিয়ার গোলাম নন। তারা দুনিয়ার ওপর সওয়ার হয়েছিলেন, দুনিয়া তাদের ওপর সওয়ার হয়নি। দুনিয়াকে তারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত ও পদানত করেছিলেন। দুনিয়া তাদেরকে তার অনুগত ও পদানত করতে পারেনি। পৃথিবীতে তারা আল্লাহর প্রতিনিধি রূপে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং এই দায়িত্বের দাবী অনুসারে দুনিয়ার বিপুল উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন করেছিলেন। কিন্তু এ সব কাজ দ্বারা তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্য চাইতেন। ফলে তারা দুনিয়াপূজারীদেরকে দুনিয়ার জীবনেও পরাভূত করেছেন, আখেরাতেও পরাজিত করেছেন।

আখেরাত একটা অদৃশ্য জগত। কাজেই তার ওপর ঈমান আনতে পারা চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির প্রশস্ততারই প্রমাণ। এটা বুদ্ধিবৃত্তির তিক্ষ্ণতার লক্ষণ। আখেরাতের জন্যে কাজ করা সংযমীদের জন্যে কল্যাণকর এবং এটা একমাত্র বুদ্ধিমান লোকদের কাছেই সুবিদিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আখেরাতের জীবনই মোত্তাকীনদের জন্যে কল্যাণকর। তোমরা কি এ কথা বুঝবে না?'

বস্তুত, আজ যারা আখেরাতকে অদৃশ্য এই অজুহাতে অস্বীকার করে, তারা নিজেদেরকে যতোই জ্ঞানী মনে করুক, আসলে তারা মূর্খ। তারা যে জ্ঞানের দাবী করে, তাতো মানুষের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভূত। (পরবর্তীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে) এই জ্ঞানের কাছে আজ পর্যন্ত একমাত্র অদৃশ্য ও অজানা তত্ত্ব ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়নি। (আয়াত ৩৩-৩৯)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

৩৩. (হে রসূল,) আমি জানি, এ লোকগুলো যেসব কথাবার্তা বলে, তা তোমাকে (বড়োই) পীড়া দেয়, কিন্তু তুমি কি জানো, এরা (এসব বলে শুধু) তোমাকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করছে না; বরং এ যালেমরা (এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার আয়াতকেই অস্বীকার করছে। ৩৪. তোমার আগেও (এভাবে) বহু (নবী)-রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ও (নানা রকম) নির্যাতন চালাবার পরও তারা (কঠোর) ধৈর্য ধারণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার (পক্ষ থেকে) সাহায্য এসে হাযির হয়েছে। আসলে আল্লাহর কথার রদবদলকারী কেউ নেই, তদুপরি নবীদের (এ সব) সংবাদ তো তোমার কাছে (আগেই) এসে পৌঁছেছে। ৩৫. (তারপরও) যদি তাদের এ উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর মনে হয়, তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি (পালানোর জন্যে) ভূগর্ভে কোনো সুড়ংগ কিংবা আসমানে সিঁড়ি তালাশ করো, (পারলে 'সেখানে চলে যাও) এবং (সেখান থেকে) তাদের জন্যে কোনো কিছু একটা নিদর্শন নিয়ে এসো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তিনি তাদের সবাইকে হেদায়াতের ওপর জড়ো করে দিতে পারতেন, তুমি কখনো মূর্খ লোকদের দলে শামিল হয়ো না। ৩৬. যারা (এ কথাগুলো যথাযথভাবে) শোনে, তারা অবশ্যই (আল্লাহর) ডাকে সাড়া দেয় এবং যারা মরে গেছে আল্লাহ্ তায়ালা এদের সবাইকেও কবর থেকে উঠিয়ে (জড়ো করে) নেবেন, অতপর (মহা বিচারের জন্যে) তারা সবাই তাঁর সামনে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৩৭. এরা বলে, (নবীর) ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের কথামতো) কোনো নিদর্শন নাযিল করা হয়নি কেন? (হে রসূল,) তুমি তাদের বলো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব ধরনের) নিদর্শন পাঠানোর ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তো কিছু জানে না।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾

৩৮. যমীনের বুকে বিচরণশীল যে কোনো জন্তু কিংবা বাতাসের বুকে নিজ ডানা দুটি দিয়ে উড়ে চলা যে কোনো পাখীই (তোমরা দেখো না কেন)– এগুলো সবই তোমাদের মতো (আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি); আমি (আমার) গ্রন্থে বর্ণনা বিশ্লেষণে কোনো কিছুই বাকী রাখিনি, অতপর এদের সবাইকে (একদিন) তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে। ৩৯. যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা (হেদায়াতের ব্যাপারে) বধির ও মূক, তারা অন্ধকারে পড়ে আছে; আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করে দেন; আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথের ওপর স্থাপন করেন।

তাফসীর

আয়াত ৩৩-৩৯

সূরার এই অংশটিতে আলোচনার মোড় স্বয়ং রসূল (স.)-এর দিকে ঘুরে গেছে। শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর মনকে প্রবোধ দিয়েছেন। সর্বজন বিদিত সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হওয়া সত্তেও জনগণ তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করায় তাঁর মনে যে দুঃখ পুঞ্জীভূত ছিলো, তা দূর করার জন্যেই এই সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়া হয়েছে। আসলে তারা তাঁকে মিথ্যুক মনে করতো না। তারা শুধু আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতে বদ্ধপরিকর ছিলো। এর কারণ ছিলো ভিন্ন, তাঁকে মিথ্যুক মনে করা এর কারণ ছিলো না। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরকেও কাফেররা মিথ্যুক সাব্যস্ত করে কষ্ট দিতো, এ কথা উল্লেখ করেও রসূল (স.)-কে প্রবোধ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই নবীরা পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন। অবশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসতো। আল্লাহর চিরন্তন নীতি অনুসারে এ সাহায্য আসতো। এই নীতি ছিলো অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। এভাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সান্ত্বনা প্রদান শেষ করে পুনরায় রসূল (স.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে ইসলামী আন্দোলন সংক্রান্ত বৃহত্তম সত্য কী, তা অবহিত করা হয়েছে। আল্লাহর শাশ্বত রীতি অনুসারে এবং তাঁর পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক হয়ে ইসলামের প্রচার কার্য চলে আয়াতের মাধ্যমে তা আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচারক বা আহবায়ককে কেবল ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে হয় না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এই প্রচার কার্যের সার্বিক ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করে থাকেন। দাওয়াতদাতাকে আদেশ অনুসারে শুধু দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। কোনো রকম তাড়াহুড়ো করারও প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহকে এ ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা প্রস্তাব দেয়ারও কোনো দরকার নেই। এমনকি

দাওয়াতদাতা যদি স্বয়ং একজন রসূল হন তবুও নয়। যারা ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের বা সাধারণ মানুষেরও কোনো প্রস্তাবে কর্ণপাত করা চলবে না। যাদের বিবেক সজীব আছে, তারা দাওয়াতকে অবশ্যই শুনবে ও গ্রহণ করবে। আর যাদের বিবেক মরে গেছে, তারা গ্রহণ করবে না। তাদের অন্তরকে সজীব করবেন– না কেয়ামত পর্যন্ত মৃতই রাখবেন, সেটা আল্লাহর বিবেচ্য বিষয়।

কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র

পূর্ববর্তী জাতিগুলোর বেলায় যেমন অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানো হতো, মক্কার কোরায়শরাও সে রকম অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চেয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এটা ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এই জাতির বেলায় তিনি তা করতে চান না, তা তিনিই ভালো জানেন, কিন্তু এতে তারা যদি অস্বীকারই করতে থাকে এবং রসূল (স.)-এর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে, তা হলে রসূল (স.) স্বীয় মানবীয় শক্তি সামর্থ নিয়ে যদি পারে অলৌকিক কান্ড ঘটাতে চেষ্টা করুক। আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টির সেরা তাদের সৃষ্টির রহস্য এবং প্রত্যেক সৃষ্টির আলাদা আলাদা স্বভাব মেজাজ ও গুণ বৈশিষ্ট্য থাকার সূক্ষ্ম ও মহৎ উদ্দেশ্যটা কী, তা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর জানা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের এই মহৎ ও সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যের আলোকেই তিনি যাকে ইচ্ছে সুপথ দেখান, যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন, আর অস্বীকারকারী মানুষদেরকে অন্ধকারে বধির ও বোবা বানিয়ে রেখে দেন।

'আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা যা বলে, তা তোমাকে ব্যথিত করে।' (আয়াত ৩৩)

জাহেলী যুগের আরব পৌত্তলিকরা বিশেষত কোরায়শদের যে শ্রেণীটি ইসলামী দাওয়াতের কঠোর বিরোধিতা করতো, তারা ব্যক্তি হিসেবে মোহাম্মদ (স.)–এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ পোষণ করতো না। কেননা তারা তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলেই জানতো। নবুওত লাভের পূর্বে তিনি তাদের মধ্যেই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি একটি মিথ্যা কথাও বলেছেন বলে কেউ শোনেনি। অনুরূপভাবে, বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী শ্রেণীটি তাঁর নবুওতের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করতো না, কোরআন যে আল্লাহর বাণী এবং কোনো মানুষ যে এ ধরনের বাণী রচনা করতে পারে না, তাও অবিশ্বাস করতো না।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা রসূল (স.)-এর দাওয়াতকে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে রাযী ছিলো না। তাদের এই রাযী না হওয়ার কারণ এটা ছিলো না যে, তারা রসূল (স.)-কে মিথ্যুক মনে করতো। বরং এর আসল কারণ ছিলো এই যে, তাঁর দাওয়াতে তারা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ তথা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বিনষ্ট হবার আশংকা করতো। আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা ও শেরকের ওপর জিদ ধরার পেছনে তাদের এটাই ছিলো একমাত্র কারণ।

কোরায়শদের এই মনোভাবের প্রকৃত কারণ ও কোরআন সম্পর্কে তাদের প্রকৃত মনোভাব কী ছিলো, সে সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু সুফিয়ান, আবু জাহল ও আখনাস বিন শুরাইক একদিন গভীর রাত্রে যখন রসূল (স.) নিজ বাড়ীতে নামায পড়ছিলেন, তখন তাঁর কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। প্রত্যেকে রসূল (স.)-এর বাড়ীর পাশে সুবিধে মতো একটা জায়গা দেখে বসে পড়লো। কিন্তু এদের একজন অপরজনের উপস্থিতির কথা জানতো না। সারা রাত তারা শুনলো। ফজর হয়ে গেলে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হয়ে গেলো। পথিমধ্যে তাদের পরস্পরের সাথে দেখা হয়ে গেলে প্রত্যেকে পরস্পরকে তিরস্কার করলো। বললো, এভাবে আর

কখনো এস না। অন্য লোকেরা যদি দেখে ফেলে তাহলে তাদের মনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। তারপর সবাই চলে গেলো। পরবর্তী রাতে এই তিনজনের প্রত্যেকে আবার গোপনে চলে এলো এবং সারা রাত ধরে কোরআন পাঠ শুনলো, ভোর হয়ে গেলে বাড়ী ফেরার পথে তারা পুনরায় পরস্পরের মুখোমুখি হলো। আবারো পরস্পরকে পূর্বের মতো ভর্ৎসনা করে সবাই চলে গেলো। তৃতীয় দিনেও একই রকম ঘটনা ঘটলো। ভোর বেলা বাড়ী ফেরার পথে যখন পরস্পর মিলিত হলো, তখন তিনজনেই বললো, 'আজ আর এভাবে চলে যাবো না। এসো আগে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এখানে আর আসবো না, তারপর বাড়ি ফিরবো।' তিন জনেই এই প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি ফিরলো। পরদিন সকালে আখনাস বিন শুরাইক লাঠি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে। গিয়ে বললো, 'আবু সুফিয়ান, আমাকে বলো, মোহাম্মদের কাছে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী?'

আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহর কসম, আখনাস, যা যা শুনেছি তার কতোকটা তো আমি জানি এবং তার অর্থও বুঝি। কিন্তু আর কতোকটা জানিও না, তার অর্থও বুঝি না। আখনাস বললো, আমার অবস্থাও একই রকম। আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে বেরিয়ে তারপর সে আবু জাহলের কাছে গেলো। সেখানে দুজনের মধ্যে নিম্নরূপ আলাপ হলো—

আখনাস: আবুল হিকাম! মোহাম্মদের কাছে যা শুনলে, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? সে বললো, আমরা বনু আবদ মানাফের সাথে মান মর্যাদা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতাম। তারা ভোজের আয়োজন করলে আমরাও করতাম। সামাজিক দায় দায়িত্ব বহন করলে আমরাও তা বহন করতাম। তারা দান করলে আমরাও করতাম। শেষ পর্যন্ত যখন সওয়ারী জন্তু জানোয়ারের ব্যাপারেও পাল্লা দিয়ে টিকে গেলাম, তখন তারা বলে বসলো যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি করে তাদের সাথে সমতা অর্জন করি? তাই আল্লাহর কসম, ওদের ওই নবীর প্রতি আমরা কখনো ঈমান আনবো না এবং কখনো তাকে সমর্থন করবো না। এ কথা শুনে আখনাস সেখান থেকে চলে এলো।

ইবনে জরীর আয়াত নং ৩৩ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আখনাস বিন শুরাইক বনু যোহরা গোত্রকে বললো, হে বনু যোহরা গোত্রের সদস্যবৃন্দ! মোহাম্মদ তো তোমাদের ভাগ্নে। ভাগ্নের আক্রমণ প্রতিরোধে তোমাদেরই অগ্রাধিকার। সে যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকে, তাহলে আজ তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করবে না। কিন্তু যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে (অর্থাৎ নবী না হয়ে থাকে), তাহলে ভাগ্নের আক্রমণ ঠেকানো সর্বাগ্রে তোমাদেরই কর্তব্য। একটু থামো আমি আগে আবুল হিকামের (আবু জাহল) সাথে দেখা করে আসি। মোহাম্মদ যদি জয়লাভ করে, তাহলে তো তোমরা নিরাপদেই ফিরে আসবে। আর যদি মোহাম্মদ হেরে যায়, তাহলে তোমাদের স্বজাতি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। (উল্লেখ্য যে, বনু যোহরা গোত্রটি মদীনায় মুসলমানদের মিত্র ও রসূল (স.)-এর মাতুল ছিলো।) এই দিনই তার নাম হয় আখনাস (কুপ্ররোচনাদানকারী)। তার আসল নাম ছিলো উবাই। আখনাস আবু জাহলের কাছে গিয়ে নিভৃতে বললো, আবুল হিকাম। মোহাম্মদ সম্পর্কে আমাকে আসল রহস্যটা জানাও। সে কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এখানে তুমি আর আমি ছাড়া আর কোনো কেরায়শী নেই যে আমাদের কথা শুনে ফেলবে। আবু জাহল বললো, দূর বোকা! মোহাম্মদ তো সত্যবাদী। মোহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু কথা হলো, বনু কুসাই (অর্থাৎ কোরায়শের ওই শাখাটি, যে শাখায় মোহাম্মদের জন্ম) যদি হাজীদের আশ্রয় দেয়া, পানি খাওয়ানো, কাবার মুতাওয়াল্লীগিরী— সব

কিছুর অধিকার পাওয়ার পর আবার নবুওততও পেয়ে যায়, তাহলে বাদ-বাকী কোরায়শদের আর থাকবেটা কী? এখান থেকেই উক্ত আয়াতের এ অংশটির প্রকৃত মর্ম বুঝা যায়, 'আসলে তারা তোমাকে মিথ্যুক বলে না, বরং ওই যালেমরা আল্লাহর আয়াতকেই মিথ্যা ঠাওরায়।'

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, এই সূরা যখন মক্কী, তখন নিসন্দেহে আলোচ্য আয়াতও মক্কী আয়াত। অথচ উক্ত ঘটনাটা বদর যুদ্ধের দিন মদীনায় সংঘটিত হয়েছিলো। তবে আমরা যেহেতু জানি যে, মুফাসসেররা যখন কোনো আয়াতের সাথে কোনো ঘটনার উল্লেখ করেন, তখন অনিবার্যভাবে এ কথা বুঝান না যে, ওই আয়াত ওই ঘটনার কারণেই নাযিল হয়েছে। বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, আয়াতটির বক্তব্য ওই ঘটনায় প্রযোজ্য, চাই ঘটনাটা ওই আয়াত নাযিল হবার আগে ঘটুক বা পরে। সুতরাং আলোচ্য বর্ণনা আমার মতে কোনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে না।

ইবনে ইসহাক বলেন, একবার বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা ওতবা বিন রবীয়া কোরায়শদের একটি বৈঠকে বসে ছিলো। সেই সময়ে মাসজিদুল হারামে রসূল (স.)ও একাকী বসে ছিলেন। উৎবা বললো, 'হে কোরায়শ জনতা, আমি একবার মোহাম্মদের সাথে দেখা করতে চাই এবং তাঁর সাথে কিছু কথা বলতে চাই। আমি তাঁর কাছে কতকগুলো প্রস্তাব দেব। সে হয়তো ওই প্রস্তাবগুলোর কোনো কোনোটা গ্রহণ করবে এবং কোনো কোনোটা প্রত্যাখ্যান করবে। সে যা চাইবে আমরা তাকে তাই দেবো। এতে যদি সে আমাদেরকে তার দাওয়াত থেকে অব্যাহতি দেয়, তা হলে ভালোই হবে। তোমরা কী মনে করো?' এ সময় হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কোরায়শরা দেখতে পাচ্ছিলো যে, রসূল (স.)-এর সাথীর সংখ্যা হুহু করে বেড়ে চলেছে। তাই সবাই একমত হয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। কথা বলো।' ওৎবা তৎক্ষণাত চলে গেলো এবং গিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে বসলো। তারপর বললো, 'ভাতিজা! শোনো। আমাদের গোত্রে ও আপনজনদের মধ্যে তুমি যে কতোখানি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছ, তা তোমার অজানা নয়। তুমি তোমার জাতির কাছে এমন একটা গুরুতর জিনিস নিয়ে এসেছো, যাতে তুমি তাদের সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেছো, তাদের স্বপ্ন ও আশা-আকাংখাকে ধূলিসাত করে দিয়েছো, তাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর নিন্দা করেছো এবং তাদের মৃত বাপ দাদাদেরকে কাফের বলেছো। এখন আমি তোমার কাছে কয়েকটা প্রস্তাব তুলে ধরছি, শোনো। এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো। হয়তো এর কোনো না কোনোটা তুমি মেনে নিতে পারবে। রসূল (স.) উৎবাকে বললেন, বলুন, আমি শুনছি। সে বললো, ভাতিজা, তুমি যে নতুন ধর্মমত নিয়ে এসেছো, তার উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে ধন সম্পদ অর্জন, তাহলে আমরা তোমার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করে তোমাকে আমাদের সবার চেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দেবো। আর যদি তুমি সম্মান ও পদমর্যাদা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের এমন নেতায় পরিণত করবো যে, তোমাকে ছাড়া আমরা কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেবো না। আর যদি তুমি রাজা হতে চাও, তবে আমরা তোমাকে রাজা বানিয়ে নেবো। আর যদি ব্যাপারটা এই হয়ে থাকে যে, তোমার কাছে যে জ্বিনটা আসে, তাকে তুমি দেখতে পাও এবং তাকে তোমার কাছ থেকে দূর করতে চাও, কিন্তু দূর করতে পারো না, তাহলে আমরা তোমার জন্যে উপযুক্ত চিকিৎসকদেরকে ডাকবো এবং তুমি আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত আমরা তোমার পেছনে যতো অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হয় করবো। কেননা অনেক সময় এমনও হয়ে থাকে যে, কোনো মানুষ যে জিনকে বশীভূত করে, তা তার মনিবের ওপর প্রবল হয়ে যায় এবং চিকিৎসা ছাড়া তার কবল থেকে মুক্তি পায় না।'

এতোক্ষণ রসূল (স.) ওৎবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। অতপর বললেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? ওতবা বললো, হাঁ। রসূল (স.) বললেন, এবার তাহলে আমার কথা শুনুন। ওৎবা বললো, আচ্ছা, বলো দেখি। রসূল (স.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা হা-মীম সাজদার (৪২ নং সূরা) শুরু থেকে পড়া শুরু করলেন। ওতবা গভীর মনোযোগের সাথে নিস্তব্ধ হয়ে পেছনে দু'হাত রেখে তার ওপর হেলান দিয়ে বসে শুনতে লাগলো। পড়তে পড়তে রসূল (স.) সেজদার আয়াত পর্যন্ত। (আয়াত ৩৮) গিয়ে থামলেন এবং সেজদা করলেন। অতপর তিনি বললেন, 'ওহে আবুল ওলীদ! যা শুনবার তাতো শুনলেনই। এখন যা করবার আপনি করুন।' উৎবা উঠে তার সাথীদের কাছে চলে গেলো। দূর থেকে তাকে দেখেই কোরায়শ নেতারা একে অপরকে বলতে লাগলো, ওৎবা যে চেহারা নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলো, এখন তা বদলে গেছে। যখন সে তাদের কাছে এলো, তখন সবাই বললো, তোমার হয়েছে কি হে আবুল ওলীদ? (আবুল ওলীদ ওতবার পারিবারিক নাম) সে বললো, আল্লাহর শপথ, আমি এমন বাণী শুনে এসেছি যা আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, ওটা জাদুও নয়, কবিতাও নয়, জ্যোতির্বিদদের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। হে কোরায়শ জনতা, তোমরা আমার কথা শোনো এবং আনুগত্যকে আমার জন্যে নির্দিষ্ট করো। এই লোকটাকে (মোহাম্মদ (স.)-কে) ওর কাজ নিয়ে থাকতে দাও। তোমরা ওর ব্যাপারে মাথা ঘামিও না। আল্লাহর কসম, আমি ওর যে সব কথাবার্তা শুনেছি, তা একদিন চমক সৃষ্টি করবেই এবং সাড়া জাগাবেই। তারপর আরবরা যদি তোমাদের সাহায্য না নিয়েই ওর তৎপরতা থামিয়ে দেয়, তাহলে ভালোই হবে। তোমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমস্যাটা মিটে যাবে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে সে যতো সম্পদের মালিক হবে, তার মালিক তোমরাও হবে, সে যতো মান সম্মানের অধিকারী হবে, তোমরাও ততো মান সম্মানের অধিকারী হবে। তোমরা তাঁর সাথে মিলিত হয়ে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারবে। সবাই বললো, আল্লাহর কসম, হে আবুল ওলীদ, মোহাম্মদ শেষ পর্যন্ত তোমাকেও জাদু করেছে। ওতবা বললো, আমি যা বুঝেছি তা তোমাদেরকে বললাম। এখন তোমরা যা ভালো মনে করো, করতে পারো।

ইমাম বাগাবী তার তাফসীরে একটি হাদীস উদ্বৃত করেছেন। ওই হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূল (স.) সূরা হা-মীম সাজদার শুরু থেকে তেলাওয়াত করতে করতে যখনই ১৪ নং আয়াতের এই কথাগুলো পাঠ করতে লাগলেন, 'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও যে, আমি তোমাদেরকে আ'দ ও সামুদের বিকট শব্দের ন্যায় আরেকটি বিকট শব্দের ব্যাপারে সাবধান করলাম।' অমনি ওৎবা তাঁর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে আত্মীয়তার দোহাই পেড়ে আর না পড়তে অনুরোধ করলো। অতপর সে কোরায়শদের কাছে না গিয়ে সরাসরি নিজের পরিবার পরিজনের কাছে চলে গেলো এবং সেচ্ছায় গৃহবন্দীর মতো হয়ে রইলো। তারপর যখন কোরায়শদের সাথে দেখা করে ঘটনা জানালো, তখন বললো যে, 'আমি মোহাম্মদের মুখে হাত চাপা দিলাম এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাকে থামতে বললাম। তোমরা তো জানোই যে, মোহাম্মদ রাখনো মিথ্যা বলে না, তাই ওই আয়াত পড়ার সময় আমার আশংকা হচ্ছিলো যে, তোমাদের ওপর আ'দ ও সামুদের মতো আযাব নাযিল হয় কি না।

ইবনে ইসহাক বলেন, কোরায়শদের একটি দল হজ্জের মওসুম আসন্ন দেখে তাদের মধ্যকার অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ওলীদ বিন মুগীরার কাছে সমবেত হলো। ওলীদ তাদেরকে বললো, হে কোরায়শ জনতা! হজ্জের মওসুম সমাগত। এ সময়ে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজন

তোমাদের কাছে আসবে। তারা তো ইতিমধ্যে মোহাম্মদের ব্যাপার-স্যাপারও শুনে ফেলেছে। এখন তোমরা তার সম্পর্কে আগত হাজীদেরকে কী বলবে সে ব্যাপারে একমত হও এবং ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করো না যাতে একজন কর্তৃক আরেকজন মিথ্যুক সাব্যস্ত না হয় এবং একজন কর্তৃক আর একজনের মত প্রত্যাখ্যাত না হয়। সবাই বললো, 'ঠিক আছে, তবে হে আবু আবদুশ শামস্, বক্তব্যটা আপনিই স্থির করে দিন। আমরা সেটিই এক বাক্যে বলবো। ওলীদ বললো, না, বরঞ্চ তোমরাই বলো, আমি শুনি। তারা বললো, আমরা তো বলি, সে একজন জ্যোতিষী। ওলীদ বললো, আল্লাহর কসম, সে কোনো জ্যোতিষী নয়, জ্যোতিষীরা যেমন ছন্দ মিলিয়ে সুরেলা কণ্ঠে কথা বলে, সেদিক দিয়ে তাদের সাথে তাঁর কোনো মিল নেই। তারা বললো, তাহলে আমরা ওকে জ্বিনে ধরা বলি? ওলীদ বললো, না সে জ্বিনে ধরা নয়। জ্বিনে ধরা মানুষ জীবনে অনেক দেখেছি। সে ধরনের গলাবদ্ধতা, কু-প্ররোচনা এবং মতিভ্রম তাঁর ভেতরে নেই। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা ওকে কবি বলি? ওলীদ বললো, না, সে কবিও নয়। আমি অনেক রকমের কবিতা পড়েছি, তার কোনোটার সাথে এর সাদৃশ্য নেই। তারা বললো, তবে কি আমরা ওকে জাদুকর বলবো? ওলীদ বললো, প্রকৃতপক্ষে সে জাদুকরও নয়। আমরা জাদুকর ও তাদের জাদু বহু দেখেছি। জাদুকরদের ফুঁক দেয়া ও গিরে দেয়ার মতো সে কিছু করেওনা। সবাই বললো, হে আবু আবদুশ্ শামস্। আপনিই বলে দিন তাহলে আমরা কী বলবো? সে বললো, মোহাম্মদের কথা বড়ই মিষ্টি, জাদুময়ী ও মোহনীয়। কিন্তু তোমরা এসব বলা মাত্রই তা বাতিল বলে প্রত্যাখ্যাত হবে। তবে সব দিক বিবেচনা করার পর মনে হয়, তোমাদের জন্যে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হবে এটাই হবে যে, সে একজন জাদুকর। সে এমন বাণী নিয়ে এসেছে, যা জাদুর মতো অলৌকিক ক্রিয়াসম্পন্ন। এই বাণী পিতা ও সন্তানের মধ্যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। অতপর এই বক্তব্য গ্রহণ করে সবাই ওলীদের কাছ থেকে চলে গেলো। পথে-ঘাটে মোড়েমোড়ে বসে থেকে তারা হজ্জে আগত লোকদেরকে মোহাম্মদ (স.) সম্পর্কে সাবধান করতে লাগলো।

ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, একবার ওলীদ ইবনুল মুগীরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসেছিলো। রসূল (স.) তাকে কোরআন পড়ে শুনালেন। এতে তার মন নরম হয়ে গেলো। আবু জাহল ব্যাপারটা জানতে পারলো। সে তৎক্ষণাত ওলীদের কাছে এসে বললো, 'চাচাজান, কোরায়শের লোকেরা আপনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে চায়।' সে বললো, কেন? আবু জাহল বললো, আপনাকে দেবে। কিন্তু আপনি যদি মোহাম্মদের কাছে যান, তাহলে লোকে তাঁর সাথে যেমন আচরণ করে থাকে, আপনিও তেমনি আচরণ পাবেন। (নর পিশাচটি ওলীদের মধ্যে অহংকার উস্কে দিয়ে এই ধারণা দিতে চেয়েছিলো যে, ওলীদ যেন রসূল (স.)-এর চেয়েও বেশী শ্রদ্ধার পাত্র)। ওলীদ বললো, কোরায়শের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আবু জাহল বললো, তাহলে আপনি এমন একটা কথা বলুন, যাতে আপনার গোত্রের লোকেরা বুঝতে পারে যে, আপনি মোহাম্মদের প্রচারিত বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেন ও অপছন্দ করেন। ওলীদ বললো, তাহলে আমি তাঁর সম্পর্কে কী বলবো? আল্লাহর কসম, কোরায়শ গোত্রে কবিতা সম্পর্কে আমার চেয়ে অভিজ্ঞ আর কেউ নেই এবং মোহাম্মদ যা বলে, তার সাথে কবিতার কোনো সাদৃশ্য নেই। তাঁর কথায় প্রবল মোহনীয় ক্ষমতা ও আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর কথা সকল বাতিলকে ধ্বংস করে দেয় এবং তা সব সময় বিজয়ী হয়, কখনো পরাজিত হয় না। আবু জাহল বললো, আল্লাহর কসম, আপনি যতোক্ষণ মোহাম্মদ সম্পর্কে কিছু না বলবেন, ততক্ষণ জনগণ খুশী হবে না। সে বললো, ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দাও। একটু ভেবে চিন্তে সে বললো,

'এটা পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছু নয়।' অতপর ওলীদ সম্পর্কে সূরা মুদ্দাসসেরের ১১-৩০ আয়াত নাযিল হয়।

অপর একটি রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, কোরায়শরা বললো, ওলীদ যদি নক্ষত্রপূজারী হয়ে যায়, তবে গোটা কোরায়শ গোত্র নক্ষত্রপূজারী হয়ে যাবে। (জাহেলী যুগের আরবরা তাওহীদপন্থী মুসলমানদেরকে 'সাবী' অর্থাৎ নক্ষত্রপূজারী বলে অভিহিত করতো– অনুবাদক) এ কথার জবাবে আবু জাহল বললো, ওলীদের নক্ষত্রপূজারী হওয়া ঠেকানোর জন্যে আমি একাই যথেষ্ট। অতপর সে ওলীদের সাথে দেখা করলো। ...... আর ওলীদ অনেকক্ষণ ভেবে চিন্তে বললো, নিশ্চয়ই এটা পুরুষানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত জাদু ছাড়া কিছু নয়। দেখতে পাওনা যে, সে স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে ও মনিব গোলামে বিভেদ ঘটায়?

এই রেওয়ায়াতগুলো থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় যে, যে সকল মোশরেক রসূল (স.)-এর দাওয়াতকে মিত্যা প্রতিপন্ন করে অস্বীকার করতো, তারা প্রকৃতপক্ষে একথা বিশ্বাস করতো না যে, তিনি তাদের কাছে যে ওহীর বাণী পৌঁছে দেন, তাতে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেন। তারা আসলে তাদের শেরেকী ধ্যান-ধারণা ছেড়ে দিতে কিছুতেই রাযী ছিল না। আর এর প্রধান কারণও এই রেওয়ায়াতগুলোতে জানানো হয়েছে। সেই কারণ হলো, রসূল (স.)-এর দাওয়াত মেনে নিলে তাদের এতোকালের অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করা ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে বলে তারা আশংকা করতো। তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। এটাই লাইলাহা ইল্লাল্লাহ– এই কলেমার মর্ম ও তাৎপর্য এবং এই কলেমাই হচ্ছে ইসলামের ভিত্তি। তাদের মাতৃভাষার কোন শব্দের মর্ম কী, তা তারা স্বভাবতই ভালোভাবে বুঝতো, আর এই কলেমার মর্ম অনুসারে ইসলাম গ্রহণ করতে তারা ইচ্ছুক ছিলো না। কেননা এই কলেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণের অর্থ দাঁড়ায়, মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য যে কোনো শক্তির সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা।

তাই আল্লাহর এ উক্তি যথার্থ যে, 'আমি জানি, কাফেরদের কথায় তুমি চিন্তিত, কিন্তু তারা তোমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে না, আসলে ওই যালেমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকেই অস্বীকার করে।' (আয়াত নং ৩৩)

এখানে 'যালেমরা' শব্দটি দ্বারা মোশরেকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যেমন কোরআনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হেদায়াত দানের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

পরবর্তী আয়াতেও রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার ধারা অব্যাহত রয়েছে। মোশরেকদের পক্ষ থেকে রসূলের দাওয়াতকে অস্বীকার করার প্রকৃত কারণ কী, এবং রসূল (স.) ও তাঁর আনীত বিধানের সত্যতা প্রতিপন্নকারী আয়াতসমূহের প্রতি তাদের উম্মার কারণ কী, সে সব বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জীবনে কী ঘটেছে এবং তারা কেমন ধৈর্যধারণ করেছে ও কাজ অব্যাহত রেখেছে, আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য এসেছে, সে সব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো একথা প্রমাণ করা যে, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটাই চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় রীতি। যে যতো প্রস্তাব ও পরামর্শই দিক এবং দায়ীদেরকে কষ্ট দেয়া, মিথ্যুক সাব্যস্ত করা ও তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার ধারা অব্যাহক রাখা হোক, এ রীতি কখনো পাল্টাবে না এবং এ কাজের গতি কখনো ত্বরান্বিত করা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমার পূর্বেও বহু রসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে ....' (আয়াত ৩৪)

বস্তুত, আল্লাহর দিকে আহবানকারীদের কাফেলাকে হাজারো বাধা-বিপত্তি ও চড়াই উতরাই পার হয়ে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যেতে হয়। সর্ব শ্রেণীর অপরাধী ও বিপথগামীরা এবং তাদের নেতা ও অনুগামীরা এই কাফেলার পথে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সত্যের আহবায়কদের ওপর নির্যাতন চালায়, তাদের রক্ত ঝরায় ও পংগু করে দেয়, কিন্তু এসব বাধা অগ্রাহ্য করে তারা নির্ভয়ে ও কিছুমাত্র বিপথগামী না হয়ে সঠিক ও সোজা পথে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। এই যাত্রা যতো দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষই হোক, শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হয়। আল্লাহর সাহায্য চিরকালই চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসে। আলোচ্য আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

একথাগুলো আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া, সান্ত্বনা দেয়া ও তাঁর প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্যে। এ কথাগুলো রসূল (স.)-এর পরবর্তী সময়ে যারা ইসলামের দাওয়াত দেবে, তাদের জন্যে তাদের চলার পথ স্পষ্ট করে দেয়, তাদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয় এবং এই পথে কী কী বাধা ও কী কী সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে দেয়। অতপর এসব বাধাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলে কী সুফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তাও জানিয়ে দেয়।

এ আয়াতটিতে বলা হচ্ছে যে, ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ যে যুগে ও যে দেশেই চালানো হোক, তার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি চিরকাল একই ছিলো এবং একই থাকবে। এই দাওয়াত চিরকালই একটা অবিচ্ছেদ্য ও অটুট একক। ও দাওয়াতকে প্রথম প্রথম অধিকাংশ মানুষই প্রত্যাখ্যান ও মিথ্যা সাব্যস্ত করে, দায়ীদেরকে লোকেরা কষ্ট দেয়, কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান, মিথ্যা সাব্যস্তকরণ ও কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও দায়ীরা ধৈর্যধারণ করে, এটাই এ কাজের রীতি এবং এটাই আল্লাহর নীতি। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের পক্ষেই আল্লাহর সাহায্য আসে। এটাও আল্লাহর নীতি। তবে সেই সাহায্যের সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়েই তা আসে। নিরীহ নিষ্পাপ পবিত্র ও নিষ্ঠাবান দায়ী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে ও মিথ্যুক প্রতিপন্ন হচ্ছে, কিংবা অপরাধী ও গোমরাহ লোকেরা নিরপরাধ, সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে, এই যুক্তিতে আল্লাহর সাহায্য ত্বরান্বিত হয় না। এ যুক্তিতেও আল্লাহর সাহায্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে আসে না যে, দায়ী একজন সৎ নিষ্ঠাবান ও নিস্বার্থ ব্যক্তি এবং তিনি তার জাতির হেদায়াতপ্রাপ্তি আন্তরিকভাবে কামনা করেন, তাদের দুঃখ দুর্দশা ও গোমরাহীকে ঘৃণা করেন এবং ইহ পরকালে তাদের আযাব ও ধ্বংসের আশংকা করেন। এ ধরনের কোনো যুক্তিতেই নির্দিষ্ট সময়ের আগে আল্লাহর সাহায্য আসে না। কেননা কোনো সৃষ্টির সুপারিশে তিনি তাঁর সাহায্যকে ত্বরান্বিত করেন না। আল্লাহর বাণীকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, তা সে বাণী আল্লাহর সাহায্য সংক্রান্তই হোক, কিংবা নির্দিষ্ট মেয়াদ সংক্রান্তই হোক।

এভাবে (৩৪নং) আয়াতটিতে সান্তনা দান ও সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে অনমনীয় নীতি ও কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর আল্লাহর এই কঠোর ও অনমনীয় সিদ্ধান্তকে রসূল (স.)-এর অন্তরে বিরাজমান সেই স্বাভাবিক মানবীয় কামনা বাসনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে, যা তিনি নিজ জাতির হেদায়াতের ব্যাপারে পোষণ করতেন এবং এজন্যে তারা যে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চাইতো, তা দেখানোর প্রতিও আগ্রহী ছিলেন। এটা একটা স্বাভাবিক আগ্রহ। রসূল (স.)-এর ন্যায় তৎকালীন

মুসলমানদেরও কেউ কেউ মনে করতেন যে, কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর যে দাবী মোশরেকরা জানাচ্ছে, তা মেনে নেয়া হোক। হয়তো বা তারা হেদায়াত লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের পদ্ধতি এবং এতে রসূলরা ও সাধারণ মানুষদের কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে, যা সে কোনো অবস্থায় লংঘন করতে পারে না। মানুষের ইচ্ছা ও চাহিদা অনুসারে মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর দাবী উক্ত নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় কোরআন এর কঠোর বিরোধিতা করেছে। পরবর্তী দুটি আয়াতে (আয়াত নং ৩৫ ও ৩৬) এই বিরোধিতা প্রতিফলিত হয়েছে।

বস্তুত, এ দুটি আয়াতের গুরুগম্ভীর শব্দগুলোর মধ্য দিয়ে এক ভয়ংকর আবহের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এই আবহের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিই করতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে অনুধাবন করবে যে, এই কথাগুলো আল্লাহ তায়ালা কাকে সম্বোধন করে বলেছেন। বিশ্ব প্রতিপালক তাঁর সেই নবীকে এ কথাগুলো বলেছেন। যার উদারতা, ধৈর্য, মহানুভবতা ও দৃঢ়তার কোনোই তুলনা হয় না, যিনি বছরের পর বছর ধরে নিজ জাতির নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন এবং একটি মুহূর্তের জন্যেও তাদের বিরুদ্ধে হযরত নূহের ন্যায় বদ দোয়া করেননি।

এ আয়াত দুটিতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, হে মোহাম্মদ, আমার নীতি এটাই। তাদের অব্যাহত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা এবং মিথ্যুক সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা যদি তোমার সহ্য না হয়, আর তুমি যদি তাদেরকে অলৌকিক কিছু নিদর্শন দেখাতে চাও, তাহলে তোমার ক্ষমতায় কুলালে ভূগর্ভে একটা সুড়ংগ অথবা আকাশে একটা সিঁড়ি বানিয়ে নাও, যেন তাদের জন্যে একটা কিছু নিদর্শন আনতে পারো।

তোমার অলৌকিক নিদর্শন এনে দেখানোর ওপর তাদের হেদায়াত নির্ভরশীল নয়। সত্যের নিদর্শনের ঘাটতিই হেদায়াতের একমাত্র বাধা নয়। ..... আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলেই তাদের সবাইকে হেদায়াত করতে পারতেন। যেমন তাদের স্বভাবটা ফেরেশতাদের মতো বানিয়ে দিতে পারতেন, যার কারণে সৎ চিন্তা ও সৎকাজ ছাড়া আর কিছু তারা জানতোই না, অথবা কোনো অলৌকিক কর্মকান্ড দেখিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে তাদের মনকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে বা ইসলাম গ্রহণ উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। আল্লাহ তায়ালা এর যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পুরোপুরি সক্ষম।

কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে মহৎ প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করে থাকেন, তার অধীনেই মানব জাতিকে একটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নির্ধারিত সেই দায়িত্বের দাবী এই যে, তাদের মধ্যে ফেরেশতাদের চাইতে ভিন্ন ধরনের কিছু নির্দিষ্ট যোগ্যতা গড়ে উঠুক। এ ধরনের ভিন্ন ধর্মী যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এবং হেদায়াত ও ঈমানে উদ্বুদ্ধকারী যুক্তি প্রমাণগুলো গ্রহণ করার পদ্ধতির বিভিন্নতা, যার ভিত্তিতে হেদায়াত বা গোমরাহীর পরিণাম ও প্রতিদানের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র ন্যায়সংগত ও সুবিচারপূর্ণ হতে পারে।

এ কারণেই তিনি সুপরিকল্পিতভাবে তাদেরকে হেদায়াত গ্রহণে বাধ্য করেননি। বরং হেদায়াত গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহর আনুগত্য বা অবাধ্যতা ও পরিণামে ন্যায়সংগত কর্মফল গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। এই নিগূঢ় তত্ত্বটা ব্যক্ত করার পর এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এ বিষয়টি জেনে নাও এবং এ ব্যাপারে অজ্ঞ থেক না।

'যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে সবাইকে হেদায়াতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দিতেন। কাজেই অজ্ঞলোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।'

বস্তুত অত্যন্ত ভীতিজনক ভাষা ও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে আয়াতটির শেষাংশে। তবে যে প্রেক্ষাপটে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা যথার্থই মানানসই হয়েছে।

বিবেক বর্জিত লোকেরাই অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়

এরপরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে মানুষের সহজাত স্বভাবের এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণে সজ্জিত হেদায়াতের বাণীর প্রতি মানুষের আচরণের বিভিন্নতার। বলা হয়েছে,

'(দাওয়াতকে) গ্রহণ করে তারাই, যারা তা শোনে। কিন্তু (মনের দিক দিয়ে যারা মৃত তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা (একেবারে পরকালেই) পুনরুজ্জীবিত করবেন। অতপর তারা আল্লাহরই কাছে ফিরে যাবে।'

বস্তুত, আল্লাহর কাছ থেকে রসূল (স.) যে সত্য বিধান নিয়ে আসেন, মানুষ সেই সত্যের সম্মুখীন হয়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শ্রেণীর বিবেক বুদ্ধি থাকে জীবন্ত, কোনো আহবানে সাড়া দেয়ার সহজাত হাতিয়ারগুলো তার ভেতরে থাকে জীবন্ত, কর্মক্ষম ও উন্মুক্ত। এই শ্রেণীর মানুষ হেদায়াতের দাওয়াত গ্রহণ করে থাকে। কেননা হেদায়াতের দাওয়াত এতোটা জোরদার ও স্বচ্ছ থাকে যে, তা শোনা ও গ্রহণ করা যায়।

আর একটা শ্রেণী মৃত। তারা জন্মগতভাবে নিস্ক্রিয়। তারা শোনেও না, সাড়াও দেয় না। তাই সত্যের আহ্বানে প্রভাবিতও হয় না, গ্রহণও করে না। সত্যের মাঝে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ না থাকা এর কারণ নয়। কেননা সত্যের প্রমাণ তার বক্তব্যের মাঝে নিহিত থাকেই। মানুষের প্রকৃতি যখনই তার সন্ধান পায়, অমনি অনিবার্যভাবে তাকে গ্রহণ করে। আসলে এই শ্রেণীর মানুষেরা যে জিনিসটির অভাবে ভোগে তা হচ্ছে তাদের স্বভাবের সজীবতা ও সক্রিয়তা এবং সাড়া দেয়ার সহজাত হাতিয়ারগুলো কর্তৃক সাড়া দান। এই অভাবটা পূরণ করা রসূল (স.)-এরও সাধ্যাতীত, আর যে অলৌকিক প্রমাণাদি তারা চায় তা দেখানোও তার সাধ্যাতীত। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা দ্বারাই পূরণ সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের মৃত চেতনা ও বিবেককেও পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। তিনি যদি জানেন যে, তাদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হবার যোগ্যতা আছে, তাহলেই তিনি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। নচেত দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আর পুনরুজ্জীবিত করবেন না, বরং নির্জীবই রেখে দেবেন এবং আখেরাতে তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর মৃতদেরকে আল্লাহ তায়ালা পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতপর তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।'

এই হলো সত্যকে গ্রহণ করা ও না করার পটভূমি। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, মানুষের হেদায়াত পাওয়া ও না পাওয়ার প্রকৃত রহস্য, জানা যায় রসূলের কর্তব্য কী ও কাজ কী, আর সব কিছুই যে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তাও জানা যায়।

রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করার পর পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে মোশরেকদের পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনার দাবীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এবং এই দাবীতে আল্লাহর বিশ্ব পরিচালনা নীতি সম্পর্কে যে অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তার পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাদের এই দাবী না মানা যে আল্লাহর কতো বড়ো অনুগ্রহ তা তারা বুঝতে পারেনি। কেননা তাদের দাবী মোতাবেক অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর পর তারা ঈমান না আনলে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হতো। এখানে আল্লাহর সূক্ষ্ম কর্মকৌশল এবং সকল প্রাণীকে

পরিচালনার নিপুণ পদ্ধতির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হয়েছে। আর সবার শেষে মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহীর পেছনে যে আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা ও তাঁর নীতিমালা ও বহু অজানা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তারা বলে, মোহাম্মদের ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা নিদর্শন নাযিল হলো না কেন? ...... (আয়াত ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ দ্রষ্টব্য)

আসলে আরবের মোশরেকরা এমন কিছু কিছু অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানিয়েছিলো যা পূর্বতন নবীদের সংগে থাকতো। কোরআনের ন্যায় চিরস্থায়ী নিদর্শন, যা মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে সম্বোধন করে-যা মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির নব যুগের সূচক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং যা এই বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এরূপ উন্নতমানের সম্বোধন করে– এতে তারা সন্তুষ্ট ছিলো না। কোরআন এমন এক মোজেযা, যা বস্তুগত মোজেযার ন্যায় কেবল সমকালীন প্রজন্মের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরই শেষ হয়ে যায় না, বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকে এবং মানব জাতির সকল বিবেকবুদ্ধিকে আবেদন জানাতে থাকে। কিন্তু আরবরা এই মোজেযায় সন্তুষ্ট ছিলো না।

তারা চাইছিলো একটা বস্তুগত মোজেযা। অথচ এ ধরনের মোজেযা আসার পর যারা রসূলের দাওয়াতকে অস্বীকার করে তাদেরকে যে আল্লাহ তায়ালা তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন এবং দুনিয়াতেই ধ্বংস করে দেন, সেটা তারা বুঝতে পারেনি। এ ধরনের মোজেযা নাযিল না করার পেছনে আল্লাহর যে সূক্ষ্ম জ্ঞান নিহিত রয়েছে তা তারা উপলব্ধি করেনি। কারণ আল্লাহ তায়ালা জানতেন যে, এ ধরনের মোজেযা আসার পরও তারা ঈমান আনবে না। এ ধরনের ঘটনা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর জীবনেও ঘটেছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুযোগ দিতে চাইছিলেন যেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কেউ চাইলে ঈমান আনতে পারে। এমন অনেক ব্যক্তি ছিলো, যে নিজে ঈমান না আনলেও তার বংশধরের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমান এনেছে। এই অবকাশ দান যে আল্লাহর কতো বড়ো নেয়ামত ছিলো, তা তারা বুঝেওনি এবং তার শোকরও করেনি। তাদের দাবী না মেনেই তিনি এই অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। অথচ তারা জানতো না যে এই দাবীর পরিণতি কতো ভয়াবহ।

কোরআন তাদের এই দাবীর উল্লেখ করে এবং মন্তব্য করে যে, তাদের অধিকাংশ লোকই এই দাবীর পরিণাম জানে না। এ দাবী পূরণ না করার পেছনে আল্লাহর কী মহৎ ইচ্ছা নিহিত রয়েছে তাও তাদের জানা নেই। কোরআন জানাচ্ছে যে, যে কোনো অলৌকিক কান্ড ঘটাতে আল্লাহ তায়ালা সক্ষম। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বান্দাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে তাদেরকে বিপদ মুসীবত থেকে রক্ষা করাকে তাঁর নিজের কর্তব্য হিসাবে গ্রহণের দরুনই তিনি এ দাবী মানেননি। (আয়াত ৩৭)

সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রন

এখানে আর একটি সূক্ষ্ম পথ ধরে কোরআন মানুষের মনে প্রবেশের চেষ্টা করে। আশপাশের বিশ্বপ্রকৃতিতে হেদায়াত ও ঈমানের প্রেরণা দানকারী যেসব প্রমাণাদি রয়েছে, তার দিকে ইংগিত করে তার চিন্তাশক্তি ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে শানিত করে ও তার ইংগিত বুঝতে উদ্বুদ্ধ করে। (৩৮ আয়াতে এই ইংগিতটি লক্ষণীয়) পৃথিবীতে এমন কোনো চলমান প্রাণী নেই ....'

বস্তুত এই বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষই একমাত্র বসবাসকারী প্রাণী নয় যে, তাদের অস্তিত্বকে একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং তাদের জীবনকে উদ্দেশ্যহীন মনে করা যাবে। বরঞ্চ তাদের

আশপাশে আরো বহু প্রাণী রয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর একটা পরিকল্পিত ও সুশৃংখল জীবন রয়েছে এবং তার পেছনে রয়েছে সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, সূক্ষ্ম কর্মকুশলতা ও সুনিপুণ দূরদৃষ্টি। অনুরূপভাবে, প্রতিটি সৃষ্টি প্রমাণ করে যে, সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা একজন এবং সব কিছুর পেছনে রয়েছে একই পরিকল্পনা ও পদ্ধতি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী এবং শূন্যে দুই ডানায় ভর করে উড্ডয়নরত এমন কোনো পাখি নেই, যা তোমাদেরই মতো এক একটা জাতি নয়।'

এখানে বিচরণশীল প্রাণী বলতে যাবতীয় পশু, সরীসৃপ ও পোকামাকড়কে এবং 'উড্ডয়নরত পাখি' বলতে যাবতীয় পাখি ও কীট-পতংগকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই মহাবিশ্বে যতো জীবন্ত সৃষ্টি আছে, সবই এক একটা জাতির সদস্য, সকলেরই একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও জীবন যাপন পদ্ধতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা মানব জাতির মতোই। অর্থাৎ কারো জীবনের কোনো অংশকেই আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান ও পরিকল্পনাবিহীন ছেড়ে দেননি, শেষ পর্যায়ে সকল সৃষ্টিকে তিনি সমবেত করবেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি যেমন খুশী ফয়সালা করবেন।

এই ক্ষুদ্র আয়াতটিতে জীবন ও জীব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের পাশাপাশি এ কথাও জানানো হয়েছে যে, ছোট বড় সকল সৃষ্টিকে তিনি নিজের সর্বাত্মক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন রেখেছেন, সকলেই তাঁর শাসনাধীন ও কর্তৃত্বাধীন রয়েছে এবং সকলেই তাঁর অসীম ক্ষমতার অধীন রয়েছে। এই দিকগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আমাকে 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' এ অনুসৃত সীমিত ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি পরিহার করে আলোচনা করতে হবে। (আমার লেখা পুস্তক 'খাসাইসুত তাসাউউরিল ইসলামী ওয়া মুকাওয়িমাতুহু' দ্রষ্টব্য) এখানে আমি সে ধরনের বিস্তারিত আলোচনার পরিবর্তে শুধুমাত্র কোরআনের বক্তব্য বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমিত রাখছি। কেননা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য হলো, পাঠকের মনে ও বিবেকে এই কথাটা বদ্ধমূল করা যে, আমাদের এই মহাবিশ্বে বিরাজমান সৃষ্টি ও তার সার্বিক ব্যবস্থা, আল্লাহর জ্ঞানে তার পূর্ণ সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয়, অতপর সর্বশেষে সেগুলোর আল্লাহর কাছে সমবেত হওয়া এ সব কিছুতে যে অকাট্য দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, তা সেই সব অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনের চেয়ে অনেক বড়, যা একটি মাত্র প্রজন্ম দেখতে পায় এবং তারপরই তা শেষ হয়ে যায়।

এ পর্বের শেষ আয়াতটিতে হেদায়াত ও গোমরাহীর পশ্চাতে আল্লাহর ইচ্ছা ও আল্লাহর নীতির উল্লেখ রয়েছে এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর সময় মানুষের স্বভাব প্রকৃতি কি রূপ ধারণ করে, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তারা যেন অন্ধকারে বধির ও বোবা। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা করেন গোমরাহ করে দেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (আয়াত ৩৯)

ইতিপূর্বে শ্রবণকারীদেরকে সত্যের দাওয়াত গ্রহণকারী এবং যারা গ্রহণ করে না তাদেরকে মৃত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানে সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে একটি ভিন্ন ভংগিতে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, যারা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর এই অসংখ্য নিদর্শনাবলীকে এবং এই কোরআনের পাতায় লিপিবদ্ধ আল্লাহর আরেক ধরনের নিদর্শন (আয়াত)-কে অস্বীকার করে, তাদের অস্বীকার করার কারণ শুধু এই যে, এই সব নিদর্শনকে উপলব্ধি করার যে ইন্দ্রিয় তাদের মধ্যে রয়েছে, তা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

তারা বধির, তাই শোনে না। তারা বোবা, তাই কথা বলতে পারে না। তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত, তাই তারা দেখতে পায় না। তাদের এ অবস্থার কারণ এটা নয় যে, শারীরিক ও বস্তুগতভাবে তারা পংগু। তাদের চোখ, কান ও জিহবা রয়েছে। কিন্তু এগুলোর অনুভূতি শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। ফলে এগুলো কোনো অনুভূতি পরিবহণ করে না। নিদর্শনগুলো যথারীতি বহাল আছে। এগুলোকে যদি বুঝবার চেষ্টা করা হতো, তাহলে এই সকল ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ কান ও জিহবার কর্মক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতো। এ সব নিদর্শনকে যখনই উপেক্ষা করা হয়েছে, তখনই তার জন্মগত শক্তি বিনষ্ট ও বিকৃত হয়েছে। ফলে তা হেদায়াতকে সজীব রাখার যোগ্য থাকেনি এবং জীবনের সেই উন্নত স্তরের উপযুক্ত থাকেনি।

এ সব কিছুর পেছনে রয়েছে আল্লাহর স্বাধীন ও অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই স্বাধীন ইচ্ছাক্রমেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মানুষকে তিনি সুপথ ও কুপথ উভয় পথগামী হবার যোগ্যতা একই সাথে দান করবেন, আর সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় ও কোনো প্রকারের চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই এই যোগ্যতাকে প্রয়োগ করবে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা, তাঁর সঠিক পথে পরিচালিত করে থাকেন। আল্লাহর এ ইচ্ছা সুপথ লাভের জন্যে চেষ্টা সাধনাকারীকে সাহায্য করে থাকে এবং তাঁর কোনো বান্দার ওপর যুলুম করে না।

বস্তুত মানুষের মনে বিপথগামী অথবা সুপথগামী যেটাই হবার আগ্রহ থাকুক না কেন, তা তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই তার মধে জন্মলাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা স্বেচ্ছায় তার মধ্যে এই দু'ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। তাই এই দু'ধরনের আগ্রহ থেকে যে গোমরাহী বা হেদায়াত লাভ হয়, তাও আল্লাহর স্বাধীন ইচ্ছাক্রমেই সৃজিত। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা স্বাধীন, অবাধ ও সক্রিয়। আর জবাবদিহী ও কর্মফল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও চেষ্টার ভিত্তিতেই নির্ণীত হবে- যদিও আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে মূলত তাকে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকারের ইচ্ছা ও চেষ্টার যোগ্যতা দেয়া হয়েছিলো।

দ্বীনের জন্যে কোরআনের কর্মীদের নির্দেশনা

সূরার এ পর্বটির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা শেষ হবার পর এ অংশে যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারকার্যে নিয়োজিতদের জন্যে কী কী শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। বস্তুত এ অংশে যা কিছু শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা কোনো নির্দিষ্ট যুগ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল যুগের ও সকল প্রজন্মের দাওয়াতদাতাদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। উপরন্তু তা ইসলামের দাওয়াতের এমন একটা পদ্ধতি ও শিক্ষা দেয় যা সর্বকালের ও সর্ব অঞ্চলের লোকদের জন্যে উপযোগী। এই সকল দিক সবিস্তারে তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় এর প্রধান প্রধান দিক সংক্ষেপে তুলে ধরছি,

আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর পথটা বড়ই বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। এ পথটা অবাঞ্ছিত ও বাধাবিঘ্নে পরিপূর্ণ। যদিও সত্যের জন্যে আল্লাহর সাহায্য আসা সন্দেহাতীত ও অবধারিত। কিন্তু এ সাহায্য আল্লাহর নির্ধারিত সময়েই আসবে। নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারেই তিনি সাহায্যের সময় নির্ধারণ করে থাকেন। সেই সময়টা সবার অজ্ঞাত। এমনকি রসূলও জানেন না কখন সাহায্য আসবে। এই পথের দুঃখ কষ্টের মূল কারণ দুটো। প্রথমত উপেক্ষা ও প্রত্যাখান, যা দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে দেখা যায় এবং দাওয়াতদাতাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ ও অত্যাচার। দ্বিতীয়ত দায়ী মনে মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার তীব্র আকাংখা ও আগ্রহ। এ আকাংখা ও আগ্রহ স্বাভাবিক ও মানবোচিত। কেননা দায়ী নিজে ইসলামের স্বাদ গ্রহণ করে জেনেছে যে, তা

কতো হৃদয়গ্রাহী। এ জন্যে ইসলামের পক্ষে তার তীব্র আবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার প্রচারের জন্যে সে অতিমাত্রায় উৎসুক হয়। এই তীব্র প্রচারাকাংখা শত্রুদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা, প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ ও অত্যাচার নিপীড়নের চেয়ে কম কষ্টদায়ক নয়। এর সবগুলোই ইসলামের দাওয়াতের পথে কষ্টদায়ক বাধা।

সূরার বর্তমান পর্বটিতে কোরআন উক্ত দুই দিক দিয়েই এই কষ্টকর বাধা অপসারণ করে। কোরআন জানায় যে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা তার দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, তাদেরকে যে দাওয়াত দেয়া হয়, তা অকাট্য সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রসূল সত্যবাদী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা দাওয়াতকে গ্রহণ করে না বরং ক্রমাগত অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। কারণ অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করায় তাদের স্বার্থ রয়েছে। যে সত্যের দিকে রসূল (স.) আহবান জানান, তার সত্যতার প্রমাণ তার সাথেই রয়েছে। এ সত্য তার স্বভাব প্রকৃতি তথা তার সহজাত বিবেক বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এই বিবেক বুদ্ধি যখন জীবন্ত থাকে এবং তার যাবতীয় অনুভূতি শক্তি ও উপলব্ধির যন্ত্রগুলো কার্যকর থাকে, তখন তা এই দাওয়াতকে গ্রহণ করে। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা শোনে তারাই দাওয়াতকে গ্রহণ করে।' কিন্তু যারা অস্বীকার করে, তাদের অন্তর মৃত ও নির্জীব এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকা বধির ও বোবা।

মৃতদেরকে ও বধিরদেরকে দাওয়াত জোর পূর্বক শোনানোর ব্যবস্থা করা রসূলের কোনো দায়িত্ব নয় এবং তা করতে তিনি সমর্থও নন। মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা দাওয়াতদাতার কাজ নয় বরং আল্লাহর কাজ। এ হলো একটা দিক। অপর দিকটি এই যে, আল্লাহর সাহায্যের আগমন নিসন্দেহে অবধারিত। কেবল আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুসারে তা আসবে এই যা। আল্লাহর সাহায্যের নীতিকে আমাদের ইচ্ছামত ত্বরান্বিত করা এবং তা পাল্টানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সাহায্যের নির্ধারিত সময়কেও হেরফের করা সম্ভব নয়। দাওয়াতদাতা যদি রসূলও হন এবং তাকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করা ও নির্যাতন করা হতে থাকে, তাহলেও আল্লাহ তায়ালা সাহায্যদানকে ত্বরান্বিত করেন না। কেননা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সাহায্যকে বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যই এই যে, আল্লাহ তায়ালা দায়ীদের কোনো রকম তাড়াহুড়ো না করে আল্লাহর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা, সকল নির্যাতনকে স্থিরভাবে ও অকুতোভয়ে বরদাশত করা এবং আখেরাতের প্রতিদানে অবিচল বিশ্বাস রাখা প্রত্যাশা করেন।

এ আয়াতগুলো থেকে এটাও জানা যায় যে, ইসলামের ব্যাপারে রসূল (স.) ও তাঁর পরবর্তী দাওয়াত দাতাদের কর্তব্য কী। তাদের কর্তব্য হচ্ছে শত বাধা বিপত্তিকেও উপেক্ষা করে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু মানুষের হেদায়াত লাভ নিশ্চিত করা ও বিপথগামিতা ঠেকানো তার কোনো দায়িত্বও নয়। সেটা তাঁর ক্ষমতার আয়ত্তাধীনও নয়। হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর শাশ্বত রীতিনীতি অনুসারেই হয়ে থাকে। এতে কোনো রদ-বদল হয় না। এমনকি রসূল (স.) যাকে ভালোবাসেন, তাকে হেদায়াত করা তাঁর প্রবল আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও তা আল্লাহর সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারে না, যেমন পারে না রসূলের শত্রুদের প্রতি তার বিরক্তি। বস্তুত এ ক্ষেত্রে রসূল (স.)-এর ব্যক্তি সত্ত্বার কোনো গুরুত্ব নেই। কতোজন লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, তিনি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য কতোটা পালন করতে পেরেছেন, কতোটা ধৈর্যধারণ করেছেন এবং কতটা আল্লাহর আনুগত্য ও আদর্শের ওপর অবিচলতা বজায়, রেখেছেন। এরপর জনগণের সব কিছু মহান আল্লাহর হাতে ন্যস্ত। জনগণের মালিক ও প্রতিপালক তো একমাত্র তিনিই।

'তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেন।'.....

'তিনি যদি চাইতেন, তবে সবাইকে হেদায়েতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করে দিতেন।'.....

'একমাত্র তারাই দাওয়াতকে গ্রহণ করে, যারা তা শ্রবণ করে।'

ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সম্পর্ক কী। আমার ওই আলোচনাই এ বিষয়ে যথেষ্ট।

এ জন্যে ইসলামের দিকে আহবানকারীর পক্ষে যাদেরকে আহ্বান করে তাদের পরামর্শ ও প্রস্তাব মেনে নিয়ে দাওয়াতের কার্যক্রমকে ইসলামী নীতিমালার আওতা বহির্ভূত করা কিংবা তাদের ইচ্ছা ও খায়েশ মোতাবেক ইসলামকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা সমীচীন নয়। কোরআন শরীফ একাধিক জায়গায় বলেছে যে, মোশরেকেরা তাদের যুগের প্রচলিত রীতিপ্রথা অনুযায়ী এবং তাদের বোধশক্তির মান অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানোর দাবী জানিয়েছিলো। এই জায়গাগুলোর মধ্যে কয়েকটা তো রয়েছে চলতি সূরায় এবং বাদ বাকীগুলো রয়েছে অন্যান্য সূরায়। যেমন, 'তারা বলে যে, মোহাম্মদের ওপর ফেরেশতা নাযিল হয় না কেন? ...... 'তারা বলে যে, তার ওপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নাযিল হয় না কেন?'.... 'তারা সর্বাত্মকভাবে শপথ করে যে, তাদের কাছে কোনো নিদর্শন এলে তারা অবশ্যই তাঁর ওপর ঈমান আনবে।' অন্যান্য সূরায় তাদের আরো বিস্ময়কর কথাবার্তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, সূরা বনী ইসরাঈলে, 'তারা বললো যে, তোমার ওপর আমরা ততোক্ষণ ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে মাটির মধ্য থেকে একটা ঝর্ণা বের করে দেবে, অথবা তোমার একটা খেজুর ও আংগুরের বাগান হবে, যার ভেতরে তুমি খাল-নালা ছড়িয়ে দেবে, অথবা তোমার দাবী মোতাবেক আকাশকে আমাদের মাথার ওপর খানখান করে ভেংগে ফেলে দেবে, অথবা আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদেরকে এনে আমাদেরকে সকলের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, অথবা তোমার একটা বিলাসবহুল প্রাসাদ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে অতপর তুমি যতোক্ষণ সেখান থেকে আমাদের ওপর একখানা বই নামিয়ে না দেবে, যা আমরা পড়তে পারি, ততোক্ষণ তোমার আকাশে আরোহণকেও বিশ্বাস করবো না।' সূরা ফুরকানে,

'তারা বলে যে, এ কেমন রসূল, যে খাদ্য খায় এবং বাজারে ঘুরে বেড়ায়? তার ওপর যদি একজন ফেরেশতা নামানো হতো এবং সে তার সাথে সতর্ককারী হয়ে চলতো, অথবা তাকে একটা অর্থভান্ডার দেয়া হতো কিংবা তার একটা ফলের বাগান থাকতো, যা থেকে সে খেতো, তবে তো খুবই ভালো হতো।'

সূরার এই পর্বে কোরআন রসূল (স.) ও অন্যান্য মোমেনকে সরাসরি নিষেধ করেছে কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী জানাতে। রসূল (স.)-কে বলা হয়েছে, তাদের মুখ ফিরানো যদি তোমার কাছে অসহনীয় মনে হয়, তাহলে যদি পারো পাতালে একটা সুড়ংগ অথবা আকাশে একটা সিঁড়ি বানাও...........'(আয়াত ৩৫, ৩৬)

একটা অলৌকিক নিদর্শন দেখালেই আমরা অবশ্য অবশ্য ঈমান আনবো বলে মোশরেকেরা কসম খাওয়ায় যে সকল মুসলমান মোশরেকদের ওই দাবীটা পূরণ করার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে, তাদেরকে বলা হয়েছে, বলে দাও যে, অলৌকিক নিদর্শনাবলী তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর ওই সব নিদর্শন যখন আসবে, তখনও যে তারা ঈমান আনবে না, সেটা তোমরা কিভাবে জানবে? প্রথম বারে ঈমান না আনার কারণে আমি তাদের মন ও চোখকে ঘুরিয়ে দেবো

এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেবো। এ কথা বলার উদ্দেশ্য প্রথমত, তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, যারা ইসলামের দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে প্রত্যাখ্যান করছে, তারা এর সপক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণ বা নিদর্শনের অভাবে প্রত্যাখ্যান করছে তা নয়, বরং তাদের প্রত্যাখ্যানের আসল কারণ হলো, তাদের শ্রবণ শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, তারা নির্জীব হয়ে গেছে এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর যে চিরাচরিত নীতি ও বিধান রয়েছে, সে অনুসারে তাদের জন্যে হোদায়াত বরাদ্দ করা হয়নি। এর আরো একটা উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, ইসলাম একটা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় নিয়মে চলে এবং তা মানুষের খেয়াল খুশীর উর্ধে।

এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, কোরআনের নির্দেশের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে, কোনো বিশেষ ঘটনার সাথে এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাবের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। কেননা সময় এবং মানুষের ইচ্ছা আকাংখা ও খেয়াল খুশী অনবরতই পরিবর্তনশীল। যারা আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেবে, তাদের এতোটা গাম্ভীর্যহীন হওয়া চাই না যে, মানুষের খেয়াল খুশী অনুসারেই চলতে থাকবে। মানুষের খেয়াল খুশী ও পরামর্শ অনুসারে চলার বাতিক ইদানীং ইসলামের দাওয়াতদাতাদের অনেককে এমনভাবে পেয়ে বসেছে যে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে বিকৃত করে পৃথিবীতে বিদ্যমান অন্যান্য অসংখ্য ছোট খাটো ধর্মমতের মতো একটা কাগুজে মতবাদে পরিণত করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে বহু ছোট ছোট কাগুজে মতবাদ বিভিন্ন সময়ে রচিত হতে দেখা যায়। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে পরস্পর বিরোধী ধ্যান ধারণার সমষ্টিতে পরিণত হয়ে গেছে। ওই সকল কাগুজে ধর্ম ও মতবাদগুলো দেখে ইসলামের দাওয়াতদাতাদেরও কেউ কেউ ইসলামী জীবন বিধানকে একটা কাগুজে শাসন ব্যবস্থা বা কাগুজে আইন ব্যবস্থায় পরিণত করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই সব কাগুজে ব্যবস্থায় আধুনিক জাহেলিয়াতের সেই সব বিধি ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। কেননা এই জাহেলিয়াতের পতাকাবাহীরা বলে থাকে যে, ইসলাম হলো শুধু একটা আকীদা-বিশ্বাসের নাম এবং জীবনের বাস্তব ব্যবস্থার সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। এই সব বিধি ব্যবস্থার ধারক বাহকরা নিজেদের জীবনে জাহেলী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে, আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহবিমুখ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে বিচার ফয়সালার জন্যে ধর্ণা দিচ্ছে এবং আল্লাহর বিধানের কাছ থেকে বিচার ফয়সালা গ্রহণ করছে না। এই সব চেষ্টা ও তৎপরতা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ধিক্কারযোগ্য। মানুষের সদা পরিবর্তনশীল মনগড়া মতাদর্শসমূহের কাছে নতি স্বীকার করে এ সব চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া ও একে আল্লাহর পথে দাওয়াতদানের সময়োপযোগী পদ্ধতি নামকরণ করা কোনো মুসলমানের পক্ষে সমীচীন নয়।

এর চেয়েও নিকৃষ্ট তৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে আর এক শ্রেণীর মানুষ, যারা ইসলামের ওপর 'সমাজতন্ত্র' ও 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি নামের পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছে। তারা মনে করে যে, এ দ্বারা তারা ইসলামের সেবা করছে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে মানব রচিত একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, যা ভুল ও নির্ভুল এবং ভালো ও মন্দ উভয় ধরনের উপাদানের সমষ্টি। আর 'গণতন্ত্র' হচ্ছে একই ধরনের একটা মানব রচিত শাসন ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক মতবাদ। মানুষের তৈরি অন্য যে কোনো জিনিসের মতো গণতন্ত্রেও ভুল ও নির্ভুল উভয় রকমের উপাদান রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম হচ্ছে একটা পূর্ণাংগ ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা, যাতে রয়েছে চিন্তা ও বিশ্বাসগত মতবাদ, রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আর রয়েছে প্রয়োগিক ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থাও। এ

ব্যবস্থা যেহেতু আল্লাহর তৈরী, তাই এটা সব রকমের দোষক্রটিমুক্ত। আল্লাহর এই নিখুঁত ও নির্ভুল জীবন বিধানকে যে ব্যক্তি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার অভিপ্রায়ে মানুষের বানানো রীতিনীতি বা মতবাদের দ্বারা মিশ্রিত করা কিংবা মানুষের কিছু কথা ও ধ্যান ধারণা দ্বারা মিশ্রিত করার জন্যে অন্য মানুষদের সাহায্য কামনা করে, ইসলামের সাথে তার কিসের সম্পর্ক? আরবের জাহেলী যুগে মোশরেকেরা যা কিছু শেরক ও পৌত্তলিকতার কাজ করতো, তাতো আল্লাহর কতক সৃষ্টিকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করেই করতো। তাদেরকে তারা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা তো কেবল এজন্যেই ওদের উপাসনা করি যেন ওরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।'

এটাই শেরক। এখন যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করছে তারা যদিও সরাসরি তাদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করে না, কিন্তু তারা বান্দাদের রচিত কোনো মতবাদ বা ব্যবস্থাকে আল্লাহর বিধানের সাথে মিশ্রিত করে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসাবে পেশ করে আরো ঘৃণ্য কাজ করছে।

বস্তুত ইসলাম ইসলামই। সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রই। গণতন্ত্র গণতন্ত্রই। ইসলাম আল্লাহর বিধান। এর আর কোনো শিরোনাম নেই এবং আর কোনো বিশেষণ নেই। আল্লাহ তায়ালা এর যে একমাত্র শিরোনাম ও বিশেষণ নির্ধারণ করেছেন, তা হচ্ছে ইসলাম। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র হচ্ছে মানব রচিত ব্যবস্থা। এগুলো মানুষেরই অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত। এগুলোকে যখন কেউ গ্রহণ করতে চায়, তখন তার এ হিসাবেই গ্রহণ করা উচিত। যারা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের মহান কাজে লিপ্ত, তাদের উচিত আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা। প্রচলিত নিত্য পরিবর্তনশীল কোনো মানব রচিত মতবাদের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে তাকে গ্রহণ করা এবং একে ইসলামের খেদমত মনে করা তাদের পক্ষে সমীচীন নয়।

যাদের কাজ ইসলাম মূল্যহীন হয়ে গেছে এবং যারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন এই যে, আজকে যখন আপনারা মানুষের কাছে ইসলামকে সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রের নামে পেশ করছেন কেননা ওই দুটো ব্যবস্থা সমকালীন সমাজে প্রচলিত ও জনপ্রিয়, তাহলে এককালে তো পুঁজিবাদও মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলো। কারণ এর ওছিলায় তারা জমিদারী শোষণ ত্রসন থেকে মুক্তি পেয়েছিলো। অনুরূপভাবে, জাতীয়তাবাদী ঐকতান সৃষ্টি করে বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলোকে অখন্ড রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আনার জন্যে এক সময় একনায়কতন্ত্রও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো, যেমন বিসমার্কের জার্মানীতে ও মাতজীনীর ইটালিতে। এভাবে আগামীতে মানুষের জন্যে মানুষের রচিত কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে সমাজে চালু হয়ে যাবে কে জানে? তাহলে আপনারা এখন ইসলাম সম্পর্কে কী বক্তব্য দেবেন?' কোন জনপ্রিয় মতবাদের মোড়কে মানুষের কাছে ইসলামকে পেশ করবেন?

সূরার বর্তমান পর্বেই শুধু নয়, বরং অন্যান্য স্থানেও কোরআন যে দিক নির্দেশনা দেয়, তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোরআন ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারে নিয়োজিত সম্মানিত ভাইবোনকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চায়। সে চায়, তারা যেন ইসলামকে অন্য কোনো নামে মানুষের সামনে পেশ না করে। তাদের মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর গোলাম মনে করে অথচ আল্লাহর দ্বীনকেই নিজের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে না এবং আল্লাহর বিধান ছাড়া আর সব বিধানের আনুগত্য থেকে সরে

আসে না, আল্লাহর এ দ্বীনের জন্যে সে ধরনের লোকের কোনো প্রয়োজন নেই, যেমন প্রয়োজন নেই স্বয়ং আল্লাহর কোনো অবাধ্য বান্দার।

মৌল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলোর দিক দিয়ে যখন ইসলামের নিজস্ব স্বাতন্ত্র ও মৌলিকত্ব রয়েছে এবং তা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করুক– এটা আল্লাহ তায়ালা চান, তখন একটা কার্যকর জীবন ব্যবস্থা হিসাবেও তার স্বাতন্ত্র ও মৌলিকত্ব রয়েছে, মানুষের সহজাত প্রকৃতি ও মনমগজকে সম্বোধনের পদ্ধতিতেও তার স্বাতন্ত্র ও মৌলিকত্ব রয়েছে। যিনি এই দ্বীনকে তার সমস্ত মৌল বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলোসহ নাযিল করেছেন এবং তার আন্দোলনী চরিত্র ও বিধানসহ নাযিল করেছেন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। মানুষের সৃষ্টিকর্তাও তিনি, আর মানুষের অন্তরে কে কী প্ররোচনা দেয়, সেটাও তিনিই জানেন।

ইসলামী চেতনার সম্মোহনী শক্তি

সূরার এই পর্বটিতে মানুষের বিবেক ও মনমগজকে কিভাবে সম্বোধন করতে হয়, তার একটা নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। সে মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক জগতের সাথে সংযুক্ত করে। বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান শিক্ষাগুলোকে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির সামনে উপস্থাপন করে এবং মানব সত্ত্বাকে এই শিক্ষাগুলো গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। বস্তুত এই শিক্ষা যদি পূর্ণ তীব্রতা ও গভীরতা সহকারে উপস্থাপিত হয়, তাহলে মানুষ তা অবশ্যই গ্রহণ করে। এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন এভাবে, 'যাদের শ্রবণশক্তি আছে, তারাই সত্যকে গ্রহণ করে।'

যে নমুনাটি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো,

'তারা বললো, তাঁর ওপর (অর্থাৎ মোহাম্মদের ওপর) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটা নিদর্শন নেমে এলো না কেন? তুমি বলো, আল্লাহ এই নিদর্শনকে নাযিল করতে সক্ষম। তবে তাদের অধিকাংশই ব্যাপারটা জানে না।'

এই আয়াতে ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদের উক্তি উদ্বৃত করা হয়েছে, তারা এমন একটা অলৌকিক ঘটনার দাবী জানাচ্ছিলো যা শুধু তৎকালীন প্রজন্মই দেখতে পেতো এবং তারপরে তা শেষ হয়ে যেতো। তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর তাদের দাবী মেনে নিলে কী হতো, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাদেরকে পাকড়াও ও ধ্বংস করে দেয়া হতো। আল্লাহ তায়ালা অলৌকিক নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম বটে। তবে তাঁর দয়া ও প্রজ্ঞার দাবী ছিলো তিনি যেন নাযিল না করেন।

অতপর আকস্মিকভাবে তাদেরকে এই সংকীর্ণ চিন্তাগত গন্ডি থেকে বের করে পার্শ্ববর্তী বিরাট বিশাল ও প্রশস্ত প্রকৃতিতে ও তার নিদর্শনাবলীতে স্থানান্তরিত করে। বিশ্ব প্রকৃতির সেই সব নিদর্শনের তুলনায় তাদের দাবী করা নিদর্শন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আর সে সব নিদর্শন বিশ্ব প্রকৃতির পৃষ্ঠদেশে পূর্বের ও পরের প্রজন্মগুলোর দর্শনের জন্যে সংরক্ষিত রয়েছে। সেই নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে,

'পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, ...' (আয়াত ৩৮)

বস্তুত এটা একটা তাৎপর্যময় সত্য। সে সময় এমন কোনো সুসংবদ্ধ বিজ্ঞান ছিলো না যে, এ সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এতে বলা হয়েছে যে, পশু, পাখি ও কীটপতংগকে এক একটা জাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও জাতিয়তা রয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এ সত্যটিকে আরো স্পষ্ট করে দেখার অবকাশ সুযোগ হয়েছে। তবে এর মূল উপাদান বৃদ্ধি করে না ও করবে না। এর পাশাপাশি রয়েছে অদৃশ্য সত্য। সেটি হলো, এই সকল জিনিসকে

আল্লাহ তায়ালা নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং পরিচালনা করছেন, উপরোক্ত প্রকাশ্য সত্য এই অদৃশ্য সত্যের সপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং যেখানেই তারা চোখ মেলে তাকাবে ও হৃদয় দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে, সেখানে যে প্রকান্ডতম অলৌকিক নিদর্শন বিরাজ করছে, তার তুলনায় তাদের দাবী করা বস্তুগত অলৌকিক নিদর্শনের গুরুত্ব কতটুকু?

এই নমুনার মাঝে কোরআনের যে মূলনীতি আলোচিত হয়েছে, তা তার বিবেক ও প্রকৃতিকে মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত করার চেয়ে বেশী কিছু করে না। তার প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের মাঝে উভয়ের জানালাগুলো খুলে দেয়। আর এই মহাবিশ্ব মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বদ্ধমূল করে দেয়।

এই নমুনা মানুষের স্বভাবগত বিবেক বুদ্ধি ও চেতনার কাছে এমন কোনো খোদাতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিকদর্শন বা আকীদাতাত্ত্বিক দর্শন পেশ করে না, যা ইসলামী বিধানের কাছে অপরিচিত। তার কাছে কোনো ঐন্দ্রিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনও পেশ করে না। তার কাছে কেবল দৃশ্যমান বাস্তব প্রাকৃতিক জগতকে তুলে ধরে এবং সেই সাথে তার দুই জগত-দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতকে তুলে ধরে। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে সে এই প্রাকৃতিক জগতের কাছ থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তবে এই শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করাটা অবশ্যই একটা সুনির্দিষ্ট বিধানের আওতাধীন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে হওয়া চাই। এমনভাবে হওয়া চাই না যে, সে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়।

অতপর প্রকৃতির এই মহা নিদর্শনগুলোকে অস্বীকারকারীদের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে এই পর্বের শেষ আয়াতটিতে,

'যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে, তারা বোবা ও বধির হয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে..........' (আয়াত ৩৯)

অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারীদের প্রকৃত অবস্থা যে কিরূপ, তা এই আয়াত থেকে পরিস্ফুট। তারা বোবা ও বধির এবং ঘোর অন্ধকারে পতিত। এরপর হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে আল্লাহর নীতি কি, তা জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে এই যে, হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর ইচ্ছার ওপর এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে যে স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেই স্বভাব প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

এভাবে ইসলামী মতাদর্শের সব কটি দিক পরস্পরের সাথে মিলিত ও সমন্বিত হয়। সেই সাথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান ও দাওয়াতকারীদের কার্যকর ভূমিকা স্পষ্ট হয়। এই আকীদা ও আদর্শকে সাথে নিয়েই দাওয়াতদাতা সামনে এগিয়ে চলে এবং সকল অবস্থায় ও প্রতিটি প্রজন্মে সে মানুষের হৃদয় জয় করার জন্যে সচেষ্ট হয়।

এই আলোচনা ও সূরার ভূমিকা একত্রে পড়লে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে এমন স্পষ্ট ধারণা জন্মে যে, তাতে করে গোটা জীবন পথই আলোকিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে সেই আলোকিত আদর্শের পথে চলবার তাওফীক দেন। (আয়াত ৪০-৪৯)

এই পর্বটিতে পবিত্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত দুর্যোগ দুর্বিপাকের সময় মোশরেকদের স্বভাব প্রকৃতি কিরূপ ধারণ করে, তার বিবরণ দিয়েছে। এই সময় তাদের জন্মগত বিবেক বুদ্ধি ও মন মগজ একটা আতংকজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারা তাদের মনগড়া বাতিল মাবুদ তথা দেব দেবীর কথা ভুলে যায় এবং তাদের চির পরিচিত মহা প্রভুর দিকে তাৎক্ষণিকভাবে ও সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করে, কেবল তাঁর কাছেই পরিত্রাণ চায়।

অতপর এ আয়াতগুলো মোশরেকদেরকে তাদের অতীত পূর্বপুরুষদের সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে, তাদেরকে দেখিয়ে দেয় আল্লাহর নীতি ও সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাদের চর্মচক্ষু ও অন্তচঁক্ষু উভয়কে দেখিয়ে দেয় আল্লাহর নবীদেরকে অস্বীকার করার পর কিভাবে তিনি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস ও পতনের দিকে ঠেলে দেন। কিভাবে তাদেরকে একের পর এক বিপদ মুসিবত, দুর্যোগ এবং তারপর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়েও পরীক্ষা করেন। কিভাবে তাদেরকে উদাসীনতার গাঢ় নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার জন্যে সুযোগের পর সুযোগ দিতে থাকেন। অতপর যখন সকল সুযোগকে তারা হাতছাড়া করে এবং বিপদ মুসিবতেও যখন তাদের চেতনা ফিরে আসে না, তখন আবার কিছু দিন সুখ সমৃদ্ধিতে গা ভাসানোর সুযোগ দেন। অবশেষে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আল্লাহর শেষ ফয়সালা বলবৎ হয়ে যায় এবং আকস্মিকভাবে তাদের ওপর আযাব এসে তাদেরকে সমূলে নিপাত করে দেয়।

হৃদয়মনকে প্রকম্পিত ও আলোড়িতকারী এই মহা দুর্যোগ অতিক্রান্ত হতে না হতেই তাদের ওপর এসে পড়ে আরেক দুর্যোগ। তারা পুনরায় আল্লাহর আযাবের শিকার হয় এভাবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং এরপর তাদের আর স্বকল্পিত মাবুদ তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

এই ভয়াবহ দু'টি দুর্যোগের শিকার হওয়া অবস্থায় তাদের সাথে রসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বলা হয় যে, তাদের দায়িত্ব মানুষকে যুগপৎ সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানো বা তাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন কাজ করা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা প্রচারক মাত্র। তারা আখেরাতের আযাব থেকে সতর্ক ও পুরস্কারের সুসংবাদ দেবেন। অতপর যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে, তারা বিপদ ও আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর যারা অস্বীকার করবে, তারা আযাব ভোগ করবে। কাজেই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। কোনটার কী পরিণতি, সেটা যেন সে জেনে নেয়।

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর আযাব এসে পড়ে ......' (আয়াত ৪০ - ৪১)

আল্লাহ মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি তথা তার বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনায় ইসলামী আকীদা ও আদর্শ সংক্রান্ত বক্তব্য কিভাবে বদ্ধমূল করেন, এটা তার একটা নমুনা। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে ও তার পূর্বে যেভাবে এ আদর্শ তুলে ধরেছেন, সেটা একটা ভিন্নতর নমুনা। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, জীব জগতে আল্লাহর সূক্ষ্ম শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার কী কী নিদর্শন রয়েছে এবং কি ভাবে তিনি সে সব সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন ও তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاۤءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَاۤ اِذْ جَاۤءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ

৪০. তুমি বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যখন তোমাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে (বড়ো ধরনের) কোনো আযাব আসবে, কিংবা হঠাৎ করে কেয়ামত এসে হাযির হবে, তখন তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? (বলো) যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ৪১. বরং তোমরা (তো সেদিন) শুধু তাঁকেই ডাকবে, তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দূর করে দেবেন (এবং) যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাতে, তাদের সবাইকেই (তখন) তোমরা ভুলে যাবে।

রুকু ৫

৪২. তোমার আগের জাতিসমূহের কাছেও আমি আমার রসূল পাঠিয়েছিলাম, তাদেরও আমি দুঃখ-কষ্ট ও বিপর্যয়ে (-র জালে) আটকে রেখেছিলাম, যাতে করে তারা বিনয়ের সাথে নতিস্বীকার করে। ৪৩. কিন্তু সত্যিই যখন তাদের ওপর আমার বিপর্যয় এসে আপতিত হলো, তখনও তারা কেন বিনীত হলো না, অধিকন্তু তাদের অন্তর এতে আরো শক্ত হয়ে গেলো এবং তারা যা করে যাচ্ছিলো, শয়তান তাদের কাছে তা শোভনীয় করে তুলে ধরলো। ৪৪. অতপর তারা সে সব কিছুই ভুলে গেলো, যা তাদের (বার বার) স্মরণ করানো হয়েছিলো; তারপরও আমি তাদের ওপর (সচ্ছলতার) সব কয়টি দুয়ারই খুলে দিলাম; শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাতেই মত্ত হয়ে গেলো যা তাদের দেয়া হয়েছিলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করে নিলাম, ফলে তারা নিরাশ হয়ে পড়লো। ৪৫. (এভাবেই) যারাই (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) যুলুম করেছে, তাদেরই মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, যিনি সৃষ্টিকুলের মালিক। ৪৬. (হে রসূল, তাদের) তুমি বলো, তোমরা কি একথা ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তায়ালা

سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ

عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ

الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

কখনো তোমাদের শোনার ও দেখার ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের ওপর মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের এসব কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবে; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমার আয়াতসমূহ আমি খুলে খুলে বর্ণনা করছি, এ সত্ত্বেও অতপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৪৭. তুমি বলো, তোমরা চিন্তা করে দেখেছো কি, যদি কখনো অকস্মাৎ (গোপনে) কিংবা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর আযাব তোমাদের ওপর আপতিত হয়, (তাতে) কতিপয় যালেম সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি? ৪৮. আমি তো রসূলদের (জান্নাতের) সুসংবাদবাহী ও (জাহান্নামের) সতর্ককারী ছাড়া অন্য কোনো হিসেবে পাঠাই না, অতপর যে ব্যক্তি (রসূলদের ওপর) ঈমান আনবে এবং (তাদের কথা মতো) নিজেকে সংশোধন করে নেবে, এমন লোকদের (পরকালে) কোনো ভয় নেই এবং তাদের (সেদিন) কোনোরকম চিন্তিতও হতে হবে না। ৪৯. (অপরদিকে) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তাদের এই নাফরমানীর কারণে আমার আযাব তাদের ঘিরে ধরবে।

তাফসীর

আয়াত ৪০-৪৯

এই পর্বটিতে পবিত্র কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত দুর্যোগ দুর্বিপাকের সময় মোশরেকদের স্বভাব প্রকৃতি কিরূপ ধারণ করে, তার বিবরণ দিয়েছে। এই সময় তাদের জন্মগত বিবেক বুদ্ধি ও মন মগজ একটা আতংকজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে গিয়ে যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তারা তাদের মনগড়া বাতিল মাবুদ তথা দেব দেবীর কথা ভুলে যায় এবং তাদের চির পরিচিত মহা প্রভুর দিকে তাৎক্ষণিকভাবে ও সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করে, কেবল তাঁর কাছেই পরিত্রাণ চায়।

অতপর এ আয়াতগুলো মোশরেকদেরকে তাদের অতীত পূর্বপুরুষদের সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে, তাদেরকে দেখিয়ে দেয় আল্লাহর নীতি ও সিদ্ধান্ত কিভাবে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাদের চর্মচক্ষু ও অন্তচক্ষু উভয়কে দেখিয়ে দেয় আল্লাহর নবীদেরকে অস্বীকার করার পর

কিভাবে তিনি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস ও পতনের দিকে ঠেলে দেন। কিভাবে তাদেরকে একের পর এক বিপদ মুসিবত, দুর্যোগ এবং তারপর সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি দিয়েও পরীক্ষা করেন। কিভাবে তাদেরকে উদাসীনতার গাঢ় নিদ্রা থেকে জেগে ওঠার জন্যে সুযোগের পর সুযোগ দিতে থাকেন। অতপর যখন সকল সুযোগকে তারা হাতছাড়া করে এবং বিপদ মুসিবতেও যখন তাদের চেতনা ফিরে আসে না, তখন আবার কিছু দিন সুখ সমৃদ্ধিতে গা ভাসানোর সুযোগ দেন। অবশেষে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী আল্লাহর শেষ ফয়সালা বলবৎ হয়ে যায় এবং আকস্মিকভাবে তাদের ওপর আযাব এসে তাদেরকে সমূলে নিপাত করে দেয়।

হৃদয়মনকে প্রকম্পিত ও আলোড়িতকারী এই মহা দুর্যোগ অতিক্রান্ত হতে না হতেই তাদের ওপর এসে পড়ে আরেক দুর্যোগ। তারা পুনরায় আল্লাহর আযাবের শিকার হয় আল্লাহ তায়ালা তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি ছিনিয়ে নেন এবং এরপর তাদের কল্পিত মাবুদ তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি আর ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

এই ভয়াবহ দু'টি দুর্যোগের শিকার হওয়া অবস্থায় তাদের সাথে রসূলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বলা হয় যে, তাদের দায়িত্ব মানুষকে সর্বাত্মকভাবে সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটানো বা তাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন কাজ করা তাদের দায়িত্ব নয়। তারা প্রচারক মাত্র। তারা আখেরাতের আযাব থেকে সতর্ক ও পুরস্কারের সুসংবাদ দেবেন। অতপর যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে, তারা বিপদ ও আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর যারা অস্বীকার করবে, তারা আযাব ভোগ করবে। কাজেই যার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক। কোনটার কী পরিণতি, সেটা যেন সে জেনে নেয়।

তাওহীদ বিশ্বাস প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রবনতা

'বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর আযাব এসে পড়ে ......' (আয়াত ৪০ - ৪১)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি তথা তার বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনায় ইসলামী আকীদা ও আদর্শ সংক্রান্ত বক্তব্য কিভাবে বদ্ধমূল করেন, এটা তার একটা নমুনা। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে ও তার পূর্বে যেভাবে এ আদর্শ তুলে ধরেছেন, এ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্নতর নমুনা। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, জীব জগতে আল্লাহর সূক্ষ্ম শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনার কী কী নিদর্শন রয়েছে এবং কি ভাবে তিনি সে সব সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান রাখেন ও তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আল্লাহর তরফ থেকে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোনো সাংঘাতিক ধরনের দুর্যোগের মুখোমুখি হলে তার সহজাত স্বভাব প্রকৃতি ও বিবেক বুদ্ধির কী অবস্থা হয় সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এটা সবার জানা যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে তার মনমগজ থেকে শেরক ও পৌত্তলিকতার সমস্ত আবিলতা দূর হয়ে যায় এবং তার অন্তরে আল্লাহর যে আসল তাওহীদবাদী পরিচয় সুপ্তভাবে বিরাজমান ছিলো, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ৪০ নং আয়াতের বক্তব্য লক্ষ্য করুন।

বস্তুত এ আয়াতটিতে দেখানো হয়েছে দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন দুর্যোগাদি দিয়ে জানমালের ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে যে আযাব দেন, সে আযাবের ভয়াবহতা কল্পনা করলে মানুষের স্বাভাবিক বিবেক ও চেতনার কী অবস্থা হয়। অনুরূপভাবে সহসা কেয়ামত সংঘটিত হবার কথা কল্পনা করলেও বা তার কী অবস্থা হয়, তা দেখানো হয়েছে। আল্লাহর জানা আছে যে,

এহেন ভয়াবহ দৃশ্য কল্পনা করতেও মানুষ শিউরে ওঠে এবং এই কল্পনার বাস্তব রূপ কেমন, তাও উপলব্ধি করে। কেননা সে তার অভ্যন্তরে সুপ্ত একটি বাস্তব অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ জানেন যে, এই বাস্তব অবস্থা তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। তাই সেই বাস্তব অবস্থাকে লক্ষ্য করেই তিনি কথা বলছেন। এ কারণেই তার স্বভাব-প্রকৃতি প্রকম্পিত হয় এবং সকল আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে আসল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন এবং তাদের মুখ থেকে সত্য জবাব চান, যাতে করে তা তাদের সহজাত স্বভাব ও বিবেকের প্রকৃত ও সঠিক জবাব হয়। তিনি প্রশ্ন করেন,

'তোমরা কি তাহলে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে ডাকবে? সত্যবাদী হয়ে থাকলে সঠিক জবাব দাও।'

এরপর তিনি নিজেই সঠিক জবাব জানিয়ে দেন। এ জবাব অবচেতনভাবে মোশরেকদের বিবেক ও মনে ও সুপ্ত রয়েছে, যদিও তারা মুখ দিয়ে সে কথা বলে না।

'বরং (সেদিন) তোমরা তো শুধু তাঁকেই ডাকবে। তোমরা যে জন্যে তাঁকে ডাকবে তিনি চাইলে তা দুর করে দেবেন'।

অর্থাৎ তোমরা শুধু আল্লাহকেই ডেকে থাকো এবং অন্য সমস্ত দেব-দেবী ও বাতিল খোদাকে ভুলে যাও। বিপদের ভয়াবহতা তোমাদের সহজাত চেতনা ও বিবেক বুদ্ধিকে অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং মুক্তি লাভের জন্যে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্য কাউকে যে ইতিপূর্বে আল্লাহর শরীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলো, তাও সে ভুলে যায়। কারণ প্রতিপালক আল্লাহর পরিচয়টাই তার সহজাত সত্ত্বার অভ্যন্তরে তথা তার বিবেক ও মনমগজে স্থায়ী সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর এই শেরক ও পৌত্তলিকতা নিছক একটা অস্থায়ী খোলস মাত্র। বিভিন্ন কারণে এই খোলস তার সাথে যুক্ত হয়। দুর্যোগ ও বিপদের আতংক তাকে এমনভাবে ঝাঁকুনি দেয় যে, সেই ঝাঁকুনিতে ওই খোলস অপসৃত হয়ে যায়। আর খোলস অপসৃত হওয়ার পর আসল জিনিসটা বেরিয়ে আসে। সহজাত মানব সত্ত্বা তখন তার স্রষ্টার প্রতি স্বাভাবিক ও স্বতক্ষূর্তভাবে মনোনিবেশ করে। সে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানায়, তিনি যেন তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কেননা তিনি ছাড়া তাকে উদ্ধার করতে পারে এমন আর কেউ নেই। উদ্ধার পাওয়ার আর কোনো কৌশলও তার হাতে নেই।

ভয়ভীতি ও বিপদ মুসীবতের কবলে পড়ে স্বাভাবিক মানব সত্ত্বা এভাবেই আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। আর এই সত্য নিয়েই কোরআন মোশরেকদের মুখোমুখি হয়। আল্লাহ তায়ালা দুর্যোগ কবলিত মোশরেকদের মিনতি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে বিবেচনা করেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ শৃংখলিত করতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করলে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তা সে পুরোপুরিভাবেই হোক কিংবা আংশিকভাবেই হোক। আর ইচ্ছা না করলে নিজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা অনুসারে বিপদোদ্ধারের মিনতি অগ্রাহ্য করেন।

বস্তুত শেরক হচ্ছে মানব স্বভাবের সাময়িক পদস্খলন। বিভিন্ন কারণে তার অভ্যন্তরে বিরাজমান সত্য যখন আচরণে আচ্ছাদিত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আল্লাহর একত্ববাদের সাথে তার পরিচয় যখন ঢাকা পড়ে যায়, তখনই তার মধ্যে এই পদস্খল ঘটে। তবে আল্লাহর অস্তিত্বের পুরোপুরি অস্বীকৃতি তথা নাস্তিক্যবাদকে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি কখনো স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়নি।

ইতিপূর্বে আমি একবার বলেছি যে, যারা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করে বলে দাবী করে, তারা সত্যিই তাতে বিশ্বাসী কিনা, সে ব্যাপারে আমি গভীরভাবে সন্দিহান। আল্লাহর হাতের তৈরি কোনো সৃষ্টি বিকৃতির এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে যে, তার সেই হাতের ছাপ তার ওপর থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ মহান আল্লাহর হাতের ছাপ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুতে ও পরতে পরতে থাকে।

আসলে ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে সৃষ্ট জগতের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাত, অমানুষিক নির্যাতন, দমন ও নিপীড়ন, ধর্মীয় নেতৃত্ব কর্তৃক মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকে অস্বীকার, অথচ নিজেদের বিকৃত ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া, ইত্যাকার ঘৃণ্য জীবনাচারে কলংকিত ইউরোপের বহু শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দেরকে নাস্তিক্যবাদের এমন নিকৃষ্টতম স্তরে নিক্ষেপ করেছে। এ যেন তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার এক মর্মান্তিক মহড়া।

খৃষ্টান জগতের এই ঐতিহাসিক অধোপতনকে এক মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে কুচক্রী ইহুদী জাতি। তারা খৃষ্টানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে আরো দূরে ঠেলে দিতে সচেষ্ট হয়, যাতে তাদের ওপর নিজেদের নেতৃত্বকে চাপিয়ে দিতে পারে, তাদের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে তাদের জাতীয় সত্ত্বাকে ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাতে সহজ হয়, 'তালমুদ' এবং ইহুদীবাদী পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবিদের নীলনকশা অনুযায়ী তাদেরকে গাধার মতো খাটানোর পথ যাতে সুগম হয়, সে জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ইহুদী জাতির একান্ত প্রয়োজন ছিলো ইউরোপের সেই পতনোন্মুখ ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে গীর্জার আনুগত্য থেকে মুক্ত করার জন্যে নাস্তিক্যবাদে দীক্ষিত করা।

রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিলো একটা ইহুদী সংগঠন এবং অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল ধরে এই দল সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়োগ করে নাস্তিক্যবাদের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির এই সর্বাত্মক চেষ্টা সত্তেও রুশ জাতির অন্তরের অন্তস্থলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি নরপশু ষ্ট্যালিনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বড় বড় ধর্মযাজককে কারামুক্ত করতে বাধ্য হয় বলে তার উত্তরসূরী ক্রুশ্চেভ জানিয়েছেন। কেননা সাধারণ মানুষের মনমস্তিষ্ক ও বিবেকে আল্লাহর প্রতি যে স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাস বিরাজ করতো, যুদ্ধের প্রবল চাপ ষ্ট্যালিনকে সেই বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিতে ও তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিলো, চাই তার নিজের ও তার সাংগ-পাংগদের বিশ্বাস এ সম্পর্কে যাই-ই থাক না কেন।(১)

যে সব খৃষ্টানকে 'গাধার' মতো পেলে পুষে ইহুদী জাতি ক্রুসেডারে পরিণত করতে পেরেছিলো, তাদের সাহায্য নিয়ে তারা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। যদিও মুসলিম জাতিসমূহের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কিছু লোককে তারা নাস্তিকতার বাড় গেলাতে সক্ষম হয়েছিলো এবং এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের অন্তরে ইসলামী আকীদা ও ঈমান আগে থেকেই দুর্বল ছিলো, তথাপি তুরস্কের 'মহান নেতা'? কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের এই চেষ্টা সফল হয়নি। অথচ কামাল পাশা, তার প্রচারিত এই মতবাদ তার যুগান্তকারী পরীক্ষা নিরীক্ষার গুণকীর্তন করে বিস্তর সাহিত্য রচিত হয়েছে। এরপর কামাল পাশার পরীক্ষা নিরীক্ষাকে কাজে লাগানো অব্যাহত থাকলেও তার ওপর নাস্তিক্যবাদের পতাকা নয় বরং ইসলামের পতাকা ওড়ানো হয়, যাতে মানুষের জন্মগত চেতনা ও আবেগের সাথে সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে না হয়, যেমনটি হতে হয়েছিলো কামাল আতাতুর্ককে। ইসলামের পতাকা উড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে চরিত্র বিধ্বংসী নোংরা ও কদর্য মতাদর্শ।(২)

---

(১) এটা ১৯৫৭ সালের লেখা।

(২) তুরস্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সবাইকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো– কামাল পাশার ধর্ম নিরপেক্ষতার আনোদালন কিভাবে আজ ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে।–সম্পাদক

ইতিপূর্বে আমি একবার বলেছি যে, যারা নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করে বলে দাবী করে, তারা সত্যিই তাতে বিশ্বাসী কিনা, সে ব্যাপারে আমি গভীরভাবে সন্দিহান। আল্লাহর হাতের তৈরি কোনো সৃষ্টি বিকৃতির এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে যে, তার সেই হাতের ছাপ তার ওপর থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ মহান আল্লাহর হাতের ছাপ তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি অণু পরমাণুতে ও পরতে পরতে থাকে।

আসলে ধর্মীয় নেতৃত্বের সাথে সৃষ্ট জগতের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাত, অমানুষিক নির্যাতন, দমন ও নিপীড়ন, ধর্মীয় নেতৃত্ব কর্তৃক মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদাকে অস্বীকার, অথচ নিজেদের বিকৃত ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়া, ইত্যাকার ঘৃণ্য জীবনাচারে কলংকিত ইউরোপের বহু শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাস শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দেরকে নাস্তিক্যবাদের এমন নিকৃষ্টতম স্তরে নিক্ষেপ করেছে। এ যেন তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার এক মর্মান্তিক মহড়া।

খৃষ্টান জগতের এই ঐতিহাসিক অধোপতনকে এক মোক্ষম সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে কুচক্রী ইহুদী জাতি। তারা খৃষ্টানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে আরো দূরে ঠেলে দিতে সচেষ্ট হয়, যাতে তাদের ওপর নিজেদের নেতৃত্বকে চাপিয়ে দিতে পারে, তাদের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে তাদের জাতীয় সত্ত্বাকে ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাতে সহজ হয়, 'তালমুদ' এবং ইহুদীবাদী পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবিদের নীলনকশা অনুযায়ী তাদেরকে গাধার মতো খাটানোর পথ যাতে সুগম হয়, সে জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে ইহুদী জাতির একান্ত প্রয়োজন ছিলো ইউরোপের সেই পতনোন্মুখ ইতিহাসকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে গীর্জার আনুগত্য থেকে মুক্ত করার জন্যে নাস্তিক্যবাদে দীক্ষিত করা।

রুশ কমিউনিষ্ট পার্টিও ছিলো একটা ইহুদী সংগঠন এবং অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল ধরে এই দল সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি নিয়োগ করে নাস্তিক্যবাদের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির এই সর্বাত্মক চেষ্টা সত্তেও রুশ জাতির অন্তরের অন্তস্থলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি নরপশু ষ্ট্যালিনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বড় বড় ধর্মযাজককে কারামুক্ত করতে বাধ্য হয় বলে তার উত্তরসূরী ক্রুশ্চেভ জানিয়েছেন। কেননা সাধারণ মানুষের মনমস্তিষ্ক ও বিবেকে আল্লাহর প্রতি যে স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত বিশ্বাস বিরাজ করতো, যুদ্ধের প্রবল চাপ ষ্ট্যালিনকে সেই বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিতে ও তার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিলো, চাই তার নিজের ও তার সাংগ-পাংগদের বিশ্বাস এ সম্পর্কে যাই-ই থাক না কেন।(১)

যে সব খৃষ্টানকে 'গাধার' মতো পেলে পুষে ইহুদী জাতি ক্রুসেডারে পরিণত করতে পেরেছিলো, তাদের সাহায্য নিয়ে তারা মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে নাস্তিকতার বিস্তার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। যদিও মুসলিম জাতিসমূহের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কিছু লোককে তারা নাস্তিকতার বাড় গেলাতে সক্ষম হয়েছিলো এবং এই মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের অন্তরে ইসলামী আকীদা ও ঈমান আগে থেকেই দুর্বল ছিলো, তথাপি তুরস্কের 'মহান নেতা'? কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ বিস্তারের এই চেষ্টা সফল হয়নি। অথচ কামাল পাশা, তার প্রচারিত এই মতবাদ তার যুগান্তকারী পরীক্ষা নিরীক্ষার গুণকীর্তন করে বিস্তর সাহিত্য রচিত হয়েছে। এরপর কামাল পাশার পরীক্ষা নিরীক্ষাকে কাজে লাগানো অব্যাহত থাকলেও তার ওপর নাস্তিক্যবাদের পতাকা নয় বরং ইসলামের পতাকা ওড়ানো হয়, যাতে মানুষের জন্মগত চেতনা ও আবেগের সাথে সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে না হয়, যেমনটি হতে হয়েছিলো কামাল আতাতুর্ককে। ইসলামের পতাকা উড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে চরিত্র বিধ্বংসী নোংরা ও কদর্য মতাদর্শ।(২)

---

(১) এটা ১৯৫৭ সালের লেখা।

(২) তুরস্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সবাইকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো– কামাল পাশার ধর্ম নিরপেক্ষতার আনোদালন কিভাবে আজ ব্যর্থতায় পর্যবষিত হয়েছে।–সম্পাদক

তবে এসব কিছু সত্তেও যে জিনিসটি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা হলো, মানুষের জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি এবং স্বতস্ফূর্ত বিবেক ও চেতনা মহান প্রতিপালক আল্লাহকে খুব ভালোভাবে চিনে এবং তাঁর একত্বে তার অটল বিশ্বাস রয়েছে। সাময়িকভাবে এর ওপর কোনো আচরণ পড়লেও যে কোনো বিপদাপদের আঘাতে তা দূর হয়ে যায় এবং তা প্রথম সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ফিরে যায়। সেই ঈমান আনুগত্য ও খোদাভীতি ফিরে আসে। কুচক্রীদের সকল চক্রান্ত নসাৎ করার জন্যে সত্যের একটি চিৎকারই যথেষ্ট। সত্যের এক চিৎকারেই মানুষের স্বভাব প্রকৃতি তার স্রষ্টার অনুগত হয়ে যায়। পৃথিবীতে এই চিৎকার দেয়ার মতো লোক থাকতে বাতিল শক্তি কখনো সফল হতে পারবে না। আর সত্যের পক্ষে আওয়ায তোলা ও চিৎকার দেয়ার মতো লোকের পৃথিবীতে কখনো অভাব হবে না, তা ইসলামের শত্রুরা যতো ষড়যন্ত্রই আটুক।

কোরআনে উপস্থাপিত ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

'আমি তোমার পূর্ববর্তী বহু জাতির কাছে নবীদেরকে পাঠিয়েছি, অতপর তাদেরকে বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত করেছি, যেন তারা বিনীত হয়, ... (আয়াত ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪)

এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রাকৃতিক দুর্যোগাদির একটি নমুনা তুলে ধরা হয়েছে। এটা ইতিহাসেরও একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। মানুষ কিভাবে আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়, তার পরিণতি কী হয়ে থাকে, কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্রমাগত সতর্ক করেন ও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেন। অতপর এতো সুযোগ দান ও সতর্কীকরণের পরও যখন তারা অবজ্ঞা ও অবহেলা অব্যাহত রাখে, বিপদ মুসিবতের কঠোরতা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দেয় না, আল্লাহর দেয়া নেয়ামত ও সুখ সমৃদ্ধি যখন তাদেরকে কৃতজ্ঞ হতে ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে না, তখন আল্লাহ তায়ালা কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, সেটাই এই কটি আয়াতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, যারা এতো সতর্ক করা ও এতো সুযোগ দেয়া সত্তেও সৎপথে ফিরে আসে না, বুঝতে হবে যে, তাদের স্বভাব প্রকৃতি ও জন্মগত বিবেক-বুদ্ধি এতো বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেছে যে, তা আর ভালো হবার আশা করা যায় না এবং তাদের জীবন এতো খারাপ হয়ে গেছে যে, তাদের আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এসব লোকের ওপর আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হয়ে থাকে এবং তাদের জনপদে অনিবার্য ধ্বংস নেমে আসে।

পুনরায় আয়াত নং ৪১ ও ৪২ দ্রষ্টব্য, 'আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম ....'

মানব জাতি এ ধরনের বহু জাতির ইতিহাস জেনেছে। স্বয়ং কোরআন এ ধরনের বহু জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছে। মানব রচিত ইতিহাসের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই কোরআনের এই ইতিবৃত্তের শুরু। মানুষ যে ইতিহাস রচনা করেছে, তা অল্প দিন আগের তৈরী। এটা পৃথিবীতে মানব জাতির জীবন যাপনের অতি ক্ষুদ্র সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ। এ ইতিহাস শুধু যে ক্ষুদ্র, সীমিত ও অসম্পূর্ণ তা নয়, বরং তা মিথ্যা ও ভুল বর্ণনায়ও পরিপূর্ণ। মানুষ মানবেতিহাসের বহু খুঁটিনাটি ঘটনা ও সেই সব ঘটনার পেছনের ঘটনা সংগ্রহ করতে সক্ষমই নয়। কেননা এর সব কিছু মানুষের জানাই সম্ভব নয়। এর কতক মানুষের অন্তরের গভীরে এবং কেতক দৃষ্টির আড়ালে বিরাজ করে। এ সব ঘটনা ও তার কার্যকারণের অংশ বিশেষই শুধু প্রকাশ পায়। অথচ এই প্রকাশ্য অংশটুকু সংগ্রহ ও সংকলন করতেও মানুষ অনেক ভুল করে, কোথাও বা মানুষ এর

ব্যাখ্যায় ভুল করে। কোথাও বা ভুল ও নির্ভুল তথ্য বেছে নিতে ভুল করে। যারা দাবী করে যে, তারা মানব জাতির ইতিহাসকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে রচনা করেছে এবং তারা এর 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং এর অনিবার্য পরিণতি সম্পর্কে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারে, তাদের এ দাবীর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কিছু হতে পারে না। মানুষ যে এতো বড় মিথ্যা বাগাড়ম্বর করার স্পর্ধা দেখায়, এটাই একটা বিস্ময়। তার চেয়েও বড় বিস্ময় এই যে, অন্য কিছু লোক এই মিথ্যা বাগাড়ম্বরকে বিশ্বাস করে। এই বাগাড়ম্বরকারীরা যদি বলতো যে, এটা তাদের ধারণা ও অনুমান, তাও না হয় কিছুটা সহনীয় হতো। কিন্তু তারা বলে কিনা, এ একেবারে অকাট্য সত্য। তবে মিথ্যাবাদীরা যখন তাদের মিথ্যা ভাষণকে অকপটে বিশ্বাস করার মতো সহজ সরল লোক পেয়ে যায়, তখন মিথ্যা রটনা কেনই বা করবে না।

আসল সত্যবাদী হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনিই বলতে পারেন ধ্রুব সত্য। কেননা কবে কী ও কেন ঘটেছিলো, সে কথা কেবল তিনিই নির্ভুলভবে জানেন। তিনিই তাঁর বান্দাদেরকে দয়াপরবশ হয়ে ও অনুগ্রহ করে তাঁর নীতি ও সিদ্ধান্তের-কিছু কিছু গোপন রহস্য অবহিত করেন, যাতে তারা সাবধান হয় ও শুধরে যায় এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অন্তরালে যে গোপন ও প্রকাশ্য কারণ ও উপকরণ সক্রিয় থাকে তাও উপলব্ধি করে, এদ্বারা তারা ঐতিহাসিক ঘটনার পূর্ণাংগ ও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে। এই উপলব্ধি ও অবগতি লাভের পর ভবিষ্যতে কী ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে তাও বলতে পারবে এবং আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতির আলোকে তার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। আল্লাহর এই নীতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রকাশ করে থাকেন।

এ আয়াত কয়টিতে বিভিন্ন জাতিতে বারবার সংঘটিত ঘটনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এই সব জাতির কাছে তাদের নবীরা আসতেন, আর তারা তাদেরকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত করতেন, তাদের জান, মাল, পরিস্থিতি ও পরিবেশের ক্ষতি সাধন করতেন। তবে এই সব বিপদ মুসিবত পূর্ববর্তী (৩৯ নং) আয়াতে বর্ণিত 'আল্লাহর আযাব' পদবাচ্য নয়, অর্থাৎ তা এত মারাত্মক কোনো ধ্বংসবজ্ঞ ঘটানো হতো না যে, গোটা জাতি ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কোরআন ফেরাউন ও তার জাতির ইতিহাসের মাঝে এ ধরনের জাতি ও তাদের জীবনে সংঘটিত সীমিত সতর্কতামূলক ও সংশোধনমূলক বিপদ মুসিবতের কিছু উদাহরণ পেশ করেছে। যেমন সূরা আরাফে বলেছেন, 'আমি ফেরাউনের জাতিকে দুর্ভিক্ষ ও ফসলের ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে শাস্তি দিয়েছিলাম, যাতে শিক্ষা গ্রহণ করে .... তাদের ওপর ঝড় বন্যা, কীটপতঙ্গ, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত পাঠিয়েছিলাম বিস্তারিত নিদর্শনাবলী হিসাবে। কিন্তু তারা অহংকার প্রদর্শন করে। আসলে তারা ছিলো এক চরম অপরাধী জাতি।'

এই আয়াতে যে ধরনের শিক্ষামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক পার্থিব শাস্তির ইংগিত দেয়া হয়েছে, সূরা আরাফের উদাহরণটি তারই একটি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের আত্মশুদ্ধির সুযোগ দান, তাদের বিবেককে জাগ্রত ও সচেতন করা ও তাদের আচরণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই কঠিন বিপদ মুসিবত ও দুর্যোগে আক্রান্ত করতেন। এ ধরনের বিপদে পড়ে যাতে তারা আল্লাহর অনুগত হয়, অহংকার পরিহার করে, একনিষ্ঠ মনে বিপদ উদ্ধারের জন্যে আল্লাহকে ডাকে এবং আল্লাহর রহমত কামনা করে, সে জন্যে এ সব মুসিবত দিতেন। কিন্তু তারা এতে প্রত্যাশা অনুযায়ী সতর্ক হতো না ও আত্মশুদ্ধি করতো না, আল্লাহর কাছে বিনয় ও অনুতাপ প্রকাশ করতো না। তাদের বিবেক বিবেচনা ফিরে আসতো না, তাদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মুক্ত হতো না, এবং

তাদের মন নরম হতো না। অধিকন্তু শয়তান তাদেরকে আরো গোমরাহী ও অহংকারে প্ররোচিত করতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কিন্তু তাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছিলো এবং শয়তান তাদের কাজকে সুশোভন করে তুলে ধরতো।'

যে পাপীর মন বিপদ মুসিবতেও নরম হয় না ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, বুঝতে হবে তার মন পাথর ও নির্জীব হয়ে গেছে। ফলে তার মধ্যে আর চেতনা, অনুশোচনা ও সুবিবেচনা ফিরে আসে না। তার অন্তরের হেদায়াত ও সদুপদেশ গ্রহণের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতা রহিত হয়ে গেছে, যে ক্ষমতা সজীব মন ও সচেতন বিবেককে সৎ পথে ফিরে আসতে সাহায্য করে। বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। যার হৃদয় এখনো সজীব আছে, বিপদ মুসিবত তাকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনবেই এবং জাগিয়ে তুলবেই। এটা তার জন্যে আল্লাহর রহমত স্বরূপ। আর যার হৃদয় মরে গেছে, কোনো বিপদ মুসিবত তাকে হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে না। কেবল এতোটুকু লাভ হয় যে, এ দ্বারা তাকে সতর্ক করার দায়িত্ব পালিত হয় এবং তার আর কোনো ওযর আপত্তি করার অবকাশ থাকে না। এরপর সে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়ার যোগ্য হয়ে যায়।

সমৃদ্ধ পাপিষ্ঠ জাতির ধ্বংস অনিবার্য

আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে ও রসূলের মাধ্যমে তার উম্মতকে এই সব জাতি সম্পর্কে যে ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, ওই সব জাতি এ দ্বারা আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করেনি এবং সংযতও হয়নি। কিন্তু এরপরও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং সুখ ও সমৃদ্ধি দিয়ে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস ও পতনের স্তরে নিয়ে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও যখন তারা ভুলে গেলো, তখন আমি তাদের জন্যে সব কিছুর দুয়ার উন্মুক্ত করে দিলাম। প্রদত্ত সম্পদে যখন তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে গেলো, অমনি আমি তাদেরকে সহসাই পাকড়াও করলাম। তখন তারা হতাশ হয়ে গেলো। অতপর অপরাধী জাতির মূলোৎপাটন করা হলো। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা।'

মনে রাখা দরকার যে, সুখ সমৃদ্ধিও দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসিবতের মতো আরেক পরীক্ষা। বরঞ্চ বিপদ মুসিবতের চেয়েও বড় পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ঈমান ও খোদাভীতির পরীক্ষা বিপদ মুসিবত দিয়েও করেন, সুখ সমৃদ্ধি দিয়েও করেন। অনুগত ও অবাধ্য উভয় ধরনের লোককে উভয় রকমের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন। মোমেন যখন বিপদের পরীক্ষায় পড়ে, তখন ধৈর্যধারণ করে এবং যখন সুখ সমৃদ্ধির পরীক্ষায় পড়ে, তখন শোকর করে। তার জন্যে দুটোই কল্যাণকর ও উপকারী হয়। রসূল (স.) বলেন, মোমেনের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তার সব কিছুই তার জন্যে উপকারী এবং মোমেন ছাড়া আর কারো এমনটি হয় না। তার যদি সুখ শান্তি আসে, সে শোকর করে। এটা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি দুঃখ কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি ঘটে, তবে সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে তাও তার জন্যে উপকারী হয়।' (মুসলিম)

কিন্তু যে সব জাতির কথা আল্লাহ তায়ালা এখানে উল্লেখ করেছেন, যারা নবীদেরকে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করানো সত্ত্বেও তারা তা যথারীতি ভুলে থেকেছে, আল্লাহ তায়ালা জেনেছেন যে, তারা ধ্বংসেরই যোগ্য প্রমাণিত হবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিপদ মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তারা বিনয় ও সততার পথে ফিরে যায়নি, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রকারের সফলতা দান করেছেন। 'তাদের জন্যে সব কিছুর দুয়ার

খুলে দিয়েছি'। এ কথা দ্বারা জীবন জীবিকা, আরাম আয়েশ বিলাস ব্যসন ও ভোগের যাবতীয় উপকরণ এবং শক্তি ও ক্ষমতাকেও বুঝানো হয়েছে। এ সব কিছুই বানের তোড়ের মতো বিনা হিসাবে এমনকি বিনা কষ্টে ও বিনা চেষ্টায়ও আসতে থাকবে।

কোরআনের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এখানে এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

'শেষ পর্যন্ত যখন তারা প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে গেলো।'

অর্থাৎ জীবিকা ও সুখোপকরণের সয়লাবে তারা ভেসে গেলো, সেই সব উপকরণ ভোগ করায় মত্ত ও প্রমত্ত হলো এবং শোকর ও স্মরণবিহীন অন্তর নিয়ে ভোগ করার ফলে যিনি এ সব নেয়ামত দিলেন তার কথা ঘুণাক্ষরেও তাদের মনে আসলো না এবং আল্লাহর ভয় ভীতিও তাদের মনে সঞ্চারিত হলো না। কেবল ভোগ লালসা চরিতার্থ করার মধ্যেই তাদের সমস্ত চিন্তা চেতনা ও উদ্যোগ আয়োজন সীমিত রইলো, মহৎ কার্যকলাপ অনুষ্ঠান থেকে তারা বিরত রইলো, যেমন ভোগবাদীরা হয়ে থাকে এবং একে একে প্রথমে তাদের মনমানসিকতা ও নৈতিকতা অতপর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ বিনষ্ট হলো এবং সব কিছু মিলে গোটা সামষ্টিক জীবনের ধ্বংসের সকল আয়োজন ষোল কলায় পূর্ণ হলো, তখন আল্লাহর সেই অমোঘ পরিণতি অনিবার্য হয়ে উঠলো,

'তাদেরকে আমি সহসাই পাকড়াও করলাম ....।'

অর্থাৎ আল্লাহ দায়ালা তাদেরকে এমন এক পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেছিলেন, যখন তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। তখন তারা হতাশ, হতবুদ্ধি ও কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলো। তখন তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

'অত্যাচারী জাতির শেষ ব্যক্তিটিকেও ধ্বংস করে দেয়া হলো ....'

শেষ ব্যক্তি ধ্বংস হলে তার পূর্ববর্তীদের ধ্বংস হওয়া অনিবার্য। এখানে 'অত্যাচারী' বলতে মোশরেক বুঝানো হয়েছে। কোরআনে সচরাচর মোশরেকদের যালেম এবং শেরককে যুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

'সর্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।'

অর্থাৎ এভাবে স্তরে স্তরে অব্যর্থ কৌশলের মাধ্যমে যালেম মোশরেকদের ধ্বংস করে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে যে পবিত্র করলেন এবং এতে করে তাঁর বান্দাদের ওপর যে অনুগ্রহ করলেন, সে জন্যে আল্লাহর জন্যেই সকল প্রশংসা।

এরূপ ধীরে ধীরে ও তিলে তিলে শাস্তি দিয়ে, অবকাশ দিয়ে, সুখ ও দুঃখ দিয়ে ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করার এই রীতি অনুসারেই আল্লাহ তায়ালা নূহ, হূদ, সালেহ, লূত প্রমুখ নবীর উম্মতদেরকে এবং ফেরাউনের জাতি, গ্রীক জাতি, রোমক জাতি প্রভৃতিকে পাকড়াও করেছেন। তাদের সভ্যতার সমৃদ্ধি ও ধ্বংসের পেছনে ছিলো আল্লাহর গোপন ও প্রকাশ্য পরিকল্পনা। আর এই সুবিদিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাও এখানে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন।

ওই জাতিগুলো বড় বড় সভ্যতার নির্মাতা ছিলো, পৃথিবীতে তাদের বিপুল শক্তি ও অঢেল সম্পদ ছিলো, অনেক সুখ ও সমৃদ্ধি ছিলো। আজকের বড় বড় সমৃদ্ধ জাতিগুলোর মতো তাদেরও ছিলো সম্পদ, সুখ ও শক্তি। কিন্তু এ দ্বারা তারা ধোকা খেয়েছো। পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট ও সুখ সমৃদ্ধি দেয়ার পেছনে আল্লাহর কী নীতি কৌশল নিহিত তা যারা জানে না, তারা সর্বকালে এভাবেই প্রতারিত হয়ে থাকে।

এই জাতিগুলো আদৌ জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোন নীতি অনুসারে পাকড়াও করে থাকেন। তারা বিপুল জাঁকজমক, সুখ সমৃদ্ধি ও প্রতাপ নিয়ে পৃথিবীতে বসবাস করে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ক্রমাগত অবকাশ দিতে থাকায় ভেবে বসেছে যে, তাদেরকে কোথাও কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তারা আল্লাহর এবাদাত করে না বা তাঁকে চিনে না, বরঞ্চ আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে ও বিদ্রোহ করে এবং তারা নিজেদের জন্যে খোদাসুলভ গুণবৈশিষ্টের দাবী করে। তারা পৃথিবীতে ফাসাদ ও অরাজকতা ছড়ায় এবং আল্লাহর ক্ষমা ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার পর মানুষের ওপরও যুলুম করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে আমি আল্লাহর এই উক্তির বাস্তব নমুনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি যে, 'যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো তা যখন তারা ভুলেই রইলো, তখন আমি তাদের ওপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম।' এ আয়াত যে দৃশ্যটিকে চিহ্নিত করে, তা হলো জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণের অঢেল প্রাচুর্য। এ দৃশ্যটা ওখানে যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমন পৃথিবীর আর কোথাও হয় না।(১)

মার্কিন জাতি তাদের এই সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের জন্যে কতো গর্বিত, তা আমি দেখেছি, আমি আরো দেখেছি যে, তারা এ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যকে 'শ্বেতাঙ্গ'দের জন্যেই নির্দিষ্ট মনে করে, আর এ কারণে অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি তারা চরম তাচ্ছিল্য, বৈষম্য, অবজ্ঞা ও জঘন্য বর্বরোচিত আচরণ করে। আর এজন্যে তারা এমন আত্মমর্যাদাবোধ ও আভিজাত্যবোধে ভোগে, যার কাছে নাৎসীদের ইহুদী বিরোধী আভিজাত্যবোধ ও প্রজাতিবিদ্বেষও হার মানে। ইহুদীদের বিরুদ্ধে নাৎসীদের সেই প্রজাতি বিদ্বেষ সারা পৃথিবীতে প্রজাতি বিদ্বেষের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। অথচ অশ্বেতাংগদের সাথে শ্বেতাংগ মার্কিনীদের আচরণ তার চেয়েও নির্মম ও নৃশংস, বিশেষত এই অশ্বেতাংগরা যখন মুসলমান হয়।

এসব কিছু দেখে আমি এই আয়াতটিকে স্মরণ করতাম, আল্লাহর চিরাচরিত নীতি তাদের ওপরও প্রযুক্ত হোক এটা প্রত্যাশা করতাম এবং উদাসীন মানুষদের দিকে আল্লাহর এ নীতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে বলে আমার মনে হতো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'শেষ পর্যন্ত তারা যখন প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো, অমনি আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম। ....'

শেষ নবী (স.)-এর আবির্ভাবের পর তিনি কোনো জাতিকে সমূলে ধ্বংস করার শাস্তি আর দেবেন না বলে ঘোষণা করেছেন বটে। তবে নানা রকমের শাস্তি অবশ্যই আসতে থাকবে। মানব জাতি, বিশেষত প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির শীর্ষে যে জাতিগুলোর অবস্থান, তারা এ সব শাস্তি প্রতিনিয়তই ভোগ করে থাকে। উৎপাদন ও প্রাচুর্যের সমারোহ সত্তেও রকমারি শাস্তি তাদের ওপর থেকে থেকে নেমে আসছেই।

যে মানসিক যন্ত্রণা, আধ্যাত্মিক বঞ্চনা, অস্বাভাবিক যৌনতা ও নৈতিক অধপতনে এ জাতিগুলো ভুগে চলেছে, তা তাদের ভোগের সামগ্রীর প্রাচুর্যকেও বিড়ম্বিত করে চলেছে এবং গোটা জীবনকেই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুঃখ দুর্দশায় ভারাক্রান্ত করে চলেছে। তদুপরি যে সব নৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্যের বেসাতি চলে এবং যৌন লালসা বা অস্বাভাবিকতার বিনিময়ে জাতীয় স্বার্থের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, সেগুলো তো রয়েছেই। এই জাতিগুলোর শেষ পরিণতি কী হতে পারে, সে সম্পর্কে এ আলামতগুলো থেকে অভ্রান্ত আভাস পাওয়া যায়।

---

(১) একথা শুধু মার্কিনীদের বেলায়ই নয়– শিল্প বিপ্লবের পর সম্পদের পাহাড় জমানো প্রতিটি পশ্চিমা দেশের বেলায়ই প্রযোজ্য।–সম্পাদক

আর এগুলো তো সবে সূচনা মাত্র। রসূল (স.) যথার্থই বলেছেন, 'যখন তুমি দেখবে যে, কোনো বান্দা অনেক পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্তেও সে যা পছন্দ করে, তাই আল্লাহ তায়ালা তাকে দিচ্ছেন, তখন বুঝবে যে, ওটা পতনের লক্ষণ। অতপর তিনি পাঠ করলেন, 'যে জিনিস তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তা যখন তারা ভুলেই রইলো, তখন আমি তাদের জন্যে সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অতপর যখন তারা প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো, অমনি আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম। তখন তারা হতাশ ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলো।' (ইবনে জারীর ও আবু হাতেম)

এতদসত্তেও একথা মনে রাখতে হবে যে, বাতিল শক্তিকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি এই যে, পৃথিবীতে কোনো না কোনো মানব গোষ্ঠীকে সত্যের পতাকা হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা হককে দিয়ে বাতিলের ওপর আঘাত হেনে তাকে চূর্ণ ও ধ্বংস করবেন। সুতরাং হকপন্থীদের অলস হয়ে বসে থেকে আশা করা উচিত নয় যে, তাদের কোনো চেষ্টা ও শ্রম ছাড়াই আল্লাহর নীতি কার্যকরী হবে ও বাতিল শক্তি ধ্বংস হবে ও সত্য বিজয়ী হবে। কেননা অলস হয়ে বসে থাকলে তারা সত্যের পক্ষ বলে বিবেচিত হবে না। একটি মানব গোষ্ঠী পৃথিবীতে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও খোদাসুলভ কর্তৃত্বের অবৈধ দাবীদারদেরকে উৎখাত করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হলেই তারা সত্যের পক্ষ বলে বিবেচিত হবে। তারাই হবে আসল ও প্রথম সত্যের পক্ষ। আল্লাহর এই বক্তব্যই ফুটে উঠেছে কোরআনের অন্য এক আয়াতে,

'আল্লাহ তায়ালা যদি একটি মানব গোষ্ঠীকে আরেকটি মানব গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী অরাজকতায় ভরে যেতো।'

পরবর্তী আয়াতে মোশরেকদেরকে আল্লাহর সম্ভাব্য আযাবের মুখোমুখি কল্পনা করে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের ব্যক্তিসত্ত্বাকে, তাদের চোখ, কান ও মনকে আযাবে আক্রান্ত করেন, তারা নিজেরাও তা প্রতিহত করতে সক্ষম নয় এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনো দেব দেবীও সেই চোখ, কান ও মনকে ফেরত দিতে সক্ষম নয়, তাহলে কে তা ফিরিয়ে দিতে পারে।

'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি তোমাদের কান, চোখ ও মনকে কেড়ে নেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ তোমাদেরকে তা ফিরিয়ে দেবে? ..... (আয়াত ৪৫)

এ আয়াতে এমন একটা দৃশ্য প্রতিফলিত হয়েছে, যা একদিকে আল্লাহর তরফ থেকে আগত বিপদ মুসিবতে আল্লাহর সামনে বান্দার অসহায়ত্ব সুস্পষ্ট করে দেয়, অপরদিকে তা তাদের বাতিল মনগড়া খোদাদের প্রকৃত স্বরূপ কী তা তুলে ধরে। তবে এই দৃশ্য মোশরেকদেরকে ভীষণভাবে পরাজিত করে। মানুষের মহান স্রষ্টা জানেন যে, মানুষের সহজাত বিবেক এই দৃশ্যটির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করবে। অর্থাৎ সে উপলব্ধি করবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার চোখ, কান ইত্যাদি যে কোনো সময় ছিনিয়ে নিতে পারেন, তার হৃদয়কে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারেন, ফলে তা আর আগের মতো কাজ করতে পারবে না। আর তিনি এটা করলে মোশরেকদের মনগড়া বিভিন্ন খোদা বা দেব দেবী তা ফিরিয়ে দিতে পারে না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে ও স্নায়ুতে একটা তীব্র কম্পন এনে দেন এবং সেই সাথে এটাও বুঝিয়ে দেন যে, শেরক একটা জঘন্য মতবাদ এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক গ্রহণ করা একটা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। অতপর বলা হয়েছে,

এতো রকমারি বক্তব্য দিয়ে বুঝিয়েও তাদেরকে যে বুঝানো যাচ্ছে না এবং তারা রোগাক্রান্ত উটের মতো বেসামালভাবে লম্ফঝম্প করছে, সেটা বড়ই আশ্চর্যজনক।

'দেখো, কিভাবে আমি আয়াতগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পেশ করি, তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।'

'সুদুফ' শব্দটা আরবদের কাছে সুপরিচিত। এটা উটের এক ধরনের চর্মরোগ, যা তাকে অস্থির ও অস্বাভাবিক করে রাখে। এ জিনিসটার উল্লেখ করে আসলে শ্রোতার মনে মোশরেকদের আচরণকে হাস্যাস্পদ ও উপহাসযোগ্য করে তুলে ধরা হয়েছে।

উপরোক্ত দৃশ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার আগেই পরবর্তী আয়াতে আরেকটা সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, যা আল্লাহর কাছে অসম্ভব নয়। এ আয়াতে নিতান্ত আকস্মিক আযাবের কারণে তাদের অর্থাৎ যালেম মোশরেকদের ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

'বলো, তোমরা কি নিজেদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছো যে, ...' (আয়াত ৪৬)

আল্লাহর আযাব যে কোনো অবস্থায় যে কোনো আকারে আসতে পারে। তা এমন আকস্মিকভাবেও আসতে পারে যে, তার জন্যে মানুষ প্রস্তুতই থাকে না, আবার প্রকাশ্যে এমনভাবেও আসতে পারে যে, তার জন্যে সে প্রস্তুত থাকতে পারে। তবে আযাব হিসাবে মোশরেকদের ওপর ধ্বংস অবশ্যই নেমে আসবে এবং তা দ্বারা তারা ছাড়া আর কেউ আক্রান্ত হবে না। আর এই ধ্বংস প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই আসুক তারা তা ঠেকাতে পারবে না। আল্লাহর আযাবকে ঠেকানোর ক্ষমতা তাদের নেই। আর তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তারাও পারবে না। কেননা তারা আল্লাহর দুর্বল বান্দা।

এই সম্ভাব্য অবস্থাটা তুলে ধরার উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন আগে থেকেই তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহর জানা আছে যে, এ দৃশ্যটা তুলে ধরলে মানব সত্ত্বা অধিকতর সতর্ক হয়ে যাবে।

রসূলদের দায়িত্ব কর্তব্য

একের পর এক এই দৃশ্যগুলো, এতদসংক্রান্ত মন্তব্য এবং অন্তর্নিহিত সতর্কবাণীগুলো পেশ করার পর পরবর্তী দুটি আয়াতে নবী ও রসূলদের দায়িত্ব কী, তা জানানো হয়েছে। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো, সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেয়াই তাদের কাজ। এরপর এ দাওয়াত সম্পর্কে মানুষ কী ভূমিকা নেবে, সেটা সে-ই স্থির করবে। আর যেমন স্থির করবে, তেমনই হবে তার কর্মফল। আয়াত ৪৭ ও ৪৮ দেখুন।

ইসলাম আদিকাল থেকেই মানব জাতিকে সঠিক বুদ্ধিমত্তার জন্যে প্রস্তুত করে আসছে, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত এই মহান দ্বীনকে কাজে লাগানোর যোগ্য বানানোর চেষ্টা করে আসছে এবং এর এমন পূর্ণাংগ ব্যবহার নিশ্চিত করে আসছে, যা দ্বারা সে সত্যকে পৃথিবীতে, মানব জীবনে ও সৃষ্টির গোপন রহস্যে এক কথায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ সব রহস্য উদঘাটনের জন্যে এবং মানবীয় বিবেককে তা অনুধাবনের নির্দেশ দানের জন্যেই কোরআনের আগমন।

এসব কিছু মানুষকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর যুগ থেকে সরিয়ে সমগ্র সৃষ্টিজগতে আল্লাহর যে অপূর্ব ও অতুলনীয় কীর্তি সংরক্ষিত রয়েছে, তা পর্যবেক্ষণের জন্যে মানবীয় বিবেক বুদ্ধিকে নির্দেশ দেন। বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনা ইসলামের অস্বীকারকারীদেরকে তা স্বীকার করতে বাধ্য করে। কেননা সে একটা প্রকাশ্য বস্তুগত অলৌকিক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত

থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সৃষ্টির নিদর্শনসমূহও অলৌকিক ব্যাপার। তবে এগুলো এমন চিরস্থায়ী অলৌকিক জিনিস যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগত প্রতিষ্ঠিত। এগুলোকে উপলব্ধি করার নির্দেশ দানের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কেতাব এসেছে, তাও এক অলৌকিক কেতাব। এ কেতাবের সমতুল্য কোনো কেতাব আর আসেনি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মোজেযা তথা অলৌকিক ব্যাপারের চেয়ে বুদ্ধি নির্ভর মোজেযা যে অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী ও কালজয়ী, সে কথা বুঝার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এতে করে মানুষ তার মানবীয় বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সৃষ্টি জগতের উন্মুক্ত পুস্তক পাঠ করার দিকে মনোযোগী হবে। মহান আল্লাহর দিক নির্দেশনা, রসূল (স.)-এর প্রশিক্ষণ ও কোরআনের নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব জোড়া এই পুস্তক একই সাথে ইতিবাচক, বাস্তব ও অদৃশ্য ভাবে পাঠ করতে হবে। এই পাঠ করার সময় প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত মতাদর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুক্ত রাখতে হবে গ্রীক দর্শনের একাংশ, ভারতীয়, মিসরীয়, বৌদ্ধ ও পার্সিক পৌত্তলিক দর্শনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতান্ত্রিক মতাদর্শগুলো থেকেও। সেই সাথে আরব জাহেলী আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার জাহেলিয়াতের আওতা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে।

রসূলের কাজ ও দায়িত্ব সংক্রান্ত এই বিবরণে এবং এই আয়াত দুটিতে তাঁর ভূমিকার যে প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে, যা পরবর্তী পর্বে আলোচিত হবে, তাতে রসূলের প্রশিক্ষণের একটা দিক প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত রসূল একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পাঠান মানব জাতিকে সতর্ক করা ও সুসংবাদ দানের জন্যে। এখানেই তাঁর কাজ শেষ। আর এখান থেকে মানুষের সাড়া দানের পালা শুরু। মানুষ যে সাড়া দেবে তার মধ্য দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা ও অদৃষ্ট পরিকল্পনা কার্যকরী হয় এবং তদনুসারে আল্লাহর প্রতিদান লাভের মধ্য দিয়ে গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও ঈমানের সাথে সৎ কাজ করে, তার ভবিষ্যত জীবনে কোনো ভয় নেই এবং অতীত নিয়ে তার কোনো উদ্বেগের কারণ নেই। অতীতে যাই করে থাকুক, তাতে ক্ষমার অবকাশ এবং সৎ কাজের শুভ প্রতিদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি রসূল (স.) আনীত বাণী ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, এই প্রকৃতি রূপী পুস্তকের পাতাগুলোতে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তাদেরকে তাদের অবিশ্বাস তথা কুফরীর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই কুফরীকে 'ফেস্‌ক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ মতাদর্শ সুস্পষ্ট ও সাবলীল। এতে কোনো জটিলতা ও অস্বচ্ছতা নেই। রসূলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সংক্রান্ত এবং তার কর্মসীমা সংক্রান্ত বিবরণ এখানে অকাট্য। এ মতাদর্শে আল্লাহকে খোদাসুলভ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের একক অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়, যাবতীয় জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার কাছে ন্যস্ত করা হয়, এর মধ্য দিয়ে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও উদ্যোগের অধিকারী করা এবং এই ইচ্ছা ও উদ্যোগের দায় দায়িত্ব ও ফলাফল তার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়। আল্লাহর অনুগত ও অবাধ্যদের পরিণাম দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করা হয়, যাবতীয় অলীক কাহিনী ও অস্পষ্ট ধ্যান ধারণা থেকে রসূলের চরিত্র ও কর্মকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়, জাহেলী যুগের প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও রীতিপ্রথা রহিত করা হয়, এভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগৃতির যুগে মানব জাতির উত্তরণ সম্পন্ন করা হয় এবং যুগ যুগ ধরে মানব জাতির বোধশক্তিকে নিঃশেষকারী অসার ধর্মীয় বিতর্ক ও মনস্তাত্ত্বিক দর্শনের কবল থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়। (আয়াত ৫০-৫৫)

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝٥٠ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝٥١ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٥٢ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝٥٣

৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, আমি তো তোমাদের (একথা) বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ তায়ালার বিপুল ধনভান্ডার রয়েছে, না (একথা বলি যে,) আমি গায়বের কোনো খবর রাখি! আর একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা, (আসলে) আমি তো সেই ওহীরই অনুসরণ করি যা আমার ওপর নাযিল করা হয়, তুমি বলো, অন্ধ আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি (কখনো) এক হতে পারে? তোমরা কি মোটেই চিন্তাভাবনা করো না?

রুকু ৬

৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি সে (কিতাবের) মাধ্যমে সেসব লোককে পরকালের (আযাবের) ব্যাপারে সতর্ক করে দাও, যারা এ ভয় করে যে, তাদেরকে (একদিন) তাদের মালিকের সামনে একত্র করা হবে, (সেদিন) তাদের জন্যে তিনি ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু কিংবা কোনো সুপারিশকারী থাকবে না, আশা করা যায় (এতে করে) তারা সাবধান হবে। ৫২. যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের মালিককেই ডাকে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের তুমি (কখনো তোমার কাছ থেকে) সরিয়ে দিয়ো না, (কারণ) তাদের কাজকর্মের (জবাবদিহিতার) দায়িত্ব (যেমন) তোমার ওপর কিছুই নেই, (তেমনি) তোমার কাজকর্মের হিসাব-কিতাবের কোনো রকম দায়িত্বও তাদের ওপর নেই, (তারপরও) যদি তুমি তাদের তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও, তাহলে তুমিও বাড়াবাড়ি করা লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে। ৫৩. আর আমি এভাবেই তাদের একদল দ্বারা অন্য দলের পরীক্ষা নিয়েছি, যেন তারা (একদল) একথা বলতে পারে যে, এরাই কি হচ্ছে আমাদের মাঝে সে দলের লোক, যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ করেছেন; আল্লাহ তায়ালা কি (তাঁর) কৃতজ্ঞ বান্দাহদের ভালো করে জানেন না।

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

৫৪. যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান এনেছে তারা যখন তোমার কাছে আসবে, তখন তুমি তাদের বলো, (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর) শান্তি বর্ষিত হোক- তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করাটা তোমাদের মালিক নিজের কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন; তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কখনো অজ্ঞতাবশত কোনো অন্যায় কাজ করে বসে এবং পরক্ষণেই তাওবা করে ও (নিজের জীবন) শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (তাকে ক্ষমা করে দেবেন, তিনি) একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৫৫. আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাফসীর
আয়াত ৫০-৫৫

মোশরেকদের পক্ষ থেকে অলৌকিক ঘটনাবলী দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (স.)-এর স্বভাব প্রকৃতি ও রেসালাতের তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগি বিষয়ক আলোচনার ধারাবাহিকতায় এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তারা কি ধরনের অলৌকিক ঘটনা দেখার দাবী করতো, তার কিছু নমুনাও পূর্বেকার আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান আয়াতগুলোতে রসূল ও রেসালাত সংক্রান্ত জাহেলী যুগের ও সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির বিভিন্ন ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে পূর্বের আলোচনার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ইতিপূর্বে আরবের জাহেলী সমাজ ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতি এই সব অলীক ধ্যান ধারণায় আক্রান্ত ছিলো। ফলে তারা রেসালাত, নবুওত, নবী ও ওহীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে নানা রকম বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয় এবং নবুওতের সাথে জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্রের এবং ওহীর সাথে জ্বিন ও পাগলামির তুলনা করার অপচেষ্টা করে। এ কারণেই তারা নবীর কাছে অদৃশ্য সংবাদ জানতে চাইতো। অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবী জানাতো এবং জ্বিনধারী ও জাদুকরের পক্ষে যা করা সম্ভব বলে লোকেরা মনে করতো, তাই তাঁর কাছেও প্রত্যাশা করতো। এরপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের অভ্যুদয় ঘটলো শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, সত্যকে দিয়ে বাতিলের ওপর আঘাত হেনে বাতিলকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও ধ্বংস করা হবে, ঈমানী মতাদর্শকে তার স্বচ্ছতা, সাবলীলতা ও বাস্তবতা ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং নবুওত ও নবীকে জাহেলী ধ্যান ধারণা, অলীক কল্পনা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা হবে। আরবের মোশরেকদের সবচেয়ে নিকটবর্তী জাহেলিয়াত ছিলো ইহুদী ও খৃষ্টানদের জাহেলিয়াত, যা নবী ও নবুওতের স্বরূপকে সবচেয়ে জঘন্যভাবে বিকৃত ও বিনষ্ট করতো।

নবী ও নবুওতের স্বরূপ

রসূল ও রেসালাতের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করার পর এবং সব রকমের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও নিষ্কলুষভাবে তাকে তুলে ধরার পর কোরআন নবুওত সংক্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসকে নির্ভুলভাবে পেশ করেছে। রসূল সম্পর্কে সে বলেছে যে, তিনি একজন মানুষ। তাঁর কাছে আল্লাহর ধনভান্ডারও নেই, অদৃশ্য জ্ঞানও নেই, নিজেকে ফেরেশতা বলেও তিনি দাবী করেন না। তিনি যেসব তত্ত্ব ও তথ্য পানতা আল্লাহর কাছ থেকেই পান এবং ওহীর মাধ্যমে পাওয়া নির্দেশই শুধু অনুসরণ করেন। আর যারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে, তারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ। তাদের সাথে সব সময় ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান করা, আল্লাহর ক্ষমা ও দয়ার কথা তাদেরকে জানানো, আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন, তাকওয়া ও সতর্কতা অবলম্বন রসূলের দায়িত্ব এবং এর মধ্যেই তাঁর দায়িত্ব সীমিত। তিনি মানুষ ও তাঁর কাছে ওহী আসে। এভাবে তাঁর পরিচিতি ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা বিশুদ্ধ হয়। এই বিশুদ্ধীকরণ ও সতর্কীকরণের মধ্য দিয়েই অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়, হক ও বাতিলের বাছাই হয়ে যায়, রসূল ও রেসালাত সম্পর্কে অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়, হেদায়াত ও গোমরাহী সম্পর্কেও অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায় এবং মোমেন ও অ-মোমেনের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

এই কয়টি বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর ইলাহত্ব ও তার সাথে রসূলের সম্পর্ক ও সমগ্র মানব জাতির সম্পর্ক অনুগত ও অবাধ্য নির্বিশেষে সকলের সম্পর্ক এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর আসল পরিচয় সম্পর্কে, আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হেদায়াত লাভ হলো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতা এবং গোমরাহী অন্ধত্বের নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ওপর দয়া ও রহমত করাকে নিজের কর্তব্য হিসাবে গণ্য করেন, বান্দাদের তাওবা ও আত্মশুদ্ধির পর তাদের অজানা গুনাহকে ক্ষমা করেন। তিনি চান, অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যাক। অতপর যে ঈমান আনতে চায়, সে যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে ঈমান আনুক, যে গোমরাহ হতে চায়, সেও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে গোমরাহ হোক এবং মানুষ কোনো অজ্ঞতা ও অস্বচ্ছতার মধ্যে নয় বরং স্বচ্ছ পরিবেশে নিজ নিজ ভূমিকা স্থির করুক। ৫০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

'বলো, আমি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার রয়েছে, ...'

কোরায়শ গোত্রের কট্টর মোশরেকেরা রসূল (স.)-এর কাছে এমন অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানা তো, যা অস্বীকার করা যায় না। অথচ আমি আগেই বলেছি যে, তারা মোহাম্মদ (স.)-এর সত্যবাদিতায় এক রত্তিও সন্দেহ পোষণ করতো না। তবু তারা অলৌকিক নিদর্শনের দাবী জানাতো। এমনকি কখনো কখনো সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটিকে স্বর্ণের পাহাড়ে পরিণত করার দাবীও জানাতো। কখনো বলতো, ওই পাহাড় দুটিকে মক্কা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, যাতে পাহাড়ের জায়গা উর্বর ফসলের ক্ষেতে পরিণত হয়। কখনো বলতো, আগামীতে কী ঘটবে তা জানাও। কখনো বলতো, একজন ফেরেশতা নামিয়ে আনো। কখনো বলতো, কাগজে লেখা একখানা কেতাব আকাশ থেকে নামিয়ে আনো। মোট কথা, তারা এমন সব দাবী তুলতো, যার মধ্য দিয়ে তাদের একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার মনোভাবই প্রকাশ পেতো।

কিন্তু তাদের এইসব দাবী দাওয়ার উৎস ছিলো তাদের পার্শ্ববর্তী জাতিগুলোর নবী ও নবুওত সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা। তাদের সবচেয়ে কাছেই ছিলো নবুওত ও নবী সম্পর্কে বিকৃত ধ্যান ধারণার অধিকারী আহলে কেতাবের কল্প কাহিনী।

বিভিন্ন জাহেলী সমাজে বিভিন্ন সময়ে মিথ্যা নবুওতের দাবীদারদের আবির্ভাব ঘটতো। প্রতারিত লোকেরা তাদেরকে বিশ্বাসও করতো। জাদুকর, জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ও জ্বিনধারীরাও মিথ্যা

নবুওতের দাবীদার হতো। তারা গায়েবী খবর, জ্বিন ও আত্মার সাথে যোগাযোগ, তাবীজ-তুমার দ্বারা, নামায দোয়া দ্বারা বা অন্যান্য উপকরণ দ্বারা প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ হস্তগত করার ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করতো। আসলে এ ধরনের সব দাবীদারই ছিলো মিথ্যাবাদী ও কল্পনাবিলাসী।

'যারা জাদুর ভিত্তিতে নবুওত দাবী করতো, তারা এরূপ ধারণা দিতো যে, তারা নানা রকম নোংরা আত্মাকে বশীভূত করে নিয়ে নানা রকম অজানা তথ্য সংগ্রহ করে, কিংবা তারা বিভিন্ন ঘটনা ও বস্তুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। আর যারা ভবিষ্যদ্বাণী করার সাহায্যে নবুওতের দাবী করতো তারা এই ধারণা দিতো যে, তারা নানা রকম দেব দেবীর প্রতিনিধি। তারা কোনো ভবিষ্যদ্বক্তা বা জ্যোতিষীর অনুগত নয়, কিন্তু তার দোয়া ও নামায কবুল করে এবং তাকে অনেক অজানা জিনিসের সন্ধান দিতে পারে। সে তাকে আলামত ও লক্ষণাদীর মাধ্যমে ঈপ্সিত জিনিসের সন্ধান দেয়। তবে সব নামায ও সব প্রার্থনাকে তারা কবুল করতে পারে না। পক্ষান্তরে জাদু ও জ্যোতিষশাস্ত্র ভিত্তিক নবুওতের দাবীদাররা ছিলো পাগলা নবী ও অচেতন নবীদের বিপরীত। কেননা জাদুকর ও ভবিষ্যদ্বক্তা যে জিনিসের দাবী জানায়, সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান রয়েছে এবং প্রার্থনার মাধ্যমে যা চায়, তা সজ্ঞানে ও সচেতনভাবেই চায়। কিন্তু পাগল ও অচেতন যারা, তারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন, তারা কী বলে তা তারা নিজেরাই বুঝে না ও জানে না। যে সব জাতির মধ্যে এ ধরনের পাগলা ও অচেতন নবীর প্রচলন ছিলো, তাদের মধ্যে তথাকথিত নবীর সাথে তার কথাবার্তার ইংগিত বোঝে ও অর্থ জানে এমন কোনো ব্যাখ্যাতাও থাকতো। গ্রীসে অচেতন নবীকে মান্টী (Manti) এবং তার ব্যখ্যাতাকে প্রোফেট (Prophet) বলতো। প্রোফেট শব্দের অর্থ হলো, অন্যের প্রতিনিধি হিসাবে যে কথা বলে। এ শব্দ থেকেই ইউরোপীয়রা নবী অর্থে প্রোফেট শব্দটিকে গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যদ্বক্তা ও অচেতন লোকরা খুব কমই সমমতাবলম্বী হয়ে থাকে। ভবিষ্যদ্বক্তা যখন অচেতন ব্যক্তির ব্যাখ্যাতা হিসাবে তার সাথে থাকে, কেবল তখনই উভয়কে একই রকম মত প্রকাশ করতে দেখা যায়। কেননা সে অচেতন ব্যক্তির ইশারা ইংগিতের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। বেশীর ভাগ সময়েই তারা উভয়ে দ্বিমত ব্যক্ত করে ও তর্ক করে থাকে। তাদের উভয়ের সামাজিক অবস্থান বিভিন্ন। অচেতন ব্যক্তি কোনো রসম রেওয়ায, পরিবেশ ও পরিভাষার ধার ধারেনা। আর ভবিষ্যদ্বক্তা অধিকাংশ সময় তার বাপ দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিদ্যা লাভ করে থাকে। জ্যোতির্বিদ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী করার বিদ্যা কেবল উপাসনালয় পরিবেষ্টিত অঞ্চলেই বিকাশ লাভ করে। কেননা অচেতন ব্যক্তিদের তথাকথিত নবুওত এ ধরনের পরিবেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। কেননা এটা কখনো অজ পাড়াগায়ে আবার কখনো সুসভ্য অঞ্চলেও দেখা দিতে পারে।'(১)

'বনী ইসরাইলের গোত্রগুলোতে নবীর সংখ্যা এতে বেশী ছিলো যে, পরবর্তী কালে তাদেরকে আধুনিক কালের সূফী দরবেশদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা কোনো কোনো যুগে তাদের সংখ্যা একশতও ছাড়িয়ে যেতো। বাইবেলের মতে এ যুগের দরবেশদের মতো তারাও সেকালে

---

(১) হাকাকুল ইসলাম ওয়া আবাতীলু খুসুমিহি (ইসলামের প্রকৃত তথ্য ও তার শত্রুদের মিথ্যাচার) লেখকঃ আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ। এখানে উক্ত পুস্তকের শুধু সেই অংশটুকুই উদ্ধৃত করেছি, যা আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজন। লেখকের নিজস্ব মতামত কি, তা উল্লেখ করিনি। প্রকৃতপক্ষে নবুওত সম্পর্কে ওহীভিত্তিক সকল ধর্মই একই মত ব্যক্ত করেছে। অবশেষে ইসলাম দিয়েছে এর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা। খৃস্টধর্ম ও ইহুদী এ সম্পর্কে পরে যে বিকৃতি এসেছে সেটা ধর্তব্য নয়। (সংক্ষিপ্ত)

নিজ নিজ গোত্রে কখনো ব্যায়ামের দ্বারা দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে আবার কখনো বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহারের মাধ্যমে পাগলামির অবস্থা সৃষ্টি করতেন।

যেমন বাইবেলের প্রথম সামাওয়ীল পুস্তকে বলা হয়েছে,

'শাওল দাউদকে কিছু দূত গ্রহণের নির্দেশ পাঠালেন।' তারা দেখলো বহু সংখ্যক নবী নানা রকমের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। অথচ শাওল তাদের সভাপতি হিসাবে তখন তাদের মধ্যেই রয়েছেন। শাওলের দূতদের কাছে রূহুল্লাহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হলো। তখন তারাও ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগলো। তাদের ছাড়া অন্যদেরকে পাঠানো হলে তারা ভবিষ্যদ্বণী করলো। .... তখন সেও কাপড় খুলে ফেললো এবং শামাওয়ীলের সামনে ভবিষ্যদ্বাণী করলো। সে সারা দিন ও সারা রাত উলংগ হয়ে কাটালো।'

সামাওয়ীল পুস্তকে আরো রয়েছে,

' ..... তুমি পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা একদল নবীর মুখোমুখি হবে। তাদের সামনে থাকবে নানা রকম বাদ্যযন্ত্র। তারা সবাই ভবিষ্যদ্বাণী করবে। তখন তাদের ওপর নেমে আসবেন প্রভুর আত্মা। তখন তুমি তাদের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করবে এবং অন্য এক ব্যক্তিতে পরিণত হবে।'

'নবুওত একটা পুরুষানুক্রমিক পেশা ছিলো, যা পিতাদের কাছ থেকে পুত্ররা পেতো। যেমন রাজাদের ২য় পুস্তকে আছে, 'নবীদের ছেলেরা যখন বললো, হে আলইয়াসা, ওই যে সেই জায়গা, যেখানে আমরা অবস্থান করি। ওটা আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তাই আমাদের জর্ডানে চলে যাওয়া উচিত।'

'তাদের কিছু ভৃত্য ছিলো, যারা বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনীর সাথে থাকতো। যেমন প্রথম যুগের পুস্তকে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, 'দাউদ ও সেনাবাহিনীর অধিনায়করা বনু আসাফ ও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীকারকদের সেবার জন্যে আলাদা করলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে।' (পূর্বোক্ত পুস্তক)

এভাবেই নবুওত ও নবীদের সম্পর্কে জাহেলী ধ্যান ধারণার সমাবেশ ঘটেছে। এর মধ্যে আসমানী কেতাবসমূহে আগত সেই সব বিশুদ্ধ ধ্যান ধারণাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা পরে বিকৃত হয়েছে। বিকৃতির পরে তা এ ধরনের বাতিল ধ্যান ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে, যা কোনো নবীর পক্ষে শোভন হতে পারে না। তখনকার লোকেরা নবুওতের দাবীদারদের কাছ থেকে এমনটিই আশা করতো, তার কাছে কখনো গায়েব সম্পর্কে খবর জানানোর আব্দার জুড়ে দিতো, তা সে জ্যোতির্বিদ্যা বা জাদুবিদ্যা যার সাহায্যেই হোক। এ সব উৎস থেকে প্ররোচিত হয়েই মোশরেকরা রসূল (স.)-এর কাছে নানা রকমের অলৌকিক কান্ড ঘটানোর আব্দার করতো। এ সব বাতিল ধারণা সংশোধনের জন্যেই কোরআনে বারবার রসূল ও রেসালাতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। তেমনি একটি উক্তি হচ্ছে,

'তুমি বলো, আমি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে এবং আমি অদৃশ্যও জানি না ....' (আয়াত ৫০)

রসূল (স.) আল্লাহর পক্ষ থেকে এই মর্মে নির্দেশ লাভ করেছেন যে, তিনি যেন নিজেকে এমন একজন মানুষ হিসাবে পেশ করেন, যে নবী ও নবুওত সংক্রান্ত যাবতীয় জাহেলী অলীক ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত এবং তিনি যেন এই আকীদা বিশ্বাসকেও সব রকমের দাবী ও প্ররোচনা থেকে মুক্ত অবস্থায় পেশ করেন। এ আকীদা রসূল সম্পর্কে এমন ধারনারই জন্ম দেবে যে, আল্লাহর দিক নির্দেশনা ছাড়া আর কিছুই যার করায়ত্ত নয়। আল্লাহর এই দিক নির্দেশনাই তাকে পথ প্রদর্শন করে থাকে।

আল্লাহর রসূল কেবল আল্লাহর ওহীর নির্দেশনাই অনুসরণ করে থাকেন। সে যা কখনো জানতো না, এই ওহী তাকে তাই অবহিত করে। সে আল্লাহর ধন ভান্ডার হস্তগত করেনি যে নিজের অনুসারীকে তা দু'হাতে বিলাবে। তার হাতে অদৃশ্যের চাবিকাঠিও নেই যে, তার অনুসারীদেরকে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানাবে। তিনি কোনো ফেরেশতাও নন, যেমন তারা ফেরেশতা পাঠানোর অনুরোধ করে থাকে। তিনি একজন মানুষ ও রসূল। এটাই হচ্ছে নবুওত সম্পর্কে ইসলামের অকাট্য ও নির্ভেজাল বক্তব্য।

এই বিশ্বাসটাই মনুষ্য স্বভাবের স্বতস্ফূর্ত আকুতি, পার্থিব জীবনের ভিত্তি এবং আখেরাতের পথের নির্দেশিকা। এই আকীদা আল্লাহর কাছে পৌঁছার একমাত্র নির্ভুল পন্থা। তাই এ আকীদার আর কোনো সাজসজ্জার প্রয়োজন নেই। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণের জন্যে এটা চায়, তার জন্যে এটাই যথেষ্ট। এটি সকল মূল্যবোধের চেয়ে বড় মূল্যবোধ। কিন্তু যে ব্যক্তি এ আকীদাকে বাজারের পণ্য মনে করে এবং তা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে চায়, সে এর যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা উপলব্ধি করে না এবং তা তাকে যেমন কোনো পাথেয় প্রদান করে না, তেমনি তার কোনো উপকারও সাধন করে না।

এ জন্যে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয় তিনি যেন এ আকীদাকে অবিকল এভাবেই পেশ করেন এবং এর সাথে কোনো সাজসজ্জা যোগ না করেন। কেননা এর কোনো সাজসজ্জার প্রয়োজনই নেই। যারা এই আকীদার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়, তাদের জানা উচিত যে, তারা কোনো অর্থভান্ডারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেনি, কোনো পার্থিব পদ-মর্যাদা বা জনগণের মধ্যে মান মর্যাদা লাভ করার সুযোগের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ আল্লাহর হেদায়াতের কাছে আশ্রয় গ্রহণেরই শামিল। আর পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে সম্মানজনক ও ঐশ্বর্যশালী আশ্রয়। ৫০ নং আয়াতের প্রথমাংশের বক্তব্য এটাই,

'বলো, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে এমন দাবী আমি করি না........'

মানব জাতির ওহীর প্রয়োজনীয়তা

ঈমানদারদের এটাও জানা উচিত যে, তারা আলো ও অন্তর্দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অন্ধতা ও অন্ধকার থেকে রক্ষা পায়। আয়াতটির শেষাংশে এ কথাই বলা হয়েছে,

'বলো, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে.....'

এ আয়াত থেকে এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যায় যে, একমাত্র ওহীর অনুসরণই হেদায়াত লাভ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হবার লক্ষণ। আর যে ওহীর অনুসরণ করে না সে অন্ধ ও পরিত্যাজ্য। এটা যখন জানা গেলো, তখন প্রশ্ন হলো এক্ষেত্রে তাহলে মানবীয় বিবেকবুদ্ধির ভূমিকা ও করণীয় কী?

এ প্রশ্নের জবাব খুবই স্পষ্ট ও সহজ। মানুষকে আল্লাহর দেয়া এই বিবেকবুদ্ধি সেই ওহীকে অর্জন ও গ্রহণ করতে সক্ষম। ওহীর বক্তব্য কী তা বুঝবার ক্ষমতাও তার রয়েছে। সুতরাং ওহীকে বুঝা ও গ্রহণ করাই বিবেকের কর্তব্য। আর আলো ও হেদায়াত লাভের এবং এই সত্য ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার অনুসরণের সুযোগটাও তার জন্যে এক সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু মানুষের বিবেকবুদ্ধি যদি ওহীর সাহায্য না নিয়েই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে, তাহলে সে বিভ্রান্ত ও বিকৃতিতে লিপ্ত হতে বাধ্য। তার দৃষ্টি হবে তখন ভ্রান্ত ও একপেশে। আর তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সবই হবে ত্রুটিপূর্ণ।

এর কারণ এই যে, ওহীর নির্দেশনা ব্যতিরেকে বিবেকের স্বাধীনতা প্রয়োগ করলে মানুষ জগত ও জীবনকে একটা একক হিসাবে দেখতে সক্ষম হবে না। বরং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এক

একটা স্বতন্ত্র অংশ হিসাবে দেখতে পাবে। এক একটা অভিজ্ঞতা, এক একটা ঘটনা দুর্ঘটনা এবং এক একটা আকৃতির আলোকে সে জীবন ও জগতকে ভিন্ন ভিন্ন অংশ হিসাবে দেখবে। গোটা জগতকে এক সাথে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না বিধায় গোটা জীবনের জন্যে সুসমন্বিত ও পূর্ণাংগ আইন ও বিধান প্রণয়নও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্যে যখন মানুষ আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর হেদায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, তখন সে একের পর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা, আইন ও বিধানের রদবদল, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে অস্থিরতা বোধ করতে থাকে এবং চরম ডান থেকে চরম বামের মাঝখানে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর এ সব করতে গিয়ে সে মানুষের বহু মূল্যবান জান ও মালের অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেলে। কিন্তু সে যদি ওহীর অনুসরণ করতো, তাহলে এত সব বিপর্যয়ের কোনোটারই সম্মুখীন তাকে হতে হতো না। যেখানে সেখানে পরিবর্তন ও রদবদল সংঘটিত হতো, কেবল বস্তু, সাজ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিতে সংঘটিত হতো। আর ওহীকে মেনে নিয়েই মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। যেখানে সে স্বাধীন হতে পারে। শেষ পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতি যদি হতো, তবে তা কেবল বস্তুদহ জগতেই হতো, নৈতিক জগতে নয়।

এসব ক্ষয়ক্ষতির একমাত্র কারণ মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের আবেগ, উচ্ছাস ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার উপস্থিতি। এগুলোর নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক, যাতে মানব জীবনের স্থিতি ও বিকাশে তার দায়িত্ব পালন নিশ্চিত হয় এবং নিজের এই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তা জীবনকে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত না করে। শুধু মানবীয় বিবেক বুদ্ধি দিয়ে প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ও আবেগ উচ্ছাস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। কেননা কামনা বাসনা ও আবেগ উচ্ছাসের চাপে এই বিবেকও প্রভাবিত হয়ে যায়। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও পাহারা দিয়ে বৈকল্য থেকে রক্ষা করার জন্যে অন্য একটা শক্তির প্রয়োজন। মানব জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে ও প্রতিটি অভিজ্ঞতায় বিবেককে সেই শক্তির পথ নির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে তার অভিজ্ঞতা ও অভিমত সুষ্ঠু ও নির্ভুল হয় এবং যাতে তার সকল কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টিভংগি নিয়ন্ত্রিত হয়।

যারা মানবীয় বিবেককে মৌলিকভাবে ওহীর ন্যায় নির্ভুল বলে দাবী করে এবং এর সপক্ষে এই যুক্তি দেয় যে, বিবেক ও ওহী উভয়ই তো আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং উভয়ে পরস্পরের অনুকূল না হয়ে পারে না, তারা বিবেকের মূল্য সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের উদ্ভট মতামতের আলোকেই এ ধরনের কথা বলে থাকে, অথচ বিবেকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এমন কথা বলেননি।

যারা মনে করে, বিবেক ওহীর বিকল্প হতে সক্ষম, এমনকি খুব উঁচুমানের বিবেকের অধিকারী ব্যক্তি বিশেষের বেলায়ও যারা এরূপ মনে করে, তারাও এ ক্ষেত্রে এমন কথা বলে, যা আল্লাহ তায়ালা বলেননি। আল্লাহ তায়ালা শুধু ওহী ও রেসালাতের আনুগত্য করার দায়িত্ব মানুষের ওপর অর্পণ করেছেন, বিবেকেরও নয়, স্বভাব প্রকৃতিরও নয়। আল্লাহকে এক বলে জানা ও তাঁর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে তিনি শুধু বিবেকের ওপর মানুষকে নির্ভরশীল করেননি। কেননা আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, বিবেক একাকী বিভ্রান্ত হতে পারে এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিও বিকৃতির শিকার হতে পারে। ওহী যতোক্ষণ পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন না করে, ততোক্ষণ বিবেক বা স্বভাবের কোনো নিরাপত্তা নেই।

আর যারা মনে করে যে, বিবেক বা বিবেকের ফসল বিজ্ঞান ধর্মের বিকল্প হতে পারে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর নির্দেশের মুখাপেক্ষিতা থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, তাদের এ উক্তির সপক্ষে কোনো তাত্ত্বিক বা বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নেই। ইতিহাস সাক্ষী যে, বিজ্ঞান বা দর্শনের ভিত্তিতে যখনই মানুষের সামষ্টিক জীবন গড়ে উঠেছে, তখন তা হয়েছে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন, চাই তাদের সম্পদের উৎপাদন ও সরবরাহের প্রাচুর্য যতোই বেশী হোক না কেন এবং তাদের জীবনে আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনের উপকরণের যতোই ছড়াছড়ি হোক না কেন। তাই বলে মানব

জীবন অজ্ঞতা ও স্বতস্ফূর্ততার ভিত্তিতে গড়ে উঠলে তা এর বিকল্প হতে পারে না। যারা এ ধরনের বক্তব্য রাখেন, তারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই এটা বলে থাকেন। ইসলাম হচ্ছে এমন একটা জীবন ব্যবস্থা, যা মানবীয় বিবেককে তার যাবতীয় দোষ ক্রটি থেকে রক্ষা করে। এরপর সেই জীবন ব্যবস্থা তার ভিত্তি গড়ে তোলে, তার জন্যে এমন আইন কানুন প্রণয়ন করে, যা তার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সাথে নিয়ে চলার নিশ্চয়তা দেয় এবং আল্লাহর শরীয়তের আইন অনুসারে জীবন যাপনেও সাহায্য করে। তার আদর্শ ও বাস্তব ব্যবস্থাকে বিকৃত করার জন্যে কোনো চাপ দেয় না। আল্লাহর ওহী ও হেদায়াতসহ বিবেকবুদ্ধি চক্ষুষ্মান, আর ওহী ও হেদায়াত ছাড়া বিবেক অন্ধ। রসূল (স.)-কে একমাত্র ওহী থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

'আমি ওহী ব্যতীত আর কিছু মানি না। ....'

আয়াতের এ অংশটি মূল্যবান শিক্ষায় পরিপূর্ণ। চিন্তা গবেষণা করা ইসলামে সর্বদাই প্রত্যাশিত ও উৎসাহিত। চিন্তা গবেষণার উৎসাহ দান কোরআনের একটা বহুল প্রচলিত রীতি। তবে এ চিন্তা গবেষণা হওয়া চাই ওহী ভিত্তিক ও ওহী নিয়ন্ত্রিত, নিছক লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী চিন্তা গবেষণা নয়, যা মানুষকে অন্ধকারে দিক-নির্দেশনাহীন করে রেখে দেয়।

ওহীর নিয়ন্ত্রণে বিবেক চললে তার বিচরণের জায়গা সংকীর্ণ হয় না বরং আরো প্রশস্ত হয়। তার বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে পড়ে গোটা ত্রিভুবন, যার আওতায় দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয় জগত রয়েছে। অনুরূপভাবে এর আওতায় এসে যায় মানুষের অন্তরের গভীরতম অঞ্চলসহ জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিভাগ। ওহী মানুষকে বিধিগত বিকৃতি, নীতিগত বিভ্রান্তি, দৃষ্টিভংগির ক্রটি, সন্দেহ সংশয় ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা ছাড়া আর কোনো কিছুতে বাধা দেয় না। এইগুলো ব্যতীত আর সমস্ত তৎপরতায় সে তাকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে। আল্লাহর দেয়া এই বিরাট হাতিয়ার বিবেককে ওহী ও খোদায়ী দিক নির্দেশনার আওতায় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই সীমা মেনে চললে তার বিপথগামী হবার সম্ভাবনা আর থাকে না।

ইসলামে আভিজাত্য কোনো মূল্যায়নের মানদণ্ড নয়

এবার ৫১ থেকে ৫৪ আয়াত ক'টি লক্ষ্য করুন।

এ আয়াত কয়টির মূল বক্তব্য ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা, দুনিয়ার মানব রচিত বাতিল মতবাদগুলোর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব এবং সংকীর্ণতা ও শ্রেণীবৈষম্যের বিরোধিতা সম্বলিত।

রসূল (স.)-কে এই আকীদা বিশ্বাস কোনো রূপ সাজসজ্জা ছাড়া হুবহু জনগণের কাছে পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যে সব নিষ্ঠাবান মোমেন এই দ্বীনের দাওয়াত বিস্তারে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়, তাদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দান ও কদর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা একনিষ্ঠ মুসলিম, তাদেরকে কোনো জাহেলী চিন্তাধারার আলোকে বা কোনো সংকীর্ণতার চাপে দূরে ঠেলে দেয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৫১ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন। এতে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

যারা কেয়ামতের দিনে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে ভীষণভাবে ভীত, অথচ আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই, তাদেরকে সতর্ক করো। কেননা তারাই সতর্কতামূলক বক্তব্যের অধিকতর মর্যাদা দানকারী ও শ্রবণকারী। তারাই এতে সবচেয়ে বেশী উপকৃতও হয়ে থাকে। তারা হয়তো সংযমী হবে, আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা পেতে ব্যাকুল হবে এবং নিষিদ্ধ কাজে কখনো লিপ্ত হবে না।

'যারা তাদের প্রতিপালককে খুশী করার জন্যে সকাল সন্ধ্য তাঁকে ডাকে, তাদেরকে দুরে সরিয়ে করো না ....(আয়াত ৫২)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ এবাদাতকারী হবার কারণে সকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে দোয়া করে ও তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তারা এরূপ করে না, তাদেরকে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিও না। এ হচ্ছে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভক্তি ও ভালোবাসার দুর্লভ নমুনা। তাদের প্রত্যেকে কেবল এবাদাত ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। একনিষ্ঠ হয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই, সর্বোচ্চ আদব ও ভক্তি আয়ত্ত করে একমাত্র আল্লাহকেই সন্তুষ্ট করার জন্যে। দোয়া ও এবাদাতের মাধ্যমে তাঁকে ডাকে এবং একেবারেই আল্লাহওয়ালা হয়ে গিয়ে আল্লাহরই জন্যে এবং আল্লাহরই সাহচর্যে জীবন যাপন করে।

আসল ঘটনাটা এই যে, আরবের 'অভিজাত ও কুলীন' শ্রেণীর একটি গোষ্ঠী মোহাম্মদ (স.) দুর্বল ও দরিদ্র লোকদেরকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়ার বাহানায় ইসলাম গ্রহণে বিরত ও বিরক্ত ছিলো। এই দরিদ্র সাহাবাদের অন্যতম ছিলেন হযরত সোহায়েব, বেলাল, আম্মার, খাব্বাব, সালমান ও ইবনে মাসউদ প্রমুখ। রসূল (স.) তাদেরকে শুধু আশ্রয়ই দিতেন না বরং তাদেরকে নানাভাবে সাহায্যও করতেন। তাদের দারিদ্রের কারণে তাদের জামা কাপড় থেকে ঘামের গন্ধ বেরুতো। তাদের সামাজিক মর্যাদা এমন ছিলো যে, তারা কোরায়শ সরদারদের সাথে একই বৈঠকে বসার যোগ্য বিবেচিত হতেন না। এই সব বড় বড় নেতা তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে রসূল (স.)-এর কাছে আবদার জুড়ে দিলো। রসূল (স.) এই আবদার সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তারা প্রস্তাব দিলো যে, তাহলে ওই দরিদ্র সাহাবীদের জন্যে আলাদা এবং অভিজাতদের জন্যে আলাদা বৈঠক করা হোক, যেখানে এই দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা থাকবে না এবং জাহেলী সমাজে ওই সব অভিজাত লোকের যে বিশেষ মর্যাদা ছিলো, তা অক্ষুণ্ন থাকবে। এই প্রস্তাবে রসূল (স.) প্রায় রাযী হয়ে যাচ্ছিলেন। কেননা তারা ইসলাম গ্রহণ করুক এটা ছিলো তাঁর অদম্য আগ্রহ। ঠিক এই মুহূর্তে নাযিল হলো,

'যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনায় সকাল সন্ধ্যা তাঁকে ডাকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না।'

মুসলিম শরীফে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, 'আমরা ৬ জন লোক রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে ছিলাম। মোশরেকরা রসূল (স.)-কে বললো, এদেরকে আপনার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিন যেন আমাদের ওপর ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। ওখানে আমি, ইবনে মাসউদ, হুযায়ে গোত্রের একজন, বেলাল এবং আমি নাম উল্লেখ করবো না এমন আরো দু'জন ছিলাম। এ সময় রসূল (স.) কী যেন ভাবলেন, তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। অতপর মনে মনে কি যেন বললেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনায় সকাল সন্ধ্যা তাঁকে ডাকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না।'

ওই সব বড় বড় নেতা এই সব দুর্বল লোকের ওপর দাপট দেখিয়ে অনেক কিছু বলেছিলো। অথচ এই দুর্বল লোকগুলো রসূল (স.)-এর খুবই প্রিয়পাত্র ও বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। তারা তাদের দারিদ্র ও দুর্বলতার নিন্দা করছিলো। রসূল (স.)-এর দরবারে তাদের উপস্থিতির কারণে ওই সমস্ত কোরায়শ নেতা ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো না এবং বিরূপ ছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা উক্ত দাবীর ব্যাপারে নিজের চূড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করলেন এবং তাদের দাবী কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন,

'তাদের কোনো হিসাব তোমার দায়িত্বে নেই এবং তোমার কোনো হিসাব তাদের দায়িত্বে নেই যে, তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে। এরূপ করলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ তাদের হিসাব তাদের কাছে এবং তোমার হিসাব তোমার কাছে। তাদের দরিদ্র হওয়া জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের কপালের লিখন। এটা আল্লাহর কাছে তাদের বিবেচ্য বিষয়, তোমার নয়। অনুরূপভাবে তোমার দারিদ্র বা ধনাঢ্যতা আল্লাহর কাছে তোমার বিবেচ্য বিষয়, তাদের নয়। ঈমান ও ঈমানের বিভিন্ন স্তরে এই চিন্তাধারার কোনো গুরুত্ব নেই। তুমি যদি ধনী ও দরিদ্রে ভেদাভেদ করে তোমার দরবার থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দাও, তাহলে বুঝা যাবে যে, তুমি আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো না এবং তাঁর মূল্যবোধের আলোকে মানুষকে মূল্যায়ন করো না। সুতরাং তুমি অবিচারকারী বলে গণ্য হবে। আর আল্লাহর রসূল (স.) অবিচারকারী তথা যালেম বলে গণ্য হবেন, এটা তো কোনো মতেই হতে দেয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত রসূল (স.)-এর দরবারে তারাই টিকে গেলেন, যাদের পকেট শূন্য হলেও তাদের অন্তর ছিলো ঈমানের ধনে ধনী। যারা দুনিয়ার পদমর্যাদায় দুর্বল কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও ঈমানের বলে বলীয়ান। তারা তাদের ঈমানের যোগ্যতায় যে জায়গায় অবস্থান করার অধিকারী সেই স্থানেই অবস্থান করতে লাগলেন। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহকে ডাকে, তাদের জন্যেই সে স্থানটি নির্ধারিত ছিলো। ফলে ইসলামের মানদন্ড ও মূল্যবোধ আল্লাহর নির্দিষ্ট মানের ওপর স্থিতিশীল রইলো।

এরপর অহংকারী, বলদর্পী ও উন্নাসিক মোশরেকদের গোষ্ঠী দূরে সরে গেলো এবং বলতে লাগলো, এটা কেমন করে সম্ভব হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্য থেকে এই সব দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে কল্যাণের জন্যে বেছে নিলেন? মোহাম্মদ (স.) যে দ্বীন নিয়ে এসেছে, তা যদি ভালোই হতো, তাহলে ওরা আমাদেরকে টেক্কা দিয়ে তা গ্রহণ করতে পারতো না এবং আল্লাহ তায়ালা ওদের আগে আমাদেরকে হেদায়াত করতেন। এটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো ধনাঢ্য ও পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা থাকতে এই সব দুর্বল ও দরিদ্র লোকদেরকে বাছাই করে তাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন।

ধন সম্পদ ও বংশীয় আভিজাত্য নিয়ে অহংকারে লিপ্ত এই লোকদের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই কঠিন পরীক্ষা নির্ধারিত করে রেখেছেন। তারা ইসলামের সত্যিকার পরিচয় যেমন জানে না, তেমনি জানে না নতুন ইসলামী বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপও। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়া উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত এই নতুন বিশ্ব সেদিনকার আরব ও অনারব গোটা দুনিয়ার কাছেও অজানা ও অপরিচিত ছিলো, আর আজকের হরেক রকমের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছেও অপরিচিত। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে একথাই বলেন,

'এভাবেই আমি তাদের একাংশকে দিয়ে আরেক অংশকে পরীক্ষা করিয়েছি, যাতে তারা বলে, এই নাকি সেই সব লোক, যাদেরকে আমাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন?'

বলদর্পীদের ছুঁড়ে দেয়া এই জিজ্ঞাসা আসলে ঈমানী মূল্যবোধকেন্দ্রিক এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাদের অবজ্ঞা ও নেতিবাচক মনোভাবই ফুটিয়ে তুলেছে। কোরআন এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে এভাবে,

'কারা কৃতজ্ঞ, তা কি আল্লাহ ভালো জানেন না?'

অতীব তাৎপর্যপূর্ণ এই ক্ষুদ্র বাক্যটি থেকে যে কয়টি শিক্ষা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ,

প্রথমত, হেদায়াত একটা নেয়ামত স্বরূপ। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তাদেরকে হেদায়াত দান করলে তারা উক্ত নেয়ামতের যথাযথ শোকর আদায় করবে, তাদেরকেই

তিনি এই নেয়ামত দিয়ে থাকেন। বস্তুত এটি এমন একটি নেয়ামত, যার শোকর আদায় করে বান্দা কখনো শেষ করতে পারবে না। তবে আল্লাহ তায়ালা তার চেষ্টা সাধনাকে কবুল করেন এবং তাকে এই তুলনাবিহীন ও নযীরবিহীন নেয়ামত দিয়ে পুরস্কৃত করে থাকেন।

দ্বিতীয়ত, ঈমান এমন একটি নেয়ামত, জাহেলী মানব সমাজগুলোতে বিদ্যমান তুচ্ছ বস্তুবাদী মূল্যবোধগুলোর সাথে যার কোনো তুলনা চলে না। এ নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদেরকেই দেন, যাদের সম্পর্কে তাঁর জানা আছে যে, তারা এর শোকর আদায় করবে। চাই তারা দুর্বল, দরিদ্র ও দাস শ্রেণীর লোকই হোক না কেন। জাহেলী সমাজে যে সব তুচ্ছ অর্থ আভিজাত্য নিয়ে বড়াই করা হয়, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় তার কানাকড়ি মূল্য নেই।

তৃতীয়ত, আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে আপত্তি করে শুধু তারাই, যারা দুনিয়ার বস্তুসমূহের প্রকৃত পরিচয় জানেনা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর যে অনুগ্রহ বিতরণ করেন, সেটা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে উক্ত অনুগ্রহের উপযোগী, তা জেনেই করেন। এ ধরনের আপত্তি তোলা আল্লাহর সাথে বেয়াদবী ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে এই মর্মে আদেশ দিচ্ছেন যে, রসূল হওয়া সত্তেও তিনি যেন তাদেরকে সালাম দেন, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সবার আগে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন, যাদেরকে ওই সব আভিজাত্যগর্বী মোশরেক নেতারা উপহাস করে থাকে। শুধু প্রথমে সালাম করা নয়, তাদেরকে এই মর্মে সুসংবাদদানেরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর অনুগ্রহ ও করুণা বিতরণ এবং কোনো গুনাহ করার পর তাওবা ও আত্মশুদ্ধি করলে তাদেরকে ক্ষমা করা নিজের কর্তব্যরূপে স্থির করেছেন। (আয়াত ৫৪)

ঈমানরূপী নেয়ামত প্রদানের পর এটা তাদের প্রতি আল্লাহর এক বাড়তি সম্মান। এই বাড়তি সম্মানের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হিসাবকে সহজ করা এবং কর্মফল প্রদানের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ ও করুণা। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই বান্দাদের ওপর রহমত করাকে নিজের জন্যে একটা কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নবী (স.)-কে এই মর্মে নির্দেশও দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রহমত ও দয়া করাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য রূপে স্থির করার বিষয়টি মোমেনদেরকে জানিয়ে দেন এবং এই দয়া ও রহমত এতো ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, অজ্ঞতাবশত গুনাহর কাজ করার পর তাওবা করে আত্মশুদ্ধির পথ অবলম্বন করলে তাদের সকল গুনাহই তিনি মাফ করে দেবেন। কোনো তাফসীরকারক এভাবেও ব্যাখ্যা করেছেন যে, অজ্ঞতা সর্বক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী, কেননা কোনো মানুষ অজ্ঞতা ছাড়া কোনো গুনাহ করে না। তাই এই ব্যাখ্যা অনুসারে সব গুনাহই তাওবা করলে ক্ষমাযোগ্য। এ ছাড়া কিছু সংখ্যক আয়াতে অজ্ঞতার শর্তের উল্লেখ ছাড়াই ক্ষমার আশ্বাস দেয়া হয়েছে। সেই সব আয়াতের বক্তব্য অনুসারেও তাওবা ও আত্মশুদ্ধি সাপেক্ষে সকল গুনাহ মাফ করা হবে। কেননা দয়া প্রদর্শনকে আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন।

শ্রেণী বৈষম্যের নির্মূলসাধনে ইসলামের সংগ্রাম

সূরার এই পর্বটির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা সমাপ্ত করার আগে এই আয়াত কয়টি নাযিল হওয়ার পটভূমি হিসাবে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার দিকে পুনরায় দৃষ্টি দিতে চাই। এই সমস্ত হাদীস ও কোরআনের অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত আয়াতসমূহ মিলিত হয়ে যে বিষয়টি প্রতিপন্ন করে, তা এই যে, ইসলাম সেদিন মানব জাতিকে যে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দান করেছিলো, পরবর্তীকালে মানব জাতি আর কখনো অতো উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি। আজও তা সেই মর্যাদার অনেক নিম্ন স্তরে অবস্থান করছে।

ঐতিহাসিক তাবারী ইবনে মাসউদ (স.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার যখন রসূল (স.)-এর কাছে সোহায়ব, আম্মার, খাব্বাব বেলাল প্রমুখ দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানরা বসা ছিলো, তখন তাঁর কাছ দিয়ে কোরায়শের শীর্ষস্থানীয় কয়েক ব্যক্তি যাচ্ছিলো। তারা বললো, হে মোহাম্মদ! তোমার জাতিতে এতো লোক থাকতে এদের নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট! ওদেরকে তাড়িয়ে দাও। ওদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার পর হয়তো বা আমরা তোমার দলে ভিড়ে যেতেও পারি।' তৎক্ষণাত এ আয়াত নাযিল হলো, 'যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সকাল সন্ধ্যা তাঁকে ডাকে, তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না' এবং 'এভাবেই আমি তাদের একাংশকে অপরাংশ দিয়ে পরীক্ষা করেছি .....।'

অপর এক হাদীসে হযরত খাব্বাব 'যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ....' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পটভূমি প্রসংগে বলেন, একদিন ইবনে হারেস আততামীমী এবং উয়াইনা ইবনে হিসন আল ফিযারী রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে এসে দেখলো তিনি বিলাল, সোহায়ব, আম্মার ও খাব্বাবের ন্যায় কিছু সংখ্যক দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানের সাথে বসে আছেন। তারা এদেরকে দেখে প্রথমে দূর থেকে নাক সিটকালো। তারপর রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললো, আমরা চাই আপনি আমাদের জন্যে এমন একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করুন, যা দেখে আরবরা বুঝবে যে, আমাদের মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন আছে। আরবের দূরদূরান্ত থেকে বহু লোক আপনার কাছে এসে থাকে। সেই সব আরব আগন্তুক আমাদেরকে এই সব দাস শ্রেণীর লোকদের সাথে দেখুক, এটা আমাদের জন্যে লজ্জাজনক। কাজেই আমরা যখন আপনার কাছে আসি, আপনি ওদেরকে আমাদের কাছ থেকে উঠিয়ে দেবেন। আমরা চলে গেলে আপনি চানতো ওদের সাথে বসবেন। রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে। তারা বললো, তা হলে এই মর্মে আপনি একটা চুক্তি আমাদেরকে লিখে দিন। রসূল (স.) কাগজ চেয়ে পাঠালেন এবং চুক্তি লেখার জন্যে আলী (রা.)-কে ডাকলেন। এ সময় আমরা এক কোণে বসে ছিলাম। সহসা জিবরীল এই তিনটি আয়াত (৫২, ৫৩ ও ৫৪) নিয়ে এলেন। রসূল (স.) সংগে সংগে কাগজটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতপর আমাদেরকে কাছে ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'তোমাদের ওপর সালাম। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর দয়া প্রদর্শনকে নিজের জন্যে কর্তব্য হিসাবে স্থির করেছেন।' এরপর আমরা তাঁর সাথে বসতাম। যখন তিনি উঠে যেতে চাইতেন, উঠতেন এবং আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতেন। অতপর আল্লাহ (সূরা কাহফের ২৮ নং আয়াত) নাযিল করলেন,

'যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাদের প্রতিপালককে সকাল সন্ধ্যা ডাকে, তাদের সাথে ধৈর্য অবলম্বন করো এবং দুনিয়ার ঐশ্বর্য কামনা করে তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না।' এরপর রসূল (স.) আমাদের সাথে বসে থাকতেন। তারপর তাঁর যাওয়ার সময় হলে আমরা আগে উঠতাম এবং চলে যেতাম যাতে তিনি ওঠেন।'(১) (কারণ আমরা না ওঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না।)

এরপর রসূল (স.) যখনই এই দরিদ্র মুসলমানদেরকে দেখতেন, প্রথমে সালাম করতেন, আর বলতেন, আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এমন লোকও সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে আগে সালাম দিতে আমাকে আদেশ করেছেন।'

---

(১) ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরে এই হাদীসকে বিরল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, এ আয়াত মক্কী, অথচ আকরা ইবনে জাবের ও উয়াইনা হিজরতের অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমি তার এ আপত্তির যুক্তি খুঁজে পাই না। রসূল (স.)-কে তারা যে কথা বলেছিলেন, তা অবশ্যই মুসলমান হবার আগেই বলেছেন। মুসলমান হয়ে তো তারা এমন কথা বলতেই পারেন না। কাজেই তাদের এই উক্তি এবং হিজরতের পরে তাদের ইসলাম গ্রহণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। মক্কায় এই আয়াত নাযিল হবার দিন তারা তাদের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় গ্রহণে বিরত থেকেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে আয়েয বিন আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সালমান, সোহায়ব, বেলাল ও অপর কয়েকজন মুসলমানের কাছ দিয়ে আবু সুফিয়ান যাচ্ছিলেন। তখন তারা বললেন, আল্লাহর 'কসম, আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর দুশমনের প্রতি উপযুক্ত আচরণ করেনি।' (অর্থাৎ আল্লাহর এই দুশমনটাকে আজও খতম করতে পারেনি।) এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) তাদেরকে বললেন, কোরায়শের নেতা ও সরদারকে তোমরা এমন কথা বললে? অতপর তিনি রসূল (স.)-এর কাছে এসে তাকে ব্যাপারটা জানালেন। রসূল (স.) বললেন, 'হে আবু বকর, তুমি হয়তো ওই কয়জন সাহাবীকে রাগিয়ে দিয়েছো। ওদেরকে যদি রাগান্বিত কর, তবে তুমি নির্ঘাত আল্লাহকেও রাগান্বিত করবে।' তৎক্ষণাত আবু বকর তাদের কাছে গিয়ে বললেন, ওহে আমার ভাইয়েরা! আমার কথায় কি তোমরা রাগ করেছো? তারা বললেন, না, ভাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।

এ আয়াত কয়টি নিয়ে শুধু আমাদের নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন। কেননা এতে শুধু যে মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা, মতবাদ, মূল্যবোধ ও আদর্শ আলোচিত হয়েছে তা নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু। এতে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা মানব জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়েছে। আল্লাহর এই দ্বীন মানব জাতির জীবনে একদিন কতো বড়ো পরিবর্তন সাধন করেছিলো, একদিন তাকে কতো উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছিলো, সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেই উচ্চ মর্যাদার আসন থেকে এখন সে যতো নিচেই গড়িয়ে পড়ুক না কেন, একদিন যে পরিবর্তন তার জীবনে সাধিত হয়েছিলো, একদিন যে উচ্চ মর্যাদায় সে আসীন হয়েছিলো, তার গৌরব কখনো ম্লান হবার নয়। অতীতের এক সময়ের এই হৃত গৌরব চিহ্নিত হলে আশা করা যায় যে, মানব জাতি একদিন তা পুনরুদ্ধারের জন্যে সচেষ্ট হবে। কেননা যে গৌরব একদিন সে অর্জন করেছিলো, তা অর্জন করা নিশ্চয়ই তার সাধ্যাতীত নয়। উচ্চ গৌরবের আসনটি যখন চিহ্নিত, পৃথিবীতে সেই একই মানব জাতি যখন অধিষ্ঠিত আর আল্লাহর যে দ্বীনকে অবলম্বন করে সেই উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিলো, সেই দ্বীনও যখন অবিকৃতভাবে বিদ্যমান, তখন বাকী শুধু সংকল্প ও প্রত্যয়। এই সংকল্প ও প্রত্যয় অর্জন করে মানব জাতির সেই হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

আলোচ্য আয়াত কয়টি এ যুগের মানব জাতির সামনে তার সেই হারিয়ে যাওয়া উচ্চ মর্যাদার আসনটিকে চিহ্নিত করে দিয়েছে, যেখানে ইসলাম আরবদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলো। জাহেলিয়াতের নোংরা আঁস্তাকুড় থেকে উদ্ধার করে ইসলাম তাদেরকে পৌঁছে দিয়েছিলো গৌরব ও মহত্ত্বের সেই স্বর্ণ শিখরে।

জাহেলিয়াতের যে আস্তাঁকুড়ে শুধু আরবরাই নয় বরং সে কালের গোটা বিশ্ববাসী নিমজ্জিত ছিলো সেই আস্তাঁকুড়েরই নোংরা কৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছিলো কোরায়শ নেতাদের নিম্নের উক্তিতে, 'হে মোহাম্মদ তোমার গোত্রের আর সবাইকে বাদ দিয়ে এই সব লোক নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলে? আমাদের সবার মধ্য থেকে একমাত্র এদেরকেই কি আল্লাহ অনুগৃহীত করলেন? আমাদের কি শেষ পর্যন্ত এদেরই আনুগত্য করতে হবে? ওদেরকে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দাও। ওদেরকে যদি তাড়িয়ে দাও, তাহলে হয়তো বা আমরা তোমার অনুসারী হয়ে যাবো।' অথবা আকরা ইবনে হাবিস আত্তামীমী ও উয়াইনা ইবনে হিসন আল ফাযারী কর্তৃক রসূল (স.)-এর প্রাথমিক যুগের সাহাবী দুর্বল শ্রেণীভুক্ত মোমেন বিলাল, সোহায়ব, আম্মার ও খাব্বারে প্রতি নাক সিটকানো ও রসূল (স.)-কে বলা, 'আমরা চাই, আপনি আমাদের জন্যে এমন একটা মজলিশের ব্যবস্থা করুন, যা দ্বারা আরবরা বুঝবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন আছে। কেননা আরবের বিভিন্ন

অঞ্চল থেকে তোমার কাছে লোকজন আসে। তারা আমাদেরকে এই সব গোলামের সাথে ওঠাবসা করতে দেখবে, এটা বড়ই লজ্জাজনক।'

এখানে জাহেলিয়াত তার কুৎসিত চেহারা প্রদর্শন করেছে, দেখিয়েছে তার নিকৃষ্ট মূল্যবোধ এবং জঘন্য মানসিকতা, দেখিয়েছে বংশীয় আভিজাত্য, সম্পদের বড়াই আর শ্রেণী বিদ্বেষ। যাদেরকে দেখে তারা নাক সিটকিয়েছে, তাদের কয়েকজন অনারব, কয়েকজন নিম্ন শ্রেণীর আরব, এবং কয়েকজন দরিদ্র। এ ধরনের মূল্যবোধ প্রতিটি জাহেলী সমাজের বৈশিষ্ট্য। জাতিগত, শ্রেণীগত ও বংশীয় শ্লোগানে আজকের দুনিয়ার কোনো জাহেলী সমাজই এর চেয়ে উঁচুমানের নয়।

জাহেলিয়াতের নোংরা আস্তাঁকুড়ের এই হলো চেহারা। পক্ষান্তরে ইসলামের অবস্থান কত উঁচুতে। তার কাছে, এই সব তুচ্ছ ভেদাভেদ এবং এই সব সংকীর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ ধ্যান ধারণার কোনো মূল্য নেই। ইসলাম আকাশ থেকে নেমেছে। মাটি থেকে গজায়নি। মাটি হলো নোংরামি ও নিচুতার স্থান। এই স্থান থেকে এমন মহত্ত্ব ও মহানুভবতার উদ্ভব সম্ভব নয়। এ স্থান থেকে সম্ভব নয় মহান ইসলামের উদ্ভব হওয়া, যার আনুগত্য প্রথমে মোহাম্মদ (স.) করেছেন, যার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে, যিনি ইতিপূর্বে ছিলেন বনু হাশেমের একটি শাখার সদস্য এবং কোরায়শের মধ্যমণি। হযরত আবু বকরও ছিলেন এই ইসলামের অনুসারী। এ সব গোলামের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে, তা শিখিয়েছিলো তাদেরকে ইসলাম। হাঁ, এরা গোলাম বটে। তবে এমন গোলাম যে, তারা সকলের গোলামীর শৃংখল খুলে দিয়েছিলো এবং শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়েছিলো। এ কারণেই তারা সর্বক্ষেত্রে নযীরবিহীন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

জাহেলী কৃষ্টি মূল্যবোধের হীনতা ও নিকৃষ্টতা যেমন কোরায়শ নেতাদের কথাবার্তায় এবং আকরা ও উয়াইনার আচরণে প্রকাশ পেয়েছিলো, তেমনি ইসলামের মহত্ত্ব ও মাহনুভবতা প্রকাশ পেয়েছিলো রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে প্রদত্ত আল্লাহর নির্দেশে।

'যারা তাদের প্রতিপালককে খুশী করার উদ্দেশ্য সকাল বিকাল তাঁকে ডাকে, তাদেরকে তুমি তোমার কাছ থেকে দূরে দিয়ো না.................. (আয়াত ৫২, ৫৩, ও ৫৪)

এটা এই সব গোলামের সাথে রসূল (স.)-এর আচরণেও প্রকাশ পেয়েছিলো। আল্লাহ তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন তাদেরকে প্রথম সালাম করতে এবং তাদের কাছে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে, যেন তারা না ওঠা পর্যন্ত তিনি দরবার ত্যাগ না করেন। অথচ তিনি ছিলেন বনু হাশেমের নয়নমণি মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ, অতপর আল্লাহর রসূল ও সৃষ্টির সেরা।

'ওই গোলামরা' আল্লাহর কাছে নিজেদের অবস্থানকে যেভাবে মূল্যায়ন করতেন, নিজেদের তরবারিগুলোকে তারা যেভাবে 'আল্লাহর তরবারি' গণ্য করতেন এবং 'কোরায়শ সরদার ও কোরায়শ নেতা' আবু সুফিয়ানকে তারা যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এ সব কিছুতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ইসলাম ও জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভংগির আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আবু সুফিয়ান কোরায়শের এতো বড় নেতা হওয়া সত্তেও মুসলমানদের মধ্যে তিনি ছিলেন পেছনের কাতারের ব্যক্তি। কারণ তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করে রসূল (স.)-এর ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করে প্রাণে রক্ষা পাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে এই দরিদ্র ও গোলাম শ্রেণীর মুসলমানরা প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করায় উঠে এসেছিলেন মুসলমানদের সম্মুখ সারিতে। শুধু তাই নয়, আবু বকর (রা.) যখন তাদেরকে আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে তিরস্কার করলেন, তখন রসূল (স.) তাকে সাবধান করে দিলেন যে, এতে ওই 'গোলামরা' রাগান্বিত হয়ে থাকতে পারে আর তাতে স্বয়ং আল্লাহও রাগান্বিত হতে পারেন।

তাদের এতো উচ্চ মর্যাদা আর কোনো মন্তব্য দ্বারা ফুটে উঠতে পারে না এবং এই মূল্যায়ন আমরা শুধু উপলব্ধি করতে পারি, ব্যক্ত করতে পারি না। আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাত চলে যান ওই 'গোলাম'দেরকে খুশী করতে, যাতে আল্লাহ তায়ালা খুশী থাকেন। তিনি গিয়ে বলেন, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা কি রেগে গিয়েছো? তারা বলে, না ভাই, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন।

এ ঘটনাটি থেকে বুঝা যায়, সেদিন মানব জাতির জীবনে কতো বড় বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। সামাজিক আচরণে, মূল্যবোধে, চিন্তাধারায় ও চেতনা অনুভূতিতে কী বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। অথচ পৃথিবী তখনো আগের মতোই রয়েছে, পরিবেশ আগের মতোই রয়েছে, মানুষ আগের মতোই রয়েছে, অর্থনীতি আগের মতোই চলছে। সব কিছু যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। কেবল আকাশ থেকে একজন মানুষের ওপর ওহী এসেছে, সেই ওহীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শক্তি নিহিত ছিলো যে, তা মানব জাতির সহজাত বিবেক ও চেতনাকে সম্বোধন করা মাত্র তার সমস্ত মরিচা ও মলিনতা দূর হয়ে গেছে, জাহেলিয়াতের নোংরা ভাগাড়ে অবস্থানকারীদেরকে তা ওপরে তুলে এনে ক্রমাগত উদ্দীপিত করে উচ্চস্তরে উন্নীত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামের এই মহিমান্বিত সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছে।

এরপর মানবতা আবার সেই উচ্চতম শিখর থেকে নিচে নামতে শুরু করেছে এবং নামতে নামতে আবার আগের সেই ভাগাড়ে এসে পৌঁছেছে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, শিকাগো, জোহান্সবার্গ প্রভৃতি তথাকথিত 'সভ্য' ভূখন্ডে পুঞ্জীভূত হয়েছে বর্ণবৈষম্য, ভাষাগত বিদ্বেষ, জাতিগত বিদ্বেষ, শ্রেণীগত বিভেদ প্রভৃতি পুঁতিগন্ধময় ও নোংরা আবর্জনা, যা আরব জাহেলিয়াতের আবর্জনার চেয়ে কোনো অংশে কম নোংরা নয়। (*তখন দক্ষীণ আফ্রিকায় প্রচন্ড বর্ণ বিদ্বেষ প্রচলিত ছিলো*)।– সম্পাদক)

ইসলাম এখনো সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মুসলিম জাতি ইসলামকে ত্যাগ করার কারণে তাদের এই অধপতন।। সভ্যতার যে উজ্জ্বলতম স্তরে মানুষ এ যাবত পৌঁছতে পেরেছে, ইসলামের অবস্থান তার চেয়ে অনেক অনেক উর্দ্ধে। ইসলাম সেখানে অবস্থান করছে মানব জাতির ওপর আল্লাহর করুণা হিসাবে। বিচিত্র নয়, ইসলাম আবারো মানুষকে চলমান নোংরা সভ্যতা থেকে উদ্ধার করতে পারে এবং মহত্ত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাতে পারে।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' আমি এ বিষয়ের আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করতে পারবো না। শুধু মানব জাতিকে আহ্বান জানাবো, ইসলাম মানবেতিহাসে যে বিস্ময়কর ও নযীরবিহীন ভূমিকা পালন করেছে এবং কিভাবে মানব জাতিকে জাহেলিয়াতের সর্বনিম্ন স্তর থেকে তুলে এনে সভ্যতা ও মহত্ত্বের সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করেছে, তা যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। আধ্যাত্মিকতা ও ঈমান-আকীদা থেকে বঞ্চিত 'জড়বাদী সভ্যতা' যখন পুনরায় মানব জাতিকে বিপথে ধাবিত করতে শুরু করেছে, তখন আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে তাকে বিপথগামিতা থেকে ফিরিয়ে আনার কী বিরাট ক্ষমতা ইসলামের রয়েছে। পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশনা ব্যতিরেকে মানুষের রচিত যাবতীয় মতবাদ ও মতাদর্শ, মানুষের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও চেষ্টা সাধনা এবং মানুষের প্রবর্তিত যাবতীয় বিধিব্যবস্থা, চিন্তাধারা ও রীতিনীতি যখন মানুষকে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের সেই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে, মানুষের জন্যে যথাযোগ্য সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করতে এবং গণহত্যা, যুলুম, নিপীড়ন, স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা করতে, সন্ত্রাস, আতংক, নির্যাতন, ক্ষুধা প্রভৃতি দুর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তখন কোন কারণে ইসলামকে আর একবার এই কাজ সমাধা করার সুযোগ দেয়া হবে না, তা আজকের মানব জাতিকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাই।

এই আয়াতগুলোকে একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে তা থেকে যে কোনো বিদগ্ধ পাঠক এ ব্যাপারে যথেষ্ট আলোর সন্ধান পাবেন। তাই এ বিষয়ে এ পর্যন্ত আলোচনাই যথেষ্ট মনে করছি।

হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চিনতে হবে

সূরার এই পর্বের শেষ আয়াতটিতে আল্লাহ বলেন, (৫৫ আয়াত) 'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

যে পর্বটির উপসংহার টানা হয়েছে এ আয়াত দিয়ে, তাতে রেসালাত ও রসূলের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ইসলামী আকীদা ও আদর্শকে নির্ভেজালভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ইসলাম যে ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের উচ্ছেদ ও যে ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা কামনা করে, তার বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ জন্যেই বলা হয়েছে,

'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি ......'

অর্থাৎ এতোটা বিশদভাবে বর্ণনা করি যে, ইসলামের দাওয়াতের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে আর কোনো অস্পষ্টতা বা সন্দেহই অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুত, সত্য একেবারেই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

এ সূরায় ইতিপূর্বে যে সব যুক্তি ও প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে, তা আল্লাহর এই উক্তির আওতাভুক্ত,

'এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করি ....'

তবে এই ক্ষুদ্র আয়াতের শেষাংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। অংশটি হলো,

'যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়।'

এ কথাটার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্ময়কর। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের প্রচার ও তার বাস্তবায়নের আন্দোলনে কোরআন যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেই পদ্ধতিটা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের অনুসৃত এই পদ্ধতি শুধু সৎকর্মশীল মোমেনদের পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সত্য ও ন্যায়ের বর্ণনাই দেয় না, বরং বাতিলেরও পরিচয় দেয়, যাতে অপরাধী ও বিপথগামী লোকদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা মোমেনদের পথ সুস্পষ্টভাবে জানতে হলে অপরাধী অসৎ লোকদের পথ কোনটা তাও জানা দরকার। দুইটি পথের মাঝে পার্থক্য করার জন্যে যেমন ভেদরেখা এঁকে দেয়া হয়, এটা ঠিক তেমনি।

মানুষের সাথে আচরণ ব্যবহারের এই পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এই তৈরী করেছেন। কেননা তিনি জানেন যে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচল বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যে এ বিপরীত বাতিল ও অসত্যের সাথেও পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানা দরকার যে, এই জিনিসটা পুরোপুরি বাতিল ও পুরাপুরি ক্ষতিকর আর ওই জিনিসটা পুরোপুরি ভালো ও পুরোপুরি কল্যাণকর। যে ব্যক্তি সত্যের ওপর আছে, সে শুধু নিজে সত্যের ওপর আছে জানলেই সত্যকে রক্ষা করার জন্যে সংগ্রাম করতে পারে না বরং যে তার বিরোধী সে যে বাতিলের ওপর আছে, সেটা জানলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। সত্যের বিরোধীরা যে অপরাধীদের পথই অনুসরণ করে থাকে তা না জানলে সত্যের জন্যে লড়াই করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি এ সূরার অপর একটি আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে অপরাধীদের মধ্য থেকে একজন শত্রু সৃষ্টি করেছি।'

এর উদ্দেশ্য রসূল (স.) ও মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, তাদের সাথে যারা শত্রুতা করে, তারা নিশ্চয়ই অপরাধী।

ঈমান, সততা ও ন্যায়নীতিকে সুস্পষ্টভাবে চিনবার জন্যে কুফর, শেরক ও অপরাধকে সুস্পষ্টভাবে চেনা অপরিহার্য। আর অপরাধীদের পথ পরিষ্কারভাবে চিনিয়ে দেয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সবিস্তারে বুঝিয়ে দেয়ার অন্যতম লক্ষ্য। কেননা অপরাধীদের পথ ও অবস্থান সম্পর্কে

যে কোনো অস্পষ্টতা ও সংশয় স্বয়ং মোমেনদের নিজেদের পথ ও অবস্থানকে সংশয়াপন্ন করে তোলে। এ দুটো আসলে একই পাতার দুই পিঠ। তাই এ দুটোই চেনা ও জানা অপরিহার্য।

এ কারণেই প্রত্যেক ইসলামী আন্দোলনের উচিত মোমেনদের পথ ও অপরাধীদের পথ চিহ্নিত করা। উভয় পথ চিহ্নিত করেই তাদের কাজ শুরু করা উচিত। শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয় বরং বাস্তবিকভাবে মোমেনদের এবং অপরাধীদের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ও আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করা চাই, যাতে দাওয়াতদাতারা জানতে পারবে তাদের পার্শ্ববর্তীদের মধ্যে কারা মোমেন এবং কারা অপরাধী। মোমেনদের পথ, আলামত ও জীবন পদ্ধতি এবং অপরাধীদের পথ, আলামত ও জীবন পদ্ধতি চিহ্নিত করা চাই, যাতে মোমেনদের ও অপরাধীদের ঠিকানা, পথ, জীবন পদ্ধতি ও আলামত মিলে-মিশে একাকার হয়ে না যায়।

যেদিন ইসলাম আরব উপদ্বীপে পৌত্তলিকদের সাথে সংঘর্ষরত ছিলো, সেদিন এই পার্থক্যটা চিহ্নিত ও স্পষ্ট ছিলো। সেদিন সবাই জানতো যে, মোমেন ও সৎ লোকদের পথ রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদেরই পথ, অন্য কিছু নয়। আর অপরাধী ও মোশরেকদের পথও অমুসলিমদেরই পথ, অন্য কিছু নয়। আর এভাবেই আল্লাহ তায়ালা উভয় পথের নিদর্শনাবলী বিশদভাবে তুলে ধরেছেন, যার নমুনা এই সূরা ও অন্যান্য সূরায় বিপুল পরিমাণে রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অপরাধীদের পথ চিহ্নিত করা।

পৃথিবীর যেখানেই এবং যে কালেই ইসলামের সাথে শেরক, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা, বিকৃত ধর্মসমূহ ইত্যাদি বাতিল মতাদর্শের মোকাবেলা হবে, সৎ মোমেনদের পথ ও অপরাধী মোশরেক ও কাফেরদের পথ স্পষ্ট হবে। উভয় পথের মধ্যে কোনো রকমের মিশ্রণের অবকাশ থাকবে না।

নাম সর্বস্ব মুসলমানদের নিয়ে সমস্যা

কিন্তু এ যুগের সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনগুলো যে কঠিনতম ও জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন সেটা এ জাতীয় কিছু নয়। এই সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে অন্যভাবে। যে সব দেশ একদিন ইসলামী দেশ ছিলো, ইসলামী আইন ও শাসনের অধীন ছিলো, সেই সব দেশে মুসলিম জাতিরই ঔরসে এমন সব মানব গোষ্ঠী জন্মেছে, যারা ওই সব দেশেই রয়েছে, নিজেদেরকে মুসলমান নামে পরিচয়ও দিচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামকে ত্যাগ করেছে, ইসলামের মূলনীতিগুলোকে তারা তাদের কর্মে ও বিশ্বাসে বর্জন করেছে অথচ মনে করছে যে, তারা ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী। ইসলাম হচ্ছে এই মর্মে সাক্ষ্য বা ঘোষণা দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়ার অনিবার্য অর্থ এই যে, একমাত্র আল্লাহকেই সমগ্র বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা, শাসক ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর বান্দারা একমাত্র তাঁরই হুকুম অনুসারে আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও জীবনের অন্য সমস্ত কাজ সমাধা করার অধিকারী বলে স্বীকার করতে হবে এবং এ কথাও বিশ্বাস করতে হবে যে. আল্লাহর বান্দাদের একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আইন কানুন গ্রহণ করতে হবে এবং জীবনের সমস্ত কর্মকান্ড সেই অনুসারে পরিচালনা করতে হবে, যে ব্যক্তি এই অর্থ ও মর্ম সহকারে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে ঘোষণা দেয় না তার নাম ও বংশ পরিচয় যাই হোক না কেন, সে ইসলামে প্রবেশই করেনি। আর যে দেশ ও জাতি এই অর্থ ও মর্ম সহকারে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে ঘোষণা দেয় না, সে দেশ ও জাতি ইসলামে প্রবেশ করেছে বলে গণ্য হবে না এবং ইসলামের অনুসারী বলে স্বীকৃত হবে না।

আজকের পৃথিবীতে এমন অনেক মানব গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের নাম মুসলমানদের নামের মতোই। জন্মগতভাবে তারা মুসলমানদেরই বংশধর, তাদের দেশও এক সময় দারুল ইসলাম

তথা ইসলাম শাসিত দেশ ছিলো, কিন্তু তারা এই মর্ম ও অর্থ সহকারে সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই।

সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনগুলো এই সব দেশে এই সব নাম সর্বস্ব মুসলিম জনতার মোকাবেলায় যে সমস্যার সম্মুখীন, সেটাই হচ্ছে তাদের জন্যে কঠিনতম সমস্যা। একদিকে ইসলাম ও 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহর' মর্মার্থ এবং অপরদিকে শেরক ও জাহেলিয়াতের মর্মার্থকে ঘিরে যে অস্পষ্টতা ও অস্বচ্ছতা বিরাজ করছে, সেটাই আজকের ইসলামী আন্দোলনের পথের সবচেয়ে কঠিন বাধা। সৎ মুসলমানদের পথ ও অপরাধী অ-মুসলিমদের পথ ও পরিচয় অস্পষ্ট থাকাটা ইসলামী আন্দোলনের পথের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। ইসলামী আন্দোলনের শত্রুরা আমাদের এই সমস্যাটার কথা জানে। তাই তারা এই সমস্যার সুযোগ গ্রহণ করে এমন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে যে, স্পষ্টবাদিতার সাহায্য নিয়ে কথা বললে মুসলমানদেরকে 'কাফের' ফতোয়া দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে কাকে কাফের আর কাকে মুসলমান বলতে হবে, সেটা জনগণের প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও পরিভাষা অনুসারে বলতে হচ্ছে– আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল যা বলেছেন, সে অনুসারে কোথাও বলা যাচ্ছে না।

ইসলামী আন্দোলনকারীদেরকে সর্বকালেই এই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় এবং এটাই তাদের পথের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। তাই আল্লাহর পথের দিকে দাওয়াতের কাজ শুরুই করা উচিত মোমেনদের পথ আর অপরাধীদের পথ আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে। যারা ইসলামের দাওয়াতের কাজ করে তাদের স্পষ্ট কথা বলা ও চিহ্নিত করে কথা বলা উচিত। এ ব্যাপারে না কাউকে ভয় পাওয়া উচিত,না কোনো নমনীয়তা ও আপোষ করা উচিত। আর না কারো নিন্দা সমালোচনার তোয়াক্কা করা উচিত যে, 'ওই দেখো, উনারা কেমন ইসলাম প্রচার করছেন, মুসলমানদেরকেই ইসলাম থেকে খারিজ বলে ফতোয়াবাজী করে চলেছেন।'

প্রতারিত লোকেরা ইসলামকে যেমন নমনীয় আদর্শ মনে করছে, ইসলাম আসলে তা নয়। ইসলাম সুস্পষ্ট এবং কুফরীও সুস্পষ্ট। ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া, এই অর্থে যে, বাস্তব জীবনের সর্বত্র একমাত্র আল্লাহরই আইন ও বিধান মেনে চলা জরুরী। যারা এই অর্থে ওই সাক্ষ্য দেয় না এবং যারা নিজেদের জীবনে পরিপূর্ণ ইসলাম বাস্তবায়িত করেনা। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা এই যে, তারা কাফের, যালেম, ফাসেক ও অপরাধী।

ইসলামের আহবায়কদের এই বাধা অতিক্রম না করে কাজ শুরু করার উপায় নেই। হক ও বাতিলকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেই এ কাজে নামতে হয়। তাহলে আল্লাহর পথে সর্বশক্তি নিয়োগ করা সহজ হয়। কোনো সন্দেহ সংশয় বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। যখন তাদের মনে অটল বিশ্বাস জন্মাবে যে, তারা 'মুসলমান' এবং তাদের পথে বাধা দানকারীরা এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দানকারীরা 'অপরাধী' ও অমুসলিম, তখনই তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে সক্ষম হবে। যতোক্ষণ তাদের এই বিশ্বাস না হবে যে, তারা যে পথে নেমেছেন, তা ঈমান ও কুফর বাছাই করে চলারই পথ, ততোক্ষণ তারা পথের বাধা বিপত্তি ও দুঃখকষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হবে না। তাদের ধর্ম ও আদর্শ এবং তাদের দেশবাসীর ধর্ম ও আদর্শ যে আলাদা, তা না জানা ও না বুঝা পর্যন্ত তারা এই পথে জানমাল বাজি রেখে অগ্রসর হতে পারবে না।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ

রুকু ৭

৫৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলে দাও, (এক) আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যাদের গোলামী করছো, আমাকে তাদের গোলামী করতে নিষেধ করা হয়েছে; তুমি (তাদের এও) বলে দাও, আমি কখনো তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না, (তেমনটি করলে) আমি নিসন্দেহে গোমরাহ হয়ে যাবো এবং আমি আর সত্যের অনুসরণকারী দলের সাথে থাকবো না। ৫৭. তুমি বলো, আমি অবশ্যই আমার মালিকের এক উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তাই তোমরা অস্বীকার করছো; (এ অস্বীকার করার পরিণাম) যা তোমরা দ্রুত (দেখতে) চাও তা (ঘটানোর ক্ষমতা) আমার কাছে নেই! (সব কিছুর) চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতেই রয়েছে; (আর এ মহা) সত্যটিই তিনি (তোমাদের কাছে) বর্ণনা করছেন, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ফয়সালাকারী। ৫৮. তুমি বলো, (আযাবের) যে বিষয়টার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তা (ঘটানো) যদি আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকতো, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যকার ফয়সালা (অনেক আগেই) হয়ে যেতো! যালেমদের (সাথে কি আচরণ করা উচিত তা) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। ৫৯. গায়বের চাবিগুলো সব তাঁর হাতেই নিবদ্ধ রয়েছে, সে-ই (অদৃশ্য) খবর তো তিনি ছাড়া আর কারোই জানা নেই; জলে-স্থলে (যেখানে) যা কিছু আছে তা শুধু তিনিই জানেন; (এই সৃষ্টিরাজির মধ্যে) একটি পাতা কোথাও ঝরে না যার (খবর) তিনি ছাড়া অন্য কেউই জানে না, মাটির অন্ধকারে একটি শস্যকণাও নেই– নেই কোনো তাজা সবুজ, (কিংবা ক্ষয়িষ্ণু) শুকনো (কিছু), যার (পূর্ণাংগ) বিবরণ একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে মজুদ নেই। ৬০. তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি রাতের বেলা তোমাকে মৃত (মানুষের মতো) করে ফেলেন, আবার দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু (যমীনের বুকে) করে বেড়াও, তাও তিনি (পুংখানুপুংখ) জানেন, পরিশেষে সেখানে তিনি

بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ

يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

حَفَظَةً ط حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ط أَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف وَهُوَ أَسْرَعُ

الْحَاسِبِينَ ۞ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

وَخُفْيَةً ج لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم

مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

তোমাদের (মৃতসম অবস্থা থেকে) আবার (জীবনের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনেন, যাতে করে তোমাদের নির্দিষ্ট সময়কালটি এভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে, (আর এ মেয়াদ পূরণ করার পর) তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন (একদিন) তাঁর দিকেই (সংঘটিত) হবে, অতপর তিনি তোমাদের (পুংখানুপুংখ) বলে দেবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে।

রুকু ৮

৬১. আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (যাবতীয় বিষয়ের) ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, (এ জন্যেই) তিনি তোমাদের ওপর পাহারাদার (ফেরেশতা) নিযুক্ত করেন; এমনকি (দেখতে দেখতে) তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফেরেশ্তারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে ফেরেস্তারা) কখনো কোনো ভুল করে না। ৬২. অতপর তাদের সবাইকে বিচারের জন্যে তাদের আসল মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; হুশিয়ার (থেকো, কারণ), যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর এবং ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর। ৬৩. তুমি (তাদের) বলো, যখন তোমরা স্থলভূমে ও সমুদ্রের অন্ধকারে (বিপদে) পড়ো, (যখন) তোমরা কাতর কণ্ঠে এবং নীরবে তাঁকেই ডাকতে থাকো, তখন (কে) তোমাদের (সেসব থেকে) উদ্ধার করে? (কাকে তোমরা তখন) বলো (হে মালিক), আমাদের যদি তুমি এ থেকে বাঁচিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ৬৪. তুমি বলে দাও, হাঁ, আল্লাহ তায়ালাই (তখন) তোমাদের সে (অবস্থা) থেকে এবং অন্যান্য যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে দেন, তারপরও তোমরা তাঁর সাথে অন্যদের শরীক করো! ৬৫. তুমি (আরো) বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আযাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে

وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; লক্ষ্য করো, কিভাবে আমি আমার আয়াতসমূহ (তাদের কাছে) বর্ণনা করি, যাতে করে তারা (সত্য) অনুধাবন করতে পারে।

তাফসীর
আয়াত ৫৬-৬৫

আলোচনার এই তরংগ ফিরে যাচ্ছে পুনরায় 'উলুহিয়্যাত' অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এ কথার তাৎপর্যের দিকে এবং রেসালাত ও রসূলের তাৎপর্য বর্ণনার পরপরই আল্লাহর নিরংকুশ মালিকানার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। সম্ভবত এতোক্ষণে অপরাধীদের ভ্রান্ত পথ ও মোমেনদের আলোকময় পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, যেমন পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শেষের দিকে আমরা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার চমৎকার আলোচনাটি এ অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হলেও সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে আমরা পুনরায় তা পেশ করছি, যাতে করে আল কোরআনের বিস্তারিত ও প্রামাণ্য কথা আসার পূর্বেই এ সম্পর্কে সবার মধ্যে মোটামুটি কিছু ধারণা এসে যায়।

আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা সর্বপ্রথম তাঁর রসূল (স.)-এর অন্তরকে উজ্জ্বল করে তুলুক, যেন তিনি তাঁর রবের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণ লাভ করতে পারেন এবং তাঁর অন্তর নিশ্চিত বিশ্বাসে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হঠকারী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকারীদের মিথ্যারোপ করার কারণে যেন তাঁর হৃদয়ের দৃঢ়তা নড়বড়ে হয়ে না পড়ে। আর এইভাবে তাঁর রব সম্পর্কে তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা আসতে পারে এবং তখনই তিনি যেন বলিষ্ঠভাবে গোমরাহীর বেড়াজাল ছিন্ন করে হেদায়াতের নূরানী পথের দিকে উদাত্ত কণ্ঠে তাদেরকে আহ্বান জানাতে পারেন এ বিষয়ে কোরআনের আয়াত লক্ষ্যযোগ্য,

'বলো, অবশ্যই আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সেই সব অলীক প্রভুদের আনুগত্য করতে যাদেরকে তোমরা (সাহায্যের জন্যে) ডাকছো। বলো! আমি কিছুতেই তাদের খোশ খেয়ালের কথা মানবো না। যদি তা করি তাহলে আমিও গোমরাহ (পথ ভ্রষ্ট) হয়ে যাবো এবং........ জেনে রেখো, হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি কথাগুলো সাফ সাফ করে বর্ণনা করছেন এবং অবশ্যই তিনি মিথ্যা ও সত্যের ফয়সালা দানকারী'।(আয়াত ৫৬-৫৭০

সত্যকে অস্বীকারকারী ও সত্যকে প্রতিহতকারীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার প্রশ্নে আল্লাহর ধৈর্য ও সহ্যগুণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে রয়েছে গোটা ইসলামের ইতিহাসে। এমন কি বারংবার তারা নবী (স.)-এর কাছে মোজেযা প্রদর্শন করার জন্যে যে দাবী করে চলেছিলো তার কারণেও আল্লাহ তায়ালা আযাব নাযিল করতে জলদি করেননি। বরং, তাদের দাবী অনুযায়ী কোনো বস্তুগত জিনিসের দ্বারা মোজেযা দেখানো এজন্যে মঞ্জুর করেননি যে আল্লাহর নিয়ম বরাবর এটাই থেকেছে যে, মোজেযা দেখানোর পর না-ফরমানী করার সাথে সাথেই তাদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছে। অতীতের যে কোনো সময়ের মতো আল্লাহ তায়ালা তখনো যে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা অবশ্যই দেখাতে পারতেন কিন্তু কাফেরদের জন্যে এটা হতো ধ্বংসাত্মক এবং মোহাম্মদ (স.)-এর যুগে অথবা তারপরে পূর্বের মতো আল্লাহ তায়ালা আর সর্বাত্মক আযাব নাযিল করবেন না বলে তাঁর সিদ্ধান্তের কারণেই ওই যিদ্দী লোকদেরকে আরো চিন্তা ভাবনার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে

শেষ পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হয়েছে। অবশ্য নবী মোহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের জন্যে এটা হচ্ছে এক বিরাট রহমত এবং আল্লাহর মহান প্রভুত্বের বহিপ্রকাশের এটাও ছিলো এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো যদি আমার কাছে (অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের) সেই ক্ষমতা থাকত যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো, তাহলে তো আমি তা অবশ্যই দেখিয়ে দিতাম এবং তোমাদের ও আমার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা অবশ্যই হয়ে যেতো। আর আল্লাহ তায়ালা তো যালেমদের অবস্থা ভালো করেই জানেন।'

আর গায়বের জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সৃষ্টির যেখানে যা কিছু ঘটছে সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে জানেন এভাবে আর কেউ জানে না, আর আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিকুলের সব কিছু কারো পক্ষে চিন্তা করাও সম্ভব নয়। 'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়বের চাবিকাঠি..................লিপিবদ্ধ রয়েছে। (আয়াত ৫৯)

আলোচ্য আয়াতগুলোতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই যে সকল মানুষের তত্তাবধানকারী এবং সকল অবস্থার মধ্যে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম, সে কথাও বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। ঘুমন্ত ও জাগ্রত, মৃত ও জীবন্ত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে, সর্বাবস্থায় একমাত্র তিনিই সবাইকে ও সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই তোমাদেরকে রাত্রি বেলায়............. জলদি হিসাব গ্রহণকারী। (আয়াত ৬০)

আবার, যারা মিথ্যারোপ করছে এবং সত্যকে অস্বীকার করে চলেছে, তাদের নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যেই তারা যখন সত্যের আলো দেখতে পায় তখন তারা প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করে, আর যখন তারা কোনো ভীতিজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়, তখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকেই তারা সাহায্যের জন্যে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ডাকে না; এতদসত্ত্বেও তারা শেরক করছে এবং যাঁকে চরম বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তারা ডাকে তাঁকেই সুখের সময় ভুলে যায়। অবশ্যই মহান আল্লাহ (এই দুর্ব্যবহারের জন্যে) নানা ভাবে শাস্তি দিতে পারেন এবং সে শাস্তি থেকে তাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

বলো, কে বাঁচায় তোমাদেরকে .... ওরা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।' (আয়াত ৬৫)

আরও এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ....যালেমদেরকে ভালো করেই জানেন।' (আয়াত ৫৭ - ৫৮)

জীবনের অপরিহার্য এসব দিকগুলো একই সাথে অত্যন্ত প্রভাবশালীভাবে এই প্রসংগ তুলে ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সেগুলো এমন ভাবে ফুটে উঠেছে যা মানুষের হৃদয়কে দারুণভাবে নাড়া দেয় এবং সমস্ত দেহ মন ও অন্তরের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এক তীব্র অনুভূতি জাগিয়ে দেয় এবং এই গভীর হৃদয়াবেগের মধ্য থেকে যেন বেরিয়ে আসে, 'বলো, ... বলো ....বলো' আল্লাহর রসূল (স.)-কে সম্বোধন করেই এই শব্দটি বেরিয়ে আসে, যাতে করে তাঁর রব থেকে এ কথাটি ওহী স্বরূপ তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়, এমন কথা যা অন্য কারো কাছ থেকে আসা সম্ভব নয়, তিনি যেন অন্য কারো অনুসরণ না করেন বা আর কেউ যেন তাঁর কাছে কিছু না পাঠাতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডেকে থাকো ....হেদায়াতপ্রাপ্ত থাকবো না।' (আয়াত ৫৬)

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তিনি ওদের খেয়ালখুশী মতো না চলেন, কারণ ওরা তো সেই সব ব্যক্তি যারা কোনো জ্ঞান বা যুক্তি ভিত্তিক কাজ করে না, বরং তারা কুপ্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চলে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে মনগড়া নানা দেব দেবী কিংবা আইনদাতা বানিয়ে মানুষের পূজা অর্চনা করে, তাদের কাজের মধ্যে সঠিক কোনো সত্যানুভূতি নাই। এমতাবস্থায় তাদের ওইসব মনগড়া কথার অনুসরণ করলে তিনিও গোমরাহ হয়ে যাবে এবং কিছুতেই সত্য পথ পাবেন না। ওদের মনগড়া কথা ওদেরকে নির্জলা গোমরাহীর দিকেই নিয়ে যাবে।

মানবরচিত আইন মানাও মূর্তিপূজার মতোই শেরক

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে মোশরেকদের মোকাবেলাতেও এই একইভাবে দৃঢ়তা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং যে সব জিনিসকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে সেগুলো থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কমুক্ত থাকার জন্যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করছেন। ইতিপূর্বেও এ সূরার অন্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'তোমরা কি সত্যই সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আছে? হে রসূল, তুমি তাদেরকে বলে দাও, অবশ্যই একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক, আর যে সব জিনিসকে তোমরা আল্লাহর শরীক বানাও সেগুলোর সাথে আমার কোনোই সর্ম্পক নাই। মোশরেকরা রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতো তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করলে তারাও তাঁর দ্বীনকে সমর্থন দেবে। তাদের দেব দেবীর পূজায় তিনি অংশগ্রহণ করলে তারাও তাঁর মুনিব আল্লাহর সামনে মাথা নত করবে। আসলে ওদের বিবেচনায় এটা করা ছিলো খুবই সম্ভব এবং তারা মনে করতো ইসলাম ও শেরকের অবস্থান একই সাথে কোনো হৃদয়ে থাকা অসম্ভব নয়। আর, আল্লাহর সংগে এক সাথেই অন্যান্যদেরও আনুগত্য করাও সম্ভব। কিন্তু আসলে এটা কখনই সম্ভব নয়। চূড়ান্ত নিশর্ত, প্রশ্নহীন ও নিরংকুশ আনুগত্য শুধুমাত্র এক আল্লাহকেই দেয়া যায়; এ ব্যাপারে অন্য কারো সাথে কোনো আপোষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন যে, তাঁর সাথে আর কাউকে ডাকতে হবে এবং তাঁর কাজে সহযোগিতার জন্যে অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে। তাই, তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে একান্তভাবে নিশর্ত ও নিরংকুশ আনুগত্যের দাবী করে। আর, তাই, যে কোনো বিষয়ে, ছোট-বড় যাই হোক না কেন, কোনো কাউকে যদি কেউ তাঁর সমকক্ষ বানাতে চায়, তাহলে তিনি তাকে কিছুতেই তাঁর বান্দা বলে স্বীকার করেন না।

তাই, আলোচ্য আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে, রসূলুল্লাহকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেয়া যে, মোশরেকরা যাদেরকে সাহায্যকারী হিসাবে ডাকতো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ত্রাণকর্তা হিসাবে মানতো, সেই সব দেব-দেবীর প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য দেয়া বা তাদের কোনো পূজা-অর্চনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং আল্লাহর বাণীর মধ্যে 'আল্লাযীনা-'র ব্যাখ্যা হচ্ছে,

'বলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য 'যাদেরকেই' তোমরা সাহায্যের জন্যে ডাকছো, তাদের প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য প্রদান করতে আমাকে পরিষ্কার ভাবে মানা করা হয়েছে।'

এখানে এসে চিন্তা শক্তি রহিত হয়ে যায়। এমন একটি কথা (যাদেরকে) এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যা বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকরাই বুঝতে পারেন। এ শব্দটি দ্বারা যদি শুধু মূর্তি ও ছবি বুঝানো হতো, তাহলে 'যাদেরকে'র প্রতিশব্দ হিসাবে ('মা') 'যা' ব্যবহার করা হতো। সুতরাং, বুঝা যাচ্ছে 'যাদেরকে' দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন সমাজের সেই সকল নেতৃবৃন্দকে যারা বুদ্ধিমান

ও জ্ঞানী-গুণী বলে পরিচিত এবং যাদের কথামত সমাজের লোকেরা উঠা বসা করে। তারা যেগুলোকে ভালো বলে সেগুলোর ব্যাপারে সাধারণত কেউ দ্বিমত করেনা, আর এই জন্যেই তাদের সর্বনামে 'আল্লাযীনা' ব্যবহার করা হয়েছে।

আর এই অর্থটিই তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে এক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত, আর ইসলামী পরিভাষায়ও এই অর্থ পুরোপুরি উপযোগী।

বাস্তব অবস্থা তখন এটাই ছিলো যে, মোশরেকরা শুধু কিছু ছবি ও মূর্তিরই পূজা করতো না, বরং তারা জ্বিন, ফেরেশতা ও কোনো কোনো মানুষকে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী মনে করতো এবং এইভাবে তাদেরকে তারা আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার করে ফেলতো। মানুষকে আল্লাহর ক্ষমতায় এইভাবে অংশীদার মনে করতো যে সমাজ ও সমাজের ব্যক্তিবর্গের জন্যে তাদেরকে আইন তৈরি করার অধিকারীও মনে করতো। তাদের নির্ধারিত সমাজ পরিচালার পদ্ধতিকে তারা চূড়ান্ত ও নির্ভুল বলে মেনে নিতো এবং বিনা শর্তে তাদের আনুগত্য করতো। এমনকি তাদেরই কথামতো তাদের বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসাও করতো।

এবার আমরা মানুষের আইন তৈরি করার অধিকারকে ইসলামী পরিভাষায় খতিয়ে দেখি। এ কাজটিকে ইসলাম শেরক বলে গণ্য করে এবং এ কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইসলাম বলে যে, মানুষের বিভিন্ন কাজের ফয়সালা দিতে গিয়ে মানব বুদ্ধির ব্যবহার করা আল্লাহর ক্ষমতায় ভাগ বসানোর শামিল এবং নিজেদেরকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা বুঝায়, বরং এর দ্বারা নিজেদেরকে আল্লাহর দোসরই বানানো হয়। আর আল্লাহ তায়ালা এ কাজটিকে তেমনি নিষিদ্ধ করেছেন যেমন ছবি ও মূর্তিকে সেজদা বা পূজাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে উপরোক্ত উভয় কাজকে একই প্রকারের বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকা একই প্রকারের অপরাধ।

আলৌকিকতার ক্ষমতা রসূলদের দেয়া হয়নি

এরপর আসছে আয়াতে উল্লেখিত দ্বিতীয় বিষয়টির পর্যালোচনা যা প্রথমটির সাথে ওৎপ্রাতভাবে জড়িত। প্রথমটির জন্যে দ্বিতীয়টি সম্পূরকও বটে! এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, অবশ্যই আমি আমার রবের পক্ষ থেকে আসা স্পষ্ট দলীল প্রমাণ নিয়েই আমার দায়িত্ব পালনে ব্রতী রয়েছি, অথচ তোমরা এই দাওয়াতকে ভ্রান্ত দাবী করে প্রতিহত করার চেষ্টা করে চলেছো। যে জিনিসের দাবী তোমরা করছো তার কিছুই আমার কাছে নেই। হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি হক কথাগুলো বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালা দানকারী'।

এটি হচ্ছে নবী (স.)-এর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ, যেন তিনি ওই মোশরেকদের কাছে স্পষ্ট ভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসকে তুলে ধরেন যারা তাদের রবকে অস্বীকার করছিলো। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রমাণ সহ তুলে ধরতে ও তাদের অন্তরের গভীরে বিশ্ব পালক আল্লাহর অনুভূতিকে জাগ্রত করে দেয়ার জন্যে তিনি তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব এবং তাঁর নবীর কাছে ওহী প্রেরণের কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যেও হুকুম দেয়া হয়েছে। নবী রসূলরা আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া যে চেতনা পেয়েছেন তার আলোকেই বলিষ্ঠ কণ্ঠে আল্লাহর ক্ষমতার কথা ঘোষণা দিতে এবং সর্বপ্রকার ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন যা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে অন্য আয়াতে নূহ (আ.)-এর যবানীতে আল কোরআন বলছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা কি একবার ভেবে দেখেছ, আমি, আমার রবের পক্ষ থেকে সত্য সত্যই স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ সহকারে এসেছি কিনা আর তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে (তাঁর বাণী রূপ) যে মেহেরবানী দান করেছেন (তাই তোমাদের কাছে পৌঁছানোর পর সেগুলোকে তোমরা অস্বীকার করে অন্ধ হয়ে রয়েছে কিনা?) তোমরা অপছন্দ করলেও আমরা কি তোমাদের ওপর তা বাধ্যতামূলক বলে চাপিয়ে দেবো?'

এই কথাটিই সালেহ (আ.)-ও বলেছিলেন, যার উদ্ধৃতি অন্য আয়াতে এভাবে দেয়া হয়েছে,

'আর সে বললো, হে আমার জাতি, আমি সত্যিই আমার রবের ক্ষমতার স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি কিনা তা একবার খেয়াল করে দেখেছো কি এবং তিনি তাঁর রহমত আমাকে দান করেছেন কিনা , তাও একবার ভেবে দেখেছো? এর পরও যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? তোমরা আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না।'

আবার ইবরাহীম (আ.) বলেছেন, আল কোরআন তাঁর কথাগুলোকে এভাবে উদ্ধৃত করেছে,

'তার জাতি তার সাথে ঝগড়া করতে শুরু করলো। সে বললো, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ, অথচ তিনি সঠিক পথেই তো আমাকে পরিচালিত করেছেন?'

ইয়াকুব (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে লক্ষ্য করে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'যখন শুভ সংবাদ নিয়ে দূত এসে (ইউসুফের জামাটি) তার মাথার ওপর রেখে দিলো, তখন সে তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো এবং অন্ধত্বমুক্ত হয়ে বলে উঠলো, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম না, যা আমি আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া জ্ঞানের মাধ্যমে জানি তোমরা তা জানো না।'

এই ভাবে, আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বাস্তবতা অবশ্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর প্রিয় পাত্রদের অন্তরের মধ্যে। যখন আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাঁর মহান অস্তিত্বের নূরকে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট করান, তখন তারা মহান সেই সত্ত্বাকে অন্তরের মধ্যে উপস্থিত পায়। এই মহা সত্যের অস্তিত্বকে খুজে পান তাঁরা যাদের অন্তরের গভীরে সত্যের এ অনুভূতি কানায় কানায় ভরে দেয় দৃঢ় বিশ্বাসের সুধা আর এই সত্যকেই সেই মোশরেকদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহব্বতের নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যারা তাঁর রবের বাস্তবতা ও সত্যতার পক্ষে কোনো অলৌকিক শক্তি দেখানোর জন্যে উপর্যুপরি দাবী করে আসছিলো, যে সত্যকে নবী (স.) তাঁর অন্তরের গভীরে স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলেন। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও, হে নবী, অবশ্যই আমি আমার রব সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছি যাঁকে তোমরা অস্বীকার করেছ।'

এমনি করে নবী (স.)-এর কাছে ওরা দাবী করছিলো, হয় অলৌকিক কিছু ক্ষমতা দেখানো হোক অথবা নাযিল করা হোক প্রতিশ্রুত কঠিন আযাব কাছ থেকে– যাতে করে ওরা বুঝতে পারে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর এসেছেন, অথচ রেসালাত ও রসূলের তাৎপর্য তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং রেসালাত ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যটুকু পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে তাঁকে বলা হয়েছিলো, আর এ নির্দেশও তাঁকে দেয়া হয়েছিলো যে, যে সব জিনিসের জন্যে তারা ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলো সেগুলো সংঘটিত করা তাঁর ক্ষমতার বাহিরের কাজ। সে বিষয়ে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই ক্ষমতা রাখেন। রসূল নিজে কোনো ক্ষমতার মালিক নন, তিনি শুধু রসূলই। তাই, তাঁর যবানীতেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিচ্ছেন,

'যে সব বিষয়ে তোমরা ব্যস্ততা দেখাচ্ছো সে বিষয়ে আমার কোনো ক্ষমতা নাই। হুকুম বা ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি সুস্পষ্টভাবে সত্যকে বর্ণনা করছেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফায়সালা দানকারী।'

অলৌকিক ক্ষমতার নিদর্শন বা মোজেযা এসে যাওয়ার পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ওপর 'আযাব নাযিল হয়ে যাওয়া' অবধারিত হয়ে যায়, আর এই আযাবের ফয়সালা এবং বাস্তবে আযাব নাযিল করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং, একমাত্র তিনিই যাবতীয় শক্তির মালিক এবং নিজ দায়ায়ই তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে যথাযথভাবে সত্য কথাটি বর্ণনা করেন এবং এই সত্য কথাটির খবরও সঠিক সময়েই দান করেন, আর একমাত্র তিনিই সত্যের পথে আহ্বানকারী ও অস্বীকারকারীদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দেন। এই সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই নিবদ্ধ, এসবের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তিনি দেননি। তাই, রসূল (স.)-ও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন যে এসব ক্ষমতা তাঁর হাতে নাই, আর আল্লাহর বান্দাদের ওপর কী ফয়সালা দেয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর। এ বিষয়ে কোনো বান্দাকেই তিনি কোনো ক্ষমতা দেন নাই। এটি একমাত্র তার সার্বভৌম ক্ষমতার আওতাভুক্ত জিনিস এবং এটি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রসূল তো একজন মানুষ, তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর কাছে ওহী নাযিল হয়, ব্যস এতোটুকু, এর বেশী কিছু নয়। তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের কাছে আল্লাহর বানী পৌঁছে দেয়া ও জাহান্নামের আযাব থেকে সতর্ক করা, কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর বা কোনো কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা দান করার ক্ষমতা তাঁর নাই। আর এরপর আল্লাহর ক্ষমতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার বা তাঁর উপর কর্তৃত্ব করার কোনো ক্ষমতা কোনো বান্দার নেই।

এরপর আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন যেন মানুষ তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকৃত সদ্ব্যবহার করে এবং যে কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত দলীল আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করে। সে ভালো করে যেন বুঝে নেয় যে এসব কথা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কাজেই কোনো কিছু ত্যাগ করতে হলে আল্লাহর মর্জি মতোই তা ত্যাগ করতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন বা এমন অলৌকিক কোনো কিছু দেখানো, যা দেখানোর পর রসূলকে অমান্যকারীদের ওপর সংগে সংগে আযাব নাযিল হওয়া অবধারিত হয়ে যায়, এ ধরনের কোনো ক্ষমতা ব্যবহার করা যদি তাঁর (নবীর) নিজের এখতিয়ারে থাকতো, তাহলে অবশ্যই তিনি নিজ ইচ্ছামত ওই ক্ষমতা দেখিয়ে দিতেন, আর তখন ওই মোজেযাকে অমান্যকারীদের ওপর সংগে সংগে আসমানী আযাব অবশ্যই এসে যেতো! কিন্তু, যেহেতু এটি নিরংকুশভাবে আল্লাহর ক্ষমতা, তাই তিনি তাদের প্রতি দরদী হয়েই ওই কঠিন আযাব তাদের ওপর নেমে আসুক, তা চাননি এবং এই জন্যেই আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদ (স.)-কে পূর্বের নবীদের আমলের মতো চাক্ষুষ ও সস্তা কোনো মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা দান করেননি। যদি আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী (স.)-এর আমলে অনুরূপ কোনো মোজেযা পাঠাতেন আর মোশরেকরা তা অমান্য করতো, তাহলে অবশ্যই পূর্বের মতো কঠিন ও ধ্বংসাত্মক আযাব সংগে সংগেই নাযিল হয়ে যেতো। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, তোমরা যার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছো তা যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকতো, তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়েই যেতো; আর আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে ভালো করেই জানেন।'

অবশ্যই মানুষের ধৈর্য -সহ্য ও প্রতীক্ষার একটি বিশেষ সীমা আছে, ওই সীমার বাইরে চলে গেলে কোনো মানুষই এই ধৈর্য ধরতে পারে না বা প্রতিপক্ষকে সময় দিতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অসীম ধৈর্যশীল, তাঁর সহনশীলতারও কোনো সীমা-শেষ নাই। তিনিই মহাশক্তিমান।

আর মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন। মানুষের মাঝে অবশ্যই কিছু মহৎ গুণাবলী ও ঔদার্য রয়েছে তবুও অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে তার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এরপর তার আত্মা যেন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চায়। এরপর সে যখন আল্লাহর দিকে তাকায় তখন মহান সে সত্ত্বাকে সে যেন বাস্তব চোখে দেখে যে তিনি তাঁর কর্তৃত্ব, খাদ্য খাবার ও পানীয় সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই দিয়ে যাচ্ছেন, বর্ষণ করছেন তাঁর রহমতের অবিরাম বারিধারা এবং তার জন্যে খুলে দিচ্ছেন তাঁর মেহেরবানীর সকল দুয়ার। এমতাবস্থায় মানুষ আবু বকর (রা.)-এর মতোই বলে উঠে, (যখন মোশরেকরা তাঁকে ভীষণভাবে প্রহার করছিলো তখন তিনি হয়রান হয়ে বলে উঠেছিলেন) হে আমার রব, কোন্ জিনিস আপনাকে এখনও ধৈর্য ধরতে উদ্বুদ্ধ করছে, হে আমার প্রতিপালক, কিসে আপনাকে এখনও সহ্য করাচ্ছে! এসময়ে তাঁকে এমনভাবে মারা হচ্ছিলো যে তার চোখ তার নিজের নাকটিও দেখতে পাচ্ছিলো না, সেই অবস্থায় তার মুখ দিয়ে একথাগুলো বের হচ্ছিলো এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, এতো কঠিন অত্যাচারের মধ্যেও তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে হতাশা দেখা দেয়নি, তবে তিনি হয়রান হয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর এক বান্দাকে এমনি করে পিটানো হচ্ছে এটা পরম করুণাময় আল্লাহ কি করে সহ্য করছেন! এটাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর সহনশীলতা আর এমনই সময়ে তিনি এমন ধীর গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে যান যে তারা টেরই পায় না।

'আর আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে ভালো করেই জানেন।'

তিনি জেনে বুঝেই তাদেরকে ঢিল দেন এবং কোনো বিশেষ কারণেই তাদেরকে সময় দিয়ে থাকেন। যেসব কদর্য কাজ তারা করছে তার সমুচিত জবাব সংগে সংগে দেয়ার ক্ষমতা তাঁর থাকা সত্তেও তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সহ্য করে থাকেন। ওই সময় সীমা পার হয়ে গেলেই তাদের ওপর তিনি ভীষণ বেদনাদায়ক আযাব নাযিল করেন।

আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি

যালেমদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কতোটুকু অবগত সে বিষয়ে জানাতে গিয়ে এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের বিবরণ দান প্রসংগে এখন এক বিশেষ আংগিকে কিছু নতুন কথা আসছে যাকে তুলনাহীন এক বর্ণনা বলা যায়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সর্বব্যাপী জ্ঞানসীমার মধ্যেই রয়েছে সকল গোপন রহস্য। তিনিই তাঁর জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিচালনা করেন এবং তাঁর চালিত সুদূর প্রসারী তীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করে চলেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাঁরই হাতে রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যার খবর একমাত্র তিনিই রাখেন, জলে স্থলে কোথায় কী আছে তিনিই সে সব কিছু জানেন। তাঁর অজান্তে গাছের একটি পাতাও পড়ে না,

আল্লাহর সীমাহীন জ্ঞান ভান্ডারের বর্ণনার এই হচ্ছে একটি অনুপম দিক। পৃথিবীর কোনো স্থানে ও আকাশের কোথাও কোনো দিন তার সমকক্ষ কেউ ছিলো না এবং কোনো দিন হবেও না। এমনি করে স্থল ভাগে এবং পানিভাগে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে এবং মহা শূন্যলোকে, জীব জগতে এবং নির্জীব পদার্থে, কোনো আর্দ্রতার মধ্যে এবং শুকনা জিনিসে, কোথাও এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না।

আমাদের সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির নিরিখেও যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার কোনো তুলনা কোথাও নাই। এর পরও মানুষ নিজ খেয়াল খুশী মতো আল্লাহর চিত্র আঁকতে চায়, অসীম সে সত্ত্বাকে সীমার মধ্যে এনে বুঝতে চায়, কি আজব এই প্রবণতা।

এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে যে কথাটি বলা হয়েছে সেদিকে না তাকিয়ে দিগন্তব্যাপী জানা অজানা, উপস্থিত অনুপস্থিত সব কিছুকে সামনে নিয়ে মানুষ যতো চিন্তাই করুক না কেন সে দেখতে পাবে যে আল্লাহর সৃষ্টির নিয়মের বাইরে কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারেনি, বরং সে যদি খেয়াল করে তাহলে দেখতে পাবে প্রতিনিয়ত তার সমগ্র আবেগ অনুভূতি দিগন্তব্যাপী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, সুউচ্চ গিরি পর্বত ও সুপ্রশস্ত উপত্যকাভূমির সব কিছু নিশিদিন প্রকম্পিত করে চলেছে, আর তখন তার মনমগয নিজ অজান্তেই ফিরে আসবে, অথবা নিজ অজান্তেই ফিরে আসতে চাইবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের রহস্যাবৃত সেই সব তথ্যের দিকে যা সকল কিছুর গভীরে লুকিয়ে রয়েছে, যার চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ এবং এসব কিছুর মধ্যে নিহিত রহস্যরাজি একমাত্র তাঁরই জানা। স্থলভাগের অজানা কন্দরে এবং গহীন সাগরের অজানা গভীরে যা কিছু বিচরণ করছে তা একমাত্র আল্লাহরই জানা। বিশ্ব চরাচরে গাছগাছালির অভ্যন্তরে অসংখ্য পত্ররাজি একমাত্র তাঁর হুকুমেই ঝরে পড়ে, তিনি ছাড়া এসবের সংখ্যা কেউ জানে না। এখানে ওখানে এবং দূর দূরান্তে যে পাতাটিই পড়ুক না কেন সবই তাঁর সর্বব্যাপী নযরে রয়েছে। পৃথিবীর অন্ধকার বুকে যে বীজটি সংগোপনে অবস্থান করছে তাও তিনি দেখছেন এবং কোনো কিছুই তাঁর নযরের বাইরে নেই। এই সুপ্রশস্ত ধরাধামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জীবন্ত মৃত সব কিছুর ওপরেই তাঁর তদারকী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। মহা মহিম আল্লাহর মহা জ্ঞানের আওতার বাইরে কোনো কিছুই সরে যেতে পারে না।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সুবিশাল এই সাম্রাজ্যের রহস্য চেতনা বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞদেরও মাথা ঘুরিয়ে দিতে চায়। মহা এ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কতো কাল থেকে আছে তার কোনো সীমা শেষ নাই, কতো বিশাল এর বিস্তৃতি তা নিরূপণ করতে মানবীয় বুদ্ধি অক্ষম। কেউ কোনো দিন দেখেনি, দেখতে পারে না এর গভীরতা কতো-এসব কিছুর রহস্য পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে চিরদিন ..... সুবিস্তীর্ণ এ সাম্রাজ্যের কিনারাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে কতো দূর দিগন্তে কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না, অথচ এসব কিছুকেই আল্লাহ তায়ালা মাত্র কয়েকটি শব্দের বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

এসবই হচ্ছে আল্লাহ পাকের অত্যাশ্চর্য রহস্যরাজি।

আর যতো বারই এবং যে ভাবেই আমরা এই ছোট্ট আয়াতটির দিকে তাকাই, ততোবারই আমরা এর মধ্য থেকে নিত্য নতুন রহস্যের সন্ধান পাই, যা আমাদেরকে আল কোরআনের উৎসের কথা জানাতে থাকে।

আমরা আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ব্যক্ত বিষয়ের একটি দিকই শুধু দেখতে পাই, কিন্তু এ পাক কালামের দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়তেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে যে, এগুলো কোনো মানুষের কথা নয়, মানব প্রকৃতির কথার কোনো ছাপ এর মধ্যে নেই। এধরনের কোনো কথা যখন মানুষ বলে, তখন সে কথার মধ্যে দেখা যায় মানুষের বোধগম্য কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করেই সে কথা বলে এবং সে কথার মধ্যে নিহিত জ্ঞান মানুষের বোধসীমার মধ্যেই থাকে। সেখানে এই সব দিক দিগন্তের অজানা রহস্যরাজির কথা বলা হয় না। মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র ও চিন্তা শক্তি এবং সেই অনুযায়ী যে কাজই সে করতে চায় তার একটা সীমা অবশ্যই আছে। মানুষ চিন্তা ভাবনা করেই কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো অংশেই কোনো গাছ থেকে যেমন কোনো পাতা আল্লাহর হুকুম ছাড়া পড়ে না, তেমনি মানুষের চিন্তার পেছনেও আল্লাহর ইচ্ছা সর্বদা কার্যকর রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত মানুষের অন্তরে কোনো চিন্তার উদ্রেকও হতে পারে না, আর

পৃথিবীর যে কোনো অংশে কোন গাছের কোন পাতাটি পড়ছে তার হিসাবও আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর এই কারণেই যে ইচ্ছাই মানুষ করুক না কেন, আর কোনো বিষয়ের যে অর্থই সে করতে চাক না কেন, তা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অবশ্যই জানা আছে। যে পাতাটিরই পতন ঘটুক না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার হিসাব রাখেন এবং তার পতনের পেছনে অবশ্যই তাঁর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে।

'আর মাটির অন্ধকারে যে দানা কণাটি লুকিয়ে আছে' কথাটির উল্লেখ দ্বারা মানুষের চিন্তাস্রোতে কী পরিবর্তন আসে? অবশ্যই ওই লুক্কায়িত দানা কণার উন্মেষ থেকে মানুষ একটি সূক্ষ্ম জ্ঞান হাসিল করতে সক্ষম হয়, আর তা হচ্ছে, পৃথিবীর পেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ওই দানাকণাগুলোর মধ্যে নিহিত বৃক্ষরাজির সম্ভাবনা নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত সহায়তার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। ওই দানা কণাগুলো থেকে বৃক্ষরাজি বেরিয়ে আসার জন্যে উপযুক্ত সুযোগের ব্যবস্থা যেমন আল্লাহ তায়ালাই করেন, তেমনি এক ফোঁটা শুক্রবীজ থেকে মানুষকে আল্লাহ তায়ালাই যে পুর্ণাংগ মানুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ করে দেন– একথা মানুষ চিন্তা করুক, বুঝুক এবং এ সুযোগ যিনি তাকে দিয়েছেন কৃতজ্ঞতাভরে তাঁর সামনে নুয়ে পড়ুক, তাঁর শোকরগোযারি করতে গিয়ে তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতগুলোর সদ্ব্যবহার করুক, নিজে ব্যবহার করুক এবং তার মনিবের হুকুমে অপরকেও সেই নেয়ামত থেকে ভাগ দিক এটাই তার কাছে আল্লাহর দাবী। নিজেদের অস্তিত্বের মধ্যে বর্তমান এই রহস্যের প্রতি সে যদি খেয়াল না করে এবং চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে সে যদি কাজে না লাগায়, তাহলে সে নিজেরই ক্ষতি করবে, অপমান করবে তার অস্তিত্বকে এবং চরম অকৃতজ্ঞ বলে সে সবার কাছেই নিন্দিত হতে থাকবে। সুতরাং মাটির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে লুকিয়ে থাকা বীজগুলোর মহা মহি-রূপে আত্মপ্রকাশের এই সব দৃশ্য মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে অবশ্যই এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

তবে, এটা অবশ্যই ঠিক, ব্যস্তবাগীশ এই মানুষ সাধারণভাবে ওই ঝরে পড়া পাতাগুলোর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় না, খেয়াল করে দেখে না পৃথিবীর পেটের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বীজগুলো থেকে বিশেষ সময়ে ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সুন্দর ও সুবিশাল বৃক্ষরাজির বেরিয়ে আসার ক্রমধারার দিকে, চিন্তা করতে চায় না অকৃতজ্ঞ মানুষ ভেজা ও শুকনা, প্রানীও নির্জীব বস্তু নিচয় থেকে তারা কি কি উপকার কেমন ভাবে লাভ করে, এমনকি এটাও তারা বুঝতে চায় না যে, যা ঘটছে এবং সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এই ক্রমোন্নতি ও বিকাশ– এসব কিছু আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না, বরং সব কিছুই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে চলেছে এবং সব কিছুর ব্যাপারে পূর্বে-গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সুরক্ষিত এক কেতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, রয়েছে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে সংরক্ষিত। এসব কিছু কার ইচ্ছায়– কার নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হচ্ছে? কে এগুলোকে চালাচ্ছে? ভূধরে, সাগরে, অন্তরীক্ষে যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছু এ কথাই জানাচ্ছে, যার মালিকানায় এসব কিছু গতিশীল রয়েছে তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা! তাঁর কাছে ছোট বড়, তুচ্ছ গুরুগম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ, গোপন ও প্রকাশ্য, জানা অজানা এবং কাছে ও দূরে সবই সমান।

এসব দৃশ্য চিন্তাশীল দৃষ্টির সামনে খুলে রেখেছে গভীর অর্থব্যঞ্জক সুবিশাল ও সুপ্রশস্ত এক দিগন্ত। পৃথিবীর যে কোনো গাছের প্রতিটি পাতা পৃথিবীর নানা স্তরে অবস্থিত গভীর গহ্বরে লুকিয়ে থাকা বিলম্বে ও পর্যায়ক্রমে সংঘটিতব্য এবং ক্রমবর্ধমান সজীব নির্জীব, ভেজা ও শুকনা সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহকে জানার ও বুঝার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। যেমন করে এসব দৃশ্যের

দিকে সাধারণভাবে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, যেমন করে মানুষ এসব বিষয় বুঝতে যত্নবান হয় না, তেমনি মানুষের দৃষ্টি এসব কিছু দেখতেও সক্ষম নয় এবং তার নযরে এসব এক সাথে ধরাও পড়ে না। এসব কিছুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর ভান্ডারেই বর্তমান রয়েছে, যিনি সব কিছু দেখেন, সব কিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সব কিছুর হেফাযতও একমাত্র তিনিই করেন।

মানবীয় চিন্তা শক্তি যেমন করে এসব দৃশ্যের মর্ম বুঝতে পারে না, ফলে এর থেকে শিক্ষাও নিতে পারে না, তেমনি তাদের দৃষ্টিও এই সব কিছু দেখতে পারে না, আর এর ফলে তার চিন্তার মধ্যে কোনো বিপ্লবী পরিবর্তনও দেখা দেয় না, এসব কিছু একসাথে দেখা, জানা, বুঝা ও হেফাযত করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর কাছে ছোট-বড়, তুচ্ছ ও গুরুত্বপূর্ণ, গোপন প্রকাশ্য, জানা অজানা, দূর নিকট সবই সমান।

আর মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেকের সদ্ব্যবহার করে তারা ভালো করেই বুঝতে পারে মানুষের কল্পনাশক্তির সীমা কতোটা এবং কতোটুকুই বা সে অনুভব করতে সক্ষম, আর তারা তাদের মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে এধরনের দৃশ্য থেকে অনেক কিছু জানতে পারে। অবশ্যই এ দৃশ্য মানুষের অন্তরে আর কোনো সন্দেহ থাকতে দেয় না, যেমন অনেক বাস্তব উদাহরণ ও মনের যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দেয়। আর এর পরও যারা সন্দেহ পোষণ করতে থাকে, তাদের পক্ষে মানুষের সকল কথাকে পুনরায় নিবিষ্ট মনে চিন্তা করা দরকার, যাতে করে তারা সকল কিছুর মূলে যে কার্যকারণগুলো রয়েছে তা অনুধাবন করতে পারে।

এই আয়াতটি এবং কোরআনের আরও বহু আয়াত থেকে কোরআনের উৎস সম্পর্কে তৃপ্তির সাথে জানা যায়।

এমনি করে ভাষার সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আয়াতটির তাৎপর্য খেয়াল করি, তাহলে আমরা এক অসাধারণ সাহিত্য সৌন্দর্যের সন্ধান পাই যা মানুষের কোনো কাজকে এমন চমৎকারভাবে কেউ কোনোদিন তুলে ধরতে পারেনি আর কোনোদিন পারবেও না। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন,

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের (অজানা-অচেনা ভান্ডারের) চাবিকাঠি যার খবর তাঁর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে নাই।'

অর্থাৎ দৃষ্টির অন্তরালে যে অজানা রহস্য রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সম্ভাবনা এবং অনাদিকালে সংঘটিতব্য সাফল্যের গভীর ও সীমাহীন আশা। এ আশায় বুক বেঁধে মোমেন পাড়ি জমায় অকূল সাগরে, মহাশূন্যে, অন্তরীক্ষে সে পথ চলতে থাকে নিরন্তর ভাবে। অতীতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এমনি করে চলে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষের অভিযান। দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'আর জলেস্থলে যেখানে যা কিছু আছে তিনি তা সবই জানেনা।'

সর্বত্রই রয়েছে আশা আকাংখা পূরণের অফুরন্ত সম্ভাবনা, যা আল্লাহর মঞ্জুর হলেই পূরণ হতে পারে। এ সম্ভাবনা যে কতো প্রশস্ত এবং কতো ব্যাপক তা নিরূপণ করা মানবীয় সাধ্যের বাইরে। এসব সম্ভাবনার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, পর্দার আড়ালে অবস্থিত বিশাল এক রহস্য-ভান্ডার। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'যখন যে পাতাটিই গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তা অবশ্যই তাঁর জানা আছে।'

তিনিই জানেন মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্যে উত্থিত যে কোনো শব্দকে, তিনি জানেন ওপর থেকে নীচের দিকে পতন বা অবতরণ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে, জানেন তিনি মৃত্যু থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর্যায়গুলোকে।

'আর মাটির অন্ধকারে কোনো দানা-কণাও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নাই,

বীজ থেকে যে শুঁড়টি বেরিয়ে বৃদ্ধি পায়, মাটির গভীর থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে ছড়ায় এবং গোপন স্থানে স্থির হয়ে থাকার পর গতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে এসব কিছুর অবস্থা তাঁর সবই জানা।

আর যা কিছু রয়েছে সজীব ও মুর্দা– শুকনা ভেজা সব কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে তাঁর কাছে রক্ষিত মহাগ্রন্থে। তাজা শাকসব্জি এবং শুকিয়ে যাওয়া বৃক্ষ লতাপাতা যেখানে যা কিছু আছে এবং জীবিত ও মৃত কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে নাই।

এখন যে কোনো ব্যক্তি চিন্তা করে দেখুক এইভাবে সব কিছুর খবর রাখার ক্ষমতা, সব কিছুকে পরিচালনা করার যোগ্যতা এবং 'না' থেকে অস্তিত্বে আনার যোগ্যতা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আছে কি? আছে কি এমন কেউ যে সৃষ্টির সকল কিছুর মধ্যে যোগাযোগ বহাল করতে পারে, অথবা এমন সৌন্দর্য এনে দিতে পারে যা আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে দান করেছেন?

গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্ধ অংশ

এরপর, নিম্নে বর্ণিত আল্লাহর মোবারক কথাটির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকি,

'আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি।'

'গায়েব' ও 'মাফাতেহু' শব্দ-দুটির দিকে মুগ্ধ নেত্রে যখন তাকিয়ে থাকি, তখন মন বলে ওঠে, হাঁ গায়েবের খবর তো আসলে কেউই বলতে পারে না এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া (তা যে যাই দাবী করুক না কেন) আর এই গায়েবের ভান্ডারের দ্বার কোনো কিছু দিয়ে উন্মুক্ত করা যায় না একমাত্র আল্লাহর কাছে রক্ষিত চাবি ছাড়া। এ জিনিস দুটি সম্পূর্ণ আল্লাহরই বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডারই হচ্ছে সেই গায়েব। ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে গায়েবের যে রহস্য জানা যায় তাই হচ্ছে ইসলামের মূল বিষয়, এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি। আর গায়েব (অদেখা) এবং গায়বিয়্যাত (অদৃশ্যতা) শব্দগুলো আজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে......... আর কোরআনুল কারীমও এই গায়েব কথাটিকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। বলছে, গায়েব-এর খবর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া– কেউ রাখে না এর চাবিকাঠি সন্দেহাতীতভাবে একমাত্র আল্লাহর হাতেই রয়েছে। ইসলাম আরও জোর দিয়ে বলতে চাইছে যে, মানুষকে জ্ঞানের ভান্ডার থেকে খুবই সামান্য কিছু অংশ দেয়া হয়েছে। এই স্বল্প মাত্রায় জ্ঞান দান করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজন ও তার ধারণ-শক্তির দিকে নযর দিয়েছেন এবং তার প্রয়োজন ও গ্রহণশক্তি অনুযায়ী তাকে যৎসামান্য জ্ঞান দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ (নিজ ইচ্ছামতো) কিছুই জানে না, জানতে পারে না, তার সঠিক কোনো জ্ঞান নেই। যেটুকু সে জানে বলে মনে করে, তা নিছক অনুমান মাত্র, নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তার আয়ত্তের বাইরে। যেমন আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে, মানুষকে একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্যে স্থায়ী এক নিয়ম দিয়ে দিয়েছেন যার কোনো পরিবর্তন নেই। এই নিয়মের মধ্যে থেকে সে কিছু চেষ্টা করতে পারে মাত্র। এইভাবে সে কিছু হাসিল করতে পারে এবং তার শক্তি ও প্রয়োজনের সীমার মধ্যে থেকে সেই জ্ঞানকে সে কাজে লাগাতে পারে। আর তাদের নিজেদের সত্ত্বা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে যে সব নিয়ম-কানুন তিনি দিয়ে দিয়েছেন তার দ্বারাতেই সুনিশ্চিতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারে যে, যে খবরটি নবী (স.) তাঁর রবের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই সত্য।

আল্লাহর গায়েবের খবর সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছে যে, সে খবর জানার ব্যবস্থা তিনি যাকে যতোটুকু দিয়েছেন, সে ততোটুকুই জানে, তার বাইরে জানার ক্ষমতা আর কারো নাই। এ নিয়ম কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ গায়েবের রহস্যরাজি চিরদিন মানুষের অজানা ছিলো ও থাকবে। যা কিছু সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ তায়ালা স্থির করে রেখেছেন তা একমাত্র তিনিই জানেন, কোনো মানুষের পক্ষে তা জানার কথা নয়।

এই সব সত্য আমরা এই তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মধ্যে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং সর্বদিক দিয়ে একটি পূর্ণাংগ আলোচনা করার চেষ্টায় কোনো কসুর করিনি। আর এই তাফসীর করতে কোরআনের মূল অর্থের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংযোগ করার চেষ্টা করেছি যেন কোনো স্থানে সীমা লংঘিত না হয়।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করীমের মধ্যে বহু স্থানে মোমেনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে, তাদের গায়েব বিশ্বাসের ওপরেই প্রধানত জোর দিয়েছেন এবং ঈমানের মৌলিক নীতিসমূহের মধ্যে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস সব থেকে গুরুত্বপুর্ণ নীতি বলে উল্লেখ করেছেন।

'আলিফ-লাম-মীম' এই সেই কেতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, এ কেতাব মোত্তাকী (আল্লাহ ভীরু)-দের জন্যে পথ প্রদর্শক। যারা গায়েবে বিশ্বাস করে নামায কায়েম করে আর যা কিছু রেযেক, তাদেরকে আমি দিয়েছি, তার থেকে তারা খরচ করে। আর যারা বিশ্বাস করে সেই কেতাবগুলোকে যা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিল হয়েছে। আখেরাতের বিষয়টিকেও তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃতপক্ষে তারাই সাফল্যমন্ডিত (বাকারা ১-৫)।

আর, একটু খেয়াল করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, মহান আল্লাহর ওপর ঈমানের অর্থই গায়েবে বিশ্বাস, কারণ আল্লাহ তায়ালাও আমাদের চোখের অন্তরালে, তাঁকে তাঁর ক্ষমতার নিদর্শনাবলী দেখে) মানুষ বিশ্বাস করে নেয়। এইভাবে সে যখন তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তখন প্রকৃতপক্ষে গায়েবের ওপরই ঈমান আনে, কারণ তারা তো পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে নাগালের মধ্যে পায় না বা দেখে না বা তাঁর কাজের অবস্থাগুলোতে দেখতে পায় না।

আবার আখেরাতের ওপর ঈমান আনার ব্যাপারটিও তদনুরূপ গায়েবকেই বিশ্বাস করা, কারণ কেয়ামত তো মানুষ না দেখেই বিশ্বাস করে। সেই আখেরাতের ওপর মানুষ যখন বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন অবশ্যই সেটিও গায়েবের ওপর ঈমান আনার শামিল। তারপর, সেই কেয়ামতের দিনে কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়া, বিচারের জন্যে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া, হিসাব নিকাশ হওয়া সবই তো গায়েবী বিষয় যা চোখে না দেখেই মোমেন বিশ্বাস করে, যেহেতু এ সম্পর্কে আল্লাহর প্রেরিত বানীকে সে বিশ্বাস করেছে।

আর যে গায়েবের বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনতে বলা হয়েছে, সেগুলো সঠিকভাবে বিশ্বাস করলে অন্য আরও কিছু বিষয়ও প্রমাণিত হয়ে যায় যেগুলো আল কোরআন মোমেনের গুণ হিসাবে স্মরণ করিয়েছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যে সেগুলোও মোমেনদের আকীদার অন্তর্গত, যেমন,

'রসূল (নিজে) সেই সব বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তার ওপর নাযিল হয়েছে এবং মোমেনরাও সেইগুলোর ওপর ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আসমানী কেতাবসমূহের ওপর এবং রসূলদের ওপর। আমরা তাঁর (পাঠানো) রসূলদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর তারা (সবাই) বলেছে, আমরা শুনেছি এবং (সর্বাত্মকভাবে) মেনে নিয়েছি; আমরা আপনার ক্ষমার প্রত্যাশী, হে আমাদের রব, আর আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো। (বাকারা ২৮৫)

এ আয়াতটিতে আমরা জানতে পারলাম যে, রসূলুল্লাহ (স.) এবং মোমেনরা সবাই (গায়েবে থাকা) আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান এনেছে তারা সেই সব জিনিসের ওপরেও যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের ওপর নাযিল করেছেন– একথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই তাকদীর সম্পর্কে ইংগিত করেছেন যা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমন অন্য আয়াতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'তিনিই একমাত্র গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত তিনি আর কারো কাছে অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই প্রকাশ করেন না, তবে কোনো রসূলকে তিনি যতোটা জানিয়েছেন ততোটাই সে জেনেছে (সূরা আল জ্বিন ২৬-২৭)

'আর ঈমান এনেছে ফেরেশতাদের ওপর'-এটাও এমন গায়েব যার ব্যাপারে কোনো মানুষ কিছুই জানতে পারে না, তবে তিনি যেটুকু যাকে জানতে দিয়েছেন সে ততোটুক জানতে পারে। তাদের শক্তি ও প্রয়োজন মতোই তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন (আর একমাত্র তিনিই জানেন কার কতোটা শক্তি আর কার কতোটা প্রয়োজন।(১)

আর গায়েবকে বিশ্বাস করার ওপরই ঈমান নির্ভর করে– আল্লাহ তায়ালাই একথাটি সাব্যস্ত করে দিয়েছেন এবং গায়েবে থাকা কোনো বিষয় সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষ তা জানতে পারে না। যেমন হাদীসে ঈমান সম্পর্কে এসেছে, ঈমান আনতে হবে তাকদীরের ভালো ও মন্দ সম্পর্কে (বোখারী , মুসলিম)

মানুষের জীবনের সব দিকের ওপর গায়েবের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত মানুষের নিজের অস্তিত্বের মধ্যে, তার প্রকৃতির মধ্যে এবং সৃষ্টির সবখানে ও আশপাশে সব কিছুর ব্যাপারেই গায়েবকে বিশ্বাস করতে হয়। সৃষ্টির শুরুতে এবং সর্বপর্যায়ে রয়েছে গায়েব সম্পর্কে বিশ্বাস, মানুষের প্রকৃতি ও তার সঞ্চালনে গায়েবে বিশ্বাস, তার জীবনের শুরুতে ও সারা জীবনে চলাফেরার মধ্যে, তার স্বভাব-প্রকৃতি ও সকল কাজ ও ব্যবহারের মধ্যে গায়েবে বিশ্বাসের প্রভাব এবং মানুষের অজানা ও জানা জিনিসের সর্ব পর্যায়ে গায়েবে বিশ্বাস বিরাজমান। সব কিছু একত্রিত করে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ দেখে খুবই সামান্য, না দেখা জিনিস ও বিষয় তার জীবনে ও সৃষ্টির সর্বত্র বহু বহু গুণে বেশী।

বিজ্ঞান ও গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা

মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকার সাগরে নিরন্তর সাঁতার কেটে চলেছে, এমনকি সে এও জানে না তার প্রকৃতির মধ্যে কোন মুহূর্তে কোন স্রোতধারা বয়ে যাচ্ছে, কাজেই তার চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কী সংঘটিত হচ্ছে তার পক্ষে তা জানার প্রশ্নই আসে না। এরপর পরবর্তীকালে তার চতুর্দিকে কী সংঘটিত হবে তা কি করে সে জানার আশা করতে পারে? কি করে তার পক্ষে জানা সম্ভব ওই সব রহস্য যা লুকিয়ে রয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুর মধ্যে, প্রতিটি বিদ্যুত কণার মধ্যে, প্রতিটি কোষের মধ্যে এবং প্রতিটি কোষের অংশগুলোর মধ্যে! মানুষের জ্ঞান ও দৃষ্টিসীমার বাইরে যা কিছু আছে তাই তো গায়েব। আর মানুষের বুদ্ধির উদাহরণ হচ্ছে, মহাসাগরের বুকে তা যেন এক ঝুড়ি খড়কুটা, যা লক্ষ্যহীন ভাবে নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে স্রোতের টানে, যা স্রোতের শেঁওলার মতো কখনও কখনও গোচরীভূত হয়। আর মানুষের ওপর আল্লাহর সাহায্য যদি না থাকতো, আল্লাহ তায়ালা যদি গোটা সৃষ্টি জগতকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে না রাখতেন এবং তাঁর কিছু আইন কানুন যদি ওদেরকে না শেখাতেন, তাহলে ওরা নিজেদের ভালোর জন্যে কিছুই করতে পারতো না। কিন্তু হায়, হতভাগা মানুষ, এসব নেয়ামতের শোকর গোযারি তারা করে না। এরশাদ হচ্ছে, 'আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই শোকর গোযারি করে।

(১) এই গ্রন্থের বর্ণিত পৃষ্ঠায় মালায়য়কাহ–অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিয়মপদ্ধতিগুলোর কিছুটা তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়ায় এবং সামান্য কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অস্ত্রে তাদেরকে সজ্জিত করায় তারা যেন অহংকারে ফেটে পড়তে চাইছে এবং মনে করছে যে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধি ও শক্তিমত নিজেই চলতে পারে। আর তার কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যেই কোনো অতিপ্রাকৃতিক কোনো শক্তির দিকে তাকানোর প্রয়োজন নাই। প্রায়ই তারা অহংকার ও অতি আত্মবিশ্বাসের চোটে ভাবে যে আধুনিক বিজ্ঞান গায়েবের খবর বের করে আনতে পারে এবং বিজ্ঞান চর্চা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মনের কথাও জানতে পারে এবং গায়েবের বিষয়ও ধরতে পারে, যার ফলে বিজ্ঞান ও গায়েবের মধ্যে এখন আর কোনো ব্যবধান নাই। তাদের মতে এখন কম্পিউটারের সাহায্যে ভবিষ্যতের অনেক খবর এবং দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা বহু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব! (১)

সুতরাং আসুন, আমরা মহাজ্ঞানী ও সর্বব্যাপী খবর রাখনেওয়ালা আল্লাহর সিদ্ধান্তকরী কথার দিকে তাকাবার পরে জ্ঞানদর্পী বৈজ্ঞানিকদের কথা ও বৈজ্ঞানিক চর্চার ফসলগুলোকে গায়েবের সাথে তুলনা করে একবার বুঝার চেষ্টা করি। প্রথমে দেখি আল্লাহ তায়ালা কী বলছেন,

'আর তোমাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের খুব সামান্য কিছু অংশই দেয়া হয়েছে' (আল-ইসরা ৮৫);

ওরা তো আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতেই চলে এবং ধারণা-কল্পনার ওপর ভর করে অগ্রসর হয়। আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমান তো কোনো কাজেই আসেনা। (আন নাজম ২৯)

'আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যার খবর তিনি ছাড়া আর কেউ রাখে না (আল আনয়াম ৫৯) এ কথাগুলো এমন হৃদয়স্পর্শী যে, একথাগুলোর ভাষাই কথাগুলোর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্যে যথেষ্ট।

এবার গায়েবের মোকাবেলায় বিজ্ঞানকে রেখে একবার আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা দরকার। দেখা দরকার এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ের মনীষীদের কথা ও মতামতে কী ব্যক্ত হয়েছে। তবে, মানুষের কোনো কথা দ্বারা আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণ করা মোমেনদের মর্যাদার পরিপন্থী। তবু ওই সব বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা ও গায়েব সম্পর্কে যে সব আলোচনা এসেছে সেগুলো অবশ্যই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং সেই বিষয়কেও বুঝার চেষ্টা করা দরকার যা আমরা আমাদের বাহ্যিক চোখ দ্বারা দেখতে সক্ষম নই। আরও খেয়াল করতে হবে সেই সব বিষয়গুলোকেও যা অপরের কাছে শুনে আমরা বিশ্বাস করি, যাতে যে সব বিষয়ে তারা চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা চালাচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে মানুষের কি মননশীলতা পয়দা হয় এবং নিজেদের যুগে ও পরিবেশে সুখ শান্তিতে বসবাস করার জন্যে কি জ্ঞান অর্জিত হয় তা আমরা বুঝতে পারি। এর ফলে তারাও যুক্তিসংগত কারণেই দ্বীন ইসলামের বিরোধী ভূমিকায় থাকবে না এবং তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মেনে নিতে পারবে যে মানুষের জ্ঞান গবেষণা লব্ধ যাবতীয় জ্ঞান থেকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত গায়েবের জ্ঞানই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, বরং সত্য উপলব্ধির প্রশ্নে এবং গায়েবের সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞানই আসল ও একমাত্র উপায়। তারা অবশ্যই এটা বুঝে যে, সত্যপ্রাপ্তির জন্যে তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তা হচ্ছে, কোনো বিষয় তারা প্রথমে ধারণা করে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তা পর্যবেক্ষণ করে, এরপর দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা

(১) সম্প্রতি আবিষ্কৃত জাপান ও আমেরিকার সুপার কম্পিউটার পর্যন্ত আবহাওয়ার কোনো নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যদবানী সঠিক করে বলতে পারে না।—সম্পাদক

চালায় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে এগুলোর সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তারপর বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির পর তাদের গবেষণা-পদ্ধতির সঠিকতা বুঝতে পারে। কিন্তু যখন পরবর্তীতে তাদের প্রাপ্ত সত্য ভুল প্রমাণিত হয়, তখন তারা পূর্বের ভুলের বিপরীত দিকে চিন্তা করতে শুরু করে। এইভাবে নিরন্তর গতিতে চলছে মানুষের মতবাদ দান (Tesis), প্রতিবাদ মতবাদ গ্রহণ (Antithesis) এবং একপর্যায়ে এসে পুরাতন ও নতুনের সমন্বয়ে তৃতীয় আর একটি মতবাদ (Synthesis) খাড়া করে। এইভাবে তারা অদেখা (গায়েব) জানার সন্ধানে নিবেদিত। তাহলে দেখা যাচ্ছে, গায়েব জানার জন্যে তাদের কাছে কোনো সঠিক ও সুনিশ্চিত মাধ্যম বা উপায় নাই। প্রকৃত পক্ষে তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিরন্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে তারা অনুমান ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছিলো এবং ওই সময়ে যে সব জিনিসকে তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো, বিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলো ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক বলেন, যে সব তথ্য তিনি এপর্যন্ত জানতে পেরেছেন তা হচ্ছে, পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্য পাওয়া গেলেও কিছু বিষয় এমন আছে যা কল্পনা করে নিতে হয়, সেগুলো আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তির সীমার বাইরের জিনিস, সেগুলো এতো সূক্ষ্ম, এতো রহস্যাবৃত যে, আমাদের নযর সে পর্যন্ত পৌঁছুতে অক্ষম। আমাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো এই সব দুর্বলতার সীমার মধ্যে এসে থেমে যায়, গণনা বা পরিমাপ করার যে শক্তি-ক্ষমতা আমাদের আছে তা অসীম নয় বিধায় আর অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গবেষণার যাত্রা শুরু হয় সম্ভাবনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আর পরিসমাপ্তিও ঘটে ওই সম্ভাবনার মধ্যে। কোনো সুনিশ্চিত জ্ঞান হাসিল করার দাবী আমরা করতে পারি না। সুতরাং একইভাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোও সম্ভাবনাময়, সেখানে ভুল-ভ্রান্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা বরাবরই রয়েছে, যেহেতু আন্দায অনুমান ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যে কোনো সময়ে ভুল হতে পারে এবং যদিও এসব গবেষণার ফল লাভ হয় অনেক সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে, তাই বলে এর ফলাফল কখনোই চূড়ান্ত নয়, বরং যে কোনো ফলাফলকে নিশ্চিত ও অবস্থার উপযোগী বানানোর জন্যে তার মধ্যে কিছু হ্রাস বৃদ্ধির কথা স্বীকার করা হয়ে থাকে, যেহেতু এ ফলাফল কোনো সময়েই চূড়ান্ত নয়। আর আমরা এটাও দেখি যখন কেউ কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় অথবা কোনো মতবাদ পোষণ করতে থাকে, তখন সে বলে, আমরা এ পর্যন্ত জ্ঞান গবেষণা করে যতোটা জানতে পেরেছি এটা তারই ফল। এরপর পরবর্তীকালে এর বিপরীত কোনো সংস্কার বা উদ্ভাবনীর জন্যে তারা দরজা খোলা রাখেন (১) বলে দাবী করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হচ্ছে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার এবং সম্ভাব্য অন্যান্য ফলাফলেরও নির্যাস। মোদ্দা কথা হচ্ছে যে 'মানুষ,' সে যেই হোক না কেন এক সীমাবদ্ধ জীব, নানা প্রকার সীমাবদ্ধ উপায় উপকরণ নিয়ে সে চলতে বাধ্য। এতদসত্ত্বেও সে কল্পনার ওপর ভর করে অসীমের সন্ধানে নিরন্তর চেষ্টা সাধনা করে চলেছে, যার ফলে পরিশেষে সে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। তবে, অবশ্যই এটা মানতে হবে যে, মানুষ যতো চেষ্টা সাধনাই করুক না কেন মহা বিশ্বের রহস্য সাগরের মধ্য থেকে দু'একটি তুচ্ছ কণার সন্ধান হয়তো সে পেতে পারে। আর যতোটুকুই সে জানতে পারে তাও চূড়ান্ত বলে সে দাবী

---

(১) দেখুনঃ Marrit stanely konegn (scientist of the NATUARAL SCIENCE) রচিত 'আল্লাহু য়্যাতাজাল্লা ফী আসরিল ইলম'- অধ্যয় 'দারস মিন শাজীরাতিল অর্দ'। অনুবাদ করেছেন ডঃ আদ্দামরাদাশ আব্দুল মজীদা সারহান।

করতে পারে না, বরং তার মধ্যেও ভুল ভ্রান্তির, কম বেশী হওয়ার সম্ভাবনা এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও পরবর্তী বিবর্তন সম্ভাবনা রয়েছেই।

মানুষ যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হোক না কেন, তার জন্যে যে সব উপায় উপকরণ সে ব্যবহার করে, সেগুলোর পেছনে রয়েছে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আন্দায অনুমান। মানুষ প্রথমে পরীক্ষা করে, তারপর যে কেয়াস বা কল্পনার ভিত্তিতে সে কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, সেটিকে সাধারণ্যে সে জানাজানি করে। আর কেয়াস বলতে প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলক গবেষণাকেই বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণার যথার্থতা ও যারা গবেষণা করেন তাদেরকে সত্য ও সত্যবাদী বলে মেনে নেয়ার মাধ্যমে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাই বলে এ ধারণাকে চূড়ান্ত এবং পরিপূর্ণ সত্য বলে দাবী করা যায় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্য উদঘাটনের প্রধান উপায় হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। যে সব বিষয়ের ওপর পরীক্ষা চালান হবে সেগুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণা করা। তবে এসব উপায় উপাদান মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং সব কিছুই যে এসব উপাদানের ওপরেই নির্ভরশীল তাও নয়। এতোটুকু মাত্র বলা যায় যে, সত্যপ্রাপ্তির পথে এগুলোও একটি উপায়। অবশ্যই সবাই এটা বুঝাবেন এবং স্বীকারও করবেন যে, কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চয়তা পাওয়া একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের মাধ্যমেই সম্ভব, যা তিনি মানুষকে পরিচালনার জন্যে যুগে যুগে তাঁর বাছাইকৃত মানুষদের (নবীদের) মাধ্যমে দিয়ে এসেছেন। আর এরপর মানুষদের জন্যে শুধুমাত্র সেই সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ রয়ে গেছে যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেন নাই। এই জন্যেই এই সব জ্ঞান বিজ্ঞান এমন চূড়ান্ত সত্য নয় যার ওপর পুরোপুরি কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে এবং গবেষণালব্ধ ওই জ্ঞানকে অকাট্য মনে করতে পারে!

মানুষের অস্তিত্ব এবং তার চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে অনেক জিনিস এমন আছে যা মানুষ এখনও জানতে পারেনি এবং সে সব বিষয় হয়তো বরাবরই রহস্যাবৃতই রয়ে যাবে। সেগুলোই হচ্ছে 'গায়েব'-এর বিষয়। সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞানের ওপরে অবশ্যই মানুষকে নির্ভর করতে হবে। এর বিকল্প কোনো পথ মানুষের জানা নেই

এই যে মানুষের অস্তিত্বকে ঘিরে রয়েছে রহস্যে ভরা বিশ্ব-প্রকৃতি, এগুলো সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে মানুষকে অনুমান করেই এগুতে হয়। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে এসব গবেষণার ধারার পরিবর্তন হয়। এই যে মানুষের জীবন, এর উৎস কী, কিভাবে জীবন গড়ে ওঠে, কিভাবে বৃদ্ধি পায়, তার প্রকৃতি কী, কোন উপাদানে তার খাসলাত চরিত্র গড়ে ওঠে, কোন কোন জিনিস তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কোন কোন জিনিস তার প্রকৃতি সংগত, তার চিন্তা-ধারা কিভাবে পরিচালিত হয় এবং কি কি জিনিস তার প্রকৃতির বাইরে– এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা একমাত্র তার স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।

মানুষ কী? কোন উপাদান দ্বারা তার সৃষ্টি এবং কোন জিনিস তাকে বস্তু থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে, অন্যান্য প্রাণী থেকে তার পার্থক্য কোথায়, কিভাবে সে দুনিয়ায় এলো, কিভাবেই বা পৃথিবীর সব কিছু মানুষের ব্যবহারে এলো, যে বুদ্ধিবৃত্তি তাকে অন্যান্য যে কোনো জিনিস থেকে পৃথক করে রেখেছে তার প্রকৃতি কী, কিভাবেই বা সে বুদ্ধিকে ব্যবহার করে এবং মৃত্যুর পর তার যাত্রা কিভাবে শুরু হবে এবং অবশেষে কোথায় সে যাবে? এগুলো সবই গায়েবের বিষয়, যার সন্ধান কোনো দিন মানুষ পায়নি - পাবে না!

এখানেই শেষ নয়, গায়েবের বিষয়ের মধ্যে মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও প্রকৃতিই প্রথম মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে। তার চিন্তা করা দরকার তার দেহের মধ্যে ও তার স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে নিরন্তর কি ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এবং কেমন ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে?(১)

---

(১) দেখুনঃ Alexie karriel রচিত 'মানুষ এক অজানা সৃষ্টি।'

সৃষ্টি রহস্য বিজ্ঞান ও গায়েবের এলেম

এ সবই হচ্ছে গায়েবের দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। এই সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরেই সে নিশিদিন পরিভ্রমণ করে চলেছে। মানব রচিত 'বিজ্ঞান' ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু উৎকর্ষ সাধন করলেও সৃষ্টি রহস্য ভান্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করা তার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হয়নি। এমন কি কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মানুষ সৃষ্টিরহস্য রাজ্যে বিচরণ করার চেষ্টা করলেও শুধু আন্দায অনুমান ছাড়া সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে সে উপনীত হতে পারে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যে সব জিনিসের সন্ধান বিজ্ঞান দিতে পারেনি তা নিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে মাথা ঘামানো কোনোভাবেই উচিত নয়। তবে বর্তমান যুগে এপথে মনে হয় মানুষ কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছে, আর তা হচ্ছে, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁর পক্ষেই আইন রচনার ক্ষমতা থাকা সংগত। একথার তাৎপর্য অনেকেই আজ অনুধাবন করতে পারছে। তবে খোদ আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা, জ্বিন, ফেরেশতা আরও যে সৃষ্টিকুল সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না সেই সবের রহস্য, মৃত্যু আখেরাত এবং হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান প্রাপ্তি এসব কিছুকে গায়েবের মালিকের হাতেই সোপর্দ করা দরকার, এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নাই এবং বৈজ্ঞানিকরা এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে কোনো ইতিবাচক ফল লাভেই ব্যর্থ হয়েছে। যার কারণে, অবশেষে বিজ্ঞান আত্মসমর্পণ করেছে। এই কথাগুলো একমাত্র তাদের জন্যেই যারা বিজ্ঞান চর্চার কারণে অহংকারী হয়ে গেছে এবং যারা নিজেদের বিজ্ঞানের নিবেদিত ছাত্র মনে করে তারাই নিজেদের জ্ঞানের ওপর বড়াই করে।

এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি ....

১। সৃষ্টি ও তার পরিচালনার নীতি সম্পর্কিত

এ বিষয় আধুনিক বিজ্ঞান বলে জগতের সৃষ্টির মূলে রয়েছে পরমাণু, আর এটিই বস্তু গঠনে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র উপাদান নয়, এটি প্রোটন (Proton বা ধনাত্মক বিদ্যুৎ ইলেকট্রন (Electron - ঋণাত্মক বিদ্যুৎ) এবং নিউট্রন (Neutron- স্থির দুটি নিরপেক্ষ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) পদার্থ নিয়ে গঠিত। আর এ পরমাণুগুলো ভেংগে গেলে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুচ্ছটা, যেহেতু পরমাণুই বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু পরমাণু ফেটে গেলে তা কোনো কল-কারখানার কাজে সহায় হয় না, বরং তার তেজোদৃপ্ত আলোর ঢেউ কখনও দোলা দিতে দিতে এগিয়ে যায়, আর কখনও বা ক্ষেপণাস্ত্র থেকেও বহু বহু গুণে বেশী তীব্র গতিতে এগিয়ে গিয়ে শহর, নগর, বন্দরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এর ধ্বংসকারিতা কতো দূর যাবে এবং কতোক্ষণ দীর্ঘস্থায়ী হবে তা কেউ বলতে পারে না অথবা এর ধ্বংস করার ক্ষমতাকে কেউ কোনো সীমার মধ্যে বাঁধতে পারে না। বিস্ফোরিত হলে এসব পরমাণু অন্য এক আইনের অধীনস্থ হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে অসীম সম্ভাবনাময় আইন। এইভাবে এই পরমাণু নিজ গতিতে চলতে থাকে। এগুলো সমষ্টির মধ্যে থাকাকালে বস্তু আকারে এর শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা বলা যেতে পারে।

ইংরেজ পদার্থবিদ ও অংকবিদ Sir James Jean বলেন, 'প্রাচীন বিজ্ঞান একথা সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছে যে, প্রকৃতি একটি মাত্র পথ পরিক্রমণ করে চলেছে, আর তা হচ্ছে সেই পথ যা ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যাতে করে এই মহাকালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই নিয়ম সর্বস্থানে বিরাজ করতে পারে এবং সর্বদা কারণ ও তার ফল একই ভাবে নির্ণীত হয় এবং (ক) একটি অবস্থার শেষে আর একটি অবস্থা আসে। একথা মেনে নিলে আর কোনো গতি থাকে না (খ) আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত যা কিছু বলতে সক্ষম হয়েছে তা হচ্ছে, (ক) একটি অবস্থার পরিণতিতে অন্য আর একটি অবস্থা আসতে পারে, (খ) অথবা (গ) অথবা (ঘ) অথবা এই অবস্থা বাদে অন্যান্য অবস্থার মধ্যে যে কোনো আর একটি অবস্থা হতে পারে যাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা

থামিয়ে দেয়। হাঁ, তার ক্ষমতার ব্যাপারে একটি কথা বলার আছে, আর তা হচ্ছে, অবশ্য (ক) কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়া, (খ) কোনো ঘটনা ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা (গ) আর একটি অবস্থা (গ) অধিক সম্ভাবনাময় অবস্থা, (ঘ) আর এই রকমই হয়তো হবে, বরং তার সাধ্যের মধ্যে, বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে কোনো একটি অবস্থা আসতে পারে– এইভাবে সম্ভাবনাকেও সীমাবদ্ধ করে দেয়া। এখানে খ, গ ও ঘ একটি আর একটির সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু এর কোনোটি কোনো নিশ্চিত খবর দিতে সক্ষম নয়, অর্থাৎ সকল ঘটনাই অন্য কোনো ঘটনার অনুসরণ করে, কারণ পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনার জন্মে দেয়। যে কোনো ঘটনা ঘটে, তা ঘটবে বলে পূর্ব হতে সিদ্ধান্ত হয়ে রয়েছে। এটাই নিয়তির তাৎপর্য।

সুতরাং দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে কী সংঘটিত হবে, ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় জ্ঞানের বাইরে কী ঘটবে এবং সৃষ্টির বুকে কোথায় কী লুকিয়ে আছে এবং এগুলো কোন সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম উপাদান দিয়ে তৈরি, তা মানুষ কি করে জানবে?

একথাটি স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে রেডিয়ামের আলোক-কণাগুলোর উদাহরণ দেয়া যায়। এইগুলো রূপান্তরিত হয়ে সীসা এবং হলিউম (Holwium)-এ পরিণত হয়। আর এই সব আলোক-কণা অজানা এক শক্তির কাছে সদা সর্বদা পুরোপুরি অনুগত হয়ে থাকে। এগুলো সেই মহাশক্তির কাছে অনুগত, যিনি লোকচক্ষুর আড়ালে অবস্থিত। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের বাইরে হলেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

আরও স্পষ্টভাবে বুঝার জন্যে বস্তুগত আর একটি জিনিসের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে আমাদের জানা আছে যে, রেডিয়াম-এর মধ্যে যে অণু পরমাণুগুলো রয়েছে, তা আলো বিকীর্ণ করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু কালক্রমে এই আলো বিকীর্ণ করা বন্ধ হয়ে শুধু সীসা ও হলিউম (Holwium) থেকে যায়। এই কারণেই রেডিয়ামের বড় অংশগুলো সেখানে স্থায়ীভাবে কমে যায় এবং থেকে যায় সীসা ও হলিউম (Holwium)। আর এক্ষেত্রে সাধারণ যে নিয়ম বলবৎ থাকে তা হচ্ছে, এক আশ্চর্য ভারসাম্য এই বিবর্তনের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। এর কারণ হচ্ছে, যতো সংখ্যক বাসিন্দা পৃথিবীর বুকে বর্তমান আছে তার সাথে পূর্ণ ভারসাম্য রেখে তার প্রয়োজন মতো এর পরিমাণ রেডিয়াম কম হয়ে যায়, যার কারণে নতুন আর কোনো রেডিয়াম উৎপন্ন হয় না এবং এগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে তার স্থানে আর একটি রেডিয়াম উৎপন্ন হয়ে যায়। অবশ্য এর অবস্থান-এর মেয়াদ কতোটা হবে তা আমরা কেউ বলতে পারবো না। অথবা হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বেশ কিছু বস্তুকণা ওই আগুনের মধ্যে পতিত হয় যা বস্তুর শেষ অবস্থা। আর তাদের মধ্যে কোনো একটিকে টিকিয়ে রাখাই তো আসল উদ্দেশ্য নয়। মোট কথা হচ্ছে, রেডিয়ামের মধ্যে অবস্থিত পরমাণুর বয়স বেশী হওয়ার কারণে তার একটি অংশ প্রভাবশীল হবে এটা মোটেই জরুরী নয়। এগুলোর কোনো এক অংশ বিলুপ্ত হলেই অপর অংশটিও ধ্বংস হয়ে যাবে তাও জরুরী নয়। কেননা সে অংশটিকেও তো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে ছায়াও দেয়া হয়েছে। বরং মৃত্যু তো হঠাৎ করেই আসে। যা পূর্বে কেউ ভাতেও পারবে না।(১)

---

(১) এমনি করেই লোকটি বলে আর আমরা তার কথার বৈজ্ঞানিক যে অর্থ গ্রহণ করেছি তা অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রতিটি জিনিসের বাহ্যিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণেই পেয়েছি। আর এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এসব জিনিস হঠাৎ করেই এবং বিনা সঠিক কারণে সংঘটিত হয়, যা আমাদেরকে চিন্তিত করে না এবং যার কোনো গুরুত্বও আমরা বুঝতে পারি না। আমরা তো শুধু জানি যে, যা হওয়ার সিদান্ত পূর্ব থেকে স্থিরকৃত ছিলো তাই হয়েছে এবং আল্লাহরই নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু হয়েছে যার তাৎপর্য একমাত্র তিনিই জানেন। আর তাঁর কাছে 'প্রতিটি জীবের মৃত্যুর দিনক্ষণ লেখা রয়েছে।' রেডিয়াম–এর মধ্যে অবস্থিত পরমাণুই হোক অথবা অন্য প্রাণী হোক, সবার ব্যাপারেই একই নিয়ম। এমনকি মানুষও এমনি করে তার মেয়াদা শেষে একই অদৃশ্য হাতের ইশারায় মৃত্যুবরণ করে।

এই সত্য কথাগুলোকে একটি বস্তুগত জিনিসের উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চাই। ধরে নেয়া যাক, আমাদের ঘরে দুই হাজার রেডিয়ামের পরমাণু রয়েছে, বিজ্ঞান কিছুতেই নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না সামনের বছরে এদের মধ্যে কয়টি বেঁচে থাকবে। কিন্তু তারা যা পারে তা হচ্ছে, তারা আন্দায করতে পারে, আগামী বছরে ওই ২০০০ পরমাণুর মধ্যে বেঁচে থাকবে হয়ত ১৯৯৯টি বেঁচে থাকবে অথবা ১৯৯৮টি। এমনি করে নানা প্রকার সম্ভাবনার কথাই তারা বলবে। এ সংখ্যাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যাটি তাদের ধারণায় ১৯৯৯। অর্থাৎ সম্ভাবনা সর্বাধিক পরিমাণে হলো। দুই হাজারের বেশী পরমাণু হতে পারে না।

আর আমরা যারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথের পথিক মনে করি, তারা বলবো, এই দুই হাজার নির্দিষ্ট পরমাণুকে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে নিরূপণ করা হবে, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। অবশ্য, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা অনুমান করতে গিয়ে এতোটুকু বুঝি যে এসব পরমাণু পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কারণে আরও বেড়ে যাবে, অথবা সব থেকে বড় যে আন্দাজটি আসে তা হচ্ছে অবশ্যই তাপ বৃদ্ধি হবে, অথবা আশপাশের অন্য কিছু পরমাণু সামনের বছরে এগুলোর সাথে সংঘর্ষ বাধাবে। কিন্তু এগুলো সবই ভুল। কারণ সংঘর্ষ অথবা উত্তাপের কারণে যদি পরমাণুগুলোর কোনো একটির ভাংগার সম্ভাবনাই থাকে, তাহলে অবশিষ্ট ১৯৯৯টিরও ভাংগার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চাপ দিয়ে অথবা তাপ প্রয়োগ করে আমাদের পক্ষে রেডিয়ামগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়াও সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে কোনো বিজ্ঞানী একে অসম্ভব মনে করেন। বরং বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস হচ্ছে প্রতি ২০০০ রেডিয়ামের পরমাণুর মধ্যে বছরে একটি করে পরমাণু মারা যায় এবং তাকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করে এবং এটিই হচ্ছে ১৯০৩ সালে গৃহীত Sir Rutherford suda-এর মতবাদ অনুসারে পরমাণুর বিচ্ছেদ নীতি।

সুতরাং নিজেদের সাধ্যের বাইরে অন্য কারো দ্বারা যদি এই পরমাণুগুলো আলো বিকীর্ণ করতে না পারে, তাহলে গায়েবী সাহায্য কেমন করে আসবে? অথবা এদের অজান্তে অথবা অন্য কারো জানা মতে কি এগুলো আলো দিতে পারে?

যে ব্যক্তি একথাটি বলছে সে মানুষের অজানা আল্লাহর যে অসীম ক্ষমতা আছে, তা যে প্রমাণ করতে চায় তা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে ওই সকল পরিণতি থেকে সে পালিয়ে যেতে চায় যেখানে গিয়ে মানুষের জ্ঞান দিশেহারা হয়ে যায়, বরং আমরা যে গায়েবী সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাই সেটি শুধু অনুমানই করা হয়।

২। আবার যে নিয়মে এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় সৃষ্টির সূচনা ও কর্মতৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে করা হয়, সেই একই নিয়মে মনে করা যায় যে পৃথিবীতে এক মহাশক্তির অদৃশ্য হাতের ইশারায় জীবনের বিস্তৃতি ও তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে এবং তারা সেই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে যা কোনো দিন মানুষ জানতে পারেনি। আর কখনও পারবে না।

Russel Tusharelz Arnest নামক-জার্মানীর ফ্রঙ্কফুট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একজন জীব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী বলেন, 'জড় জগত থেকে সৃষ্টি জগত কিভাবে বাস্তবে এলো, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কয়েকটি মতো পেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনো কোনো আলোচক বলেছেন যে, Protegein অথবা Ferous নামক জীব-কণা থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা হয়েছে অথবা কিছু সংখ্যক বড় Proton একত্রিত হয়ে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছে। এই কল্পনাবিলাসী দার্শনিকরা এ বিষয়ে যে সব অবোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলো কল্পনা জগতেই ভালো

মানায়, বাস্তবের কোনো পদার্থ দ্বারা এগুলোকে বুঝাতে তারা অক্ষম। তবু Protegein দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেন এমন এক পদার্থকে যার পেছনে অজানা এক শক্তির অদৃশ্য হাত সক্রিয় রয়েছে। আবার Ferous বলতে তারা বুঝাতে চেয়েছেন এমন এক বস্তুকণাকে যার নিজের মধ্যে উৎপাদনী ক্ষমতা আপনা থেকেই বর্তমান রয়েছে। বিদগ্ধ যে কোনো ব্যক্তি বুঝবেন এসবই হচ্ছে গোঁজামিল। যখন মানুষ বুদ্ধিহারা হয়ে যায়, তখন তারা (ওইসব নাস্তিকরা) এসব গোঁজামিলের শব্দ দ্বারা মানুষকে ভেড়া বানাতে চায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ বেওকুফদের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার তৌফিক দিন। আর কারো কারো কাছে মনে হয় যে, এইসব মতবাদ অনুযায়ী জীব জগত ও জড়জগতের মধ্যে যে শূন্যতা রয়েছে, যা এদুটিকে পৃথক করে রেখেছে, সে শূন্যতাকে পূরণ করে দেয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে এ বাস্তবতাকে অবশ্যই মেনে নেয়া উচিত যে, নির্জীব পদার্থ থেকে সজীব প্রাণী কিভাবে বাস্তবে এলো তা জানার জন্যে যতো প্রকার চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা এ পর্যন্ত হয়েছে তা সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না, তারা তাদের দাবীর পক্ষে সরাসরি কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। তারা মনে করে যে, এ প্রাণী জগত হঠাৎ করেই অস্তিত্বে এসেছে; হতে পারে জীবজগতের এই বাহ্যিক আত্মপ্রকাশ এবং আমাদের দৃষ্টির সামনে বাস্তবে টিকে থাকা এটা কিছু জীবন্ত জীবনকোষের সম্মিলনের ফলে সম্ভব হয়েছে। আর সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুক্ত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তির এ এক স্বতন্ত্র চিন্তা। কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস থেকে এইভাবে হঠাৎ করে জীবজগতের আগমন কল্পনাকে মেনে নেয়া আরও অনেক বেশী কঠিন। বরং আল্লাহ তায়ালা তাঁর হুকুম বলে সৃষ্টি করেছেন এবং যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই এককভাবে গ্রহণ করেছেন-এটাই বুদ্ধি-গ্রাহ্য।

-অবশ্যই আমি এটা বিশ্বাস করি, প্রত্যেকটি জীবনকোষ ও তার ক্ষমতা সম্পর্কে এমন কিছু জিনিস বিশ্বাস করতে হয় যা বুঝা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। অথচ পৃথিবীর বুকে কতো বহু মিলিয়ন জীবকোষ আল্লাহর ক্ষমতার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে, যা আমাদের চিন্তা ও বুদ্ধিকে জাগিয়ে দেয়, আর এই কারণেই আমি আল্লাহর অস্তিত্বে চূড়ান্তভাবে এবং সর্বান্তকরণে বিশ্বাসী করি। (১) এই সাক্ষ্য প্রমাণের যে জিনিসটি আমাদেরকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় তা হচ্ছে জীবন ও তার সৃষ্টি রহস্য অবশ্যই আল্লাহর গোপন তথ্য ভান্ডারের মধ্যে একটি অতি গোপন রহস্য, যেমন সৃষ্টিজগতের শুরু ও কর্মতৎপরতা আজও রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে মানুষের কাছে সুনিশ্চিত কোনো জ্ঞান নাই। তাদের গবেষণাপ্রসূত জ্ঞান দ্বারা শুধু 'সম্ভাবনার' কথাই বলতে পারে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তায়ালা সঠিকভাবে বলেছেন, 'না, তুমি তাদের কিছুতেই সৃষ্টি ও পৃথিবীর সৃষ্টি দেখাতে পারোনি, না তাদের দেখাতে পেরেছো তাদের নিজেদের সৃষ্টির গোপন রহস্যকে।'

জ্ঞানের পরিমণ্ডলে গায়েব বিশ্বাসের প্রভাব

৩। এবারে আমরা মানুষের সৃষ্টি রহস্য বুঝার জন্যে একটু বড় রকমের পদক্ষেপ নিতে চাই। দেখুন, পুরুষদেহ থেকে লাফিয়ে একবারে নির্গত বির্যের মধ্যে প্রায় ষাট লক্ষ শুক্রকীট (জীবন) থাকে এবং এগুলোর প্রত্যেকটি জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু এই

---

(১) একটি বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত, 'জ্যান্ত কোষগুলো রসূলুল্লাহ (স.)-এর রেসালাত-এর প্রমাণ দেয়, দেখুন গ্রন্থ': আল্লাহু য়াতাজাল্লা ফী আস্‌রিল, আর আমরা এ বিষয়ে সতর্ক করতে চাই যে, আমরা যখনই কোনো জিনিস গ্রহণ করতে চাই, তখন আমরা বস্তুগত জিনিসগুলোর দিকেই তাকাই (প্রতীকী পদার্থ) যা এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের মধ্যে এসেছে। অথচ এটা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে স্থিরকৃত কোনো জিনিস নয় যার লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে ও নিশ্চিন্ত মনে আমরা গ্রহণ করতে পারি। এগুলো সেই চিন্তাগত ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয়, যা আমরা পেশ করতে চাই।

প্রতিযোগিতায় কোন কীটটি জরায়ুস্থ ডিম্বকোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা কেউ বলতে পারে না। এটিই গায়েবী জিনিস, এই অদৃশ্য জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই খবর রাখে না। এ শুক্র কীটের মধ্যে থেকে পুরুষ কীট, না নারী-কীট কোনটি জয়ী হবে এর খবরও একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। আর ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হওয়ার এই প্রতিযোগিতা যাদের মধ্যে চলে, তারা কেউ পুং-কীট এবং কেউ স্ত্রী-কীট। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে একটি মাত্র কীট ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয় এবং ভ্রূণ নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু পুং-কীট বা নারী-কীট কোনটি জয়ী হবে তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। অবশ্যই এটা আল্লাহর গায়েবী জ্ঞানের বিষয়। কোনো মানুষের কিংবা ঐ ভ্রূণের পিতামাতার পক্ষেও জানা সম্ভব নয় যে ওই ভ্রূণ পুংলিংগ না স্ত্রী-লিংগ, অন্য কোনো মানুষেরও এতে হাত নাই। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালাই জানেন গর্ভধারিণী মহিলা তার গর্ভে কী ধারণ করে, গর্ভাশয়গুলোতে কী কমে এবং কী বৃদ্ধি পায়। আর প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে তাঁর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ! তিনি গায়েব এবং উপস্থিত সব কিছুর খবর সমান ভাবে রাখেন, তিনিই বড়, তিনিই মহান (সূরা রা'দ ৮-৯)(১)

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে, যা ইচ্ছা তিনি তাই পয়দা করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি পুত্র সন্তান দেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন কন্যা সন্তান। অথবা পুত্র ও কন্যা উভটাই দেন, আবার যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি বন্ধ্যা বানান। নিশ্চয় তিনিই জাননেওয়ালা, সব কিছু করতে সক্ষম' (আশ শূরা ৪৯-৫০)।

তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটের মধ্যে সৃষ্টি করেন, তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে একের পর এক তোমাদের সৃজনী কাজ অগ্রসর হয়। এইভাবে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের রব-প্রতিপালক মালিক ও মুনিব। বাদশাহী একমাত্র তাঁর। তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক আর কেউ নয়। এখন বলো, তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? (আয্ যুমার ৬)

এই হচ্ছে সেই 'গায়েব' যার সামনে এসে মানবীয় জ্ঞান থেমে যায় থমকে দাঁড়িয়ে যায় তার জ্ঞানদর্পী মন। আর তাকে তো বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সব কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা অতীতের বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা জাহেলী মন মানসিকতার মধ্যে লালিত পালিত। তারা মনে করে যে, গায়েবে বিশ্বাসের অর্থই হচ্ছে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা। আর বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা গবেষণা করে অবশ্যই তাদের গায়েবের চিন্তা বা যা দেখা যায় না তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়। এটিই তো হচ্ছে মানবীয় জ্ঞানের পরিধি। তবে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের বলে যে সব ফল মানুষ হাতে পেয়েছে বলে দাবী করে তা শুধু সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যে সুনিশ্চিত ও একমাত্র সত্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে এসেছে তাই হচ্ছে অদৃশ্য মহাশক্তির উপস্থিতি ও তার সক্রিয়শীলতা। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। গায়েব বা অদৃশ্য আল্লাহর 'উপস্থিতি বিষয়টির' আলোচনা পরিত্যাগ করার পূর্বে ইসলামী আকীদার মধ্যে 'ঈমান বিল গায়েব' এর আকীদা বলতে কী বুঝায়, এ বিষয়ে ইসলামী চিন্তাধারাতে কী বলা হয়েছে এবং ইসলামী যুক্তিতেই বা এই বিষয়ে কি বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই।

---

(১) বর্তমানে স্ক্যানিং করে গর্ভাবস্থায় সন্তানের লিংগ জেনে নেয়ার সাথে এর কোনো বৈপরিত্য নেই। কোরআন এখানে যা বলেছে, তা হচ্ছে ভ্রূণ সংক্রান্ত বিষয়ে। একবার সন্তান জন্ম নিয়ে গেলে তার লিংগ জানাটা এর মধ্যে পড়ে না।—সম্পাদক

অবশ্য কোরআনুল করীমই হচ্ছে ইসলামী আকীদা ও এর চিন্তাধারাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তিপূর্ণভাবে পেশ করার জন্যে মূল উৎস, যা সুনিশ্চিতভাবে একথার ঘোষণা দিয়েছে যে, তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু জানেন। মানুষ যা কিছু জানে তা অদৃশ্য কোনো জিনিস নয়, আর সৃষ্টির যে সব বস্তুকে তারা কাজে লাগাচ্ছে তা অজানা কোনো জিনিস নয়।

এই মহা সৃষ্টির জন্যে রয়েছে এক সুসংবদ্ধ নিয়ম-শৃংখলা। এর মধ্যে মানুষের জীবনের জন্যে যে সব জিনিস অপরিহার্য, সেইগুলোকে সে তার প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়। যাতে সে পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা যে নিয়ম দান করেছেন সেই অনুযায়ীই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এসব জিনিসের মূল্য ও ব্যবহার পদ্ধতিও জানিয়ে দিয়েছেন। আর খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার তাগিদেই তাকে সৃষ্টির বহু রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতাও দিয়েছেন। যোগ্যতা দিয়েছেন পৃথিবীকে বশীভূত করার, জীবনকে উন্নতমানের করে গড়ে তোলার এবং এর মধ্যস্থিত উপায় উপাদানগুলোকে উপকার লাভের প্রয়োজনে ব্যবহার করার কাজে লাগানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। এই সকল বিধানকে সর্বসাধারণের মধ্যে চালু করার মাধ্যমেই আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহর ইচ্ছাকে কেউ তার নিজ কাজ দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে পারে না বা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারও রাখে না। মানুষের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে যতো পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহর যে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত রয়েছে তা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। শুধু চেষ্টার দ্বারাতেই কেউ কিছু করতে পারে না। তাকদীর তো হচ্ছে এমন এক পরিচালিকাশক্তি যা প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর আল্লাহরই ইচ্ছা ও বিধান অনুযায়ীই তাকদীর গঠিত হয়। যতোবারই তাকদীরের লিখন সম্পর্কে চিন্তা করা হয়, ততোবারই দেখা যায় এর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে, যার নিশ্চিত কোনো জ্ঞান কারো কাছেই নাই। এ বিষয়ে মানুষ যতোই চিন্তা ভাবনা করুক, আর যতো গভীরভাবেই গবেষণা করুক না কেন সব কিছুর পেছনে শুধু মাত্র 'সম্ভাবনা' কাজ করে, অর্থাৎ 'এটা বা ওটা হতে পারে', হবেই বলে নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। মানুষের যুক্তি-বুদ্ধিও একথাকে স্বীকার করে যে, 'সম্ভাবনার' কথা বলা ছাড়া, নিশ্চয়তা দান করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আর একই মুহূর্তে, মানুষের গঠনকে পূর্ণাংগ বানানোর জন্যে কোটি কোটি বস্তু সক্রিয় রয়েছে এবং এগুলোর সবাই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে কাজ করে চলেছে, যাদেরকে আমরা বাস্তব চোখে না দেখলেও কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কিছু বস্তুকে আমরা সক্রিয় দেখি। আবার আরও কোটি কোটি জিনিস আছে মানুষ যেগুলোকে দেখে না। এসব অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়গুলো গোটা সৃষ্টির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত জুড়ে বিরাজ করছে। আর এসব কিছু নিয়েই সৃষ্টির অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে। এদের কোনোটা জানা যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এদের কোনো কোনোটিকে আল্লাহ প্রদত্ত খেলাফতের যোগ্যতা নিয়ে মানুষ ব্যবহার করে চলেছে।

খেয়াল করে দেখুন এবং বুঝতে চেষ্টা করুন, মানুষ নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীতে আসেনি, বা কেউই জানে না পৃথিবীতে তাকে নামিয়ে আনার উদ্দেশ্য কী। জীবন শেষে পুনরায় এখান থেকে বিদায় হওয়া– তাও তার নিজের ইচ্ছায় হবে না এবং এ সফরের শেষ কোথায় তাও সে জানে না। আর সব কিছুর অবস্থাও এই একই। তার জ্ঞান ও বোধশক্তি যতো গভীর ও যতো প্রশস্ত হোক না কেন, এ বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারও নাই।

ইসলাম মানুষকে যে যুক্তি-বুদ্ধি শিখিয়েছে তার মধ্যে অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাসই প্রধান, কারণ অদৃশ্য বিষয়ই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস করার জিনিস যার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তার

বুদ্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় এবং সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই তার প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যে মানুষ সৃষ্টিজগতের অতি অল্প বস্তুই তার চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখতে পারে, তার পক্ষে 'যা দেখি না তা বিশ্বাস করবো না'-বলা চরম নির্বুদ্ধিতা ও নিদারুণ মূর্খতা বৈ কি! এ জ্ঞানদর্পীরাই আসলে মুর্খতার মধ্যে ডুবে রয়েছে।

আর একমাত্র ইসলামী বুদ্ধি বৃত্তি অদৃশ্য জ্ঞান ভান্ডারের সেই গোপন রহস্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, সাথে সাথে তাকে জানায় সেই সব নিয়ম সম্পর্কে যার কোনো পরিবর্তন নাই। এর সাথে তাকে আরও জানায় বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সেই সব রহস্য সম্পর্কে যা পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যে উৎকর্ষ করেছে তা যেমন একজন খাঁটি মুসলমানের কাছে সুপরিচিত, তেমনিই আল্লাহর রহস্য ভান্ডারের বাস্তবতাও তার কাছে সমভাবে উন্মুক্ত। আর একটি বিষয় রয়েছে যার রহস্য আল্লাহ তায়ালা যাকে জানাতে চান সে যৎসামান্য জানতে পারে, অন্য কেউ তার কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করতে পারে না। আর তা হচ্ছে মানুষের তাকদীর বা ভাগ্যলিখন।

আর অদৃশ্যের বিশ্বাস (গায়েবের ওপর ঈমান) হচ্ছে এমন দুর্লংঘ কাজ, যা করার দ্বারা এক ব্যক্তি পশুত্বের স্তর থেকে মনুষ্যত্বের স্তরে আরোহণ করে, কারণ পশু পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যা বুঝে তাই গ্রহণ করে। কিন্তু মানুষ এর অতিরিক্ত আরও কিছু গ্রহণ করতে পারে যা কোনো পশু পারে না। মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাইরের আরও বহু কিছু বুঝতে পারে এবং আরও বড় গভীর ও সুক্ষ্মগতিসুক্ষ্ম অনেক কিছু জানতে ও অনুভব করতে সক্ষম হয়, যা সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়নিচয় গ্রহণ করতে পারে না। অথবা একে বলা যায় সেই প্রস্তুতি যা, অনুভূতি শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। ঈমান (অদৃশ্য আল্লাহকে বিশ্বাস) সকল সৃষ্টির রহস্য ভান্ডারের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্যে তার ধারণা-শক্তিকে অভাবনীয় রূপে সমৃদ্ধ করে, যা সাহায্য করে তার নিজের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে অনুভব করতে অথবা প্রত্যেকটি অনুভূতিকে সক্রিয় করার জন্যে শক্তি যোগায়, অথবা এই সৃষ্টিজগতকে টিকিয়ে রাখার রহস্য জানায় এবং এই বিশ্ব ও এর বাইরের জগত সম্পকে অনুভূতি দান করে।

এই বিশ্বাস, পৃথিবীর বুকে বসবাস করা-কালীন জীবনের সর্বত্র তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে পৃথিবীর সংকীর্ণ জীবনে চিন্তাশীল ব্যক্তি ও তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ জগত শেষে বৃহত্তর আর এক জগতে বিশ্বাসী মানুষের জ্ঞান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীর সর্বত্র তাদের প্রাধান্য ও নেতৃত্বের ডংকা বাজতে শুরু হয়। সব কিছুর ওপর তারা প্রভাবশীল হয়ে ওঠে। তারা অনুভব করতে থাকে তাদের দিগন্ত প্রসারী প্রভাব বলয়, ছড়িয়ে পড়ার কথা এবং স্থান কালের সীমা অতিক্রম করে তাদের এই সংকীর্ণ জীবনের পরবর্তীতে প্রকাশ্যে ও গোপনে মানুষ তাদের কথা স্মরণ করতে থাকে। আর তাদের এই ঈমানী শক্তির কারণে সব চেয়ে বড় যে সত্য স্থাপিত হয়, তা হচ্ছে, মানুষ বুঝতে শুরু করে কে মহান আল্লাহর অস্তিত্বই শুধু টিকে থাকবে আর সব কিছু শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারা একথা বুঝবে যে, মহান আল্লাহকে তারা তাদের চর্ম চোখ দিয়ে দেখে না বটে কিন্তু তাঁর কুদরতি চোখের দৃষ্টি যে সর্বত্র প্রসারিত তা সে প্রতিমুহূর্তে উপলব্দি করে;

এই পাশব শক্তি ব্যবহারের জগতে মানবতার উন্নয়নে ঈমান বিল-গায়েবই হচ্ছে পার্থক্য নির্ণয়কারী। মোমেন ও কাফেরের মাঝে গায়েবের প্রতি ঈমান এসে দু'জনকে দুটি ভিন্ন পথে

পরিচালিত করে। আজকের আধুনিক যুগের এই বস্তুবাদী দল সর্বযুগের বস্তুবাদী দলের মতোই একই প্রকার ব্যবহার ও চিন্তার অধিকারী। এরা মানুষকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিতে চায়। এদের কাছে যা ধরা ছোঁয়া যায় না বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা জানা যায় না, তার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নাই। এগুলোকে তারা প্রাচীন পন্থা বলে মনে করে। অথচ এই ধারণাই হচ্ছে প্রকৃত হীনতা যার থেকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে বাঁচিয়েছেন। অতপর তাদেরকে দান করেছেন সেই মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান যার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল-কোরআন বলছে, 'যারা গায়েবে বিশ্বাস করে' .....। আল্লাহর সকল নেয়ামতের জন্যে তাঁর যাবতীয় প্রশংসা আর হীনতা-দীনতা অপমান সকল প্রাচীনপন্থী ও সত্য থেকে পশ্চাদপ সরণকারীদের জন্যে অনিবার্য।(১)

আর যারা গায়েব সম্পর্কে বিতর্ক তোলে এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা বলে, তারা ঐতিহাসিক সত্যকেই সিদ্ধান্তকর বলে দাবী করে! অথচ বর্তমান যামানায় বিজ্ঞান সিদ্ধান্তকর বা চূড়ান্ত সত্য বলে কোনো জিনিস আছে বলে দাবী করে না, আর সত্য কথা বলতে কি, বিজ্ঞানে চূড়ান্ত সত্য বলতে কোনো কিছু আছে বলে স্বয়ং বিজ্ঞানীরাও দাবী করেন না। তারা শুধু সম্ভাবনার কথাই বলেন!

একমাত্র কার্ল মার্কসই তার পেশকৃত মতবাদকে চূড়ান্ত বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ কোথায়? তিনি বলেছিলেন ইংল্যান্ডে অবশ্যই একদিন সমাজতন্ত্র কায়েম হয়ে যাবে। তিনি দাবী করেছিলেন যে, শিল্প বিপ্লবের চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে, যার ফলে পুঁজিবাদের চরম প্রসার হবে, একদল লোক পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলবে এবং আর এক দল হয়ে যাবে নিস্ব শ্রমিক। আর সেই সময়েই শ্রমিকদের বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, যার ফলে অধিকাংশ মানুষ ও সংগঠন রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য অঞ্চলে শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বে। পুনরায় শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলো আর উন্নতি করতে পারবে না!

লেনিন এবং পরবর্তীতে ষ্টালিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁদেরই উত্তরসূরী ক্রুশ্চেভ সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পরিবর্তে সহ অবস্থান ও শান্তির পতাকা উড্ডীন করেন।(২)

ইতিহাস সাক্ষী যে, এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী কোনো সময়েই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং এখন আর এ ব্যাপারে বেশী আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

এ প্রসংগে একটি কথাই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায়, আর তা হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়ের সত্যতা, যা দেখা বা ধরা ছোঁয়া না গেলেও অনুভব করা যায়। বাকি সব কিছু হচ্ছে শুধু সম্ভাবনা আর সম্ভাবনা। একটি কথাই চূড়ান্ত সত্য তা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন তাই হয় এবং তাই সংঘটিত হয় যা তাকদীরে লেখা রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত এই ভাগ্যলিপি ও অদৃশ্য বা গায়েবের বিষয় যা তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি জানে না। আর এখানে বা ওখানে যা কিছু সংঘটিত হচ্ছে তা হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী এ বিশ্বের প্রচলিত পদ্ধতি, মানুষ এগুলো জানতে পারে এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে সে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের লিখন যা আছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে, তা গ্রহণ করার জন্যে তার মনের দুয়ারকে অবশ্যই খোলা

---

(১) ফী যিলালিল কোরআন-এর প্রথম খন্ড থেকে গৃহীত।

(২) ইদানীং বরং দেখা যাচ্ছে কমিউনিজমের অপমৃতুর পর স্বয়ং রাশিয়াই পশ্চিমা পুজিবাদের দোসরে পরিণত হয়ে গেছে। কোথায় গেলো আজ মার্কসের ভবিষ্যতবানী, যাকে তিনি একসময় বলেছিলেন ইতিহাসের 'অমোঘ সিদ্ধান্ত'।–সম্পাধক

রাখতে হবে, আর একথাও মানতে হবে আল্লাহর কাছে যে অদৃশ্য বিষয়াদি আছে তা সবই অজানা এবং এই কেতাবই সকল কিছুর পরিচালক অবশ্যই এই কোরআন সেই দিকেই পরিচালনা করে যা সত্য সঠিক এবং মযবুত।

গায়েবের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহরই হাতে, আর একমাত্র তিনিই জানেন বিশ্বের কোথায় কী ঘটে ও ঘটছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় স্থির সত্য বলতে কোনো কিছু না থাকায় এক সিদ্ধান্ত থেকে অন্য সিদ্ধান্তের দিকে তারা প্রতিমুহূর্তে পালতুলে এগিয়ে চলেছে এবং মানুষকে নানাভাবে পেরেশান করে চলেছে। এমনকি আল্লাহর অসীম কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও তারা নাক গলাতে চায়। এ কারণে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন,

'আর তিনিই তোমাদেরকে রাতের বেলায় .....পৃথিবীর বুকে করতে থেকেছো।' (আয়াত ৬০)

বান্দার ওপর আল্লাহর সার্বক্ষণিক তদারকি

এ প্রসংগে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করছি, যেমন গায়েবের দিগন্তসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে, এ বিষয়ের দূরত্ব ও গভীরতা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। এসব বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞান সীমার শুধু কিছু ইশারা ইংগিত পেছনের আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে মাত্র। মানুষের জীবন সম্পর্কিত আরও কিছু কথা আছে যা একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানের ভান্ডারে পুঞ্জীভূত রয়েছে, যার নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই হাতে, অর্থাৎ ইচ্ছা করলেও কেউ সে জ্ঞান জগতের সন্ধান পেতে পারে না, তাঁর ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনায় সে জ্ঞানের ব্যবহার করা হয়। সেই রহস্যাবৃত জ্ঞান হচ্ছে মানুষের জাগরণ ও নিদ্রা, তাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং তাদের আল্লাহর দরবারে একত্রিত হওয়া ও তাঁর কাছে (অতীতের) সমস্ত কাজের হিসাব-দান সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় যার খবর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই রাখেন। কিন্তু মানুষ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এই আল কোরআনের দেখানো পথে চলার মাধ্যমে জীবিত ও নির্জীব এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু ও বিষয়সমূহ সম্পর্কে এমন বিস্ময়কর জ্ঞান অর্জন করতে পারে যা দৃশ্য অদৃশ্য ও চলমান সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সে বিষয়ে তার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।(১) তাই, আল কোরআনের ঘোষণা,

আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা যিনি রাতের বেলায় তোমাদের 'মৃত্যু (ওফাত)' দান করেন।

এ হচ্ছে সেই 'ওফাত' যার আগমন তন্দ্রা আসার সাথে সাথে শুরু হয়ে যায়। এ হচ্ছে এমন এক মৃত্যু যার মধ্যে অনুভূতি শক্তি অকেজো হয়ে যায় এবং মানুষের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার কারণে গোটা শরীরে নেমে আসে অনাবিল এক প্রশান্তি। যতোক্ষণ ঘুমের মধ্যে কাটে ততোক্ষণ জ্ঞান বুদ্ধি অনুভূতি সব কিছু অকেজো থাকে, অর্থাৎ এগুলো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ এমন এক রহস্যজনক অবস্থা যার বিবরণ দিতে মানুষ অক্ষম, শুধুমাত্র বাহ্যিক যে অবস্থা দৃষ্টিতে আসে এবং যে কারণে মানুষ সকল কর্ম-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাই আমরা প্রকাশ করি। এই হচ্ছে মানুষের সেই সব অদৃশ্য অবস্থার অন্যতম যা মানুষকে পুরোপুরি বশীভূত করে ফেলে বা অবশ করে দেয়, জাগ্রত অবস্থার বৈশিষ্ট্য বা চিন্তা ভাবনার শক্তি ক্ষমতা ও সকল প্রকার কর্মক্ষমতা কেড়ে নেয়। প্রকৃতপক্ষে ঘুমন্ত এই অবস্থায় মানুষ জীবনের যাবতীয় স্পন্দন হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অবশ্য, প্রকৃতপক্ষে সর্বদাই তো সে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, যদিও খেয়াল না করার কারণে অনেক সময় আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। এই অসহায় অবস্থা থেকে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই মানুষ মুক্তি

(১) দেখুনঃ আত্তাসবীরুল ফান্নিও ফিল কোরআন পুস্তকের 'ত্বারীকাতুল কোরআন' অধ্যায়।

পেতে পারে এবং তাঁর ইচ্ছাতেই জেগে উঠে সে আবার সুস্থ দেহে ও পূর্ণ শক্তি নিয়ে কর্মরত হয়। তাহলে দেখুন, আল্লাহর হাতে মানুষ কতো অসহায়।

'আর তিনি তোমাদের সেই সব অপকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত যা তোমরা দিনের বেলায় করে থাকো।'

অর্থাৎ ওদের অংগ প্রত্যংগ ভালো বা মন্দ কোনো কিছু গ্রহণ অথবা বর্জন করার ব্যাপারে ওরা যা কিছু করে তা অবশ্যই আল্লাহর জানা রয়েছে ...... জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার কাজ কর্মের জন্যে মানুষ যে নড়াচড়া করে অথবা স্থির থাকে তার অনেকাংশ মানুষ জানে ও বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালা জানতে পারবেন না! অবশ্যই তিনি সবার সকল অবস্থা জানেন, তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছুই নাই, বরং দিনের আগমনে ঘুম থেকে জেগে উঠে অংগ প্রত্যংগকে কাজে লাগিয়ে মানুষ যা-ই করে তার সব কিছুই আল্লাহর জানা রয়েছে।

'তারপর পুনরায় তিনি তোমাদেরকে দিনের বেলায় যিন্দা করেন যাতে করে (তোমাদের জন্যে) নির্ধারিত মেয়াদ পূরণ করে দেয়া যায়।'

অর্থাৎ দিনের বেলায় তোমাদেরকে তিনি তোমাদের ঘুম থেকে এবং সম্বিতহারা অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলেন যাতে করে তোমাদের জীবনের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন। এইভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আল্লার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মানুষ অবশ্যই বেঁচে থাকবে এবং তারপরেই আসবে পূর্ব নির্ধারিত অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু, যার থেকে তাদের পালানোর কোনো উপায় নাই এবং ওই নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত তাদের পরিসমাপ্তি অন্য কখনো নয়।

'তারপর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

অর্থাৎ সামান্য কিছু সময় এই প্রথিবী নামক স্থানে কাটিয়ে সবাইকেই ফিরে যেতে হবে মূল পরিচালকের কাছে।

'আর তখনই তিনি তোমাদেরকে সেই সব বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা (দুনিয়ায়) করতে থেকেছো'।

জীবনের যাবতীয় কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যার ভিত্তিতেই রোজ হাশরে সবার বিচার করা হবে, আর পরম সুবিচারের জন্যে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবে রক্ষিত এই রেকর্ডের কারণে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।

আর এইভাবে সামান্য কয়েকটি কথা সম্বলিত একটি আয়াতে আলোচ্য ওই কেয়ামতের চিত্র ও দৃশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, পেশ করা হয়েছে অবশ্যম্ভাবী সত্যকে, হৃদয়ে সাড়া জাগানোর মতো সেই সত্য তথ্যগুলো যা ছায়ার মতো মানুষকে অনুসরণ করে। সুতরাং এইভাবে গায়েবের বিষয়গুলোকে হৃদয়পটে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কে অংকিত করতে পারে? আর প্রাণবন্ত এসব আয়াতদ্বারা মানুষের অন্তরগুলোকে যদি আলোকিত করা না হতো, তাহলে শুধু কি কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে কোনো লাভ হতো? অতীতে যেমন করে অস্বীকারকারীরা অলৌকিক ক্ষমতা দেখার পরও না-ফরমানী করে আযাবের শিকার হয়েছে, আজকের দাবীদাররাও একই ভাবে কঠিন আযাবে ঘেরাও হয়ে যেতো।

উলুহিয়্যাত বা সার্বভৌমত্ব কথাটির তাৎপর্য অন্য এক ভাবে বর্ণনা করা যায়। এ তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর বান্দাদের ওপর বশীকরণ শক্তি (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগে বান্দাদেরকে তাঁর হুকুম মানানোর ক্ষমতা) এবং সার্বক্ষণিক এমন তত্ত্বাবধান যার থেকে ক্ষণিকের জন্যেও তিনি

অমনোযোগী হন না, আর সেই স্থির নিয়তি যা পূর্বেও সংঘটিত হবে না, পরেও নয়। প্রত্যেকের জন্যে পূর্ব নির্ধারিত সময় আসলেই এ জগত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই নির্ধারিত সময় থেকে পালানোর সাধ্যে কারো নাই। আর সেই মহা বিচার দিনে সংঘটিত হবে শেষ বিচার, যা থেকে কেউ দূরে সরে যেতে পারবে না বা সে বিচারকে কোনোভাবেই ঠেকিয়েও রাখা যাবে না, আর এসব কিছুই হচ্ছে গায়েবের বিষয় যা মানুষকে নিশিদিন ঘিরে রেখেছে এবং যার চিন্তা থেকে কোনো মানুষই মুক্ত নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই তাঁর বান্দার ওপর বল প্রয়োগকারী ....আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর বল প্রয়োগকারী।' (আয়াত ৬১)

অর্থাৎ তিনিই শক্তি প্রয়োগ করে হুকুম মানানোর ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষ এতোই দুর্বল যে তাঁর হুকুম অমান্য করার কোনো ক্ষমতাই সে রাখে না, বা এমন কোনো সাহায্যকারীও সে পাবে না যে তাঁর হুকুম না মানার ব্যাপারে তাকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারবে। কারণ তারা সবাই মনিবের অসহায় গোলাম, যাদের ওপর আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতা বিরাজমান এবং তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য!

আর এই হচ্ছে যবরদস্ত ও সর্বশক্তিমান মুনিবের কাছে বান্দার বিনয়াবনত দাসত্ব। আর এই সত্যটি সম্পর্কেই মানুষকে বলা হয়েছে, যেখানেই সে বসবাস করুন না কেন সে যেন এই সত্যটি অনুধাবন করে এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব না করে, তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেন এ বাস্তবতাকে সে যথাযথভাবে হৃদয়াংগম করে এবং তাকে যে সক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে যেন সে তার উপর অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে– অবশ্যই বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে প্রত্যেককেই কিছু বিশেষ যোগ্যতা দান করা হয়েছে। তাদের প্রকৃতির সকল স্পন্দন আল্লাহর ক্ষমতার কথা ঘোষণা করছে এবং তাদের প্রতি মুহূর্তের নড়াচড়ার মাধ্যমে তাদের অংগ-প্রত্যংগ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করার প্রমাণ পেশ করছে। কেননা ইচ্ছা করলেই তাদের প্রকৃতি এর বিপরীত কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। যদিও তাদের প্রকৃতিগত নড়াচড়া প্রতিমুহূর্তে তাদেরকে বিশেষ এক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমনকি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব ও তৎপরতাও তাদেরকে সেইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনি তোমাদের ওপর খবরদারী করার জন্যে এবং তোমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পাহারাদার(ফেরেশতা) পাঠান।'

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এই আয়াতাংশ তাদের (ফেরেশতাদের) প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই বলেনি। অন্য বহু জায়গায় বলা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে সেইসব ফেরেশতা যারা মানুষের সকল কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করে। এখানে ফেরেশতাদের উল্লেখ দ্বারা এটাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফেরেশতারা মোতায়েন থেকে তাদের সকল কাজের তদারকী করে থাকে। এখানে এই ধারণাও দেয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিই এক মুহূর্তের জন্যেও একাকী থাকে না– তাদের সাথে অবশ্যই কোনো না কোনো ফেরেশতা মোতায়েন থেকে তাদের যাবতীয় কাজ ও তৎপরতার রেকর্ড তৈরী করে এবং তাদের যাবতীয় কাজকর্মের রিপোর্ট সংরক্ষণ করে, তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। এই ধারণাই মানুষের গোটা অস্তিত্বের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে, প্রতি ব্যাপারেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং তার প্রতিটি অংগকে কর্মতৎপর করে দেয়। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশেষে তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে যায় তখন তাকে আমার দূতরা এসে তার এবং এই কর্তব্য পালনে তারা এতোটুকু গাফলতি করে না।'

এখানে এই তাফসীর অন্য আর একভাবে ওই অন্তিম অবস্থার কথা পেশ করেছে। প্রতিটি মানুষই অনেক মানুষের সাথে বহুরকম বন্ধনে আবদ্ধ সামাজিক জীব হওয়ার কারণে কেউই একাকী বসবাস করতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের আগমন অপেক্ষায় তাদেরকে ছেড়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে নির্ধারিত সময় সম্পর্কে কেউই অবগত নয়, ওই নির্ধারিত সময়ও একদিকে গায়েবই বটে, কারণ ওই নির্ধারিত সময় কখন আসবে তাও কেউ জানে না এবং কারো কাছে সে গোপনীয়তা প্রকাশ করাও হয়নি। একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানেই রয়েছে মৃত্যুর দিন ক্ষণের খবর, যার পূর্বে বা পরে কারো মৃত্যু আসবে না। প্রত্যেক মানুষকে ওই সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, যখনই সে সময় এসে যাবে তখনই সবাইকে মৃত্যুর দুয়ারে হাযির হয়ে যেতে হবে এবং মৃত্যুদূত আজরাঈল (আ.) আল্লাহর অতি বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে প্রাণ কেড়ে নেয়ার কাজ আনজাম দিয়ে থাকেন। এব্যাপারে তার কোনো ভুল ভ্রান্তি হয় না বা কোনো প্রকার অলসতাও তাঁকে স্পর্শ করে না। ফেরেশতাকুলের মধ্যে তিনি বার্তাবাহক এক দূত বটে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময়ে হাযির হয়ে তিনি তাঁর গুরু দায়িত্ব পালন করেন– যখন সে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে এবং তার মৃত্যু সম্পর্কে থাকে পূর্ণ অজ্ঞ। এমনই কর্মব্যস্ত মুহূর্তে এই মৃত্যুদূত তার জীবনাবসানের বার্তা নিয়ে হাযির হয়ে যায়। এহেন অসহায় ও করুণ অবস্থার চেতনা বা কল্পনা যখন মানুষের মধ্যে জাগে তখন তার মানব প্রকৃতি প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তখনই সে অনুভব করে অজানা অচেনা নিয়তি তার দুয়ারে হাযির এবং তখনই প্রতি মুহূর্তে সে অনুভব করে যে তার জান কবয করে নেয়া হবে, আর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

'তারপর তাদের তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের আসল মালিকের কাছে।'

আল্লাহ তায়ালাই তাদের আসল ও একমাত্র, অন্য যে সব দেব-দেবতা বা জীবন্ত কাউকে কাফেররা নিজেদের মাওলা বা মুনিব মনে করে তাদের কোনোই ক্ষমতা নাই। সকল সৃষ্টির আসল মালিক তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তিনি যিনি তাদেরকে পয়দা করেছেন এবং জীবনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তার তদারকীতে কোনো প্রকার গাফলতী বা ভুল ভ্রান্তি নেই। তারপর সেই সময়েই তিনি যখন তিনি চাইবেন তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন যাতে করে তাঁর হুকুমে তাদের সঠিক বিচার ফয়সালা করা হয়, এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো উপায় নাই।

'শোনো, বিচার করার অধিকার ও হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র তিনি এবং তিনিই সর্বাধিক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'

অতএব, এটা জানা গেলো যে, তিনিই একমাত্র বিচার করবেন এবং একমাত্র তিনিই হিসাব নেবেন। তাঁর বিচার কার্য পরিচালনা করায় কোনো প্রকার বিলম্ব হবে না এবং প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারেও তিনি কিছুমাত্র সময় নেবেন না। আর দ্রুতগতিতে হিসাব নেয়ার কথা ঘোষণা করায় মানুষের মনে একথা জাগে যে, কোনো বিচারই পরিত্যক্ত হবে না।

একজন মোমেনের চিন্তা চেতনা

একজন মুসলমান, যখন হায়াত-মওত ও পুনরুত্থানের পর হিসাব-নিকাশ হবে– এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে চিন্তা করে তখন পৃথিবীর বুকে বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই যে একমাত্র হুকুম দান ও বিচার ফয়সালার মালিক সে বিষয়ে তার মনে আর কোনো সংশয়ই থাকে না।

আখেরাতে হিসাব নিকাশ গ্রহণ, প্রতিদান দেয়া ও ফয়সালা করা এসব কিছু দুনিয়ার বুকে মানুষ যে আমল করবে, তারই ভিত্তিতে হবে। মানুষ, তার স্বাধীন বুঝ মতো যে সব কাজ-কর্ম

দুনিয়ার বুকে করে তার হিসাব ততোক্ষণ পর্যন্ত নেয়া হবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত কানুনের মাধ্যমে হালাল-কোন্‌টি এবং হারাম কি কি জিনিস সে বিষয়ে স্পষ্ট করে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া না হয়। আরও জানা দরকার যে, কেয়ামতের দিন শুধু মৌলিক বিষয়ের জন্যে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর এটাও এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়া ও আখেরাতের শাসন কাজও একমাত্র মৌলিক বিষয়াদির ওপরই সংঘটিত হবে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, মানুষ যখন দুনিয়ায় আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান অনুযায়ী বিচার আচার করে, তখন আখেরাতে তাদের বিচার হবে কার বিধান মতে? তারা দুনিয়ায় যেমন করে মানুষের মনগড়া আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করতো, কেয়ামতের দিন কি সেই অনুযায়ী তাদের বিচার ফয়সালা করা হবে বলে তারা মনে করে? না তাদের বিচার ফয়সালা হবে সেই আসমানী বিধান মতে যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সবার জন্যে রচনা করেছেন?

এটা অবশ্যই সত্য কথা বলে মানুষ বিশ্বাস করবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ বিধান অনুযায়ীই সবার বিচার ফয়সালা করবেন– কোনো মানুষের মন-গড়া আইন অনুযায়ী নয়। সুতরাং এ কথা যে কোনো বিবেক সম্পন্ন মানুষ বুঝবে যে, ধর্মীয় কার্যকলাপ বলে তারা যা মনে করে এবং মনে করে সেগুলো ধর্মের প্রতীক; আর মনে করে শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক এবাদাতই আল্লাহর বিধান মতো করা জরুরী। তারা বুঝেনা যে, তাদের এই প্রত্যেক এবাদত তথনই আল্লাহর কাছে কবুল হবে যখন তাদের জীবন পরিচালনা, লেনদেন সম্পর্কিত আইন কানুন, বিচার ফায়সালা তথা সার্বিক জীবন আল্লাহর আইন কানুন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যেহেতু এই ব্যাপারেই মানুষের মধ্যে দুর্বলতা দেখা যায়। এজন্যে এই বাস্তব লেনদেন ও জীবন পরিচালনা সম্পর্কেই কেয়ামতের দিন প্রথমত ও মুখ্যত আল্লাহর দরবারে হিসাব গ্রহণ করা হবে। আসলে, এটাই সত্য কথা যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তায়ালাই যে সর্বশক্তিমান মনিব, প্রতিপালক ও আইনদাতা একথা তারা মানতোনা, বরং তাঁকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে তারা তাদের পালনকর্তা, মুনিব ও আইন-দাতা মনে করতো। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা একথা অস্বীকার করার কারণেই প্রথমত তাদের হিসাব নেয়া হবে। অতপর আনুষ্ঠানিক এবাদাতসমূহ ও আনুগত্য প্রদর্শনের প্রতীকী কাজগুলোতে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার মনে করার কারণে হিসাব নেয়া হবে। এ কারণেও তাদের হিসাব নেয়া হবে যে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আইন কানুন মানার ব্যাপারে আল্লাহর আইন মানার পরিবর্তে মানুষের তৈরী বিধান মানা বেশী পছন্দ করতো। এমনকি দৈনন্দিন জীবনে লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের বিধানেও মানব-রচিত বিধানকে তারা অগ্রাধিকার দিতো। কাজেই এসব বিষয়েও তাদের হিসাব নেয়া হবে। তবে, একথাও সত্য যে, মহান আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, তাঁর ক্ষমার দরজা অতি প্রশস্ত। একমাত্র শেরকের গুনাহ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন (বলে তিনি ওয়াদা করেছেন)।

সর্বপ্রথম আল্লাহকে অনুভব করা

এরপর তাদেরকে তাদের সেই স্বভাব প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুপ্রাণিত করছেন যা সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনিবের অস্তিত্বকে অনুভব করতে সাহায্য করে কঠিন ও দুঃসময়ে তাদের প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ও যে কোনো ভয় ভীতি এবং দুঃখের মধ্যে তাদের জন্যে এই সঠিক প্রকৃতি ধারণ করতে অনুপ্রাণিত করে। এমতাবস্থায় আল্লাহর সেই বান্দা সচ্ছলতা ও খুশীর সময়ে কেমন করে তাঁর

বিরোধিতা করতে পারে! দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত অথচ দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা নিরন্তন সে পর্যবেক্ষণ করছে, অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়ে জীবন যাপন করলেও জীবনকে স্পন্দন দানকারী, অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী অকাট্য ও সুস্পষ্ট যে সব নিদর্শন তার সামনে রয়েছে সেগুলো কি আল্লাহর ক্ষমতা তাদের বুঝবার জন্যে যথেষ্ট নয়।

দুনিয়ায় যে সব দুঃখ দৈন্য ও সংকট সমস্যা মানুষকে স্পর্শ করে তা এতো দীর্ঘস্থায়ী নয় যে, একেবারে রোজ হাশর বা হিসাব দিবস পর্যন্ত তাকে গ্রাস করে রাখবে। যখন স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকারের মধ্যে মানুষ কোনো বিপদে পড়ে, তখন তারা ওই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে একমাত্র আল্লাহকেই কাতরভাবে ডাকে, আর ওই সময় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে উদ্ধার করে না এবং করতে পারে না। এ সকল অবস্থাই মানুষের সামনে রয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও সুদিনে ও খুশীর সময় দেখা যায় তারা অন্য কাউকে মনে করতে থাকে এবং এইভাবে পরিষ্কার শেরকের অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে চিন্তা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন,

'বলো, যখন তোমরা বিপদে পড়ো স্থলভুমে বা সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে বিপদে পড়ো। যখন কঠিন দুঃসময়ে তোমরা কাতর কণ্ঠে এবং নীরবে সাহায্যের জন্যে ডাক। বলো, তখন কে এই বিপদ থেকে তোমাদের রক্ষা করেন, কাকে তোমরা তখন বলো, হে মালিক আমাদের যদি বাচিয়ে দাও তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'

এ অভিজ্ঞতা সেই ব্যক্তিই লাভ করতে পারে যে বাস্তবে কোনো সংকটে পড়ে অথবা কঠিন দুঃসময়ে দুঃখের মধ্যে পতিত ব্যক্তিরাই আল্লাহর এ সাহায্য প্রত্যক্ষ করে। পৃথিবীর স্থলভাগ এবং জলভাগের মধ্যে বিপদের ঘনঘটা প্রচুর, আর এসব বিপদ যে একমাত্র রাতের বেলাতেই আসে তা জরুরী নয়। অহংকার, সন্দেহ বা বিশৃংখলাও এক প্রকার অন্ধকার, বিপদাপদ এক প্রকার অন্ধকার, স্থলভাগে ও গহীন সমুদ্রের বুকে অজানা অদেখা বস্তু, যা আসবে বলে মানুষ অপেক্ষা করতে থাকে তাও এক প্রকার অন্ধকার পর্দা, যার অন্তরালে কি আছে– না আছে মানুষ সে বিষয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। আর যখনই স্থলপাণে বা সাগরের অজানা গহীনে মানুষ ভ্রমণ করে, তখন সেটাও একপ্রকার অন্ধকার হিসাবে তার সামনে প্রতিভাত হয় এবং সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে তাদের অন্তরের মধ্যে তারা আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পায়। কাজেই তাঁকেই তখন তারা কাকুতি মিনতি করে ডাকে অথবা নীরবে তাঁর কাছে মোনাজাত করতে থাকে। এসময় মানব প্রকৃতির মূল সত্ত্বা জেগে ওঠে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য থেকে তার ঘুমন্ত মানবতার স্বচ্ছ চেহারা বেরিয়ে আসে, আর তখন গোপন ও রহস্যাবৃত সত্য তার সামনে খোলসমুক্ত হয়ে গভীর উজ্জ্বলতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে– আর সে সত্য হচ্ছে এক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাস্তবতা এবং তখন আল্লাহর দিকে সবার মন ঝুঁকে পড়ে, যার ক্ষমতায় ভাগ বসানোর মতো কেউই নাই। এসময় শেরকের দুর্বলতা প্রকাশিত হয়ে যায় এবং স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার মতো কেউ কোথাও নাই; আর তখনই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিরা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে,

'(হে আল্লাহ) যদি আমাদেরকে (এই কঠিন বিপদ থেকে) নাজাত দেন, তাহলে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ বান্দাদের দলে শামল হয়ে যাবো।'

অপরদিকে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে ডেকে, সত্য সঠিক বিষয়টি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলছেন,

'বলো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ওই কঠিন বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে উদ্ধার করবেন তোমাদেরকে। (অতএব, তিনি ছাড়া ডাকে সাড়া দিতে পারে অথবা বিপদ দূর করতে পারে এমন কেউই নেই।)

দলাদলি আল্লাহর গযব

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদের অদ্ভুত রকমের অন্যায় কাজটির উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন,

'এরপরও তোমরা শেরক করছো!'

আর এখানে এ সূরাটি তাদেরকে ওই জঘন্য অন্যায় কাজের অপেক্ষমাণ আল্লাহর শাস্তির কথা জানাচ্ছে যা একবার আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে পাকড়াও করবে! এটা একবার এসেই যে শেষ হয়ে যাবে তা নয় এবং তারা যে ধারণা করে যে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে একদিন মুক্ত হয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করবে তাও নয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও তিনি তোমাদেরকে ওপর থেকে ....যাতে করে তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। (আয়াত ৬৫)

এখানে ওপর থেকে ভীষণ তাপজনিত আযাব এবং নীচে থেকে বন্যা-আকারের আযাবের যে ধারণা দেয়া হচ্ছে, তাতে তারা অবশ্যই বুঝবে যে, এসব কষ্টকর শাস্তি ডান অথবা বাম দিক থেকে আসা যে কোনো শাস্তি থেকে অনেক বেশী কষ্টকর হবে। যে আযাব ওপর থেকে বা নীচে থেকে আসবে তা হবে অত্যন্ত কঠিন এবং এতো ভীষণ যে গোটা মানব দেহকে তা প্রকম্পিত করে তুলবে। সে আযাব কেউ ঠেকাতে পারে না, বা কেউ তা সহ্যও করতে পারে না! আযাবের যে হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা এখানে পেশ করা হয়েছে তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে একথা সাফ সাফ করে জানিয়ে দেয়া যে, যে কোনো সময় এবং যে কোনোভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আযাব দিতে পারেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার আযাব দিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। একথার সাথে আর একটি কথাও এখানে যোগ করা হয়েছে যে, এসব কঠিন আযাব ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে আসতে থাকবে এবং তা এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ হবে না, বরং দিন রাত ধরে সে আযাব হবে তাদের সংগের সাথী। (বলা হচ্ছে),

'বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তিনি তোমাদেরকে পারস্পরিক দ্বন্দে লিপ্ত করে দেবেন।'

মতের এই বিভিন্নতা ও দলাদলি– এটা এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী আযাব। তাদের নিজেদের হাতেই তারা এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে। মতভেদের এই তিক্ত শরবত তারা ঢোক ঢোক গিলতে থাকবে। যখন তাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করে দেয়া হবে, কেউ কাউকে ভালোবাসবেনা এবং ঝগড়া বিবাদ করে এক দল থেকে আর এক দল যে পৃথক হয়ে দূরে চলে যাবে তাও যাবে না। বরং একই স্থানে পাশাপাশি থেকে সর্বদা নানা প্রকার ফাসাদ ও কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকবে। আর এইভাবেই এক দল দ্বারা অপর এক দল সদা সর্বদা কষ্ট পেতে থাকবে এবং এক দল অন্য দলকে বিপদগ্রস্ত করতে থাকবে।

মানবেতিহাসে দেখা যায় বহু সময়ে বহু আযাব মানব জাতির ওপর নেমে এসেছে। এসব আযাব তখনই এসেছে যখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে এবং নিজেদেরকে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে চালিত করে দিয়েছে, শক্তি-ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে, হঠকারিতা করে সঠিক পথ এড়িয়ে চলেছে, নানা প্রকার দুর্বলতার শিকার হয়েছে এবং নানা প্রকার দোষ-ত্রুটিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এসব অবস্থায় প্রবৃত্তির তাড়নে যখন মানুষ চলেছে, ভাবের আবেগের কাছে যখন মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে, যৌন ক্ষুধার শিকার হয়ে যখন মানুষ যথেচ্ছাচারিতা করেছে, হঠকারিতা করে চলেছে, যুক্তিকে উপেক্ষা করেছে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খেয়েছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে নানা প্রকার দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটি করেছে, তখনই এসেছে এই সব ভীষণ আযাব। আর যতোবারই মানুষ শৃংখলা ভংগ করে মনগড়া পন্থা অবলম্বন করেছে এবং জীবনের নানা

বিষয়ের জন্যে নিজেরাই আইন তৈরি করে নিয়েছে, নিজেদের মূল্যবোধ নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে, এক শ্রেণীর মানুষ অন্যদেরকে দাসত্ব শৃংখলায় আবদ্ধ করেছে এবং আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সোপর্দ করার পরিবর্তে কোনো সংগঠন কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা, সংস্কার বা মানব রচিত পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ কোনো আইনের অনুগত হয়েছে। তখনই এসেছে এসব ভয়ানক আযাব। যালেম লোকেরা কখনও বা নিজেরা আইন তৈরী করে জোর করে অপরকে সে আইন মানতে বাধ্য করেছে, কেউ মানতে না চাইলে তাদেরকে নির্যাতন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় এসেছে বিদ্রোহ এবং এই কারণেই তারা পরস্পর আক্রমণের মাধ্যমে ডেকে এনেছে অশান্তি ও খুন খারাবী, আর ঘৃণা করেছে একে অপরকে। এই হচ্ছে সেই আযাব যা মানুষ মানুষের হাতে বরাবর পেতে থেকেছে। এসব মানুষ একই পাল্লায় সকল জীবনের মূল্যায়ন না করায় এসব জটিলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক যুদ্ধ বিগ্রহের রূপ নিয়েছে। আবার এমনও হয়েছে, কোনো এক দল মানুষ কোনো সজীব বা নির্জীব কোনো কিছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে এবং তাদের পূর্ণ দাসত্বে নিজেদেরকে এমনভাবে আবদ্ধ করে ফেলেছে যে তাদের প্রতি নম্র হতে গিয়ে নিজেদের মর্যাদা পর্যন্ত ভুলে গেছে এবং যখন তাদের কাছে বিনয় প্রকাশ করেছে তখন নিজেদেরকে যে কতো ছোট করে ফেলছে তাও অনুভব করতে পারেনি।

নিশ্চয় পৃথিবীতে সব থেকে বড় বিপদ হচ্ছে এমন সব লোকের মধ্য বেচে থাকা যারা তাদের নিজেদেরকে বা কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো শ্রেণীর মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করে। এরপর তাদেরকে বাস্তব ও সার্বিক আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী মনে করে। এই ফেতনা জনগণকে বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত করে ফেলে। কারণ প্রকাশ্যে তারা মানবতা দেখাতে গিয়ে নিজেদেরকে এক জাতি বা এক মানব গোষ্ঠী বলে প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এক দল আর এক দলকে গোলাম বানিয়ে রাখতে চায় এবং তারা কেউ কেউ ক্ষমতায় জেঁকে বসে থাকে এবং সে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার জন্যে যে কোনো হীন পন্থা গ্রহণ করতেও কসুর করে না। এর প্রধান কারণই হচ্ছে, এরা আল্লাহর প্রেরিত বিধানকে থোড়াই কেয়ার করে। বরং এদের কারো কারো মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ এবং অপরের জন্যে পতন ও অকল্যাণ কামনার মনোভাব বিরাজ করে। যারা ক্ষমতাসীনদের পতনের অপেক্ষায় থাকে এবং পরস্পর অকল্যাণ কামনা করে, তারা উভয়ে এসব মন্দ কামনা- বাসনার কুফল ভোগ করে এবং এর ফলে না তারা একে অপর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, না পৃথক পৃথকভাবে থেকে নিজেদের সুখশান্তি নিয়ে নিজের বসবাস করতে পারে। আর না তারা পরস্পর মিলে মিশে বাস করতে পারে।

গোটা পৃথিবীর জনগণ আজ ধীর অথচ দীর্ঘস্থায়ী এই কঠিন অনৈক্য তথা অশান্তির আযাবে আবদ্ধ হয়ে থেকে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

আজ মুসলমানদের দশাও এর থেকে কোনো অংশে উন্নত নয়।

অনৈক্য ও মতভেদের বিষাক্ত বীজ মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকেও দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলেছে। তাই, আজ আমাদেরকে জাহেলিয়াতের ওই ভাবধারা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে সুন্দর, সুসংবদ্ধ এবং পরস্পর কল্যাণকামী এক জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। জাহেলিয়াতের সকল প্রকার নিয়ম নীতি, তাদের বিচার ব্যবস্থা এবং তাদের সংগঠন পদ্ধতি, যা শরীয়তের নিয়ম নীতির সাথে সংঘর্ষশীল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না ও একমাত্র

তাঁকেই আইনদাতা ও শাসনকর্তা মানতে চায় না, সে সব কিছু থেকে এবং সে সব মানুষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বতন্ত্র এক জাতি হিসাবে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আজকে সময়ের দাবী হচ্ছে, চতুর্দিকে জাহেলিয়াতের যে সয়লাব বয়ে যাচ্ছে, তার নাগালের বাইরে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে হবে এমনকি, যারা ওই সয়লাবের ভেতরে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ওই জাহেলিয়াতের মধ্যেই থাকা পছন্দ করে নিয়েছে, তাদের নিয়ম কানুনকে অগ্রাধিকার দেয়া শুরু করে দিয়েছে, তাদের আইন কানুন, তাদের বিচার ব্যবস্থা, তাদের মূল্যবোধ এবং তাদের জীবন যাপন প্রণালীকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। সুতরাং তাদের থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত করে নিতে হবে।

সারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির যে অবস্থা আজ চলছে তাতে এই আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নাই এরশাদ হচ্ছে,

'অথবা তোমাদেরকে তিনি দলে দলে বিভক্ত হওয়ার বিপদে আচ্ছন্ন করে ফেলবেন এবং (এর ফলেই) তিনি স্বাদ গ্রহণ করাবেন এক দলের দৌরাত্ম্য দ্বারা অপর দলকে।'

তবে বিশ্বাসে, চেতনায় এবং জীবন ব্যবস্থা অনুসরণে সমগ্র মুসলিম জাতি তাদের মধ্যে বিরাজমান জাহেলী ভাবধারাকে যদি পুরোপুরি বর্জন করতে পারে, তাহলেই মহান আল্লাহ তাদের জন্যে 'দারুল ইসলাম' কায়েম করার সুযোগ করে দেবেন। আর তখনই এই দারুল ইসলামকে তারা মযবুতভাবে নিজেদের আবাসভূমি বানিয়ে সেখানে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা চালু করতে পারবে এবং তখনই তারা উম্মতে মুসলিমাহ্ হিসাবে পৃথিবীর বুকে গৌরব-মর্যাদার আসনে বসতে পারবে এবং আশপাশের অন্যান্য সেই সব জাতি ও জনপদকে তাদের আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত করতে পারবে, যারা ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে জাহেলিয়াতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করা সত্তেও এ জীবন ব্যবস্থা কায়েম না থাকার কারণে এর আকীদা ও আইন কানুনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কায়েম থাকার এই অবস্থা যখন আসবে, তখনই তারা আল্লাহর কাছে প্রতিপক্ষ দুশমন জাতির ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্যে আবেদন জানানোর যোগ্য হবে, আর তখনই মহা দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে বিজয় দান করবেন। অবশ্যই তিনি সর্বোত্তম বিজয় দানকারী। এইভাবে হঠকারী জাহেলদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পারা পর্যন্ত এবং তাদের থেকে নিজেদের পার্থক্য না দেখানো পর্যন্ত আল্লাহর আযাবের এই ধমকি অবশ্যই বহাল থাকবে। অর্থাৎ মুসলিম জাতির গোটা সমাজের নানা দল উপদলের মধ্যে একটি দল অবশ্যই এমন থাকতে হবে, যারা পৃথিবীর বুকে নিজেদের স্বভাব চরিত্র, লেনদেন ও সকল বাস্তব কাজের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ইসলামী আদর্শকে তুলে ধরবে, নিজেদের মধ্যেও এ আদর্শকে কায়েম করবে এবং আশপাশের জাতিসমূহের কাছে তাদের বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের বাস্তবতাকে জীবন্ত ও সুন্দরতম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেশ করবে। পরিপূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে এ কর্তব্য পালন না করা পর্যন্ত অনৈক্য রূপ আল্লাহর কঠিন আযাব চলতেই থাকবে এবং তার ফলে স্থায়ীভাবে মানুষ এই শাস্তির মধ্যে কষ্ট পেতে থাকবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্যও কিছুতেই আসবে না।

অন্যায়কারী ও ইসলাম বিরোধীদের থেকে নিজেদেরকে পৃথক করা এবং তাদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে ইসলামী জনতাকে অবশ্যই বেশ কিছু দুঃখ দৈন্য ও কষ্টের

সম্মুখীন হতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হবে এমন কিছু বিষয় বা বস্তু ত্যাগ করতে হবে যা তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তবে এটাও সত্য যে, এসব ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃখ কষ্ট, বিভেদ ও বিভিন্নতাজনিত বিপদ সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্য না করার ফলে আগত বিপদ থেকে মোটেই কঠিন নয়। বিভেদ বিচ্ছিন্নতার এই ব্যধি যেমন করে ইসলামী সমাজকে ভিতর থেকে ঘুণে ধরার মতো খেয়ে ফেলে, তেমনি করে অপরাপর জনগোষ্ঠী ও জাতির কাছেও এ কুৎসিত স্বভাব মুসলমানদেরকে প্রভাবহীন করে দেয়।

পূর্বে আগত রসূলরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানের যে মহান কাজ করেছেন সে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের মনে নিশ্চিত এ বিশ্বাস জন্মে যে, যদি আমরাও ঐক্যবদ্ধভাবে এবং সঠিকভাবে ইসলামী দাওয়াতী কাজ করি, তাহলে অতীতের মতো আজও আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে, রসূলরা ও মোমেনদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় দানের ওয়াদা ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাতিল ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ও কর্মপ্রণালী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ করে তোলার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা না চালানো হয়েছে। এই ভাবেই মানব নির্মিত জীবন ব্যবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলামী দাওয়াত দানের পদ্ধতি চিরদিন এক ও অভিন্ন থেকেছে এবং সেই একই পদ্ধতিতে আজও কাজ করতে হবে। আজকে আমরা যদি বাতিলের ওপর বিজয়ী হতে চাই এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করতে চাই তাহলে রসূল (স.)-এর যামানায়, তিনি যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন আমাদেরকেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যেহেতু সকল নবী রসূল এই একই পন্থা অবলম্বন করে গেছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'দেখো কেমন করে আমি, (আমার) আয়াতগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি যাতে করে ওরা সঠিকভাবে সত্য ব্যবসার যথার্থতা বুঝতে পারে।'

অতপর আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্য চাই, যেন তিনি আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ওই আয়াতসমূহের আলোকে তারা সঠিক বুঝ পেয়েছে।

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

৬৬. তোমার জাতির লোকেরা এ (কোরআন)কে অস্বীকার করেছে, অথচ তাই একমাত্র সত্য; তুমি (তাদের এটুকুই) বলে দাও যে, আমি তোমাদের ওপর কর্মবিধায়ক নই। ৬৭. প্রতিটি বার্তার (প্রমাণের) জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ মজুদ রয়েছে এবং তোমরা অচিরেই (তা) জানতে পারবে। ৬৮. তুমি যখন এমন সব লোককে দেখতে পাও যারা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে হাসি-বিদ্রূপ করছে, তখন তুমি তাদের কাছ থেকে সরে এসো, যতোক্ষণ না তারা অন্য কথার দিকে মনোনিবেশ করে; যদি কখনো শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে (ওখানে বসিয়ে) রাখে, তাহলে মনে পড়ার পর তুমি যালেম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসে থেকো না। ৬৯. তাদের (এসব) কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে, তাদের ওপর হিসাবের কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তবে উপদেশ তো দিয়েই যেতে হবে, হতে পারে তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে। ৭০. সেসব লোকদের তুমি (আল্লাহর বিচারের জন্যে) ছেড়ে দাও, যারা তাদের দ্বীনকে নিছক খেল-তামাশায় পরিণত করে রেখেছে এবং এ পার্থিব জীবন যাদের প্রতারণার জালে আটকে রেখেছে, তুমি এ (কোরআন) দিয়ে (তাদের আমার কথা) স্মরণ করাতে থাকো, যাতে করে কেউ নিজের অর্জিত কর্মকান্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে না পারে, (মহাবিচারের দিন) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো সাহায্যকারী বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবে না। সে যদি নিজের সব কিছু দিয়েও দেয়, তবু তার কাছ থেকে (সেদিন তা) গ্রহণ করা হবে না; এরাই হচ্ছে সে (হতভাগ্য) মানুষ, যাদের নিজেদের অর্জিত গুনাহের কারণে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হবে, আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করার কারণে তাদের জন্যে (আরো থাকবে) ফুটন্ত পানি ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর

আয়াত-৬৬-৭০

ওপরের আয়াতগুলোতে পেশ করা হয়েছে নবী (স.)-এর জাতির সেই কাফেরদের কথা, যারা তাঁর আনীত সত্যের বার্তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে উড়িয়ে দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সত্য যখন সমাগত হলো তখন তা প্রতিষ্ঠিত হতেই এলো। এর ফলে বিচ্ছেদ ঘটে গেলো তাঁর এবং তাঁর জাতির মধ্যে, সত্যের বীজ যমীনে উপ্ত হলো, নবী (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হলো ওদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে। তাঁকে আরও নির্দেশ দেয়া হলো একথার ঘোষণা দেয়ার জন্যে যে, তিনি তাদের কর্ম নির্বাহক বা তাদের ওপর দারোগা হিসাবে নিয়োজিত হয়ে আসেননি। তাঁকে আরও বলা হলো যেন তাদেরকে তিনি সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে সুযোগ করে দেন যা অবশ্যই একদিন আসবে। তাঁকে আরও হুকুম দেয়া হলো যেন তিনি তাদের থেকে তখনই মুখ ফিরিয়ে নেন যখন তারা দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে নানা প্রকার বাজে মন্তব্য করতে থাকে এবং ঠাট্টা-মস্কারি বা উপহাস বিদ্রূপ করতে থাকে ও দ্বীন ইসলামের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করতে থাকে, তখন অবশ্যই যেন তিনি তাদের সাথে বসে না থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদেরকে সতর্ক করা ও উপদেশ দানের কাজ যেন বন্ধ না করেন, এ পর্যায়ে সে বিষয়েও তাঁকে হেদায়াত দান করা হলো। তাঁকে জানানো হলো যে, তারা মানুক বা না মানুক আল্লাহর বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতেই হবে। তারপরও যদি তারা ভুল পথ পরিত্যাগ না করে এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে সরে না আসে; সে অবস্থাতে তারা রসূল (স.)-এর নিজের জাতি হওয়া সত্তেও তাদেরকে এর মন্দ পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অপর দিকে, একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সত্যাশ্রয়ী ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অধিকারী মানুষ এবং ওইসব যুক্তি-বিরোধী হঠকারী লোকদের দূরত্ব ও পার্থক্য অনিবার্য, যেহেতু বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে তারা পৃথক পৃথক জাতি। সুতরাং, ইসলামে কোনো জাতীয়তাবাদ নাই, শ্রেণীবাদ বা গোত্রবাদ অথবা আপনজন তোষণ নীতিও ইসলামে নাই। অবশ্যই ইসলাম এমন এক পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাস্তব জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে অথবা সম্পর্ক কেটে দেয় আদর্শের নৈকট্যের কারণে বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং আদর্শের পার্থক্যের কারণে বন্ধন কেটে যায়। ইসলাম হচ্ছে সেই আকীদা বিশ্বাসের নাম, যা মানুষকে আবদ্ধ করে এক ঐক্যবদ্ধ জামায়াতে অথবা (এর বিভিন্নতায়) তাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর, কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে যখন দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো পাওয়া যায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কও গড়ে ওঠে। আর আদর্শের এই বন্ধন রশি যখন কেটে যায়, তখন অন্যান্য সকল প্রকার সম্পর্কও কেটে যায় এবং সকল প্রকার বন্ধনও ছিন্ন হয়ে যায়।

ওপরে আলোচিত আয়াতগুলোর এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সার। দেখুন পরবর্তীতে কী চমৎকারভাবে আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন।

'আর তোমার জাতি ....তা জানতে পারবে।' (আয়াত ৬৬)

এখানে দেখা যায়, শুধু রসূল (স.)-কে এককভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে এ কেতাব দেয়া হয়েছে এবং তাঁর পরবর্তীতে মোমেনদেরকেও দেয়া হয়েছে এই একই কেতাব। এ কেতাবের সত্যতা এতোই অকাট্য যা অন্তরকে প্রশান্ত করে দেয়। অবশ্যই এ সত্য হক আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, যদিও তাঁর জাতি এ কেতাবকে অপপ্রচার মিথ্যা বলে দাবী করেছে এবং এ কেতাবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তারা ভীষণভাবে জিদ ধরে রয়েছে। তাহলে এহেন আচরণে তাদের প্রতি কী ফয়সালা আসা উচিত? এ সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা তো একমাত্র আল্লাহ

তায়ালাই দিতে পারেন, আর তিনিই স্থিরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ কেতাব অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে সত্য। এ ব্যাপারে তাঁর জাতির মিথ্যা সাব্যস্ত করার বা তাদের এ কেতাবকে অস্বীকার করার কোনোই মূল্য নেই বা তারা কি বললো না বললো জাগ্রত বিবেকওয়ালা ব্যক্তিদের কাছে তার কোনোই গুরুত্ব নাই।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.)-কে সম্পূর্ণভাবে তাঁর জাতি থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং সকল প্রকার সহযোগিতার হাতকে তাদের থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে দৃঢ়তার সাথে হুকুম করছেন। আর তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করারও নির্দেশ দিচ্ছেন, জানাচ্ছেন যে, তাঁর দায়িত্ব শুধু তাদেরকে জানিয়ে দেয়। এছাড়া তাদের ওপর তিনি কোনো কর্তৃত্বের অধিকারী নন। আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে আরও জানাচ্ছেন যে, তিনি তাদের ওপর কোনো পাহারাদার নিযুক্ত হয়ে আসেননি বা আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার পর তাদের দারোগাগিরি করাও তাঁর কাজ নয়, বা তাদের অন্তরগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত না করতে পারায় তাঁকে কোনোভাবে দায়ীও করা হবে না। কারণ এটা রসূলের দায়িত্ব নয়। তাঁর কাছে আগত সত্যকে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার পর তাঁর ও ওদের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্কের অবসান হয়েছে। তাদের ও তাদের পরিণতির কথা প্রকাশ করার পর তিনি দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেছেন। অতপর জানানো হচ্ছে, প্রত্যেকটি ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। সময় পর্যন্ত তারা অবশ্যই টিকে থাকবে, আর ওই সময় যখন পূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই তারা জানতে পারবে তাদের ভাগ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'প্রত্যেকটি ঘোষণার জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা (সকল অবস্থা) জানতে পারবে।'

এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলো দ্বারা আসন্ন কঠিন শাস্তির যে হুমকি দেয়া হয়েছে তাতে অপরাধীদের অন্তর কেঁপে ওই স্বাভাবিক .....।

নিশ্চয়, একমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসতে পারে, আর যখনই বাতিল ব্যবস্থা খতম হওয়ার নিশ্চয়তা আসে, তখন মোমেনদের অন্তরে অবশ্যই খুশী লাগে। মিথ্যারোপকারীদেরকে যে কোনো সময়ে পাকড়াও করা হবে এটা পূর্ব থেকে নির্ধারিত রয়েছে, এটাও সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক ঘোষণার বাস্তবায়ন একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে হবেই হবে এবং বর্তমানের সকল মানুষকে এজীবন শেষে আল্লাহর দরবারে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে তাদের আসল ও চিরস্থায়ী মূল জীবনে।

মক্কী ও মাদানী জীবনে দাওয়াতের ধরণ

একবার ভেবে দেখুন, কোরায়শ জাতির মিথ্যারোপের মোকাবেলায় ইসলামের দিকে দাওয়াতের গুরুত্ব কতো বেশী ছিলো! আজও কি অনুরূপভাবে দ্বীন ইসলামের যথার্থতাকে মিথ্যা বানানোর প্রচেষ্টা কালে ইসলামী দাওয়াত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নয়! যারা এ কাজ করবে তাদের নিজ গোত্রও যদি হঠকারী হয়, তাহলে তাদেরকেও নাফরমান পরিবার থেকেও দূরে থাকতে হবে, সইতে হবে নানা প্রকার দুখ কষ্ট ও কঠোরতা এবং অত্যাচার। এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই একমাত্র স্থায়ী শান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসবে বলে আল কোরআন জানাচ্ছে এবং মুসলমানদের মনে এর জন্যে প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি করছে।

তারপর যখন এই সত্য বাণী পৌঁছে দেয়া তাদের কাছে অপছন্দনীয় হলো এবং সত্য দ্বীনকে সরাসরি অস্বীকার ও উপেক্ষা করা হলো, তখন নবী (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তিনি তাদের সাথে কোনো ওঠা, বসা না করেন, এমন কি যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অশ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করবে এবং নানা প্রকার অশ্লীল মন্তব্য করবে, তখন তাদের কাছে দ্বীনের

দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্যেও যেন তাদের সাথে কোনো বৈঠকে না বসা হয়। কারণ ওই দ্বীনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা এবং ভয় না থাকলে তাদের কাছে এ মূল্যবান দাওয়াত পৌঁছানোতে আসলে কোনোই ফায়দা নাই। তারা ত দ্বীনকে কথায় ও কাজে ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে– এই জন্যেই তাদের সাথে কোনো বৈঠকেই বসা উচিত নয়। তারা যে সব জাহেলী ধ্যান ধারণার মধ্যে ডুবে রয়েছে, তার মধ্যেই যখন তারা টিকে থাকতে চায়, সে অবস্থায় তাদের সাথে ওঠা বসার অর্থ দাঁড়াবে তাদের 'দ্বীন'কে স্বীকার করা এবং দ্বীন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা অথবা দ্বীন ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির কমতি দেখানো। এসব নিষেধাজ্ঞা আসার পরও এমন হতে পারে যে, শয়তান কাউকে ভুলিয়ে দেবে এবং তাদের সাথে ওঠা বসা করা হবে, কিন্তু সে সময়েও যখনই মনে পড়বে তখনই সেখান থেকে ওঠে আসতে হবে এবং তাদের থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তাদেরকে দেখবে ...... বৈঠকে বসবে না।' (আয়াত ৫৮)

অবশ্য এ নির্দেশটি ছিলো রসূল (স.)-এর জন্যে। আর সম্ভবত আলোচ্য আয়াতের মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোর আওতায় মুসলমান জনসাধারণও পড়ে, অর্থাৎ মুসলমানদেরকেও ওই একই নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যেন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং যেখানেই কোরআনুল করীমের বা তার কোনো আয়াতের সমালোচনা করা হয়, তা প্রতিহত করার মতো অবস্থা বা অনুকূল পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে সে বৈঠক থেকে অবশ্যই সরে আসা দরকার। এ আচরণের মাধ্যমেও ওদের প্রতি কিছু না কিছু ঘৃণা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। রসূল (স.) যখন মক্কায় দাওয়াতী স্তরে অবস্থান করছিলেন, তখনই তাঁর প্রতি এ নির্দেশ দেয়া হয়। এসময়ে আল্লাহরই ইচ্ছা ও বিশেষ হেকমতের কারণে তাঁকে মক্কার ওই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়নি। অথচ মোশরেকদের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়েও তাদের দৌরাত্যের কিছু না কিছু জবাব অবশ্যই দেয়া প্রয়োজন ছিলো; আর এই কারণেই তাদের বৈঠক থেকে উঠে আসার মাধ্যমে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিলো এবং তাদের কাজের মৌন প্রতিবাদ জানানো দরকার ছিলো। এজন্যেই নবী (স.)-এর প্রতি ছিলো ওই নির্দেশ যেন তিনি মোশরেকদের বৈঠকাদিতে সেই সময়ে না বসেন যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অসংগত চিন্তা ভাবনা করতে দেখেন বা অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখতে পান। আর এসব বৈঠকাদি পরিত্যাগ করার কথা যদি শয়তান ভুলিয়ে দেয়, তখন আল্লাহর বিধি নিষেধ মানার আবশ্যকতা স্মরণ করতে হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে যালেম জাতি বলতে মোশরেকদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যেহেতু কোরআনে করীমেও মোশরেকদেরকে যালেম আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, যেখানে মোশরেকদের সাথে ব্যবহারে নবী (স.)-এর চরিত্রের আর একটি দিক ফুটে উঠলো। সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে জেহাদ ও যুদ্ধ করার নির্দেশ এসে গেলো এবং এ নির্দেশে বলা হলো যে, অশান্তি, বিশৃংখলা ও ফেতনা ফাসাদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে এ যুদ্ধ। আর এটি বাস্তব সত্য যে এ সময়ের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে আজে বাজে কথা বলা বা মন্তব্য করার কোনো সাহস কেউ করেনি।

তারপর মোমেন ও মোশরেকদের মধ্যে পৃথকীকরণের কথা বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে, যেমন করে ইতিপূর্বে রসূল (স.) ও মোশরেকদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছিলো।

এরপর জানানো হয়েছে যে, মোমেনরা মোশরেকদের থেকে থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এ জীবন শেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নেও মুসলমান ও মোশরেকদের আকীদা বিভিন্ন। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আল্লাহর ভয়ে বাছ বিচার করে চলে (তাকওয়া পরহেযগারী করে) তাদের ওপর ওইসব মোশরেকের হিসাব নিকাশের ব্যাপারে কোনো দায়দায়িত্ব নাই। তবু তাদেরকে উপদেশ দিয়েই যেতে হবে, হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করতেও পারে।'

এটাও খেয়াল করার বিষয়, মোমেন ও মোশরেকদেরকে একই জনগোষ্ঠী সমভাবে অনুসরণ করে না। এদের অনুসারী অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন জগগোষ্ঠী। তারা একই গোত্র বা একই গোত্রের লোক হলেও বিশ্বাসগত পার্থক্য থাকায় তারা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং আল্লাহর বিচারদন্ডে গোত্রীয় বা বংশগত ঐক্যের কোনোই মূল্য নাই, ইসলামও তাদের ওই সব ঐক্যকে গ্রাহ্য করে না। বস্তুত আল্লাহভীরু জনতা এক স্বতন্ত্র জাতি এবং যালেম (মোশরেক)-রা ভিন্ন আর এক জাতি। আর মোত্তাকীদের ওপর যালেমদের অনুসারী ও তাদের হিসাবের কোনো দায়িত্ব নাই। বরং তারা আল্লাহর ভয় ও মহব্বতের কারণে তাদের এই আশায় উপদেশ দিতে থাকবে যে, হয়তো তারা ওদেরই মতো মোত্তাকী পরহেযগার হয়ে যাবে এবং তাদের সাথে এসে মিলিত হবে, নচেত আকীদা বিশ্বাসের মিল না হলে তাদের সাথে কোনো ব্যাপারেই কোনো সহযোগিতা বা অংশীদারিত্ব থাকবে না!

যাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ঈমানদারদের উচিৎ

এই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর কথা, এ দ্বীন বহির্ভূত যে কোনো কথা যার মনে যা আসে আসুক এবং যে যারা বলতে চায় বলুক, তবে তার মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এ জীবন ব্যবস্থার সমালোচনায় বা এর ত্রুটি সন্ধানে কেউ যদি কোনো কথা বলে তাহলে অবশ্যই সে দ্বীন ইসলামের গন্ডী থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

ওই সকল বে-আদব মোশরেকদের সাথে সম্পর্ক ছেদ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে তাদের সাথে লেনদেনের কথাও এসে গেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা তাদের......... তাদেরকে দেয়া হবে বেদনাদায়ক শাস্তি। (আয়াত ৭০)

এই আয়াতের শিক্ষার আলোকে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ের মুখোমুখি হই।

প্রথম, রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা হয়েছে। অবশ্য কথাগুলো সকল মুসলমানের জন্যেই প্রযোজ্য। সবাইকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যেন তারা ওই হতভাগা লোকদের নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দেয় এবং তাদের কুকীর্তির উচিত সাজা পাওয়ার জন্যে ওইসব ব্যক্তিকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেয় যারা তাদের ধর্মকে বানিয়ে নিয়েছে নিছক গান বাজনা, নর্তন কুর্দন ও বাজে কাজের আসর হিসাবে। আর তাদেরকে পরিত্যাগ করার কাজ হতে হবে কথায় ও কাজে। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ও আনুগত্যের মাধ্যমে এবং চরিত্র ও ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ না করবে, গ্রহণ না করবে জীবনের নিয়ম নীতি ও আইন কানুনের ক্ষেত্রে, সে-ই এ জীবন ব্যবস্থাকে খেল তামাশা ও সাময়িক ঝোকপ্রবনতা বা স্রেক সামাজিক কিছু অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করবে। আর কিছু লোক এমনও আছে, যারা এই জীবন ব্যবস্থা, জীবনের মূলনীতি ও আইন কানুন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এমন এমন কথা বলে বসে যাতে এই জীবন ব্যবস্থা উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ইসলামী আকীদার বিষয়গুলোর মধ্যে গায়েবে বিশ্বাস অন্যতম। আর এই বিষয়ে তারা ঠাট্টা মস্কারি করে এই বিশ্বাসের বিষয়টিকে উড়িয়ে দিতে চায়। আর কিছু লোক আছে, তারা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ– যাকাত সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এই ব্যবস্থা 'সেকেলে এবং আধুনিক

যুগের সমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়' বলে মন্তব্য করে। আবার কিছু সংখ্যক লোক দ্বীন ইসলামের অন্যতম মূলনীতি মানুষের লজ্জা-শরম, চরিত্র ও পবিত্রতা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করে। বলে, কৃষিজীবীদের সামাজিক জীবনে অথবা যৌথ সংসারে অথবা পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজে এই সব লজ্জা শরমের কথা অবান্তর। আর যারা ইসলামী নিয়মে বিবাহিত জীবনের বন্ধনকে অপছন্দ করে বা এসব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে চায়, আর যারা নারীদের চারিত্রিক হেফাযতের জন্যে কারো কথা শুনা এবং নিয়ম মানার কাজকে শৃংখলিত জীবন মনে করে এবং এসব কিছুর আগে ও পরে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব মানতে পছন্দ করে না, পছন্দ করে না রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে। তারা বলে, আমাদের উচিত হবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিজেদের আইন নিজেরাই তৈরি কর নেয়া'। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধি বিধান মানতেই হবে এটা কোনো জরুরী বিষয় হতে পারে না। এ সকল কথার সবগুলোরই অর্থ হচ্ছে, 'তারা তাদের দ্বীনকে খেল তামশা ও আনন্দ উল্লাসের জিনিস হিসাবে গ্রহণ করেছে' এই কথাটিই এ আয়াতের মধ্যে রয়েছে। এদের সবার সাথেই মুসলমানদেরকে দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং এদের সবার সাথে সর্ম্পচ্ছেদ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তাদের উপদেশ দেয়ার প্রয়োজনেই যেটুকু মেলামেশা প্রয়োজন সেইটুকুর অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র। আর যালেম বলতে মোশরেক ও কাফেরদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা তাদের নিজেদের কীর্তিকলাপের জালে নিজেরাই আবদ্ধ হয়ে চরম লাঞ্ছিত হয়েছে এবং তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। এই হচ্ছে সেই কুফরী কাজের পরিণতি। তাদের জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে গরম পানীয় ও বেদনাদায়ক আযাব।

দ্বিতীয়, আল্লাহর রসূল (স.) ও সকল মুসলমানকে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের ধর্মকে বানিয়ে নিয়েছে খেলা ধুলা ও আনন্দ উৎসবের জিনিস, তাদের কথা বাদ দেয়ার পর মুসলমানদের প্রতি হুকুম হয়েছে যেন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় এবং যেসব অন্যায় কাজ তারা করে চলেছে তার প্রতিদানে, তাদেরকে আযাবের ভয়ও যেন দেখানো হয় যেহেতু তাদের কাজের ফলে এই আযাবই তাদের পাওনা। তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও জানিয়ে দেয়া দরকার যে, যদি যদি তারা এভাবেই চলতে থাকে তাহলে তাদের দরকার যে কেয়ামতের দিন তাদের সাহায্য করার জন্যে কোনো বন্ধু বা শাফায়াতকারী থাকবে না, যেমন করে এটা ঠিক যে, কোনো কাজের নির্ধারিত ফল পাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার ওযর আপত্তি শোনা হবে না বা তার বদলে অন্য কোনো বদলাও গ্রহণ করা হবে না।

কোরআনে করীমের বর্ণনাভংগিতে যেমন রয়েছে অনাবিল সৌন্দর্য, তেমনি রয়েছে অর্থের গভীরতা। বলা হচ্ছে,

'এবং উপদেশ দাও (কোরআনের দ্বারা) যাতে করে কোনো ব্যক্তি তার কুকীর্তির ফলে শাস্তির মধ্যে পড়ে না যায়। নেই আল্লাহ ছাড়া তার কোনো বন্ধু নেই; নেই কোনো শাফায়াতকারী। আর যদি মুক্তিপন হিসেবে তার সবকিছু দিয়েও এহেন পাপী ব্যক্তি আযাব থেকে রেহাই পেতে চায়, তাহলে তার কাছ থেকে তা কিছুতেই গ্রহণ করা হবে না।

ওপরের আয়াতটির বর্ণনাভংগিতে বুঝা যাচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথকভাবে তার অতীতের মন্দ কর্মকান্ডের জন্যে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে যে, তার মুখ হয়ে যাবে অন্ধকার। তখন এমন কঠিন অবস্থা তার হয়ে যাবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তখন বন্ধু হিসাবে কেউ কোনো সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসবে না বা আসতে পারবে না। আর সেদিন কারো কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হবে না। আর ওই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণও গ্রহণ করা হবে না।

প্রকৃতপক্ষে নাচ, গান, খেল তামাশা এবং হৈ-হুল্লোড়কেই যারা দ্বীন বা ধর্ম বুঝে নিয়েছে আতশ বাজি, আনন্দ উল্লাস ইত্যাদির মতো পাপ কাজের জন্যে তাদের শাস্তি পাওনা হয়ে গেছে, তাদের জন্যে ওই কঠিন শাস্তি যার বর্ণনা ওপরে দেয়া হয়েছে। ওই শাস্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া তাদের জন্যে লিখিত হয়ে গেছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারাই হচ্ছে ওই সব ব্যক্তি যারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই নিজেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের কুফরীর কারণে তাদের জন্যে রয়েছে ফুটন্ত পানির শাস্তি ও আরো বিভিন্ন ধরনের মর্মন্তুদ আযাব।'

পৃথিবীতে যা তারা করেছে তার কারণেই তাদেরকে চরমভাবে পাকড়াও করা হবে- আর এটিই হবে তাদের জন্যে সমুচিত প্রতিদান। এমন গরম পানি যা তাদের হলকুম ও পেটকে ঝলসে দেবে, আর তাদের কুফরীর (সত্যকে অস্বীকৃতির) কারণে দেয়া হবে ব্যথার শাস্তি। এই কুফরীর মনোভাবই তো তাদেরকে সত্য সঠিক জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের দাওয়াতের প্রতি উপহাস বিদ্রূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

তৃতীয়, মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী, 'যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশা ও উপহাস বিদ্রূপের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে।'

তাহলে ওই আনন্দ উল্লাস ও খেল তামাশাই কি ছিলো ওদের 'দ্বীন'?

অবশ্য আল কোরআনের বর্ণনা থেকে একথাটিই বুঝা যায়, এ কথাটি সেই ব্যক্তির জন্যেও প্রযোজ্য যে মুখে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করেও এই সত্য 'দ্বীন'-এর প্রতি কটাক্ষপাত করেছে এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে চলেছে। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অবশ্যই এ নিকৃষ্ট খাসলাতটি পাওয়া যায় এবং তাদেরকে মোনাফেক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যেহেতু এসব ব্যক্তি মদীনাতে ছিলো।

আবার যে সব ব্যক্তি ইসলামের শান্তির ঘরে প্রবেশ করেনি, তাদের জন্যেও কি এ আয়াতটি প্রযোজ্য? অবশ্য ইসলামই তো প্রকৃতপক্ষে সত্য দ্বীন (বা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা) .... দ্বীন অর্থই হলো আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থা শব্দটি দ্বারা আসলে কখনেই মানব নির্মিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝানো হয় না। এখন এসব ব্যবস্থাকে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। সুতরাং তার 'দ্বীন' পরিত্যাগ করার অর্থে সেই 'দ্বীন'কে পরিত্যাগ করা বুঝায় যা আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

আর এই জন্যেই আলোচ্য আয়াতে সেই 'দ্বীনের' দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে পাঠিয়েছেন। এ জন্যেই এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওই সব ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করো যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল তামাশা, ঠাট্টা মস্কারি ও উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন ওদের পরিণতি সম্পর্কে তবে আমাদের কাছে মনে হয়, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে অবতীর্ণ 'দ্বীন' ইসলামকেই এখানে বুঝানো হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এই দ্বীনকে উপহাস বিদ্রূপের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছে সে প্রকৃতপক্ষে তার নিজের (আমল) 'দ্বীন'-কে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, তা সে যেই হোক না কেন। এমনি করে মোশরেকদের মধ্য থেকেও যদি হয়।

আর মোশরেক যে কারা তার বর্ণনা দেয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। তবু বলছি, এরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের

সাথে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে। যেমন তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে দেব-দেবীদের অংশীদার বলে বিশ্বাস করে বা আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যে পূর্বে, আরও কারো দাসত্ব করা প্রয়োজন বলে বোধ করে অথবা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শাসন, ক্ষমতা ও তাঁর আইন দান ক্ষমতার সাথে আরও কাউকে শাসনকর্তা হিসাবে কবুল করে। আর যারা এস কাজের কোনো একটিও করবে তাদেরকে যে ধরনের মুসলমানই বলা হোক না কেন, তারা সবাই মোশরেক। সুতরাং দ্বীন শব্দটির অর্থ সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে, যালেম বা মোশরেক এবং যারা তাদের দ্বীনকে খেল তামাশার বিষয় বানায়, তাদের সাথে কতোক্ষণ পর্যন্ত ওঠাবসা করা যায়? ইতিমধ্যে আলোচনা এসে গেছে যে, উপদেশ দেয়া ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে যতোটুকু ওঠাবসা বা মেলা মেশার প্রয়োজন হয় তা করতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে তাদের সাথে ওঠা বসা করা যাবে না। আর যখনই আল্লাহর আয়াতসমূহের ভালোমন্দ বিচার করার মনোভাব তাদের মধ্যে পরিস্ফুট দেখা যাবে, অথবা আল্লাহর আয়াতগুলোকে হাসি বিদ্রূপের বিষয় হিসাবে তারা গ্রহণ করছে বলে তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পাবে, তখনই তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের মজলিস থেকে উঠে পড়তে হবে-এর বিস্তারিত বিবরণ ইতিমধ্যে এসে গেছে।

এ প্রসংগে কুরতুবীর মতামত ও কথা তাঁর কেতাব 'আল জামেউলে আহ্কামিল কোরআন' নামক কেতাবটিতে এ বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে,

'এই আয়াতটির মধ্যে ওই সকল বিজ্ঞ ব্যক্তির কথাকে রদ করা হয়েছে যে তারা এবং তাদের অনুসারীরা যুক্তিতর্ক করার যোগ্য বিধায় তারা ওই সকল ফাসেকের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক বৈঠকে বসতে পারে এবং ওদেরকে ভুল পথ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এবং তাদের ও পর নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মেলামেশা করতে পারে। মতের একমাত্র উপদেশ দান ও স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে কারো ভুল সংশোধনের জন্যে এবং অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মত পরিবর্তনের ইচ্ছা নিয়ে কারো সাথে মেলামেশা করা এই আয়াতের আলোকে জায়েয বলে আমরা মনে করি। সাধারণভাবে ফাসেক লোকদের সাথে মেলামেশা করা এবং তারা অন্যায় কথা বললে বা অন্যায় কোনো কাজ করলে প্রতিবাদ না করে চুপ থাকাটা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কারণ এতে বাতিল বা অন্যায়কে মেনে নেয়া বুঝায় এবং সত্যের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া প্রতীয়মান হয়, সাধারণ লোকেরাও এ কাজকে মোনাফেকের কাজ বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ওদের সাথে মেলামেশা করায় আল্লাহর দ্বীনকে এবং যারা দ্বীনের ওপর টিকে আছে তাদেরকে হেয় করা হয়। এই ধরনের অবস্থাতে মেলামেশার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এসেছে ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে।

এইভাবে কুরতুবী তাঁর কেতাবে নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছেন,

ইবনে খুওয়ায়েয ইবনে মেকদাদ বলেন, আল্লাহর আয়াতকে যারা সমালোচনার বিষয় বানিয়েছে, সে মোমেন বা কাফের যেই হোক না কেন, তাকে আমি পরিত্যাগ করেছি এবং তার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তিনি আরও বলেন, আর এমনি করে আমাদের পূর্ববর্তী গুরুজন দুশমনের দেশে প্রবেশ করতেও মানা করেছেন, মানা করেছেন তাদের গীর্জা ও এবাদাত খানাতেও যেতে।(১) কাফের ও বেদয়াতকারীদের সাথে উঠা বসা করতেও মানা করেছেন। তাদের

(১) বায়তুল মাকদেসের-এর মধ্যে খৃষ্টানদের দখলদারিত্বের আমলে এ মসজিদকে গীর্জা হিসাবে ব্যবহার কালে ওমর (রা.) যেখানে নামায পড়েছেন, অবশ্য এসময় সে জায়গাটি মোশমনদের কবলমুক্ত হয়েছিল বিধায় তখন এ স্থানটি মোশমনদের ছিলো না, বরং ঘরটি চুক্তির আওতাধীন এবং যিম্মিদের হাতে ছিলো। খৃষ্টানরা ওই সময়ে ওই এলাকায় যিম্মী হিসাবেই বসবাস করছিলো।

ভালোবাসা প্রদর্শনকে ও বিশ্বাস করতে মানা করেছেন, তাদের কথা শুনতে এবং তাদের সাথে যুক্তি তর্কে লিপ্ত হতেও নিষেধ করেছেন, এমনকি তাদের নিজেদের পারস্পরিক তর্ক বিতর্কে কান দিতেও মানা করেছেন। এরপর, একটি দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আবু এমরান আন্নাখয়ীকে লক্ষ্য করে কোনো এক বেদয়াতকারী বলেছিলো, 'আমার একটি কথা শুনুন, কিন্তু তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'না, একটি কথাও শুনবো না, এমনকি তোমার কোনো কথার অর্ধেকও শুনবো না।(২) অনুরূপ বর্ণনা আবু আয়্যুব আস সুখতিয়ানী থেকে পাওয়া যায়। ফযায়েল ইবনে আয়্যাযও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বেদআতকারীকে ভালোবাসে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত নেক কাজকে পন্ড করে দেবেন এবং তার অন্তর থেকে ইসলামকে বের করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীর সাথে নিজ কন্যাকে বিয়ে দেবে তাঁর সাথে সম্পর্ক কেটে দেবে, আর যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীর সাথে ওঠাবসা করবে, তাকে 'প্রজ্ঞা' বলতে কোনো জিনিস দেয়া হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানতে পারেন যে, সে কোনো বেদআতকারীকে ঘৃণা করে, আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে মুক্ত রাখবেন। হযরত আয়শা (রা.) থেকে আবু আব্দুল্লাহ আল হাকেম রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বেদয়াতকারীকে সম্মান দেখালো, সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।'

সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের ওপর থাকা সত্তেও যদি কোনো বেদয়াতী কাজ করে, তাহলে তার সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে এই সব কঠিন কথা। আর যে ব্যক্তি কোনো শাসনকর্তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করে এবং এই দাবীর ওপর সে যদি দৃঢ় হয়ে থাকে, সে অবস্থায় সে শুধু বেদয়াতকারীই হবে না বরং সে তো কুফরী করছে এবং সে হবে নির্জলা কাফের অথবা সে হবে মোশরেক ও তার কাজটি হবে পরিষ্কার শেরক। এ ধরনের লোক ইসলামের প্রথম যুগে না থাকায় তাদের সম্পর্কে সরাসরি তেমন কোনো মন্তব্য পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে ইসলামের আগমনের পর থেকে মুসলমান দাবীদার হয়েও তাদের কাছ থেকে এই ধরনের দাবী কখনও শোনা যায়নি। আর ফরাসী বিপ্লবের পরে ছাড়া এই ধরনের দাবীও উত্থাপিত হয়নি ওই বিপ্লবের পরই সাধারণভাবে মানুষ ইসলামের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাঁচিয়ে থাকলে সে ভিন্ন কথা। আর এইভাবে পূর্ববর্তী ওইসব ওলামার কথায় ওই সিদ্ধান্তকর কথা আসেনি যা আজকের নাফরমানদের জন্যে বলতে হচ্ছে। পূর্ববর্তীরা ফাসেক লোকদের সম্পর্কে যতো কথাই বলেছে, আজকের ও সীমালংঘনকারীরা অপরাধের দিক দিয়ে ঐ সময়ের সকল সীমা পার হয়ে গেছে।

---

(১) কোরআনে আছে, মুখ ফিরিয়ে নাও তাদের থেকে যারা আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং শুধু পার্থিব জীবন (ও তার কল্যাণই) চেয়েছে।

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ط وَهُوَ الَّذِىٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ط قَوْلُهُ الْحَقُّ ط وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ط عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿٧٣﴾

রুকু ৯

৭১. তুমি (তাদের) বলো, আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো, যে- না আমাদের কোনো উপকার করতে পারে, না আমাদের কোনো অপকার করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যেখানে আমাদের (চলার জন্যে) সঠিক পথ বাতলে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে বাদ দিয়ে আমরা কি আবার উল্টো পথে ফিরে যাবো- ঠিক সে ব্যক্তিটির মতো, যাকে শয়তানরা যমীনের বুকে পথভ্রষ্ট করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাওয়াচ্ছে, অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, তুমি আমাদের কাছে এসো, আমাদের কাছে (মজুদ আল্লাহ তায়ালার) সহজ সরল পথের দিকে! তুমি বলে দাও, সত্যিকার অর্থে হেদায়াত তো তাই; যা আল্লাহর (পক্ষ থেকে এসেছে) এবং আমাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা সৃষ্টিকুলের মালিকের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করি, ৭২. আমরা যেন নামায প্রতিষ্ঠা করি এবং আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করি; (কেননা) তিনিই হচ্ছেন এমন সত্তা, যাঁর সামনে (একদিন) তোমাদের সবাইকে সমবেত করা হবে। ৭৩. তিনিই যথাবিধি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; যেদিন (আবার) তিনি বলবেন (সব কিছু বিলীন) হয়ে যাও, তখন (সাথে সাথেই) তা (বিলীন) হয়ে যাবে, তাঁর কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত সত্য, যেদিন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে (সেদিন) যাবতীয় কর্তৃত্ব ও বাদশাহী হবে একান্তই তাঁর; তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত রয়েছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি সম্যক অবগত।

তাফসীর

আয়াত ৭১-৭৩

সব কিছুর মধ্যে একই কথার প্রতিধ্বনি, একই সুর। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও তাঁর সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করছে। অপরদিকে শেরককে শেরক মনে না করা এবং হেদায়াত লাভ করার পর পুনরায় শেরকের দিকে প্রত্যাবর্তন, আর ওই দৃশ্য যা পশ্চাদপসারণকারী ব্যক্তিকে দ্বীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয় এবং মুরতাদ হয়ে

যেতে উস্কানি দেয়, তার অহংকারের কারণে গড়ে ওঠা তার দিশেহারা অবস্থা তাকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাধ্য করে এবং সব কিছুর মধ্যে এ স্বীকৃতি যে আল্লাহর দেয়া পথই নির্ভুল .... সব কিছুর মধ্য থেকে এই একই সুর, গভীরভাবে ও উচ্চস্বরে আল্লাহর সর্বব্যাপী ক্ষমতার কথাই ঘোষণা করছে। সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসে প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্যে এবং জানা অজানা সব কিছুর মধ্যে একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতার কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর শক্তি-ক্ষমতার এ বহিপ্রকাশ তাদের কাছেও হচ্ছে যারা তাঁর অস্তিত্বকে অন্ধভাবে অস্বীকারকারী। আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সকল কবরবাসীকে কবর থেকে উঠানো হবে, সে দিন যারা আল্লাহর বাদশাহীতে বিশ্বাস করতো না, তারা সেদিন ঠিকই বিশ্বাস করবে সকল কিছুর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য একমাত্র আল্লাহরই। আর অবশেষে তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে (কিন্তু, সেদিনের সেই বিশ্বাস তাদের কোনো কাজেই লাগবে না।)

আল্লাহর কাছে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ

'বলো, (হে রসূল) আমরা কি আল্লাহকে বাদা দেয় .... সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি। (আয়াত ৭১)

'কূল- এ শব্দটিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে আলোচ্য সূরার মধ্যে বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। ওহীর মাধ্যমে জাহানো হয়েছে যে, এসব হুকুম সবই আল্লাহর, আর রসূল (স.) তিনি তো শুধু সতর্ককারী এবং পৌঁছে দেনেওয়ালা মাত্র। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই পৌঁছে দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে এবং এর মহত্ত্ব সম্পর্কে মানুষকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিতে। এই দায়িত্ব এক বিশাল গুরু দায়িত্বও বটে। আর রসূলুল্লাহ (স.)-কে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব পালন করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

'বলো (হে রসূল,) আমরা কি আল্লাহ তায়ালাকে বাদদিয়ে এমন কাউকে ডাকবো যে আমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না।'

হে মোহাম্মদ, নিষেধ করতে গিয়ে তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা ও তার কাছে সাহায্য চাওয়া কিছুতেই চলবে না এবং পরিচালক হিসাবে ইসলাম ওইসব লোককে নির্দেশ দিচ্ছে যে, যারা তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না তাদের কাছে কখনও সাহায্যপ্রার্থী হয়ো না। যাদেরকে ডাকা হয় তারা পুতুল হোক বা মূর্তি হোক, পাথর হোক বা গাছ হোক, আত্মা হোক বা ফেরেশতা হোক, শয়তান বা মানুষ যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একই। এরা কারো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না। এই উপকার বা ক্ষতি করার ব্যাপারে এরা সবাই চরম অক্ষম। যেখানে যা কিছু হচ্ছে তা সবই আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুযায়ীই হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা যা করার বা হওয়ার অনুমতি দেননি তা কিছুতেই হবে না। আর যা কিছু তিনি পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাই সংঘটিত হয় আর যেসব বিষয়ের ফয়সালা তিনি করে রেখেছেন, তা-ই বাস্তবায়িত হয়।

(হে আহাম্মদ,) নিষেধ করতে গিয়ে তাদেরকে বলো, তারা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে না ডাকে বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পূজা অর্চনা না করে অথবা বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং নিরংকুশভাবে যেন কারো আনুগত্য না করে। খবরদার, তারা যেন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছে কাতর হয়ে কিছু না চায়। এ হুকুম অমান্য করলে আল্লাহর আক্রোশ নাযিল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে। এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মোশরেকদের দাবীর কড়া প্রতিবাদ করা হয়েছে, তারা বলেছিলো নবী (স.) আল্লাহর আনুগত্য ও আনুষ্ঠানিক এবাদাতের সাথে

মোশরেকদের দেব দেবীরও সত্যতা যেন স্বীকার করে নেন। অথবা মোশরেকদের প্রচলিত এবাদতগুলোকে নিষেধ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মোমেনদের প্রতি তাদেরকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ। মোমেন চরিত্রের বৈশিষ্ট হলো যখনই তার সামনে সত্যের জ্যোতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন সে সকল অন্যায় ও অপশক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং এধরনের যাদের সাথে সম্পর্কের বন্ধন কোনো না কোনোভাবে রয়ে গেছে তা পুরোপুরি ছিন্ন কর এবং পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব থেকে দূরে সরে যায়।

প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি এই দুর্বলতাকে দূর করে অন্যায় ও অসত্য ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে আসার জন্যে প্রয়োজন হেদায়াতের আলো। আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ জন্যেই দান করেছেন যেহেতু তারা একমাত্র আল্লাহর অনুগত্য করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং জীবনের সর্বময় কর্তা হিসাবে একমাত্র আল্লাহকেই গ্রহণ করেছে। এদের প্রতি তাঁর নির্দেশ,

'বলো, আমরা কি (সাহায্যের জন্যে) ডাকবো এমন কাউকে, যে আমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, আর কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর আমাদেরকে কি আমাদের পেছনের (জাহেলী অবস্থার) দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে?'

পেছন দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে মুরতাদ হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ সত্যকে জেনে, বুঝে গ্রহণ ও সত্যের পথে অগ্রগতি লাভ করার পর (কোনো সংকটে পড়ে হোক বা কোনো স্বার্থের আকর্ষণেই হোক) সে সত্য থেকে ফিরে যাওয়া।

এরপর আসছে এমন একটি দৃশ্যের বিবরণ যা চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে চায়, প্রাণকে উজ্জীবিত করে এবং তার গভীর প্রভাব গোটা দেহ মনে ছড়িয়ে পড়ে। সে এমন এক ব্যক্তির মতো হয়ে যায় যার ওপর শয়তান ভর করার কারণে সে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার বহু বন্ধু বান্ধব আছে যারা তাকে সঠিক পথ দেখাতে চেয়ে বলে, এসো আমাদের কাছে।

এ এক জীবন্ত দৃশ্য, বাস্তব দৃশ্য সচরাচর কোনো ব্যক্তি যখন শেরকে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন শয়তানরা তাকে সকাল সন্ধ্যা সারাক্ষণ ভুল পথে নিয়ে যায়, পেরেশানীর মধ্যে ডুবিয়ে রাখে এবং তার অন্তরের গতি বিভক্ত হয়ে কখনও আল্লাহর দিকে আর কখনও আল্লাহর সৃষ্ট কোনো কোনো বান্দার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং হেদায়াত ও গোমরাহীর মধ্যে তার অনুভূতি দোল খেতে থাকে। আর সর্বশেষে তার মধ্যে পয়দা হয়ে যায় আত্মম্ভরিতা। এই হচ্ছে ওই শ্রান্ত ক্লান্ত সৃষ্ট জীবের অবস্থা।'

'যার ওপর শয়তান ভর করার কারণে পৃথিবীতে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

আর 'এস্‌তেহওয়া" অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া-এ এমন একটি শব্দ যা সেই ব্যক্তির ছবি ফুটিয়ে তোলে যার মধ্যে এ মারাত্মক ত্রুটিটি এসে যায়। এইভাবে কুপ্রবৃত্তির তাড়নে যারা চলে তাদের মধ্যে অবশ্যই অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পয়দা হবে যা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে। ঈমানের ক্ষীণ রশ্মি তার মধ্যে থাকার কারণে কখনো কখনো এই ভুল পথের মধ্য থেকেও আল্লাহর মেহেরবানীতে সঠিক পথপ্রাপ্তি ঘটে। তার পাশাপাশি কিছু এমন বন্ধু-বান্ধব জুটে যায়, যারা ওই দিশেহারা অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যে তাদেরকে উদাত্ত কণ্ঠে ডাকতে থাকে– এসো এসো, এসো সত্য সঠিক পথে। মনগড়া পথে চলার ইচ্ছা এবং সত্যের প্রতি আহ্বান-এই দুই-এর মাঝে পড়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে সে ভাবে কী করবে, কোন দিকে যাবে। দুই দলের মধ্যে কোন দলের আহ্বানে সাড়া দেবে।

এ এমন একটি কঠিন অবস্থা যে-এর মধ্যে সে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার জন্যে এটা একটা মানসিক শাস্তি। অবশেষে সে নিজের এ কঠিন অবস্থা অনুধাবন করে।

যতোবারই আমি এ আয়াতটি পড়েছি, ততোবারই গভীরভাবে অনুভব করেছি যে, কী নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে ওই হতভাগা গোষ্ঠী যারা ঈমান গ্রহণ করার পর দোদুল্যমান হয়ে যায় এবং কখনো এদিকে কখনো ওদিকে হয়রান পেরেশান হয়ে বেড়ায়। কী করবে স্থির করতে পারে না। তাদের জন্যে এটা শুধু চিন্তা কল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরিশেষে তাদের অবশ্যম্ভাবী কঠিন অবস্থাগুলো মানস চোখে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি যার মধ্যে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট রয়েছে আর তা হচ্ছে সেই স্থান যার মধ্যে থেকে নেমে আসবে কঠিন শাস্তি। এসব সেই সকল মানুষের অবস্থা যারা আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং এ ক্ষমতার মধ্য থেকে আসা আল্লাহর শাস্তিও প্রত্যক্ষ করেছে। এই জানাটা যতোটুকুই হোক এবং যতোটা তারা এর স্বাদ গ্রহণ করে থাকুক না কেন, তারপরও তো তারা মুরতাদ হয়ে নশ্বর দেহের অলীক দেব দেবীদের পূজা অথবা সমাজপতিদের অন্ধ আনুগত্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। ওদের ভয় বা ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা তাদেরকে ওদের পূজা বা অন্ধ আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার পরেই নেমে এসেছে তাদের জন্যে সীমাহীন কষ্ট, আর তখনই তারা বুঝেছে ঐ কঠিন অবস্থা বলতে কী বুঝায় এবং আল্লাহর আযাবের ব্যাখ্যা কী!

এই প্রাণ সঞ্জীবনী বিবরণ, যা প্রচন্ডভাবে হৃদয়ে নাড়া দেয়, চোখগুলো বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে যেতে চায়, ভয়ে বিহবল হয়ে যেতে চায়। মানুষ এই ক্লান্তিকর প্রত্যাবর্তন বা দুনিয়া ছেড়ে বিদায়ের কথা মনে করে ....এই কথাগুলোর বিবরণ অত্যন্ত দৃঢ় ও অকাট্যভাবে মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতে চায়। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, অবশ্যই আল্লাহর হেদায়াতই সঠিক দিক-নির্দেশনা, আর আমাদেরকে রব্বুল আলামীনের কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে',

আরও নির্দেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, নামায কায়েম করো এবং তাঁকে ভয় করো।'

বিদগ্ধ হৃদয়ে দাগ কাটার মতো এ এক অমোঘ যুক্তি। এরপরও কোনো বিদ্রোহী হঠকারী ব্যক্তি যদি এসকল কথা বুঝতে না পারে এবং সঠিক পথের দিশা নিরূপণ করতে না পারে এবং কোন পথে চলবে তা স্থির করতে না পারে, তাহলে সে যে কঠিন আযাবে পতিত হবেই তাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং তার জন্যে তৃপ্তি ও স্বস্তির অবস্থা খুঁজে পাওয়া বড়ই মুশকিল।

এরপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ওই অকাট্য যুক্তি পেশ করা হচ্ছে,

'বলো,আল্লাহর হেদায়াত (পথ প্রদর্শনা)ই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সত্য সঠিক পথ।'

হাঁ, আল্লাহ তায়ালা প্রদর্শিত পথই একমাত্র হেদায়াতের পথ, যা এখানে সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদভাবে ব্যক্ত হয়েছে এবং অবশই সে কথাগুলো পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথেই বলা হয়েছে।

মানুষ সাধারণভাবে অহংকারের কারণে সঠিক চেতনা থেকে দূরে চলে যায়, আর দেখা যায় যে, এই অহংকারের কারণেই সে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয়। আলোর পথ থেকে দুরে সরে যায়, এর ফলে তার চিন্তা চেতনার ধরন পরিবর্তন হয়ে যায়, তার সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়, তার জীবনের কর্মপদ্ধতি পাল্টে যায়, নিয়ম-কানুন বদলে যায়। কোনো মূল্যবোধ ও জ্ঞান এবং সঠিকপথের দিশা হারিয়ে কোনো সঠিক মানদন্ড থাকে না। এর ফলে তার মধ্যে অহংকারবোধ জাগে, আর এই অহংকারের কারণে সে নির্ভুল কোনো গ্রন্থ (অর্থাৎ আল কোরআন) অনুসরণ করতে পারে, আর না তার অহংকারপূর্ণ পদক্ষেপের পক্ষে হারিয়ে কোনো সঠিক যুক্তি রয়েছে যর ওপর নিশংকাচিত্রে সে নির্ভর করতে পারে।

অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকৃতির কোনো কোনো বিষয়ের কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছে, দেয়া হয়েছে তাকে কিছু শক্তি ও ক্ষমতা, যাতে করে সেগুলো ব্যবহার করে পৃথিবীর বুকে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এই ক্ষমতাবলে জীবনকে সে গড়ে তুলতে আল্লাহর পছন্দমতো ছাঁচে; কিন্তু বিশ্ব রহস্যের শেষ কোথায় তা জানার বা সব গায়বের রহস্য উদ্ধার করা তার সাধ্যের বাইরে। এই গায়েব বা অদেখা অনেক কিছু আছে, যা তার বুদ্ধি ও অনুভূতির বাইরে। তাকে যতোটুকু শক্তি ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং তার অস্তিত্বের মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনাসমূহেরও বহির্ভূত বহু জিনিস বিশ্বের বুকে বর্তমান।

এ কারণেই সৃষ্টি সম্পর্কিত, তার বাস্তব জীবন সম্পর্কিত এবং আকীদা সম্পর্কিত নির্দেশনা জানার জন্যে তাকে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয়। নির্ভর করতে হয় তার সৃষ্টিরহস্য জানার জন্যে, জীবনের প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা কিসে তা জানার জন্যে, কিভাবে তারা সংগঠিত হবে, পারস্পরিক ব্যবহার কি ভাবে সুষ্ঠু হবে তা জানার জন্যে, তার জীবনে কোনো নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার এবং বাস্তব জীবনে কোন আইন কানুন তার জন্যে উপযোগী– এসব কিছু জানার জন্যে অবশ্যই তাকে আল্লাহর নির্দেশের ওপর নির্ভর করতে হবে।

আর যখন মানুষ এসব অজানা অদেখা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার জন্যে আল্লাহর শরণাপন্ন হয়, তখনই সে বা সঠিক পথ পেয়ে যায়। আর যে মুহূর্তে আল্লাহর হেদায়াত থেকে দূরে চলে যায় এবং আল্লাহর কেতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে নিজ বুদ্ধিতে চলতে চায় এবং নিজ বুদ্ধি দ্বারা কিছু পরিবর্তন আনতে চায়, তখনই সে বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত এবং দিশাহারা হয়। কারণ আল্লাহর দেখানো পথের বাইরে যা কিছু আছে তা-ই ভুল। এর বাইরে তৃতীয় কোনো পথ নাই– 'সত্যের বাইরে যা আছে তা সবই ভ্রান্তি তা সবই গোমরাহী।'

আর বারবার মানব জাতি গোমরাহীর এই অভিশাপের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং যতোদিন পর্যন্ত আল্লাহর পথ নির্দেশনা এবং তাঁর বিধান থেকে মানুষ দূরে সরে থাকবে, ততোদিন তাদের ওপর এই বিপদ আসতেই থাকবে। আর এটাই হচ্ছে ইতিহাসের নিয়ম, অমোঘ ও অনিবার্য বিধান। কারণ এ হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর দেয়া তথ্যের মাধ্যমে এটা সুনিশ্চিতভাবে জানা। এই অনিবার্য পরিণতি যে আসবেই তা আল্লাহরই ফয়সালা, এটা কারো কোনো বদদোয়ার ফল নয়। আর যে জাতি আল্লাহর হেদায়াত থেকে দূরে সরে গিয়ে মানব জাতিকে কষ্ট দিয়েছে বা দেবে তাদেরকে অবশ্যই এ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ও হবে। একথাটি বুঝার জন্যে বেশী দূরে যেতে হবে না। আশপাশে যেদিকেই তাকানো হোক না কেন এবং যে কোনো কাজে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়েছে সেখানেই এটা তারা প্রত্যক্ষ করবে। আর বুদ্ধিজীবীরাও এ সত্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বারবার চিৎকার করে বলছে।(১)

আর এ প্রসংগে আয়াতটি একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণের, একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা ও শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করে চলার নির্দেশ দিচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে।

'আর আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।'

বলো, হে মোহাম্মদ এবং ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহর পথপ্রদর্শনই একমাত্র সঠিক পথ, আর সে ক্ষেত্রে তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণের জন্যে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা একমাত্র তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের সব কিছুই

(১) 'আল মুশকিলাতু অল হাযারাত' কেতাবের অধ্যায়ঃ 'তাখাব্বুতুন ওয়া ইযত্বিরাব' এবং আর একটি পুস্তকঃ 'আত্তাত্বওয়ারু অস সিবাতু ফী হায়াতিল বাশারিয়্যাত' কেতাবের অধ্যায় শাহাদাতুল কারনুল ইশরীয়া।

একমাত্র তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে চলেছে। বিশ্বের আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ও এই দুই-এর মাঝে যা কিছু আছে সবই এবং সবাই যখন প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে, তখন একা মানুষ কেন তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে না? সে একাই কোন কারণে এই আনুগত্যের বাইরে থাকতে পারে?

এখানে গোটা বিশ্বের সব কিছু যে আল্লাহর প্রভুত্বের অধীনে রয়েছে এবং তাঁর প্রতিপালনে থেকে সব কিছু টিকে আছে সেই কথাটিকে অকাট্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এই সত্যটি তুলে ধরা হয়েছে যে তিনি ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় পাওয়ার কোনো উপায় নাই। আসলে বিশ্বপালকের কাছে গোটা সৃষ্টিই আত্মসমর্পণ করে তাঁর আনুগত্য করে যাচ্ছে, আনুগত্য করে চলেছে দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছুই, মেনে চলছে আল্লাহর সকল বিধান। এ বিধানের বাইরে এক পা-ও বাড়ানোর ক্ষমতা কোনো কিছুর নাই। মানুষেরও শরীরের যাবতীয় অংগ প্রত্যংগ একই আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করে চলেছে। এ বিধানের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারো নাই। মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে কিছুটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, শুধু সেইটুকু বাদে বাকি তার গোটা অস্তিত্ব আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধ্য। ইচ্ছা এখতিয়ারের ক্ষেত্রে একটু স্বাধীনতা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের পরীক্ষা নিতে চান যে, সে ভুল পথ গ্রহণ করে, না হক পথটি বাছাই করে নেয়, যদিও তার শরীরে সকল অংগ প্রত্যংগ আল্লাহর পুরোপুরি আনুগত্য করে চলেছে। আর ইচ্ছাশক্তিতে আমানত স্বরূপ যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেই আমানতের হক যদি সে আদায় করতে গিয়ে সেখানেও আল্লাহর হুকুম মতো চলতো, তাহলে আল্লাহর হুকুমকে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতো, তার ব্যবহার ও কাজগুলোকে আল্লাহর পছন্দ মতো পরিচালনা করতো, তার শরীর ও মনকে আল্লাহর বিধান অনুসারে ব্যবহার করতো এবং দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়কে তাঁর নির্দেশিত পথে সম্পাদন করতো।(১)

আবার দেখুন, রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাথে মুসলমানদের জন্যে নির্দেশ হয়েছিলো আল্লাহর কাছে সকল বিষয়ে আত্মসমর্পণ করতে, যার কারণে তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। এর ফলে, তারা নিজ এলাকায় এবং তৎকালীন পৃথিবীতে বরণীয় হয়েছিলেন এবং আজও তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দান করার পর বাস্তব জীবনের যাবতীয় কাজে কথায় ও ব্যবহারে তাঁরই হুকুম পালনের নির্দেশ এসে গেলো,

'আর নামায কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় করো।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রব্বুল আলামীনের প্রভুত্ব কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণই আসল কথা, তাঁকেই মানতে হবে একমাত্র আইন দাতা ও শাসনকর্তা এবং মানতে হবে একমাত্র প্রতিপালক হিসাবে– যিনি জীবনের সকল কাজের জন্যে তাকে যোগ্যতা দান করেছেন। এইভাবে সর্বত্র তাঁরই ক্ষমতা বিরাজমান– সার্বক্ষণিক আনুগত্যের মাধ্যমে তারই প্রমাণ দিতে হবে। এইভাবে বাস্তব কাজের মাধ্যমে আনুগত্যের প্রমাণ পেশ করার পর আসবে অনুভূতি ও মানসিক দিক দিয়ে আনুগত্য বোধ এবং এরই ফলে আত্মসমর্পণের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ অন্তরের গভীরে আনুগত্যবোধের এই ভিত্তি গড়ে না ওঠা পর্যন্ত আত্মসমর্পণ বাস্তবে প্রমাণিত হবে না।

(১) দেখুনঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর 'মাবাদিউল ইসলাম' গ্রন্থের 'আল-ইসলাম' অধ্যায়। (স্মরণ করা প্রয়োজন, যে সময় সাইয়েদ কুতুব এ তাফসীর রচনা করেছেন তখন মওলানা মওদূদী (রা.)–এর বইটি আরবী অনুবাদ শিমরে প্রকাশিত হয়েছিলো।–সম্পাদক)

সৃষ্টিজগতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রভাব

আয়াতটিতে শেষে যে বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে, মানুষের অন্তরের গভীরে মৌলিক বিশ্বাসগুলোর ওপর দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করা। ওই বিশ্বাসগুলোর বিষয় হচ্ছে, রোয হাশরের তাৎপর্য, সৃষ্টির রহস্য, ক্ষমতার এককেন্দ্রিকতা, দেখা অদেখা জ্ঞানের রহস্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহের জ্ঞান এবং সর্ববিষয়ে খবর রাখার তাৎপর্য এসব কিছুই হচ্ছে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য ও সার্বভৌমত্ব প্রকাশগুণাবলী, আর এগুলোই বক্ষ্যমাণ সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে, আর তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথাবিধি।'

অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তিনিই সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে, সকল সৃষ্টির মূলে তাঁরই হাত ক্রিয়াশীল– অন্য কারো নয়। আর রোয হাশরের দিনে তিনি বলবেন, হও, অমনি সব কিছু বাস্তবে এসে যাবে। তাঁরই কথা (অনড়) সত্য; আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিনের বাদশাহী, কর্তৃত্ব, মালিকানা ও হুকুম দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। তিনিই দেখা-অদেখা উপস্থিত ও দৃষ্টির অন্তরালের সকল বিষয়ের জাননেওয়ালা। তিনিই মহাজ্ঞানী ও সকল বিষয়ে ওয়াকেফহাল। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যাঁর কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

অবশ্যই রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করা অবশ্য করণীয় এবং অতীব জরুরী। তিনিই সেই মালিক, যার কাছে সৃষ্টিকুলের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং, তাদের জন্যে এটাই শ্রেয় যে, হঠাৎ করে সেই মৃত্যুর দিনটি সমাগত হওয়ার পূর্বেই তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া এবং হাশরের সেই মহা ময়দানে হাযির হওয়ার পূর্বেই সেই কঠিন অবস্থা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করা এবং এমন সব কাজ করাই যা সেদিন নাজাত লাভে সহায়তা করবে। স্বাভাবিকভাবেই একজন মানুষের জন্যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা উত্তম হবে, যাঁর কাছে বিশ্ব জগতের সবাই ও সব কিছু আত্মসমর্পণ করেছে এবং সবাই সেই কঠিন দিনে কৈফিয়াত দেয়ার জন্যে মহান মালিকের দরবারে দন্ডায়মান থাকবে। আর এভাবেই, মানস পটে জীবন্ত ছবির মতো ফুটে উঠেছে এই মহা সত্য– রোয হাশরের বাস্তবতা। সব কিছুর শুরুতে আল্লাহর কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তাঁর দরবারে ফিরে যেতে হলে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করে পালানোর কোনো রাস্তা নাই– এটিই একমাত্র পরিত্রাণের পথ।

'আর তিনিই সেই মহান প্রভু যিনি যথাবিধি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।

এইটি আর একটি সত্য যা মনের ওপর সমভাবে ক্রিয়াশীল........ সুতরাং আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে। আর সৃষ্টি যিনি করেন তিনিই তো মালিক, তিনিই তো পরিচালনা করেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে, তিনিই ফয়সালা দেন সকল বিষয়ে এবং সব কিছুর একমাত্র তাঁরই ওপর কর্তৃত্ব চলে। আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান যমীন 'প্রকৃতপক্ষে তিনিই'। প্রকৃত স্রষ্টা তিনি, যিনি সৃষ্টিজগতের সব কিছুর পরিচালক। এ আয়াতটিতে যে কথাটি ইতিবাচকভাবে বলা হয়েছে, তার সাথে একথাটিও রয়েছে যে, সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে তথাকথিত দার্শনিকরা যে সব বাজে বকাবকি করে, সেসব ফযুল কথা নাকচ করে দেয়া হয়েছে, বিশেষ করে প্লেটো মতবাদী ও আদর্শবাদী? যে সব দর্শন পেশ করেছে সে সবগুলো এ আয়াতের আলোকে নাকচ হয়ে যায়। এসব দর্শন দ্বারা বুঝা যায় যে এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের

বাইরে প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অবশ্য কেউ কেউ আবার এসব দর্শনের ওপর সংশোধনীও এনেছে। এ বিষয়ে আল কোরআনের বক্তব্য হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এই গোটা সৃষ্টির মূল বুনিয়াদ এবং একইভাবে তিনিই এর শেষ। আর যে আল্লাহর কাছে মানুষ আশ্রয় চায়, তিনি প্রকৃতির সব কিছুর মূলে, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে বিরাজ করছেন, এক মহাশক্তি এসব কিছুকে এক অদৃশ্য সূতায় বেঁধে রেখেছেন, যাঁর ধারে কাছে বাতিল কোনো কিছু ঘেঁষতে পারে না। সৃষ্টির মূলে বাতিল শক্তির কোনোই হাত নাই, বাতিলের কোনো অস্তিত্বও সেখানে নাই। ঐ বাতেল শক্তির কথা বলতে গিয়ে তুলনা করা হয়েছে একটি অকল্যাণকর বৃক্ষের সাথে যার শেকড় একেবারেই শক্তিহীন, গভীরে তার মূল প্রবেশ করে না এবং ঐ গাছের কোনো স্থায়িত্বও নাই। আর একটি উদাহরণ, যেমন পানির ওপর ফেনা ওঠে, কিন্তু তারও কোনো স্থায়িত্ব নাই। কিন্তু সত্য চিরদিন আছে, থাকবে। সে মহা সত্য বিরাট, বিশাল ও ভয়াবহ, যা সব কিছুর ওপর প্রভাবশীল ও গভীর ক্রিয়াশীল।

যে মোমেন অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে আছেন, অবশ্যই সে তার মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা যাঁর হাতে গোটা সৃষ্টিজগত, তাঁর সাথেই তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

(তিনিই আল্লাহ, সবারই প্রতিপালক) সুতরাং, যে বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহর করুণা দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সে অবশ্যই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে রয়েছে এবং তাঁর দয়ার সাগরে অবগাহন করছে ..... যে মোমেন এই সত্য অনুভব করে সে বাতিল শক্তির মধ্যে কোনো ভালো বা তোয়াক্কা করার মতো কিছুই দেখে না, তা সে শক্তি যতো বড়ই হোক না কেন, বা যতো ভয়ংকর বা অত্যাচারী হোক না কেন এবং যতোই যুলুম নির্যাতন করে তার আনুগত্য আদায় করার চেষ্টা করুক না কেন ওইসব শক্তি সৃষ্টির বুকে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, যা ব্যাঙের ছাতার মতো গজায়। কিন্তু সামান্য বাতাসের দোলাতে তা নীস্ত-না বুদ হয়ে যায় ওই শক্তির এমন কোনো শেকড় নাই যা তাকে দৃঢ়ভাবে টিকিয়ে রাখতে পারে। তার নাই এমন কোনো সাহায্যকারী যে বিপদে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। তার ক্রোধাগ্নি খুব শীঘ্রই নিভে যায় এবং এমনভাবে তার শক্তি সামর্থ সব বিলুপ্ত হয়ে যায় যে, কোনোদিন তার কোনো অস্তিত্ব ছিলো বলেই মনে হয় না।

এমনি করে কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আল্লাহর শক্তির কথা চিন্তা করে, তখন সে ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তার প্রতিদানও পায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন তিনি কিছু করার ইচ্ছা করেন, বলেন হয়ে যাও, আর অমনি হয়ে যায়।'

অতএব, তিনিই শাসন কর্তৃপক্ষ, নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক, আর সৃষ্টি করার ব্যাপারে বা নতুন করে কোনো জিনিস অস্তিত্বে আনার ব্যাপারে অথবা কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন করার ব্যাপারে এবং তাঁর ইচ্ছাকে পুরোপুরি ব্যবহারের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। উপরন্তু মোমেনদের অন্তরে ঈমানের ভিত্তি রচনা করতে তিনি পুরোপুরি সক্ষম। এইভাবে তিনি আরও সক্ষম সেই সকল লোকের হৃদয়ে ঈমানকে এক সঞ্জীবনী সুধা হিসাবে পেশ করতে যারা সৃষ্টিকর্তা তথা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সকল সৃষ্টির মাবুদ মওলা তিনি। তিনি কোনো কিছু সংঘটিত করতে চাইলে বলেন, 'হয়ে যাও,' সংগে সংগে তা বাস্তবে এসে যায়।

'তাঁর কথাই সত্য'।

এ সত্য কথা সৃষ্টির সম্পর্কেও হতে পারে যাদের সম্পর্কে 'হও' বললেই 'হয়ে যায়' অথবা সেই কথায় হতে পারে একমাত্র তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়, অথবা সেই

কথায়ও হতে পারে যার দ্বারা আত্মসমর্পণকালে মানুষকে কিছু করতে বলা হয় অথবা সেই কথাতেও হতে পারে যার দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অজানা তথ্য প্রকাশিত হয় এবং সৃষ্টি সম্পর্কে, সৃষ্টির শুরু সম্পর্কে, হাশর ও প্রতিদান সম্পর্কে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাও এই কথার অর্থে আসতে পারে।

সকল কিছুর ব্যাপারে তাঁর কথাই সত্য। সুতরাং, যারা তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরীক করে যা না পারে তাদের কোনো উপকার করতে, আর না পারে তাঁর সৃষ্টির কোনো ক্ষতি করতে। আর এইভাবে যারা তাঁর কথা ছাড়া অন্য কারো কথামতো চলে, সৃষ্টির মনগড়া ব্যাখ্যা দেয় এবং যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, নিজেরাই জীবনের জন্যে আইন রচনা করে, তাদের শাস্তি সম্পর্কিত আগত কথাও সত্য। তাই এরশাদ হয়েছে,

'আর যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিনে বাদশাহী হবে একমাত্র তাঁর।'

সুতরাং আজকের এই দিনে, রোয-হাশরের দিনে, যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে 'বিউগলের মতো হবে সে ভীষণ শব্দ' সেই সেদিনে সংঘটিত হবে পুনরুত্থান দিবস এবং সবাই আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে এক সাথে একত্রিত হবে। এমন এক অবস্থা সেদিন সবার হবে যা কোনো মানুষ জানে না। এ এক গায়েবী অবস্থা, যা আল্লাহ তায়ালা গোপন করে রেখেছেন। এ অবস্থার প্রকৃতি কী হবে, কতো ভয়ানক হবে এ অবস্থা এসব তথ্য সবই রয়েছে অত্যন্ত গোপন। এর একটি অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে, শিংগার এক ফুঁকের শব্দ শুনে তখন মৃত্য ব্যক্তিরা সবাই সাড়া দেবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়– এ শিংগাটি হবে পুরোপুরি আলোকময়– একজন ফেরেশতা এতে ফুঁক দেবে, যার শব্দ প্রত্যেক কবরবাসী শুনতে পাবে এবং তা তাদেরকে বাধ্য করবে রব্বুল আলামীনের দরবারে সংগে সংগে একত্রিত হওয়ার জন্যে। আর এটিই শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক। প্রথটির শব্দে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবে, এই ভয়ানক অবস্থা থেকে বাঁচতে পারবে সেই সব মানুষ যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাতে চাইবেন। তারপর হবে শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক। সাথে সাথে কবরবাসী সবাই জেগে উঠবে এবং বিস্ফারিত নয়নে দেখতে থাকবে দিগন্তব্যাপী উন্মুক্ত ময়দানের ভয়াবহ এ দৃশ্য। সেদিনের ওই সব অবস্থা ও শিংগায় ফুঁক দেয়ার আকৃতি প্রকৃতির বিবরণ আমাদেরকে ওই দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস দান করে। এ হবে এমন এক অবস্থা যা পৃথিবীতে কখনো সংঘটিত হয়নি এবং মানুষের কল্পনাতেও ওই অবস্থা কিছুতেই আসা সম্ভব নয়। আল্লাহর গায়েবী বস্তুসমূহের মধ্যে এ অবস্থা হচ্ছে এক ভীষণ ভয়ানক অবস্থা, এ অবস্থা সম্পর্কে আমরা ততোটুকুই জানতে পারি যতোটুকু তিনি জানিয়েছেন, জানিয়েছেন তার ভয়াবহতা ও তার কিছু চিহ্ন। আর আমরা কিছুতেই এর নির্ধারিত আগমনকে ঠেকাতে পারি না– এ থেকে নিরাপদ থাকারও কোনো উপায় আমাদের কাছে নাই। ওই দিবস সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে আমরা কিছুই জানি না-সামান্য কিছু আন্দাজ করতে পারি মাত্র।

যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তার বিবরণ অবশ্যই অবিশ্বাসীদেরকেও অভিভূত করে, এমনকি নাস্তিকরাও এর ভয়াল প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সেদিনের বাদশাহী হবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া বিশ্ব জুড়ে আর কারো কোনো ক্ষমতা থাকবে না। তাঁর ইচ্ছা-ছাড়া আর কারো কোনো ইচ্ছাও থাকবে না। সুতরাং আজ যারা এ দুনিয়াতে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করছে, তাদের পক্ষে শিংগায় ফুঁক দেয়ার সেই দিনটি আসার পূর্বেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা শ্রেয়।

'তিনিই গায়েব জাননেওয়ালা।'

তিনিই জানেন পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা গায়েবের সেই কঠিন অবস্থা। তিনি তেমন করেই সেই অবস্থাকে জানেন যেমন করে উপস্থিত দৃশ্যমান জিনিসগুলো তিনি জানেন। তাঁর কাছে বান্দার কোনো জিনিস বা কোনো অবস্থাই গোপন নাই। তাদের কোনো অবস্থা জানার ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীকদারও কেউ নাই। সুতরাং তাদের জন্যে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত, তাঁরই নিরংকুশ আনুগত্য করা উচিত এবং একমাত্র তাঁকে ভয় করে চলাই তাদের জন্যে উত্তম। এইভাবেই সত্য মওলা নিজেই তাঁর প্রতি কর্তব্য করার কথা স্মরণ করে দিচ্ছেন এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারী তথা অস্বীকারকারীদের নীচের আয়াতের দ্বারা তাদের কথার, সমুচিত জওয়াব দিচ্ছেন।

'আর তিনিই মহা বিজ্ঞানময় আল্লাহ তায়ালা, যিনি সব কিছুর খবর রাখেন।'

তিনি তাঁর সৃষ্টির সকল কিছুর সব ব্যাপার নিজেই পরিচালনা করেন, পরিচালনা করেন তাঁর বান্দাদের দুনিয়া আখেরাতের সব বিষয় অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং তাদের সব কিছু জেনে বুঝে। সুতরাং তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁর আইনের অনুগত থাকার কারণে তাঁর কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত। তাহলেই তারা আল্লাহর সকল কাজের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রয়েছে তা বুঝতে পারবে এবং জানতে পারবে তাঁর সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখার বাস্তবতা হওয়া সম্পর্কে। আর তখনই একমাত্র তাঁর দিকে তারা চূড়ান্তভাবে রুজু করতে সক্ষম হবে। এইভাবে তারা অহংকারের অভিশাপ থেকে রেহাই পাবে এবং আল্লাহর পাকের সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের মনে কোনো সংশয় থাকবে না। সাথে সাথে তারা আশ্রয় লাভ করবে মহান রব্বুল আলামীনের রহমতের ছায়াতলে এবং অবগাহন করতে সক্ষম হবে পাক পরওয়ার দিগারের জ্ঞান সাগরে। এইভাবে তারা আশ্রয় লাভ করবে আল্লাহর হেদায়াত ও দূরদর্শিতার সুশীতল ও সুকোমল কোলের মধ্যে।

আর এইভাবেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই সত্য প্রতিভাত হবে তাদের বুদ্ধি ও অন্তরের কাছে এক জীবন্ত সত্য হিসাবে। .... (আয়াত ৭৪ - ৯৪)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ج إِنِّيٓ أَرٰكَ وَقَوْمَكَ

فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۝٧٤ وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرٰهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝٧٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج قَالَ هٰذَا رَبِّي ج

فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝٧٦ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّي ج

فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّينَ ۝٧٧

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّي هٰذَآ أَكْبَرُ ج فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ

يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝٧٨ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٧٩ ج

৭৪. (স্মরণ করো,) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বললো, তুমি কি (সত্যি সত্যিই এই) মূর্তিগুলোকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছো। ৭৫. এভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশসমূহ ও যমীনের যাবতীয় পরিচালন ব্যবস্থা দেখাতে চেয়েছিলাম, যেন সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের দলে শামিল হয়ে যেতে পারে। ৭৬. যখন তার ওপর আঁধার ছেয়ে রাত এলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো, (তারকাটি দেখেই) সে বলে উঠলো, এ (বুঝি) আমার মালিক, অতপর যখন তারকাটি ডুবে গেলো, তখন সে (কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে) বললো, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি (আমার মালিক বলে) পছন্দ করতে পারি না! ৭৭. (এবার) যখন সে (আকাশে) একটি ঝলমলে চাঁদ দেখলো, তখন বললো (হাঁ), এই (মনে হয়) আমার মালিক, অতপর (এক পর্যায়ে) যখন তাও ডুবে গেলো তখন সে বললো, আমার 'রব' যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে আমি অবশ্যই গোমরাহ লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবো। ৭৮. (এরপর দিনের বেলায়) সে যখন দেখলো একটি আলোকোজ্জ্বল সূর্য এবং (দেখেই) বলতে লাগলো, (মনে হচ্ছে) এই আমার মালিক, (কারণ এ যাবত যা দেখেছি) এটা তার সবগুলোর চাইতে বড়ো, (সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে) তাও যখন ডুবে গেলো, তখন ইবরাহীম (নতুন বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে) নিজের জাতিকে ডেকে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, তোমরা যে সব কিছুকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাও, আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ৭৯. আমি নিষ্ঠার সাথে সেই মহান সার্বভৌম মালিকের দিকেই আমার মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি এই আসমানসমূহ ও যমীন (সহ চাঁদ-সুরুজ-গ্রহ-তারা সব কিছু) পয়দা করেছেন, আমি (এখন) আর মোশরেকদের দলভুক্ত নই।

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَاۤ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝۸۰ وَكَیْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ عَلَیْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۸۱ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْۤا اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝۸۲ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَیْنٰهَاۤ اِبْرٰهِیْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ۝۸۳ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَیْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهٖ دَاوٗدَ

৮০. (এর পরই) তার জাতির লোকেরা তার সাথে (আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে) বিতর্ক শুরু করে দিলো; (জবাবে) সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে স্বয়ং (কুল মাখলুকাতের মালিক) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে তর্ক করছো, অথচ তিনিই আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন; আমি (এখন আর) তোমাদের (মাবুদদের) ডরাই না– যাদের তোমরা আল্লাহ তায়ালার (কাজে) অংশীদার (মনে) করো। অবশ্য আমার মালিক যদি অন্য কিছু চান (সেটা আলাদা কথা); আমার মালিকের জ্ঞান সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত; (এরপরও) কি তোমরা সতর্ক হবে না? ৮১. তোমরা যাকে আল্লাহ তায়ালার সাথে অংশীদার বানাও, তাকে আমি কিভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (এ অবস্থায় তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী? (বলো!) যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে! ৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাদের ঈমানকে যুলুম (-এর কালিমা) দিয়ে কলুষিত করেনি, তারাই (হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতে) নিরাপত্তালাভের বেশী অধিকারী, (মূলত) তারাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।

রুকু ১০

৮৩. এ ছিলো (শেরেক সম্পর্কিত) আমার সেই (অকাট্য) যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর দান করেছিলাম, (এভাবেই) আমি (আমার জ্ঞান দিয়ে) যাকে ইচ্ছা তাকে সমুন্নত করি; অবশ্যই তোমার মালিক প্রবল প্রজ্ঞাময়, কুশলী। ৮৪. অতপর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব (-এর মতো দুই জন সুপুত্র); এদের সবাইকেই আমি সঠিক পথের দিশা দিয়েছিলাম, (এদের) আগে আমি নূহকেও হেদায়াতের পথ দেখিয়েছি, অতপর তার বংশের মাঝে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও

وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ۚ قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

(আমি হেদায়াত দান করেছি); আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ৮৫. যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম); এরা সবাই ছিলো নেককারদের দলভুক্ত। ৮৬. আমি (আরো সৎপথ দেখিয়েছিলাম) ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লূতকেও; এদের সবাইকেই আমি (নবুওত দিয়ে) সৃষ্টিকুলের ওপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলাম। ৮৭. এদের পূর্বপুরুষ, এদের পরবর্তী বংশধর ও এদের ভাই বন্ধুদেরও আমি (নানাভাবে পুরস্কৃত করেছিলাম), আমি এদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং আমি এদের সবাইকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। ৮৮. এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত, নিজ বান্দাদের মাঝে যাকে চান তিনি তাকেই এ হেদায়াত দান করেন; (কিন্তু) তারা যদি শেরেক করতো, তাহলে তাদের যাবতীয় কর্ম অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেতো। ৮৯. এরাই ছিলো সেসব লোক, যাদের আমি কেতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করেছি, (এ সত্ত্বেও আজ) যদি তারা তা অস্বীকার করে (তাতে আমার কোনোই ক্ষতি নেই), আমি তো (অতীতে) এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, যারা কখনো (এগুলো) প্রত্যাখ্যান করেনি। ৯০. এরা হচ্ছে সে সব (সৌভাগ্যবান বান্দা)– আল্লাহ তায়ালা যাদের সৎপথে পরিচালিত করেছেন; অতএব (হে মোহাম্মদ), তুমিও এদের পথের অনুসরণ করো (এবং কাফেরদের) বলো, আমি এর ওপর তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; (আসলে) এ হচ্ছে (দুনিয়ার) মানুষের জন্যে একটি স্মরণিকা মাত্র।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ

রুকু ১১

৯১. তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি, (বিশেষ করে) যখন তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা কোনো মানুষের ওপর (গ্রন্থের) কোনো বস্তুই নাযিল করেননি; তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো, (যদি তাই হয় তাহলে) মূসার আনীত কেতাব– যা মানুষের জন্যে ছিলো এক আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ, যা তোমরা কাগজের (পাতায়) লিখে রাখতে, যার কিছু অংশ তোমরা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে এবং অধিকাংশই গোপন করে রাখতে, (সর্বোপরি) সে কিতাব দ্বারা তোমাদের এমন সব জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো, যার কিছুই তোমরা জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও জানতো না– তা কে নাযিল করেছেন? তুমি বলো (হাঁ,) আল্লাহ তায়ালাই (তা নাযিল করেছেন), (হে নবী,) তুমি তাদের (এসব) নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকতে দাও। ৯২. এটি এক বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, যা আমি (তোমার কাছে) পাঠিয়েছি, এটি আগের কিতাবের পুরোপুরি সত্যায়ন করে এবং যাতে এ (কিতাব) দিয়ে তুমি মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহের মানুষকে সাবধান করবে; যারা আখেরাতের ওপর ঈমান আনে তারা এ কিতাবের ওপরও ঈমান আনে, আর তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে। ৯৩. সে ব্যক্তির চাইতে বড়ো যালেম আর কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার ওপর মিথ্যা আরোপ করে, অথবা বলে, আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, (যদিও) তার প্রতি কিছুই নাযিল করা হয়নি, (তার চাইতেই বা বড়ো যালেম কে,) যে বলে, আমি অচিরেই আল্লাহর নাযিল করা গ্রন্থের মতো কিছু নাযিল করে দেখাবো! যদি (সত্যি সত্যিই) যালেমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময় (তাদের অবস্থাটা) তুমি দেখতে পেতে! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশ্তারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে,

أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও; তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং আল্লাহর আয়াতের ব্যাপারে যে (ক্ষমাহীন) ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, তার জন্যে আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদের দেয়া হবে। ৯৪. (আজ সত্যি সত্যিই) তোমরা আমার সামনে (একাকী) নিসঙ্গ অবস্থায় এলে, যেমনি নিসঙ্গ অবস্থায় আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, অতপর তোমাদের আমি যা কিছু (বিষয় সম্পদ) দান করেছিলাম, তার সবটুকুই তোমরা পেছনে ফেলে (একান্ত খালি হাতে এখানে) এসেছো, তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারী ব্যক্তিদের- যাদের তোমরা মনে করতে তারা তোমাদের (কাজকর্মের) মাঝে অংশীদার, তাদের তো আজ তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি না। বস্তুত তাদের এবং তোমাদের মধ্যকার সেই (মিথ্যা) সম্পর্ক আজ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের ব্যাপারে তোমরা যা ধারণা করতে তাও আজ নিষ্ফল (প্রমাণিত) হয়ে গেছে।

তাফসীর

আয়াত ৬৪-৯৪

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলছিলো, 'আপনি কি মূর্তিসমূহকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন? আমি তো আপনাকে এবং আপনার জাতিকে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। .... হায়, অবশ্যই তোমাদের সকল সম্পর্ক (সে দিন) ছিন্ন হয়ে যাবে, আর তোমাদের মধ্যে তোমাদের কৃত্রিম পূজনীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা বদ্ধমূল (ভুল) ধারণা সে দিন সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হবে। আয়াত ৭৪-৯৪

আলোচ্য এই পাঠে দেখা যায়, একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়ের ওপর একটি দীর্ঘ ভাষণ পেশ করা হয়েছে এবং বিষয়টির সকল দিক ও বিভাগ পরস্পর এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে যে, এর যে কোনো একটি অংশকেও বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না। এ সূরার মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বন্দেগীর তাৎপর্য বলতে গিয়ে মুসলমানদের আকীদার বুনিয়াদ এবং মনিব ও গোলামের মধ্যে বিদ্যমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করে তোলা।

এ বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে অতীত কাহিনী বর্ণনার নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর সাথে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষা ও ভংগি ব্যবহার করা হয়েছে, যার সন্ধান সূরাটির বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায়। এর মধ্যে আরও দেখা যায় পরিদৃশ্যমান উপস্থিত পূর্ণাংগ সকল

প্রাকৃতিক দৃশ্য, অতপর সব কিছু এক দীর্ঘ ও অবিচ্ছেদ্য প্রসংগকে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি দিক একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যে বিষয়ে সূরাটির শুরুতে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি।

সামগ্রিকভাবে সূরাটির মধ্যে ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো নূহ (আ.)-এর সময় থেকে নিয়ে মোহাম্মদ (স.)-এর সময় পর্যন্ত। আর এ আলোচনার শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের কথাটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন করে বিষয়টির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে আল্লাহর অন্যতম নেক বান্দা ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনীতে। সেখানে দেখানো হয়েছে একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছে কেমন করে সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অসত্যের অসারতা কেমন করে সত্য সন্ধিৎসু হৃদয়কে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে বিপ্লবী করে তোলে এবং কী চমৎকারভাবে অন্তরের গভীরে সত্য-সঠিক মালিকের জন্যে সাড়া জাগায় এবং এর বহিপ্রকাশ ঘটে জাহেলিয়াতের ধ্যান-ধারণা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে এবং অসত্যের সাথে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। পরিশেষে নিশ্চিন্ত মন সত্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে স্থির হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ প্রশান্তি নেমে আসে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে। তখন অন্তরের মধ্যে সে অনুভব করে এমন এক প্রমাণ ও যুক্তি যা বাহ্যিক যে কোনো যুক্তি-প্রমাণ থেকে বহু বহুগুণে বেশী শক্তিশালী ও জোরালো। এটিই প্রমাণিত হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলীতে। কারণ বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়ার পর যখন সত্য পথের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাকে সত্য পথ দেখিয়ে দিলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'এবং তার জাতি তার সাথে .... কে বেশী যোগ্য?' (আয়াত ৮০)

এরপর আলোচনা প্রসংগ এগিয়ে চলেছে সেই ঈমান সম্পর্কে যা মানুষকে এগিয়ে দেয় চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে, এগিয়ে দেয় সেই পথে যার সন্ধান সর্বকালের সকল রসূল দিয়েছেন। এই ঈমান মোশরেকদের শেরক ও মিথ্যারোপকারীদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ও মূল্যহীন করে দিয়েছে। এই ঈমানই মহান আল্লাহর পথে দৃঢ়তার সাথে থাকতে সাহায্য করে এবং জানায় যে, চিরদিন ঈমানের পথ এক ও অভিন্ন এবং এই ঈমানের বন্ধনেই সর্বকালের সকল দেশের সকল সত্যাশ্রয়ী মানুষ পূর্ব থেকে শেষ অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাদের সম্পর্ক থেকেছে অটুট এবং সত্যের বন্ধনের কারণে পূর্ববর্তী ঈমানদার ব্যক্তিদের পরবর্তীরা অনুসরণ করেছে। এ ব্যাপারে কোন সময়ের মানুষ বা কোন স্থানের মানুষকে অনুসরণ করা হচ্ছে- এ প্রশ্ন কখনও তোলা হয়নি। কোন বংশের লোককে অনুসরণ করা হবে বা কোন বর্ণের লোককে অনুসরণ করা হবে তাও কারো মনে জাগেনি। সুতরাং দেখা গেছে, ঈমানদারদের এ মহান কাফেলা ঈমানের মযবুত রশিতে আবদ্ধ থাকায় স্থান-কাল-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে এক ও অবিচ্ছেদ্য জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

অবশ্য একইভাবে এ একটি ভয়াবহ দৃশ্যও বটে। যা আল্লাহর সেই মহান ভাষণে ফুটে উঠেছে যা মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)-কে সম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে,

'হাঁ, এই হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত। এ হেদায়াতের আলোকে তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। আর, (এরপরেও) তারা যদি শেরক করে তাহলে (যা কিছু ভালো কাজ তারা করছে) তা সব বরবাদ হয়ে যাবে। ওরাই তো সেই সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমি আল্লাহ কেতাব (আসমানী কেতাব), শাসন ক্ষমতা ও নবুওত দান করেছি। এর পরও যদি ওরা কুফরী

করে, তাহলে এসব নেয়ামত এমন এক জাতির হাতে সোপর্দ করবো যারা কোনো ভাবেই এগুলোকে অস্বীকার করবে না। ওরাই হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং তাদেরকে প্রদত্ত এই হেদায়াতেরই অনুসরণ করো। বলো, হে রসূল, তোমাদেরকে এই হেদায়াতের দিকে আহ্বান জানানোর বিনিময়ে আমি কোনো প্রতিদান চাই না। অবশ্যই সারা জগতের সবার জন্যে এ হচ্ছে এক স্মরণিকা।'

নবীর মাধ্যমে সত্যের পথে এইভাবে উদাত্ত আহ্বান জানানোর পর ওই সব ব্যক্তির জন্যে ঘোষণা করা হচ্ছে এক ভীষণ পরিণতির কথা যারা মনে করে যে আল্লাহ তায়ালা কোনো রসূল পাঠাননি,বা কারো ওপর কোনো কেতাব নাযিল করেননি...... আসলে তারা আল্লাহ তায়ালার সঠিক মর্যাদা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে তাদের বুদ্ধি-বিবেক, ঝোঁক-প্রবণতা, দুর্বলতা এবং তাদের দোষ ত্রুটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানাচ্ছেন যে, এসকল সীমাবদ্ধতার কারণে কোনোভাবেই তাদের মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের গুণাবলী আসা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর ইনসাফ ও তাঁর মতো রহমতের অধিকারী হওয়া ... একমাত্র আল্লাহর জ্ঞান, রহমত ও ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতার মাধ্যমেই তাঁর বান্দাদের কাছে রসূল পাঠানো সম্ভব, সম্ভব কোনো কোনো রসূলের কাছে কেতাব পাঠানো, যাতে করে রসূলরা সবাই মিলে মানুষকে তাদের মনিবের কাছে পৌছানোর পথটি দেখাতে পারে, মুক্ত করতে পারে মানুষকে সেই জেহালতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে– যার মধ্যে তারা নিরন্তর হাবুডুবু খাচ্ছে। সকল নবী রসূল মানুষের মনগড়া ব্যবস্থা সমাজের বুকে চালু করার পথ রুদ্ধ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো যেন মানুষ ঐ জাহেলী ব্যবস্থা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতে না পারে এবং মানব নির্মিত কোনো ভুল কাজে সাড়া দিতে না পারে তাদেরকে সেইভাবে শিক্ষা দেয়া। এ বিষয়ে মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত কেতাবের উদাহরণ দেয়া হয়েছে আর এই শেষ কেতাবের কথাও বলা হয়েছে যা পূববর্তী সমস্ত কেতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

অবশেষে দীর্ঘ এ শিক্ষামূলক পাঠটি শেষ করতে গিয়ে চরম ঘৃণার সাথে জবাব দেয়া হচ্ছে ওই ভীষণ মিথ্যারোপের যা ওই হতভাগা ও অপরিণামদর্শীরা আল কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তাঁর ওপর আরোপ করছিলো। কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য ওদের, ওরা নবী সম্পর্কে উক্তি করতে গিয়ে বলছিলো, সে মনে করে যে, তার কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী নাযিল হয়েছে। আরও সে মনে করে যে, এ ধরনের আয়াত পুনরায় কখনও অন্য কেউ পেশ করতে সক্ষম হবে না। যারা ইসলামী দাওয়াত দেয়, তাদেরকে অনেক সময় এই ধরনের কথার মোকাবেলা করতে হয়। যারা এসব কথা বলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ওহী পায় বলে দাবী করে। আবার কেউ কেউ নবুওতের দাবীও করে।

সর্বশেষে, মোশরেকদেরকে কী মর্মান্তিক ও ভয়াবহ পরিণতির শিকার হতে হবে, সেই দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রসংগে,

'তুমি যদি মৃত্যু যন্ত্রনা উপস্থিত হওয়ার সময় যালেমদের অবস্থায় দেখতে পেতে।

অর্থাৎ দেখতে পেতে সেই সময়ে যখন তাদের ওপর জান কবজ করার আযাব শুরু হয়ে যাবে আর ফেরেশতারা তাদের রুহ বের করার জন্যে হাত বাড়াবে রূহ বের করে নেয়ার জন্যে। বলতে থাকবে বের করে দাও তোমাদের প্রাণগুলোকে, আজকে তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে অপমানের আযাব দ্বারা সেই সমস্ত না হক কথার কারণে, যা আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা বলতে

থেকেছো এবং তাঁর নিদর্শনগুলো অহংকার ভরে দেখেও দেখোনি, বরং অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থেকেছো। তোমরা তেমনি করে একাকীই আমার কাছে আসবে যেমন করে প্রথম বারে তোমাদেরকে আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ একাকী অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলাম। আর যে মহান গ্রন্থ আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, সে পবিত্র কালামকে তোমরা তোমাদের পেছনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।

'আজকে কই, তোমাদের সেই সব সুপারিশকারীকে তো দেখতে পাচ্ছি না, যাদেরকে তোমরা তোমাদের কাজের অংশীদার মনে করতে! তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক তো আজ ছিন্ন হয়ে গেছে, আর যে সব জিনিসকে তোমরা সাহায্যকারী মনে করতে তারা আজ সবাই তোমাদের কাছ থেকে সরে গেছে।'

এ সময় নেমে আসবে হৃদয়বিদারক, বেদনাদায়ক ও ভীষণ ভীতিজনক এক দৃশ্য। এ সময়ে শুধু বেইযযতি তিরস্কার ও ধিক্কারই বর্ষিত হতে থাকবে চতুর্দিক থেকে- এটিই হবে অহংকারপূর্ণ ব্যবহার, সত্য থেকে জেনে-বুঝে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং সত্যকে মিথ্যা বলে দাবী করার উচিত প্রতিদান।

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা

এরপর আমরা এই অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনায় যাবো। এর প্রথমেই এসেছে মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সেই অমর কাহিনী, 'আর স্মরণ করে দ্যখো সেই সময়ের কথা .... অংশীদার মনে করে না। (আয়াত ৭৪-৭৮)

আল কোরআনের মধ্যে বর্ণিত এ আয়াতগুলোতে অত্যাশ্চর্য ও অতি চমৎকার এক- দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের স্বভাব প্রকৃতির স্বাভাবিক মননশীলতার দৃশ্য ফুটে উঠেছে প্রথম দৃষ্টান্তটিতে। এ দৃশ্যে মূর্তি পূজার জাহেলী ধারণার প্রতি চরম ঘৃণা ফুটে উঠেছে এবং ঘৃণা প্রদর্শনও করা হয়েছে। তারপর দেখা যায় সত্য, সঠিক ও প্রকৃত ক্ষমতার সেই মালিকের সন্ধানে সুস্থ-বুদ্ধি সম্পন্ন এই মানুষটির চিন্তাধারা গভীর আবেগ ও আগ্রহের সাথে এগিয়ে চলেছে যাঁকে তিনি তার বিবেকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন, তিনি তাঁর স্মৃতি ও অনুভূতির মধ্যে রক্ষিত এ সত্যটিকে প্রকাশ করতে পারেননি। কিন্তু এই তীব্র অনুভূতি সৃষ্টির অন্তরালে দুঃখ-ভারাক্রান্ত, সত্য-সন্ধিৎসু এ মানুষটি সত্য সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে ভাবছেন হয়তো এটিই হবে তার ঈপ্সিত মালিক। এইভাবে মনের গোপন কন্দরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে পেয়ে গেলেন তিনি তাঁর মালিককে। আর এই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে তাঁর মনের গোপন কক্ষে তাঁর মালিকের মতো অনুরূপ কারও অস্তিত্ব তিনি দেখতে পেলেন না। তাঁর সর্বব্যাপী যে গুণাবলী ও ক্ষমতা ছড়িয়ে রয়েছে সৃষ্টি জগতের পাতায় পাতায় অনুরূপ গুণাবলী অন্য কারো আছে বলে কোথাও তিনি দেখতে পাননি। বরং একমাত্র বিশ্বপালক মহান আল্লাহকেই তাঁর সমগ্র মনে প্রাণের মধ্যে সমুজ্জ্বল ও ভাস্বর দেখতে পেয়েছেন। মহা খুশীতে তাঁর তীব্র এই অনুভূতি অগ্রসর হতে থাকে এবং মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে যখন পরিপূর্ণ প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে যায় তাঁর মন, তখন দরদবিগলিত ধারায় নেমে আসে তাঁর আনন্দাশ্রু, আর তখনই তিনি নিশ্চিন্ত মনে মহামূল্যবান এ সত্যের ঘোষণা দিতে শুরু করেন। যে সত্যের সন্ধানে তিনি অস্থির হয়ে রাত-দিন চেষ্টা করেছেন, সে মহা সত্যকে ইবরাহীম (আ.) নিজের মনের মধ্যে খুঁজে পেয়ে চমৎকারভাবে জনগণের সামনে ঘোষণা করেছেন তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই ছোট আয়াতগুলোতে দেয়া হয়েছে।.... এই হচ্ছে হক ও বাতিলের মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক সম্পর্ক। আর আকীদা বিশ্বাসের প্রশ্নে মোমেনরা চিরদিন

একই ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এবং এব্যাপারে কোনো দোষারোপের ভয় সে করে না। আর ঈমানের প্রশ্নে পিতা পুত্রের, পরিবারের, গোত্রের বা জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ারও পরওয়া করে না। ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা ও জাতির সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এই দৃষ্টান্তই স্থাপন করেছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে লক্ষ্য করে বললো, এ মূর্তিগুলোকে কি আপনি ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেন? অবশ্যই আপনাকে ও আপনার জাতিকে আমি স্পষ্ট ভুল পথে দেখতে পাচ্ছি।'

এটিই হচ্ছে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক কথা যা ইবরাহীম (আ.)-এর মুখের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে, স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান এই সত্যানুভূতিই যে তাঁকে হেদায়েতের পথে এগিয়ে দিয়েছে তা নয়, বরং তার সুস্থ বিবেক সর্বপ্রথম তার মধ্যে ভুল পথের কদর্যতার প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে দিয়েছে এবং জানিয়েছে যে, তার জাতি যে সব প্রাণহীন মূর্তির পূজা করে চলেছে তা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অন্যায় কাজ।

ইবরাহীম (আ.)-এর জাতি ইরাকে অবস্থিত ক্যালডিনিয়া ((Caldinian) জাতি উদ্ভূত। তারা গ্রহ নক্ষত্র ও বিভিন্ন মূর্তির পূজা করতো। কিন্তু যিনি সুখ দুঃখের মালিক, যিনি মানুষ ও সকল প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে মানব প্রকৃতির কাছে প্রভু পালনকর্তা ও মালিক এবং বাদশাহ– এসব ক্ষমতার মালিক কোনো পাথরের মূর্তি বা কাঠ-খড় দ্বারা নির্মিত কোনো পুতুল হতে পারে না বলেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বিবেক তাকে জানিয়েছিলো, বিশেষ করে একথা তাঁর মনে প্রশ্নের ঝড় তুলেছিলো যে, এসব মূর্তি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কারো কোনো প্রয়োজন মেটাতে পারে না, কোনো কিছু শোনে না বা জবাবও দিতে পারে না। সে অবস্থায় কি করে তাদের সামনে মাথা নতো করা যায়, কি ভাবেই বা তাদের পূজা করা যায়! আর একথা বুঝার জন্যে বেশী কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, সাধারণ দৃষ্টিতেই তাদের এসব দুর্বলতা ধরা পড়ে। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই তাদের পূজা করা চলে না বা সঠিক মালিকের কাছে পৌঁছানোর জন্যে মাধ্যম হিসাবেও তাদেরকে গ্রহণ করা যায় না।

এই কারণেই প্রথম দৃষ্টিতে ইবরাহীম (আ.)-এর সুস্থ বিবেকের কাছে তাদের এসব কাজ অন্যায় বলে মনে হয়েছে। এটিই আল্লাহ প্রদত্ত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির কাছে সত্যের পক্ষে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা পড়েছে। তারপর এই সুস্থ বিবেকের কাছে তৎকালীন লোকের অযৌক্তিক ও ভুল কাজগুলো অপ্রিয় ও ঘৃণ্য মনে হয়েছে। তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছে প্রকৃত সত্য কথাটি আর সত্যের এই অনুভূতিই আকীদার মূল কথা। তাঁর এই অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়ে নাযিল হচ্ছে,

'তুমি কি মূর্তিগুলোকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো? অবশ্যই আমি তোমাকে ও তোমারজাতিকে সুস্পষ্ট ভুল পথে দেখতে পাচ্ছি।'

ওপরের একথাটি ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে লক্ষ্য করে বলছেন। আর এমন নম্র, ভদ্র, দরদী, সহিষ্ণু ও উন্নতমানের এবং নরম মেযাজের ছেলের কথা যার মহৎ গুণাবলী কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার আপত্তির বিষয়টি ব্যক্তিগত কিছু নয়, এ হচ্ছে মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের বিষয়। এ বিষয়ে কোনো আপোষ করা সম্ভব নয়, যেহেতু এ মৌলিক বিশ্বাসের গুরুত্ব সব কিছুর ওপরে, এমনকি বাপ বেটার সম্পর্ক থেকেও এর গুরুত্ব অনেক অনেক বেশী, সহ্য-শক্তি

ও বিনয়-নম্রতার গুরুত্ব থেকেও এর গুরুত্ব অনেক উর্ধে। আর আল্লাহর রহমতে ইবরাহীম (আ.) ছিলেন এমন দৃঢ়চেতা ও সত্য প্রবক্তা যে, আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানের জন্যে তার ওইসব মহান গুণাবলী অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার এই সত্যানুভূতি ও দৃঢ়চিত্ততাকে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে এক অনুপম আদর্শ হিসাবে স্থাপন করেছেন।

আর ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্দর সুমহান ও বিশুদ্ধ গুণাবলীর জন্যে এটিই ছিলো উপযুক্ত ভূমিকা, তার পরম সত্য নিষ্ঠার জন্যে এই ছিলো পরম মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপ। এই মহামূল্যবান গুণাবলী দ্বারা তাঁকে সজ্জিত করা হয়েছিলো যেন তিনি সৃষ্টির গোপন রহস্যের দ্বারোঘাটন করতে পারেন এবং সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সত্য পথের জীবন্ত দিশা খুঁজে পেতে পারেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর এমনি করেই আমি, ইবরাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান (আমার) ক্ষমতা দেখিয়েছি, আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন সে দ্বিধাহীন ও অবিচল বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

এই রকমই সুন্দর সুস্থ এবং উন্মুক্ত এই অন্তর্দৃষ্টি, সত্যের জন্যে এই পরম নিষ্ঠা এবং অসত্যকে অস্বীকার ও প্রতিরোধের এই অমিয় শক্তির মধ্য দিয়েই আমরা দেখতে পাই কেমন করে ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন, দেখতে পেয়েছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহর ক্ষমতা .... আর আমরাও সৃষ্টির গোপন বহু রহস্য সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি এবং দেখছি মহান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বিছানো রয়েছে সারা বিশ্বের প্রতিটি পাতায় পাতায়। আরও আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষের অন্তরের মধ্যে, তার প্রকৃতির মধ্যে এবং এই রহস্যময় পৃথিবীর মধ্যে ঈমানকে সতেজকারী বহু প্রমাণাদি, যার ফলে বিভিন্ন অহংকারী ও মনগড়া ক্ষতাধরদের ক্ষমতার অসারতার কথা মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং প্রকৃত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমতার কথা হৃদয়ের অভ্যন্তরে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে যায়।

আর এটিই হচ্ছে স্বভাব প্রকৃতির স্পষ্ট ও গভীর দাবী। এ বিশ্ব চরাচর এক বিশাল জ্ঞান ভান্ডার। পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার শত চেষ্টাতেও এই জ্ঞান ভান্ডারকে মুছে দিতে পারে না এবং যে কোনো চোখ অবশ্যই আল্লাহ পাকের রহস্যময় সৃষ্টিজগতের মধ্যে তাঁর অত্যাশ্চর্য কীর্তিসমূহ দেখতে পায় এবং মানুষের চিন্তাশক্তির সামনে খুলে যায় সেই দৃশ্যাবলী যা তাকে বহু গোপন রহস্য ভান্ডারের খবর জানিয়ে দেয়। এইভাবেই এসে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা এবং এটাই হয় সত্যপ্রাপ্তির পথে চূড়ান্ত সংগ্রামের আশু প্রতিদান।

আর এভাবেই ইবরাহীম (আ.) অগ্রসর হলেন, আর এই পথ-পরিক্রমায় তিনি পেয়ে গেলেন তাঁর আরাধ্য আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া আয়ালাকে। তাঁকে পেলেন তিনি তাঁর অনুভূতির মধ্যে এবং তাঁর হৃদয়-গহ্বরে। এইভাবে তাঁকে পাওয়ার পর তাঁর প্রকৃতি এবং বিবেকের কাছে এই প্রাপ্তি যথেষ্ট বলে মনে হলো। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর অন্তরের গভীরে খুঁজে পেলেন এবং তাঁর অনুভূতির মধ্যে তীব্রভাবে অনুভব করলেন– এই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রকৃতি ও বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং পরম সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী নবী ইবরাহীম (আ.)-এর প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে এবং পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে তাঁর পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ পথে চলা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। আপাত দৃষ্টিতে এ পথে চলা তুচ্ছ ও সহজ ব্যাপার মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এপথে চলা খুবই বিপদসঙ্কুল ও দুরূহ ব্যাপার।

মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঈমানের যে বীজ নিহিত রয়েছে, সেই ঈমানী শক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত ঈমানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, আর তখনই সেই ঈমানী যিন্দেগীতে আল্লাহর নির্দেশিত কর্তব্যগুলো এবং আইন-কানুন চালু হয়ে যায়। এমন সব কর্তব্য তখন তার ওপর এসে পড়ে যেগুলোকে শুধুমাত্র তার যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার বিবেচনার ওপর আল্লাহ তায়ালা কখনও ছেড়েনি। বরং তিনি নবীদের মাধ্যমেই তাদেরকে সঠিকপথ দেখিয়েছেন। সকল নবীকেই তিনি দান করেছেন তাঁর নিজের পক্ষ থেকে মহামূল্যবান বার্তা। এই বার্তাই ছিলো তাঁদের হাতে সত্য জীবন ব্যবস্থার প্রমাণ। তারা শুধু তাদের স্বভাব প্রকৃতি বা মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হননি, বরং আল্লাহর বাণীকে তাদের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে সেদিন পেশ করা হবে। আল্লাহর সুবিচার ও মেহেরবাণী বর্ষণ করার জন্যেই তাদের হিসাব নেয়া হবে এবং হিসাব নেয়া হবে মানব জন্মের তাৎপর্য ও জ্ঞানকে পরীক্ষা করার জন্যেও বটে।

ইবরাহীম (আ.) যেভাবে আল্লাহকে খুঁজে পেলেন

এখন দেখুন ইবরাহীম (আ.)-এর অবস্থা। তিনি তো সেই ইবরাহীম যিনি ছিলেন আল্লাহর অন্তরংগ বন্ধু এবং মুসলিম জাতির পিতা। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তাকে রাত্র ঢেকে ফেললো, তখন সে দেখলো দিগন্ত বলয়ে একটি উজ্জ্বল তারকা আর তখনই সে বলে উঠলো, এটিই আমার রব (মনিব-মালিক), কিন্তু যখন এটি ডুবে গেলো তখন সে বললো, না, ডুবে যাওয়া কোনো জিনিসকে আমি রব হিসেবে কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না।

ইবরাহীমের ব্যক্তিত্বের বহিপ্রকাশে ছিলো একটি বিশেষ অবস্থা, অর্থাৎ উজ্জ্বল তারাটিকে ডুবে যেতে দেখে তাঁর মনে ওই তারাটির শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে বিরাট সন্দেহ জেগে উঠলো, তাঁর মনের মধ্যে ওই তারাটির প্রতি তীব্র তাচ্ছিল্য বোধ জেগে উঠলো, যা তার পক্ষ থেকে দৃঢ়-ভাবে অস্বীকার করারই শামিল ছিলো। অথচ ঐ একই সময়ে তাঁর পিতা ও গোটা জাতি ওই তারকাসহ আরও বিভিন্ন জড় পদার্থের পূজা করতো, পূজা করতো নিজেদের তৈরি বহু মূর্তির। এই সময়ে তার অজান্তেই ওইসব জিনিসের শক্তি সম্পর্কে তার সকল বিশ্বাস খতম হয়ে গেলো এবং তিনি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। এই অবস্থার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল কোরআন বলছে,

'তারপর রাত্রি যখন তার ওপর এসে তাকে আচ্ছাদিত করে ফেললো।'—

একথায় মনে হয় যেন রাত একা তাকেই ঘিরে ফেলেছে এবং রাতের অন্ধকার আশপাশের অন্য কাউকে ঘিরে ফেলেনি। প্রকৃতপক্ষে এ বাক্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রাতের অন্ধকার তাকে ছেয়ে ফেলার সাথে সাথে তার চিন্তার উদ্রেক করলো, অনুভূতি তীব্রতর হলো এবং গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন হয়ে গেলেন। আর নবতর এই চিন্তাই তাকে আরও অগ্রসর হয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং পুনরায় নতুনভাবে তাঁকে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যখন সে দেখলো শুভ্র সমুজ্জ্বল সন্ধ্যা তারাটিরে দেখে, বললো, এই তো আমার রব।'

আর এসময়ে অবস্থা ছিলো এই যে, তার দেশবাসী সকল অলীক দেব-দেবতার মূর্তিসহ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা-অর্চনা করতো, যার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। তারপর ইবরাহীম এগুলোর ক্ষমতাধর সর্বময় মালিক হওয়ার ব্যাপারে যখন হতাশ হয়ে পড়লেন, হতাশ হয়ে পড়লেন ওই সব মেকী দেব-দেবতাদের মধ্যে তাঁর প্রকৃত পাওয়ার প্রশ্নে, যাকে তিনি তার ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে এবং অবচেতনভাবে তার অন্তরের গভীরে অনুভব করেছিলেন এবং যাকে তিনি

কোনো মূর্তির মধ্যে পাচ্ছিলেন না। অবশ্য এসময়ে হয়তো তিনি আশা করছিলেন তাঁর আকাংখিত সত্ত্বার সন্ধান তিনি পাবেন সেই সব জিনিসের মধ্যে যাদের পূজা তার জাতি করে চলেছিলো।

তার জাতি যে সব গ্রহ উপগ্রহ ও তারকারাজির সামনে পূজার উদ্দেশ্যে মাথা নত করছিলো– এটা তিনি যে একেবারে প্রথম দেখতে পেলেন তা নয় বা ওই যে উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারাটিরে এই প্রথম বারের মতো পূজা করতে দেখলেন তাও নয়, আর ইবরাহীম যে জীবনে এই প্রথম বারেই সন্ধ্যা তারাকে দেখলেন তাও ঠিক নয়, কিন্তু আজকে রাতে তিনি যখন ওই তারকাটি হঠাৎ করে দেখলেন, তখন সে তারাটি যেন তার সাথে সরাসরি কথা বলে উঠলো, যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি এবং তার কাছে যেন গায়েব থেকে নতুন এক বার্তা পৌঁছে দেয়া হলো, যা তাঁর এতোদিনকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে অপসারিত করে দিলো এবং দূর করে দিলো সেই মহা চিন্তা-ভাবনাকে যা তার গোটা সত্ত্বাকে ছেয়ে রেখেছিলো। আর এই চিন্তার কারণেই তিনি কখনও একে ভেবেছেন রব, আবার কখনও ওকে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, কারও ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তার এই উৎকণ্ঠার দিকে ইংগিত করে এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, এই তো আমার রব'।

এতে দেখা যাচ্ছে, আপতদৃষ্টিতে মনে হয়, তার সামাজিক মর্যাদার কারণে ও তার নিজের ভুল জ্ঞানের কারণে মনে হয়েছে, হয়তো হবে এটা একজন (প্রতিপালনকর্তা), কিন্তু না! তার সুস্থির চিন্তাধারার কাছে এটা অবশ্যই ভুল ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তা ডুবে গেলো, তখন সে বলে উঠলো, না, আমি অস্ত যাওয়া কোনো জিনিসকে মোটেই পছন্দ করি না।'

মহান আল্লাহকে দৃষ্টির সীমার বাইরে অবশ্যই তুমি পাবে। হাঁ, সৃষ্টির গন্ডির বাইরে তিনি রয়েছেন, এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে কে পরিচালনা করছে এ সমগ্র সৃষ্টিকে, আর কেই বা এর সকল কাজকে সম্পাদন করে চলেছে? প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিচালকের হাত যদি এর পেছনে না থাকবে তাহলে কে রক্ষণাবেক্ষণ করছে সবাইকে! সুতরাং গায়েব বা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া 'এ বস্তু' অবশ্যই আমাদের 'রব' (সকল সৃষ্টির পালনকর্তা) হতে পারে না।

এ হচ্ছে যুক্তিবুদ্ধির স্বাভাবিক সব থেকে নিকটবর্তী, ও স্পষ্ট অর্থ ....এর দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে অর্থটি বেরিয়ে আসে, তা মানুষের মনের মধ্যে অবস্থিত যুক্তি বুদ্ধির সাথে পরোপুরি সামঞ্জস্যশীল এবং তা সরাসরি মানুষের বিবেককে স্পর্শ করে। গোটা মানব জাতি গভীর ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতেই দৃঢ়তার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত......। এরশাদ হচ্ছে,

'ডুবে যায় এমন কিছুকে তো আমি রব হিসেবে পছন্দ করতে পারিনা।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের প্রকৃতি ও তার মালিকের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা হচ্ছে মহব্বতের সম্পর্ক, আর এটিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষ আন্তরিক সম্পর্ক। ইবরাহীম (আ.)-এর স্বভাব প্রকৃতি কিছুতেই ডুবে যাওয়া জিনিসকে পছন্দ করতে পারেনি, যার কারণে তাদেরকে তিনি সর্বশক্তিমান মনিব বলেও মেনে নিতে পারেননি। ইলাহ তো তিনিই যাকে মানুষের স্বভাব প্রকৃতি অবশ্যই পছন্দ করবে.... যার অস্তিত্ব কখনো অনুপস্থিত বা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন চাঁদকে সে উদিত হতে দেখলো, বলে উঠলো, এটিই আমার রব, তারপর যখন এটা ডুবে গেলো তখন সে বললো, না, আমার প্রকৃত মালিক যদি আমাকে সঠিক পথটি না দেখান, তাহলে অবশ্যই আমি ভুল পথের পথিক হয়ে যাবো।'

অভিজ্ঞতা মানুষের বারবার হয়। এখানে কথার সুরে মনে হচ্ছে, যেন ইবরাহীম (আ.) ইতিপূর্বে কখনও চাঁদকে দেখেননি এবং তাঁর পরিবারের লোক ও তাঁর জাতিকে এর পূজা করাটাও

তাঁর নযরে পড়েনি! ওই একটি রাতেই আসলে তিনি নতুন করে চাঁদকে দেখলেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'সে বললো, এটিই তো আমার রব।'

হাঁ, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আদিগন্ত ধরিত্রির বুকে যখন বিস্তৃত হয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে সারা আকাশ জুড়ে তার রূপালী আভা, তখন তার প্রতি অবশ্যই ভালোবাসার একটি আবেগ এসে যায়। কিন্তু হায়, এও যে একসময় ডুবে যায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে রব তো তিনি, যাঁর সম্পর্কে ইবরাহীম (আ.)-এর সুস্থ প্রকৃতি ও অন্তর বলছিলো যে, অবশ্যই তাঁর কোনো ক্ষয় নাই, লয় নেই। কোনো কালে সে মহান সত্ত্বা অদৃশ্য বা অনুপস্থিত হয় না।

ইবরাহীম (আ.) তাঁর তীব্র অনুভূতির এই পর্যায়ে এসে বুঝতে পারছিলেন যে, আল্লাহকে জানতে, বুঝতে ও তাঁর সান্নিধ্য পেতে হলে সরাসরি তাঁরই সাহায্য প্রয়োজন, যাঁকে তিনি তাঁর অন্তরের গভীরে এবং তাঁর বিবেকের মধ্যে অনুভব করেন। তিনি সেই মনিব, যিনি তাঁকে ভালোবাসেন, কিন্তু এরপর তিনি তার মালিককে অন্তরের মধ্যে ধরে রাখতে পারেননি, তাই তিনি এই মনে করে অস্থিরতা অনুভব করছিলেন যে, যদি তার মালিক সঠিক পথ পাওয়ার ব্যাপারে তাকে সহায়তা না করেন, প্রসারিত না করেন তাঁর সাহায্যের হাত এবং তাঁকে পাওয়ার পথ তার সামনে উন্মুক্ত না করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি পথহারা ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন এবং অবশ্যই পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'তিনি বললেন, যদি আমার রব আমাকে হেদায়াত না করেন, তাহলে আমি হয়ে যাবো পথভ্রষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত।'

আবারও দেখুন এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর যখন তিনি দেখলেন সূর্যকে..........আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (আয়াত ৭৮)

আকাশের দৃশ্যমান ও সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত এবং উজ্জ্বল জোতিষ্ক হচ্ছে সূর্য। প্রতিদিনই তো সূর্য উদিত হচ্ছে ও দিন শেষে অস্তমিত হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ করে আজকের দিনে ইবরাহীম (আ.)-এর চোখে এ মহা জ্যোতিষ্ক নতুন এক রূপ নিয়ে দেখা দিলো। এটা ছিলো তার জন্যে তৃতীয় পরীক্ষা। আজকে যেন কেন তার চোখে সব কিছু নতুন রূপ ও মাধুর্য নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, যার দ্বারা তিনি নিশ্চিন্ততা লাভ করছিলেন এবং যার কাছে পৌঁছে তার মন নিশ্চিন্ত হচ্ছিলো। আর বহু অস্থিরতা ও বহু চেষ্টা-সংগ্রামের পর গিয়ে আজ তার মনের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি এসে গেলো।

তাঁর মনের সেই অবস্থাটি আল্লাহ তায়ালা নিজেই তুলে ধরেছেন,

'এটিই আমার রব, কারণ যা কিছু দেখেছি তার মধ্যে এটিই সব থেকে বড়।'

কিন্তু হলে কি হবে, এটাও তো ডুবে যায়............।

আর এখানে এসেই তাঁর মনের মধ্যে খোদ প্রকৃত মালিকের কাছে দোয়া এসে গেলো যে, স্বয়ং তিনিই তাঁকে পথ দেখান। আর এর পরপরই আল্লাহর নূরের সাগরে জোয়ার এসে গেলো এবং মানবপ্রকৃতি ও আল্লাহর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলো, তাঁর অন্তরে সত্যের নূর গভীরতর হতে থাকলো আর সে নূরের আভা ছড়িয়ে ছিলো তাঁর বুদ্ধি ও স্মৃতিতে। এই পর্যায়ে এসে ইবরাহীম (আ.) পেয়ে গেলেন মূল মালিককে, পেলেন তাঁকে অন্তরের গভীরে ও তার অনুভূতিতে, যা পূর্বে তার অস্তিত্বের মধ্যে তার রক্ত মাংসের সাথে মিশে ছিলো, মিশে ছিলো তার বিবেকের সাথে কিন্তু প্রকাশিত হতে পারছিলো না। আজ এখানে এসে তার প্রাকৃতিক গোপন অনুভূতি এবং স্পষ্ট বুদ্ধি সংগত ধ্যান ধারণার মধ্যে ঘটে গেলো এক মহা সমন্বয়। এ পর্যায়ে

এসেই ইবরাহীম (আ.) পেয়ে গেলেন তার মালিকের সন্ধান, অথচ ইতিপূর্বে এই সন্ধান আর কখনও পাননি উজ্জ্বল সন্ধ্যায় তারার মধ্যে, পাননি স্নিগ্ধ চাঁদের মধ্যে এবং পাননি দেদীপ্যমান সূর্যের মধ্যে। ইতিপূর্ব আল্লাহ করীমের সন্ধান পাননি ওই সকল জিনিসের মধ্যেও, যা নিশিদিন তাঁর চোখে পড়েছে বা তাঁর অনুভূতিতে এসেছে। আজকেই তিনি পেয়ে গেলেন তাঁকে তার অন্তরের মাঝে তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে, তার বুদ্ধিতে, তার স্মৃতিতে এবং চতুপার্শ্বে অবস্থিত সব কিছুর মধ্যে। তিনি আজ রব্বুল আলামীনকে দেখতে পেলেন যা কিছু মানুষের দু'চোখে পড়ে যা সে অনুভব করে এবং যা তার বুদ্ধিতে আসে সে সকল কিছুর স্রষ্টা হিসাবে।

আর এই স্তরে এসে তিনি সঠিকভাবে বুঝলেন তার ও তার জাতির মধ্যে বিরাজমান পরিপূর্ণ দূরত্ব সম্পর্কে যেহেতু তারা অলীক ও অসার দেব দেবীর পূজায় লিপ্ত ছিলো। আজকেই তিনি সম্পূর্ণভাবে শেরেকী ধ্যান ধারণা থেকে মুক্ত হলেন এবং তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন। ওই মোশরেকরা আজকে আর ধোকাবাজির মাধ্যমে তাঁকে শেরকের মধ্যে ধরে রাখতে পারলো না বা বিভ্রান্ত করতেও সক্ষম হলো না। অবশ্য এটা সত্য কথা যে, ওই মোশরেকরা আল্লাহকে যে অস্বীকার করতো, তা নয়, তাঁর সাথে অন্য বহু অলীক দেব দেবীকে অংশীদার মনে করতো মাত্র। অপরদিকে তিনি খালেসভাবে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতায় ভাগীদার থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তাই কালামে পাক জানাচ্ছে,

'সে বললো, হে আমার জাতি, তোমরা যে সব জিনিসকে আল্লাহর সাথে শরীক করছো, আমি সে সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমি আমার মুখকে একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সেসব কিছুকে এবং আমি মোশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টার কাছে এইভাবে মুখ ফেরানোই কাম্য। একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দিকে এইভাবে যে রুজু করে, সে শেরকের দিকে কখনও আর ফিরে আসে না। মোশরেকদের সাথে তার পুরোপুরি বিচ্ছেদ ঘটে যায়, মনের মধ্যে পরিপূর্ণ স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর পরই এইভাবে আল্লাহ তায়ালার দিকে মন রুজু হয় আর এরপর সুস্থ বুদ্ধির মানব মনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ থাকে না, থাকে না কোনো আশ্চর্যের অনুভূতি সেই সব জিনিসের জন্যে, যা সত্যের ব্যাপারে তার বিবেকের মধ্যে প্রতীতি জন্মিয়েছে।

পুনরায় আর একবার আমরা সেই চমৎকার ও অত্যুজ্জ্বল দৃশ্য দেখতে পাই, আর সে দৃশ্য হচ্ছে গভীর বিশ্বাসের দৃশ্য, যা অন্তরের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এবং মনকে গভীর আবেগে আপ্লুত করে ফেলে, আকীদা-বিশ্বাসের দিকটি জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে মুক্ত হওয়ার পর যখন আমরা জাগ্রত মানবতাকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পাই, তখন এই জাগ্রত মানবতার ওপর আর কোনো কিছুই মর্যাদাবান বা মূল্যবান মনে হয় না। এসময়ে মোমেনের মনের মধ্যে তার সেই মহান রব সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা ও অনাবিল এক প্রশান্তি এসে যায়, যাঁকে তার অন্তরের মধ্যে, তার বুদ্ধিতে এবং তার চতুর্দিকের সব কিছুর মধ্যে সে খুঁজে পায়। এ এমন এক দৃশ্য যে অবাক বিস্ময়ে সেই দিকে সত্যাশ্রয়ী মানুষ তাকিয়ে থাকে, যার সৌন্দর্য সম্পর্কে পরবর্তী ছত্রে আরও সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তার জাতির বিতর্ক

ইবরাহীম (আ.) তাঁর বিবেক ও বুদ্ধি এবং চারিদিকের সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার অস্তিত্বকে দেখার কাজ সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর হৃদয় নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো এবং তার গোটা নেমে এলো দেহে এক অনাবিল প্রশান্তি। তিনি আল্লাহর সাহায্যেই (তাঁকে) অনুভব করলেন এবং তার পদযুগল তাঁরই সরাসরি সহায়তায় পথ চলতে শিখল। আর এই সময়েই তার জাতি তার সাথে সেই বিষয়ে বিতর্কে নেমে গেলো, যে বিষয়ে গভীর বিশ্বাসে সুদৃঢ় এবং তৌহিদী বিশ্বাসে তার বুক ভর্তি। তার জাতি তাকে ওদের দেব-দেবীদের ভয় দেখালো যাদের সম্পর্কে তার মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদের কোনোই ক্ষমতা নেই। আর এ কারণে তিনি পরিপূর্ণ মযবুত মন নিয়েই তাদের মোকাবেলা করলেন, মোকাবেলা করলেন অবিচল ঈমান নিয়ে এবং প্রকাশ্য ও গোপনে তার পবিত্র মনিবের সেই ক্ষমতা ও শক্তি নিজ চোখে দেখার মহাশক্তি দ্বারা তিনি বলীয়ান হলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তার জাতি..........কাজে লাগাও তাহলে তোমরা বুঝবে! (আয়াত ৮০)

মানুষ যখন নিজ স্বভাব প্রকৃতি ও বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে, তখনই সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তারপর ভুল পথে থাকার মেয়াদ এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, একের পর এক সে ভুল করতেই থাকে এবং এতো বেশী ভুল তার জীবনে এসে যায় যে, তার পক্ষে সঠিক পথে ফিরে আসা আর সম্ভব হয় না। এই কঠিন অবস্থাই হয়েছিলো ইবরাহীম (আ.)-এর জাতির। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, গ্রহ-উপগ্রহ ও তারকারাজির পূজা করতো। তাদের কাজগুলো অর্থপূর্ণ কি না, সে বিষয়ে তারা মোটেই চিন্তা ভাবনা করতো না। আর ইবরাহীম (আ.) যে জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, সে বিষয়ে তারা মোটেই চিন্তা করার দরকার মনে করতো না। তাদের সমাজেও এমন কোনো ব্যক্তি ছিলো না, যারা তাদেরকে এসব বিষয়ে চিন্তা করতে আহ্বান জানাতে পারতো। এর পরিবর্তে, তারা দল বেঁধে তার সাথে বিতর্ক ঝগড়া করতে এগিয়ে এলো। এভাবে তারা তাদের ওই নীচ ধারণার মধ্যেই হাবুডুবু খেতে লাগলো এবং সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যেই রয়ে গেলো।

কিন্তু ইবরাহীম তো ছিলেন একজন খাঁটি মোমেন, যার অন্তরের মধ্যে, যার বিবেক বুদ্ধি ও গোটা সত্ত্বার মধ্যে ঈমানের এই অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালা টের পেয়েছিলেন। এরই ফলে ইবরাহীম (আ.) দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে ওই সব ভুল কাজের বিরোধী ছিলেন। তাই বলা হচ্ছে,

'সে বললো, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে তর্ক করছো, অথচ তিনি তো (নিজেই) আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন!'

উক্ত আয়াতাংশে বলা হচ্ছে, তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করছো, অথচ তিনি তো আমাকে নিজে হাত ধরে হেদায়াতের পথে এগিয়ে এনেছেন, তিনি নিজেই আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যে এবং তাঁকে চেনার ক্ষমতা তিনি নিজেই দিয়েছেন। .... তিনি হাত ধরে আমাদের তাঁর দিকে পরিচালনা করেছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি সবখানে এবং সর্বদা বর্তমান আছেন। আর আমার মনের মধ্যে এই হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তাঁকে আমার অন্তরের মধ্যে দেখতে পেয়েছি এবং আমার জ্ঞানের মধ্যে তাঁকে আমি খুঁজে পেয়েছি, ঠিক যেমন করে পেয়েছি তাঁকে গোটা সৃষ্টি লোকের সবখানে। সুতরাং তোমাদের তর্ক বিতর্ক এমন একটি বিষয়ে, যার সত্যতা আমি, আমার মনের মধ্যে পেয়েছি। কাজেই এ বিষয়ে আমার আর কোনো দলীল প্রমাণ দরকার নাই। তিনি যে আমাকে, তাঁর দিকে যাওয়ার জন্যে পথ দেখিয়েছেন এটিই আমার দলীল!

'আর আমি ভয় করি না (সেই সব জিনিসকে), যাদেরকে তোমরা তাঁর সাথে শরীক করছো।'

আর যে আল্লাহকে পেয়ে গেছে, সে কি করে অন্য কাউকে ভয় করবে? কি ভাবে ভয় করবে এবং কাকেই বা ভয় করবে? আল্লাহর শক্তি ব্যতীত অন্য যতো শক্তি আছে সবই তো তুচ্ছ এবং আল্লাহর ক্ষমতা ছাড়া অন্য যতো ক্ষমতা আছে তা মোটেই ভয় করার মতো নয়।

ইবরাহীম (আ.) ছিলেন পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণকারী। তিনি তার নিজেকে এই সঁপে দেয়ার মধ্যে কোনো কমতি রাখতে চান নাই। তিনি ছিলেন আল্লাহর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং মনে করতেন সবই আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে।

'তবে অন্য কোনো কিছুর পরওয়া করাটা যদি কিছু আমার রব চান তো সে স্বতন্ত্র কথা, আমার রব সব কিছুরই খবর রাখেন।'

এতে বুঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর ওপরই পুরোপুরি ভরসা করেছেন, তাঁর সাহায্য এবং তাঁরই পরিচালনার ওপর নির্ভর করেছেন। আর তিনি ঘোষণা করছেন যে, তিনি ওদের এই সমাজের মোশরেক সমাজপতি শাসক ওই সব দেব দেবীকে কিছু মাত্র ভয় করেন না। যেহেতু তিনি তাঁরই সাহায্য ও পরিচালনার ওপর নির্ভর করেন এবং তিনি জানেন আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো বিপদই আসে না এবং তাঁর জ্ঞান সব কিছুর ওপরেই ছড়িয়ে রয়েছে।

'আর কিভাবে আমি তাদেরকে ভয় করবো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক করেছ, অথচ তোমরা যে আল্লাহর সাথে শরীক করছো এতে তোমরা কোনো ভয় করছো না, যে বিষয়ে কোনো প্রমাণ আল্লাহ তায়ালা নাযেল করেননি। অতএব এই দুই দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তা পাওয়ার বেশী অধিকারী, বলো, যদি তোমরা তোমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে থাকো!

এই হচ্ছে সেই বিশ্বস্ত মোমেনের যুক্তি, যে এই সৃষ্টির মধ্যে সত্যের সন্ধান পেয়েছে। অবশ্য অন্য কেউ ভয় করলেও ইবরাহীম (আ.) ভয় করার পাত্র ছিলেন না। সেই ব্যক্তিও কখনও ভয় করবে না যে তার হাতকে আল্লাহর হাতে রেখে দিয়েছে এবং তাঁরই পথে চলতে শুরু করেছে। আর যেসব নির্বোধের অক্ষম ওই দেব-মূর্তিগুলোকে নিজেদের হাতে বানিয়েও ওই সব দেবতার পূজা পার্বণকে টিকিয়ে রাখতে চায় দুনিয়ার সেই সব যুলুম বাজের সকল ক্ষমতাও পরিশেষে আল্লাহর ক্ষমতার সামনে খতম হতে বাধ্য। ইবরাহীম কি ভাবে এসব ক্ষমতাহীন দেব-দেবীর সামনে ভয়ে মাথা নত করবেন, অথচ তারা যে বিনা যুক্তিতে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতায় অন্যদের ভাগীদার বানাচ্ছে, সে বিষয়ে তারা আল্লাহর আক্রোশের ভয় করছে না। এটা তারা মোটেই হিসাব করছে না যে, জড় বা জীবিতের মধ্যে কোনো জিনিসেরই কোনো শক্তি নাই। এমতাবস্থায় এই দু'দলের মধ্যে কে বেশী নিরাপত্তার অধিকারী? যে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং তাঁর ক্ষমতায় কোনো শরীক মানতে অস্বীকার করে? না, যে অযৌক্তিকভাবে আল্লাহর ক্ষমতায় অন্যকে অংশীদার মনে করে? ভেবে দেখো একবার, নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে সত্যিকারে কার? হায়, ওদের যদি কিছুমাত্র জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকতো!

একথার জওয়াব আসছে আরশে মোয়াল্লা থেকে এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ বিষয়ের ফয়সালা করে দিচ্ছেন,

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে তারা যুলুমের সাথে সংমিশ্রিত করে নাই, তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা লাভের বেশী অধিকার এবং (প্রকৃতপক্ষে) তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।'

ঈমান যারা এনেছে এবং যুলুম করে করে তাদের ঈমানকে যারা কলুষিত করেনি, বরং কিছুতেই সেই সত্যপন্থীরা তাদের সামনে যুক্তিহীনভাবে মাথা নত করে না বা তাদের অন্ধ

আনুগত্যও করে না এবং অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের মুখাপেক্ষীও হয় না, তাদের জন্যেই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

এটিই ছিলো সেই যুক্তি, যা আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে সরাসরি দান করেছিলেন, যাতে করে এই যুক্তি দ্বারা তিনি ওদের কূটতর্ককে খন্ডন করতে পারেন। আর সত্যিকারে বলতে কি, তাদের কল্পনার হীনতা তাদের নিজেদের কাছে প্রকাশ পেয়েও গিয়েছিলো এবং তারা পরিষ্কার বুঝছিলো যে, এসব দেব দেবী ও অহংকারী অত্যাচারী আসলে কারো কোনোই ক্ষমতা নাই। তারা এসব নিরর্থক কাজ করে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তা ও আসল মালিককেই যে অস্বীকার করছিলো তা নয় এবং গোটা সৃষ্টি জগতের ক্ষমতাধর এবং মূলশক্তি যে একমাত্র আল্লাহ, তাও তারা অস্বীকার করতো না, বরং তারা এই দেবতাদেরকে মনে করতো যে, তারা আল্লাহর ক্ষমতায় কিছু অংশীদার মাত্র। তারপর ইবরাহীম (আ.) যখন তাদের মুখোমুখি হলেন, বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেকে নিশেষে বিলিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না, তার অবশ্যই ভয়ের কোনো কারণ নাই, বরং যে আল্লাহর সাথে শেরক করে, তারই তো ভয় করার কথা। এরপর তিনি যখন আল্লাহ প্রদত্ত এসব যুক্তি প্রমাণ নিয়ে তাদের মোকাবেলা করলেন, তখন তাদের সব খোঁড়া যুক্তি খানখান হয়ে ভেংগে গেলো এবং তাঁর যুক্তিই জয়ী হলো, আর ইবরাহীম (আ.) তার আকীদা বিশ্বাস, তার যুক্তি ও মর্যাদাকে সমুন্নত করতে সক্ষম হলেন। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে চান, তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। যার ফলে সে তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সাহাবাদের সাথে কোরআনের সম্পর্ক

'নিশ্চয়ই, তোমার রব মহা বিজ্ঞানময় জাননেওয়ালা।'

আয়াতটির আলোচনা শেষ করার পূর্বে রসূল (স.)-এর সাহাবাদের যামানায় যে স্বর্ণযুগ বিরাজ করতো এখানে সেই শান্তিপূর্ণ যুগের একটি ছবি তুলে ধরতে চাই। এ সময়ে আল কোরআন ধীরে ধীরে নাযিল হচ্ছিলো, যার অমিয় সুধা সাহাবায়ে কেরাম আকণ্ঠ পান করছিলেন, তারা কোরআনের সাথেই নিজেদের জীবনকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন এবং কোরআনের আলোকে প্রাপ্ত জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলছিলেন, এ মহান গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী মেনে চলছিলেন এবং এর চির জীবন্ত দলীল ও উদ্দীপক আয়াতগুলো দ্বারা তারা ধন্য হচ্ছিলেন, এর আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলছিলেন এবং সর্বতোভাবে এবং এক আশ্চর্যজনক আকর্ষণ নিয়ে তারা আল কোরআনের শিক্ষার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হচ্ছিলেন। আজকে আমাদেরকেও এর মধ্যে বর্ণিত ভীতিজনক দৃশ্যাবলী গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং চমৎকৃত করে এর বর্ণনাভংগি। এ মহা গ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমরা বেশ বুঝতে পারি, কেমন করে এ পবিত্র কেতাব তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) এক স্বতন্ত্র জাতিরূপে গড়ে তুলেছিলো এবং কেমন করে এই জনগোষ্ঠী দ্বারা এক চতুর্থ শতাব্দীকালের মধ্যে আল কোরআন অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক এক দায়িত্ব পালন করেছিলো।

ইবনে জারীর আবদুল্লাহ ইবনে ইদীরসের বরাত দিয়ে রেওয়ায়াত করেন। তিনি বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলুম কলুষিত করেনি, তখন এ আয়াতটি রসূল (স.)-এর সাহাবাদের কাছে বড়ই কঠিন মনে হলো। তারা বললেন, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের ওপর যুলুম করেনি। রেওয়ায়াতকারী বলেন, তখন রসূল (স.) বললেন, না, তোমরা যেমনটি মনে করেছো, ব্যাপারটা আসলে তা নয়, বরং কথাটি হচ্ছে সেইভাবে যেমন লোকমান তাঁর ছেলেকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, নিশ্চয় শেরক অত্যন্ত বড় যুলুম।

এমনি করে ইবনে মোসায়েবের বরাত দিয়ে, রেওয়ায়াত করা হয়েছে যে, খাত্তাবপুত্র ওমর (রা.) একবার পড়লেন, 'যারা ঈমান আনলো, কিন্তু তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করলো না। যখন তিনি পড়ছিলেন তখন দেখা গেলো তিনি ভয়ে কাঁপছেন। তখন উবাই ইবনে কা'ব (রা.) উপস্থিত ছিলো। তাকে তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে আবুল মুনযির, আল্লাহর কেতাবের এ আয়াতটি কি পড়েছো? ব্যাপারটি যদি এমনই হয় তবে কে ইসলামের উপর আছে? তিনি বললেন, সে কেমন? তখন তিনি আয়াতটি তাকে পড়ে শোনালেন ও বললেন, এখন বলো দেখি, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের ওপর যুলুম করেনি? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালা তোমাকে মাফ করুন! তুমি কি আল্লাহকে একথা বলতে শোননি, 'নিশ্চয় শেরক অবশ্যই বিরাট এক যুলুম।' অবশ্যই এটা যুলুম দ্বারা যারা তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি তারাই রেহাই পাবে।

আর একটি রেওয়ায়েতে জানা যায়, যায়দ ইবনে সাওহান সালমানকে এ আয়াতটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ, এ আয়াতটি অবশ্যই আল্লাহর কেতাবের একটি আয়াত, এটা আমি ঠিকই পেয়েছি- এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোনো যুলুম দিয়ে কলাবিত করেনি। তখন সালমান বললেন, এখানে যুলুম বলতে শেরককেই বুঝানো হয়েছে। এ সময়ে যায়দ বললেন, আপনার কাছ থেকে আমি আয়াতটি শুনতে পাইনি-এতে অবশ্যই আমি খুশী হতে পারিনি। আমি এরকম যা কিছু শুনি, আমার ইচ্ছা হয় আমি তা পুরোপুরি কণ্ঠস্থ করে রাখি।

ওপরে বর্ণিত একক রেওয়ায়াত ভিত্তিক হাদীস তিনটির আলোকে আমরা বুঝতে পারি কোরআনুল করীম সম্পর্কে এই মহান দলটির কি অনুভূতি ছিলো, এর মর্যাদা তাদের অন্তরে ছিলো কতো গভীর। কি ভাবে তারা কোরআনুল করীমের প্রত্যেকটি আয়াতকে গুরুত্ব দিতেন, কেমন করে সত্যাশ্রয়ী এ দলটি আল কোরআনের আয়াতগুলোকে ব্যবহার করতেন। যখন তাঁরা বুঝতেন যে, এগুলো তাদেরকে নির্দেশিত কাজগুলোকে চালু করার জন্যে সরাসরি হুকুম দিচ্ছে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে আনুগত্য করতে বলছে, পরিশেষে শুধু উপদেশ দিয়েই এ গ্রন্থ থেমে যাচ্ছে না বরং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের নির্দেশ দিচ্ছে। আমাদের চেহারাগুলো যেমন বিভিন্ন, মনের মধ্যেও একইরূপ বিভিন্নতা বিরাজ করাটাই স্বাভাবিক। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও ছোট্ট এই দলটার মধ্যে কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে বা থাকবে এতে তাদের ভয় পাওয়ার কী আছে এবং প্রতিনিয়তই তো নানা প্রকার ক্রুটি বিচ্যুতি আমাদের হচ্ছে, যথাযথভাবে করা যাচ্ছে না বলে ঘাবড়ে যাওয়ারই বা কি আছে। বিশেষ করে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সব সহজ করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা, ওই সব ব্যক্তিদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত উজ্জ্বল এক দৃশ্য, যারা দ্বীনের পতাকা তুলে ধরেছিলেন। তারা আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছিলেন, তাক্বদীরের ওপর পূর্ণ ভরসা করেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে আল্লাহর ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্যে ছিলেন তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এরপর বিশদ আলোচনা আসছে ঈমানের ভুমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে। যে ঈমান যুগে যুগে রসূলদের সাহাবাদেরকে করতো মহীয়ান। নূহ (আ.) থেকে ইবরাহীম এবং তাঁর থেকে শেষ নবী মোহাম্মদ (স.)-এর আমল পর্যন্ত যে বিরাট জনগোষ্ঠী সত্যের মশাল হাতে মানবজাতিকে পথ দেখিয়েছেন, তারা নিজেরা নবীদের পদাংক অনুসরণ করে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে তাদের মধ্যে যে ঈমানের শক্তি ছিলো কী ছিলো তার রূপরেখা? এ বিষয়ে যথা সম্ভব বিস্তারিত

বিবরণ পেশ করা হচ্ছে, বিশেষ করে পেশ করা হচ্ছে, ইবরাহীম (আ.) ও তার বংশের মধ্যে আগত নবীদের ঘটনাবলী। তবে পৃথিবীর অন্যান্য ঘটনাপঞ্জীর মতো তাদের ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস বর্ণনা করা হয়নি। কারণ ইতিহাস বর্ণনা করাই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, ঈমানের ভূমিকা কি এবং এ ভূমিকায় তারা কে কিভাবে অবদান রেখে গেছেন সেই বিষয়টিকেই তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। তাই, এরশাদ হচ্ছে,

'আমি দান করলাম তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব নামক পুত্রদ্বয়। এদের প্রত্যেককে আমি, সঠিক পথনির্দেশনা দান করলাম আর নূহকেও ইতিপূর্বে হেদায়াত করেছিলাম– এবং তার বংশধরদের মধ্যে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ঈসা ও হারূনকেও হেদায়াত করেছিলাম, আর এইভাবেই আমি এহসানকারীদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। অপরদিকে যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস– এদের কথা পৃথকভাবে বলেছি। এরা সবাই ছিলো নেককার। আবার ইসমাঈল, য়্যসা, ইউনুস ও লুতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এদের প্রত্যেককেই আমি সারা পৃথিবীর সবার ওপর মর্যাদাবান বানিয়েছি– মর্যাদা দিয়েছি এদের বাপ-দাদা, বংশধর ও তাদের ভাই-ব্রাদার অনেককে। গোটা মানবমন্ডলী থেকে তাদেরকেই আমি বাছাই করে নিয়েছি আমার পছন্দনীয় বান্দা হিসাবে আর দেখিয়ে দিয়েছি তাদেরকে আমি সরল-সঠিক মযবুত ও সমুজ্জ্বল পথটি। এটিই হচ্ছে আল্লাহর দিক-নির্দেশনা, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। আর এই হেদায়াত এসে যাওয়ার পর ওরা যদি বিন্দুমাত্র শেরক করতো, তাহলে অবশ্যই যা কিছুই করেছে সব বরবাদ হয়ে যাবে। ওরাই তো হচ্ছে সে সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমি কেতাব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং নবুওত দিয়েছি। এরপরও যদি ওরা কুফরী করে, তাহলে ওদের জেনে রাখা দরকার, অতীতে যারা এভাবে আমার নেয়ামতের না-শোকরী করেছে, তাদের থেকে দায়িত্ব তুলে নিয়ে আমি অন্যদেরকে দিয়েছি, যারা না-শোকরী করেনি। এইভাবে যারা আমার হেদায়াতের সঠিক মূল্যায়ন করেছে এং কৃতজ্ঞ চিত্তে সঠিক পথ অনুসরণ করেছে তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা চালিয়েছেন সঠিক পথে। সুতরাং তাদের পথেই চলো, বলো, হে রসূল, এ পথ দেখানোর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আসলে এ উপদেশমালা গোটা বিশ্বের জন্যেই এক মহা শিক্ষা'।

দেখুন ওপরের আয়াতগুলোতে নূহ ও ইবরাহীম ছাড়া সতের জন নবী-রসূলের নাম বলা হয়েছে আর অন্যদের সম্পর্কে নীচের আয়াতে ইংগিত দেয়া হয়েছে,

'তাদের বাপ-দাদা-পূর্বপুরুষ, বংশধর ও ভাই-ব্রাদার এবং সমসাময়িক ব্যক্তিরা'। আর এ প্রসংগের শেষ কথা বলা হয়েছে, 'আর এইভাবেই আমি এহসানকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।' ....'এদের সবাইকেই আমি জগদ্বাসীর মধ্যে সম্মানিত করেছি; .... মানবমন্ডলীর মধ্যে থেকে তাদেরকে (এ কাজের জন্যে) আমি বাছাই করে নিয়েছি এবং তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি সরল সঠিক, সুদৃঢ় ও সুন্দরতম পথ।' দেখুন, এসকল কথার শেষ কথা হচ্ছে, এই সম্মানিত দলের প্রতি ছিলো আল্লাহ তায়ালার বিরাট এহসান, তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে মহা সম্মান দান করা হয়েছিলো এবং সর্বোপরি সরল-সঠিক ও সুদৃঢ় পথে তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে পরিচালনা করা হয়েছিলো।

ওপরে বর্ণিত এই সত্যাশ্রয়ী দলটির এই বিশেষ উল্লেখ এবং তাঁদের প্রতি অর্পিত মহান দায়িত্ব পালনের বর্ণনা পেশ করা– এসবই হচ্ছে নীচে উল্লেখিত আলোচনার ভূমিকা মাত্র।

'এটিই হচ্ছে, আল্লাহর হেদায়াত, এর দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। এই হেদায়াত পাওয়ার পরও যদি কোনো জনগোষ্ঠী শেরক করে, তাহলে (জীবনে ভালো) যে সব কাজ তারা করেছ তা সবই বরবাদ হয়ে যাবে।'

এ পৃথিবীর বুকে হেদায়াতের যতো সব উৎস রয়েছে, সেইগুলোরই বিবরণ এখানে পেশ করা হলো। অতপর আল্লাহর হেদায়াত রসূলদের কার্যাবলীর মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করেছে এবং দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীরা এই জীবনাদর্শের ওপর নির্ভর করেই নিজেদের জীবন পরিচালনা করে। আর, যারা আল্লাহর পথে চলতে চায়, তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, হেদায়াতের মূল উৎস আল্লাহর কেতাবের দিকেই ফিরে যাওয়া, যেহেতু এই উৎসকে আল্লাহ তায়ালাই হেদায়াতের উৎস বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকেই হেদায়াত করেন তাদের সবাইকেই এই উৎসের দিকে এগিয়ে দিয়ে থাকেন। আবার হেদায়াতপ্রাপ্ত ওই সকল বান্দা যদি তাওহীদের সীমা লংঘন করে এবং হেদায়াতের উৎসকেই একমাত্র উৎস হিসাবে গ্রহণ না করে জীবন পথে চলার জন্যে অন্যান্য আরও অনেকের কাছে দিক নির্দেশনা নিতে চায় এবং বিশ্বাস, অনুসরণ ও মেলামেশার ব্যাপারে আল্লাহর কেতাবের সাথে অন্য কিছুকে পরিচালক মানতে চায়, তাহলে তাদের পরিণতি হবে তাদের কৃত ভালো কাজগুলোও বরবাদ হয়ে যাবে, অর্থাৎ (কারো কাছেই) এর কোনো মূল্য থাকবে না এবং তাদের কাজগুলো এমন ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন ভাবে কোনো পোকা বিষাক্ত কোনো চারাগাছের মধ্যে প্রবেশ করলে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যায় এবং অবশেষে মারা যায়। এটিই হচ্ছে 'হুবুত' শব্দের অভিধানিক অর্থ।

'ওরাই হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি, যাদেরকে আমি মহান আল্লাহ কেতাব, বিচার ক্ষমতা এবং নবুওত দিয়েছি।....অতপর যারা এসব নেয়ামতের নাশোকরী করবে, তাদেরকে ক্ষমতাহীন করে এসব নেয়ামত অন্য এমন এক জাতির হাতে আমি সোপর্দ করবো, যারা অস্বীকারকারী হবে না (এবং যাদেরকে ওরাও অস্বীকার করতে পারবে না)।

আর এটিই হচ্ছে দ্বিতীয় বর্ণনা ..... প্রথম বর্ণনায় হেদায়াতের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে সকল রসূলের শিক্ষার সারবস্তু পেশ করা হয়েছে। তারপর দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে সেই সকল রসূলের কথা, যাদের সম্পর্কে এখানে ইংগিত করা হয়েছে, তাদেরকেই আল্লাহ তায়ালা কেতাব, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতা দিয়েছেন, আরো দিয়েছেন নবুওত। এখানে 'হুকম' হিকমতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন একইভাবে 'ক্ষমতা'র অর্থেও শব্দটি এসেছে এবং এই উভয় অর্থই আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তারপর যে সকল রসূলের বর্ণনা এখানে এসেছে তাদের মধ্যে কারো ওপর কেতাব নাযেল হয়েছে, কারো ওপর হয়নি, যেমন মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে তাওরাত, দাউদ (আ.)-এর ওপর যাবুর, ঈসা (আ.)-এর ওপর ইনজীল। এদের সবার আনুগত্য করার জন্যেই তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিলো। এদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে আবার 'হেকমত' বা বিশেষ বুদ্ধিমত্তা দেয়া হয়েছিলো যেমন দাউদ ও সোলায়মান আলাইহিমাস্সালামকে বিশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী বানানো হয়েছিলো এবং প্রত্যেককে এই অর্থে ক্ষমতা দান করা হয়েছিলো যে, আল্লাহ প্রদত্ত যে ব্যবস্থা তাদের কাছে ছিলো তা তো আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ। আর তারা যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন তা সকল মানুষ এবং সকল বিষয়ের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতা বহন করে নিয়ে এসেছিলো। সুতরাং সকল রসূলকেই পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে বলেই আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন। আর যতো

কেতাবই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন তার উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে বিচার ফয়সালা করা। এ বিষয়ে অন্য আরো বহু আয়াতে এইভাবে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী রসূলদের সবাইকে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও নবুওত দেয়া হয়েছে এবং সবাইকে আল্লাহ তায়ালা দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর দ্বীনকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা মানুষের কাছে বহন করে নিয়ে গেছেন, নিজেরা ওই জীবন ব্যবস্থা পুরোপুরি মেনে চলেছেন, এর যথার্থতা সম্পর্কে তারা নিজেরা একান্তভাবে বিশ্বাসী থেকেছেন এবং তারা যথাযথভাবে এ দ্বীনের হেফাযত করেছেন। তারপর যখন আরবের কাফেররা কেতাব, (আল্লাহর) হুকুম ও নবুওতকে অস্বীকার করলো, তখন আল্লাহর মহান এ 'দ্বীন' তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বেপরওয়া হয়ে গেলো, তাদেরকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করে অন্যদের কাছে এ মহান আবেদন পেশ করা হলো। ফলে (আল্লাহর মেহেরবানীতে) মুষ্টিমেয় সত্যাশ্রয়ী ওই ছোট্ট দলটি এবং তাদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যারা পরবর্তীতে গড়ে উঠলো, তারাই এ দ্বীনের জন্যে যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হলো। এতো সেই পুরাতন সত্য কথা, এর শাখা দিগন্তব্যাপি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে এর প্রতিটি পদক্ষেপ জীবনের সকল বিভাগে বিস্তৃত হলো। এই দাওয়াত সকল রসূল একের পর এক বয়ে নিয়ে এসেছেন। তাদের প্রত্যেকেই এ দ্বীনের ওপর ঈমান এনেছেন এবং তারাও ঈমান এনেছে, যাদের নসীবে আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে বন্টন করা হয়েছে। এসব বিবরণ যে কোনো মোমেনের অন্তরে অবশ্যই ঈমানের সুধা ঢেলে দেবে এবং ছোট-বড় যে কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই একই প্রেরণা সৃষ্টি করবে, তা সংখ্যায় তারা কম-বেশী যাই হোক না কেন! এ দলটি মোটেই অসহায় নয়, নয় এরা মূল-বৃক্ষ থেকে বিচ্যুত বিচ্ছিন্ন কোনো শাখা, বরং এর শাখা বেরিয়ে এসেছে এমন মহীরুহ থেকে যার শেকড় প্রোথিত রয়েছে মাটির গভীরে এবং তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে সুবিশাল আকাশে। এ দলটি হচ্ছে এমন এক মানবগোষ্ঠী, যাদের সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর সাথে এবং তিনি নিজেই তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। একজন মোমেন হলো এমন এক ব্যক্তি, যে পৃথিবীর যে কোণেই থাকুক না কেন এবং যে জনপদেই অবস্থান করুক না কেন, সে একাই এক অভংগুর শক্তি এবং সে সর্বদাই অন্য সকল বাতিল শক্তির চেয়ে বড়, যেহেতু সে সেই মযবুত ও দীর্ঘ বৃক্ষের সাথে সম্পৃক্ত যার শেকড় বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে মানবজাতির প্রকৃতির গভীরে এবং মানব ইতিহাসের একেবারে মুলের সাথে। আর এ মহান মানবগোষ্ঠীর একটি দল আল্লাহর সাথে আবদ্ধ হয়ে আছে, যাদেরকে যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তায়ালা পথ দেখিয়েছেন।

'ওরাই তো হচ্ছে সেই সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেছেন। সুতরাং তাদের দেখানো পথে চলো। বলো, আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোনো প্রতিদান চাই না। এ তো গোটা বিশ্বজগতের জন্যে এক উপদেশ বাণী।'

এ হচ্ছে তৃতীয় বিবৃতি। এই হচ্ছে সেই মহান সত্যাশ্রয়ী দল যারা ঈমানদারদের দলকে পরিচালনা করে থাকে। এদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিজে হেদায়াত করেছেন, তাদেরকে পথ দেখিয়েছে সেই সব আয়াত, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এসব আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রসূল (স.)-এর জন্যেও রয়েছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং যারা এ কেতাবের ওপর ঈমান এনেছে তাদের জন্যেও রয়েছে ঈমানের পথে চলার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা। সুতরাং এই একটি মাত্র হেদায়াত গ্রন্থ তার জন্যে অত্যন্ত সহজ (অনুসরণযোগ্য) এবং হেদায়াতের এই কেতাবের আলোকেই তারা যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত ফয়সালা গ্রহণ করে, আর হেদায়াতের এই কেতাবের দিকেই নবী (স.) মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং এরই ভিত্তিতে তিনি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন। সুতরাং যাদেরকে তিনি ডাকেন তাদেরকে তিনি বলেন,

'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। এ হচ্ছে গোটা বিশ্ব জগতের জন্যে এক স্মরণিকা।'

'গোটা বিশ্ব জগতের' জন্যে বলতে বিশেষ কোনো জনপদ, কোনো শ্রেণী বা দূর অথবা নিকটের কোনো জাতিকে বুঝানো হয়নি। এ হচ্ছে বিশ্বমানবের সবাইকে উপদেশ দেয়ার জন্যে। আর এই কারণেই কারো কাছ থেকে কোনো প্রতিদান পাওয়ার প্রশ্ন আসে না। এর প্রতিদান দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।

যুগে যুগে ইসলামবিমুখ মুর্খদের চালচিত্র

তারপর প্রসংগ এগিয়ে চলেছে এবং তিরস্কার করা হচ্ছে তাদেরকে যারা নবুওত ও রেসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং অত্যন্ত জোরালোভাবে বলা হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা সঠিকভাবে বুঝতেই সক্ষম নয়। তারা জানে না আল্লাহর বিজ্ঞানময় কাজ, তাঁর মেহেরবানী এবং তাঁর সুবিচারের কথা।

প্রসংগক্রমে এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শেষ নবীর রেসালাতে কোনো নতুন কথা নেই। পূর্বের নবীরা যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, সেই একই পয়গামের পুনরাবৃত্তি ও সমাপ্তিকর কথা নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন এবং শেষ কেতাব পূর্ববর্তী কেতাবগুলোর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। পূর্বের কেতাবসমূহ এ কেতাবের মূল উদ্দেশ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে চমৎকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এরশাদ হচ্ছে,

'আর ওরা আল্লাহর যথাযোগ্য মূল্যয়ন তারা করেনি.......... তারা নামাযগুলো সংরক্ষণ করে।' (আয়াত ৯২)

মোশরেকরা হিংসা ও জিদের বশবর্তী হয়ে বলে, আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্য থেকে রসূল পাঠাননি, আর এমন কোনো কেতাবও নাযেল করেননি যা কোনো মানুষের কাছে ওহী স্বরূপ এসেছে। উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে তাদের পাশেই আহলে কেতাব অধ্যুষিত একটি দ্বীপ ছিলো যার সবই ছিলো ইহুদী। এরা মক্কাবাসীদের কাছে নিজেদের আহলে কেতাব হওয়ার কথা বলতে মোটেই খারাপ মনে করতো না। আর মূসা (আ.)-এর কাছে তাওরাত কেতাব নাযিল হওয়ার কথা বলতেও কুণ্ঠিত হতো না, বরং তারা তো অন্যদেরকে ঘৃণা করতো ও নিজেদের বড়ত্ব দেখানোর জন্যেই ডাঁটের সাথে এসব কথা বলতো, যার উদ্দেশ্য ছিলো মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতকে অস্বীকার করা। সুতরাং কোরআনুল করীম তাদের প্রতি তিরস্কার বর্ষণ করার উদ্দেশ্যে তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে, 'তারা বললো, কোনো মানুষের কাছে আল্লাহ তায়ালা কোনো কেতাব নাযেল করেননি।

'এ কথাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা সঠিকভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মর্যাদা দেয়নি।

জাহেলী যামানায় মক্কার মোশরেকরা এই ধরনের বিভিন্ন কথা বলতো। অবশ্য সব যুগেই হঠকারী নাদান জাহেলরা এই রকম কথাই বলে থাকে। আজও আধুনিক জাহেলরা এইভাবে বলে চলেছে। তারা মনে করে যে, এসব ধর্ম সব মানুষেরই তৈরি করা। কোনো মানুষ এসব নিয়ম কানুন তৈরি করার পর মানুষের উন্নতির সাথে সাথে ক্রমোন্নতি হচ্ছে। মানুষ তার কল্যাণার্থে চিন্তা করে ও আইন তৈরি করে বলেই এসব ধর্মের বিধি বিধানের মধ্যে পরস্পর তেমন কোনো পার্থক্য নাই, যেমন পৌত্তলিক পূজা প্রাচীন কালে ছিলো, এখনও আছে। মানুষের উন্নতি বা অবনতির সাথে পুতুল পূজারও রদ বদল হচ্ছে। কিন্তু সব সময়েই আল্লাহ প্রেরিত 'দ্বীন' (জীবন ব্যবস্থা)-এর বাইরেই এই পুতুল পূজা থেকেছে এবং রসূলরা সর্বকালে আল্লাহর কাছ থেকে ব্যবস্থা নিয়ে

এসেছেন, সে সবগুলো নিজ নিজ মূলনীতির ওপর দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ সকল রসূল যখনই কোনো বার্তা আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন, তখন জনগণের মধ্যে এক দল লোক তাঁর সেই আদর্শ গ্রহণ করেছে, আর বিদ্বেষবশত অস্বীকারও করেছেন অপর একটি দল। এরপর চলেছে আল্লাহর ফরমান থেকে ফিরে যাওয়া ও এর মধ্যে পরিবর্তন আনার অপচেষ্টা। এইভাবে প্রত্যেক নবী রসূলের ইন্তেকালের পর তাদের উত্তরসূরীরা জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে গেছে এবং পরবর্তীকালে মযলুম মানুষ নতুন কোনো রসূলের আগমন অপেক্ষায় থেকেছে, যা তাদেরকে সেই একই দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক জগতের যে সব মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা ও মর্যাদা বুঝতে পারে না, জানে না তাঁর মেহেরবানীর কথা এবং বুঝে না কতো মহান তিনি, তাঁর করুণারাশি ও সকল কিছুর মধ্যে যে সুবিচার ও ভারসাম্য ব্যবস্থা তিনি কায়েম রেখেছেন, তা যারা আন্দাজ করতে পারে না, তারাই এসব ফালতু কথা বলে, 'কোনো মানুষকে তিনি রসূল বানিয়ে পাঠাননি, তিনি চাইলে তো ফেরেশতাদেরকেই রসূল হিসাবে পাঠাতে পারতেন।' আরবরাও এইভাবেই বলতো। অথবা বলতো, এই বিশাল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা মহাবিশ্বের মধ্যে একটি বিন্দু-সম পৃথিবী নামক এই তুচ্ছ গ্রহের অধিবাসী অতি তুচ্ছ এই মানুষকে বানাবেন রসূল আর তার কাছে পাঠাবেন তাঁর বাণী বা কেতাব, যার দ্বারা সে মানুষকে পথ দেখাবে? এটা কল্প কাহিনী বই কিছু নয়, বরং এটা অবশ্যই একটা হাস্যকর ব্যাপার। প্রাচীন ও আধুনিক কালের বহু দার্শনিকও এইভাবে বলে, অথবা বলে, আরে রাখো, কোনো ইলাহ্ (বা সর্বময় ক্ষমতার, মালিক) কোনো ওহী বা রসূল বলতে কিছুই নাই.... এসব বাজে কথা, অথবা মানুষকে ধর্মের নামে ধোকা দেয়ার এ এক ফন্দী, বস্তুবাদী নাস্তিকরাও এইভাবে বলে!!!

এসব কিছুই হচ্ছে মূর্খতা ও আল্লাহর মর্যাদা পরিমাপ না করতে পারার ফল। আল্লাহ তায়ালা মহীয়ান মহা-দয়াময়, মহান তাঁর সত্ত্বা, তিনি ইনসাফওয়ালা-সুবিচারক মহা জ্ঞানী– বিজ্ঞানময়। এই মহাসৃষ্টিকে তিনি পথ নির্দেশনা ছাড়া কখনই ছেড়ে দেন না। তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি জানেন তার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল অবস্থাকে। তার ক্ষমতা ও শক্তিকে, তার ক্রুটি ও দুর্বলতাকে, আর তিনি আরও জানেন মানুষের সকল অবস্থার কথা এবং শেষ বিচার দিনে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়ার সময়ে তার প্রয়োজনের কথা, তার ধারণা কল্পনা ও চিন্তাধারার কথা। তার কথা-কাজ, ব্যবহার এবং সাংগঠনিক তৎপরতার কথা। যাতে করে তিনি পরখ করতে পারেন তার সঠিক পথে থাকা এবং সংশোধনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতার কথা, অথবা তার ক্রুটি বিচ্যুতি বা বিশৃংখল মনোবৃত্তির কথা। আর আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে যে বুদ্ধি-রূপ নেয়ামত দিয়েছেন, যার দ্বারা কুপ্রবৃত্তির তাড়না, ভ্রান্ত-চিন্তা ও তার লোভ-লালসার আক্রমণ থেকে সে বিরত থাকতে পারে তার কথা, তার আবেগ ও ঝোঁক প্রবণতার কথা। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর শক্তিসমূহকে করায়ত্ত ও ভোগ-ব্যবহারের ক্ষমতাও তাকে দিয়েছেন এবং এগুলোকে তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে এনে দিয়েছেন। তবে, এটাও ঠিক যে, এসব কিছু ভোগ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন নয়। অথবা জীবনের জন্যে স্থায়ী কোনো মূলনীতি রচনা করতেও সে সক্ষম নয়। অবশ্যই এই মূলনীতি স্থির করার জন্যে মানুষকে একটি স্থায়ী ও অবিচল বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে, যেখান থেকে পাবে সে সকল কাজ ও ব্যবহারের জন্যে প্রেরণা। সুতরাং এটাও পরিষ্কার যে, সে বিশ্বাসের উৎস হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অর্থাৎ আল্লাহর কাছে থেকেই এই বিশ্বাসের শক্তি নেমে আসে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে জগত

ও জীবনের জন্যে ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারা। আর এসব কিছুর জন্যে মানুষকে প্রদত্ত বুদ্ধিকে আল্লাহ তায়ালা যথেষ্ট বানাননি এবং এই বুদ্ধির ওপর নির্ভরও করতে বলেননি, অথবা হক আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া বিশেষ জ্ঞানই তার জন্যে যথেষ্ট বলে আল্লাহ তায়ালা জানাননি। এমন কি সর্বান্তকরণে আল্লাহর দিকে রুজু করা বা কঠিন দুঃসময়ে তাঁর কাছে কায়মনোবাক্যে সাহায্য চাওয়ার কারণে বান্দা ও মাওলার মধ্যে যে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাও মানুষের জীবনের মূলনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট বলা হয়নি। কারণ এই স্বাভাবিক মানব প্রকৃতি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন চাপের কারণে প্রভাবিত হয়। মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান নানা প্রকার উস্কানি ও চাটুকারিতার মাধ্যমে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাঁর প্রেরিত ওহীর ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে বলেছেন। নির্ভর করতে বলেছেন তাঁর রসূলদের আনীত হেদায়াতের ওপর এবং আসমানী কেতাবসমূহের ওপর, যাতে করে তাদের প্রকৃতির গতি সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট পথে এগিয়ে যেতে পারে, তাদের বুদ্ধিও সঠিক পথে এবং শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে পারে, অপসারিত হয় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গোমরাহীর সকল পর্দা। আর এই হচ্ছে মহান আল্লাহর দয়া মেহেরবানী ও মর্যাদার জন্যে সঠিক ব্যবহার এবং তাঁর কুশলী ক্ষমতারও সর্বব্যাপী জ্ঞানের যথাযথ কাজ ..... তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষ, তাকে সৃষ্টি করে দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দেবেন- এটা কিছুতেই হতে পারে না! মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে কোনো রসূল তাদের মধ্যে না পাঠিয়ে কেয়ামতের দিন তাদের হিসাব নেবেন- এটা কি করে সম্ভব! তাই তিনি জানাচ্ছেন,

'আমি কিছুতেই আযাব দেব না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমি কোনো রসূল পাঠাই।'(১)

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত তক্বদীর অবশ্যই সত্য, যা মানুষের এতেকাদ বা আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ তিনি তাঁর বান্দাদের কাছে রসূলদেরকে পাঠিয়ে তাদেরকে জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকার থেকে হেদায়াতের স্বচ্ছ আলোর দিকে বের করে এনেছেন, যেন তারা মুক্তি পায়, ভুল পথ থেকে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন চাপের মধ্যে তাদের বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করে সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে এবং পরিশুদ্ধ চিন্তা এবং গভীর পর্যবেক্ষণ দ্বারা সঠিক পথ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। আর অবশ্যই করুণাময় আল্লাহ তায়ালা এ সকল রসূলের কাছে ওহী পাঠিয়ে তাদেরকে দাওয়াতী কাজ পরিচালনার জন্যে সঠিক পদ্ধতিও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের মধ্যে অনেকের কাছে কেতাব পাঠিয়েছেন, যা আজও বর্তমান রয়েছে, যেমন মূসা, দাউদ ও ঈসা নবীদের কাছে প্রেরিত কেতাবসমূহ, অথবা সেই কেতাব যা পৃথিবী বিলীন হওয়া পর্যন্ত সকল যামানার, সকল মানুষের জন্যে আলোর দিশারী হয়ে থাকবে, যেমন এই আল কোরআন।

যখন আরব উপদ্বীপের মধ্যে মূসা (আ.)-এর নবুওতের কথা জানাজানি হলো এবং যখন আহলে কেতাবরা এতদঞ্চলে পরিচিত হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল (মোহাম্মদ স.)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি রেসালাত ও ওহীর মূল দাওয়াত নিয়ে ওই অঞ্চলের নাফরমান মোশরেকদের সামনে হাযির হন, তুলে ধরেন তাদের কাছে সত্যের এ দাওয়াতকে।

'বলে দাও, হে মোহাম্মদ! আলোকবর্তিকা ও মানুষের জন্যে সত্যের দিশারী হিসাবে যে কেতাব নিয়ে মূসা এসেছিলো তা কে নাযেল করেছিলো? তোমরা তো সে কেতাবকে কিছু কাগজের পাতার সমষ্টি বানিয়ে নিয়েছো, যার কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ করতে এবং বেশীর ভাগকেই রাখতে গোপন করে, অথচ তোমাদেরকে যে কেতাব ও হেকমত (এই কেতাবের

মাধ্যমে) শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না এবং তোমাদের বাপ দাদারাও জানত না।'

এ সূরাটি সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে আমি বলেছি যে, এ আয়াতটি মদীনার জীবনে নাযিল হয়েছে এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে ইহুদীরা। তারপর সেখানে আমরা তাফসীরে তাবারীর লেখক ইবনে জারীরের অন্য আর একটি কেরাত সম্পর্কে প্রদত্ত তার মতটি তুলে ধরেছি

'ওরা (এ কেতাবকে) বানায় কিছু কাগজের সমষ্টি, যার কিছু অংশ তারা প্রকাশ করে, কিন্তু বেশীর ভাগই তারা লুকিয়ে রাখে'।

এ কেরাতের লক্ষ্য ওখানে মোশরেকগণ বলে উল্লেখিত হয়েছে। অথচ এখানে বলা হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। তাদের বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, তারা তাওরাত কেতাবের মূল কেতাবকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে রেখেছে। এ কেতাবটিকে নিয়ে তারা এক জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছিলো। মানুষকে ধোকা দেয়া ও পথভ্রষ্ট করার জন্যে উপযোগী এর কিছু অংশ মানুষের সামনে প্রকাশ করতো। তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী ও ফরয কাজগুলো সম্পর্কে ঠাট্টা-মশকারা করতো এবং এগুলোকে তারা খেল তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছিলো। এ কারণে, তাদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যাবলী ও পদক্ষেপসমূহের সমর্থনে তারা যে অংশগুলোকে মনে করতো না তাওরাতের সে অংশগুলোকে তারা লুকিয়ে রাখতো। তাদের এই কদর্য ব্যবহার সম্পর্কে আরবের লোকেরা কিছু কিছু জানতো এবং পরবর্তীতে কোরআনুল করীমে ইহুদীদের এসব হীন চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে তাদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে। এখানে এই আয়াতে ইহুদীদের কথা উল্লেখ করে শুধু তাদের কদর্য ব্যবহারের সংবাদটি দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে (ঘৃণায়) তাদেরকে কোনো প্রকার সম্বোধনই করা হয় নাই। তাদের সম্পর্কে যে আয়াত এখানে আনা হয়েছে তা মাদানী নয়, বরং মক্কী, অবশ্য আমরা ইবনে জারীরের গৃহীত মতটিই পোষণ করছি।

সুতরাং হে মোহাম্মদ, তাদেরকে বলো, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে আলোকবর্তিকা ও হেদায়াত হিসাবে মূসা (আ.) যে কেতাব নিয়ে এসেছিলেন তা কে নাযেল করেছিলো? এই কেতাবটিকে তারা কয়েকটি ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করে ফেলেছিলো। এগুলোর কিছু কিছু তারা প্রকাশ করতো এবং বেশীর ভাগকেই তারা গোপন রাখতো। এ নিকৃষ্ট খেলায় তারা অসদুদ্দেশ্যেই মেতে উঠেছিলো– না জেনে না বুঝে নয়। এমনি করে তাদের অবস্থা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কারণ তাদের এসব মন্দ আচরণের অশুভ পরিণতি তারা মোটেই জানে না। এজন্যে তাদেরকে প্রকৃত পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়াই ছিলো করুণাময় আল্লাহর মহান উদ্দেশ্য। এর বিনিময়ে তাদের কর্তব্য ছিলো আল্লাহর মেহেরবানীর কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালাই যে তাঁর রসূলের কাছে তাঁর কেতাব ও ওহী পাঠিয়েছেন তা অস্বীকার না করা।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাদেরকে দিশাহারা অবস্থায় ছেড়ে দেননি। অবশ্যই তিনি রসূল (স.)-কে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে এ বিষয়ে জিদ করা ছাড়া যুক্তি-তর্ক পেশ করার মতো কোনো সুযোগ না থাকে। তাই বলা হচ্ছে,

'বলো, আল্লাহ, তারপর তাদের চিন্তা-ভাবনা ও জল্পনা-কল্পনার মধ্যে মত্ত থাকতে দাও।'

বলো, আল্লাহ তায়ালাই তো নাযিল করেছেন এ কেতাব কে। এ কথা বলার পর আর তাদের তর্ক-বিতর্ক, জিদ ও জল্পনা-কল্পনা কোনো কিছুর দিকে কান দিয়ো না। ছেড়ে দাও তাদেরকে, তারা যুক্তিহীন ভাবে তর্ক করতে থাকুক, বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাক এবং ফযুল

খেল-তামাশার মধ্যে মগ্ন থাকুক। এ কথার মধ্যে তিরস্কারের একটা সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বরং তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানোর উদ্দেশ্যেই এইভাবে কথা বলা হয়েছে এবং সত্যের মর্যাদাকে উন্নীত করা হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের বাজে কথা সকল সীমা অতিক্রম করলো, তখন সত্যের পক্ষে চূড়ান্ত যুক্তি তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে ছিলো, আর এই কারণেই এখানে তাদের সম্পর্কে তিরস্কারমূলক কিছু বেশী কথা বলা হয়েছে।

আল কোরআনের কিছু বৈশিষ্ট

এরপর এই নতুন কেতাব সম্পর্কে প্রসংগক্রমে কিছু কথা এসে গেলো, যেহেতু অস্বীকারকারীরা এ কেতাব সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছে যে এটা আল্লাহর কেতাব কিনা, বা আল্লাহ তায়ালা এ কেতাবকে নাযিল করেছেন কিনা। আসলে এ হচ্ছে একটি চক্র যা সদা সর্বদা সত্যের পেছনে লেগে রয়েছে। এর পূর্বেও এ রকম বহু চক্র এসেছে। চিরদিন আল্লাহ তায়ালা যে, সকল মহান ব্যক্তিদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের সবার বিরুদ্ধে এ ধরনের হীন চক্রান্ত করা হয়েছে, কাজেই এটা কোনো নতুন পদক্ষেপ নয়। তিনি যাকে পছন্দ করেছেন তাঁকে তিনি রসূল বানিয়েছেন। এতে কার কী বলার অধিকার রয়েছে? দেখুন মহান আল্লাহর বাণী,

'আর এই যে এক কেতাব, যাকে আমি মহান আল্লাহ বরকতপূর্ণ বানিয়েছি এবং এর সামনে অন্য যে সব কেতাব রয়েছে এ কেতাব সে সবগুলোর সত্যায়নকারী (অর্থাৎ এ কেতাব পূর্ববর্তী সকল কেতাব যে সত্য সত্যই আল্লাহর কেতাব ছিলো সে বিষয়ে সাক্ষ্য দানকারী)। আরও এসেছে এ কেতাব উম্মুল কুরা, অর্থাৎ মক্কা ও তার আশেপাশের লোকদের জন্যে এ কেতাব অবশ্যই সতর্ককারী। আর যাদের মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে, তারাই এ কেতাবকে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযগুলোকেও অবশ্যই হেফাযত করে।

আল্লাহর যে সব নিয়ম বিশ্বব্যাপী চালু রয়েছে রসূল প্রেরণ তন্মধ্যে অন্যতম। সাথে সাথে তাদের প্রত্যেকের কাছে কেতাব পাঠানো এবং এই যে নতুন কেতাব যাকে তারা আল্লাহর কেতাব বলেই অস্বীকার করতে চায়, এটাও আল্লাহর প্রচলিত পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্য, আল্লাহ তায়ালা এ কেতাবকে বিশেষভাবে বরকতপূর্ণ বানিয়েছেন, যার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন আনে এমন সাধ্য কারো নাই এবং যা পড়তে ভালো লাগে, যতো পড়া হয় ততোই যেন আরও পড়তে ইচ্ছা হয়। তাই, আল্লাহ তায়ালা সত্য সত্যই বলেছেন, এ মহান কেতাব বরকতপূর্ণ। হাঁ, এ কেতাব তো বরকতপূর্ণ আছেই, স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তিনিও তো মহা বরকতপূর্ণ। কী যে ভালো লাগে তাঁকে ডাকতে, আকুতি জানাতে, যতোই তাঁকে ডাকা যায়, মন যেন ভরেও ভরতে চায় না, তাঁকে ডাকার সাথে সাথে মনের মধ্যে এক পরম পুলক অনুভূত হয়। সেই ব্যক্তি তা বুঝে যে একটু খেয়াল করে।

বরকতের যতো অর্থ আছে বা হতে পারে, সে সকল অর্থেই তিনি বরকতপূর্ণ। আসলে মৌলিকভাবেই তিনি বরকতপূর্ণ। তিনি তাঁর কেতাবকেও বরকতপূর্ণ বানিয়েছেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে এ কেতাবকে পরম শ্রুতিমধুর করে পাঠিয়েছেন। এ কেতাব সেই এলাকার জন্যে মোবারক যার অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে তারাই এ কেতাবের ধারক বাহক হিসাবে প্রথম যোগ্য, বিশেষ করে যে মহান রসূলের কাছে তিনি এ কেতাব পাঠালেন প্রিয় ও মহান সে মোহাম্মদ (স.)-এর হৃদয়কে তিনি বানিয়ে দিলেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবকে মহত্ত্ব ও বিশালত্বের কারণে বরকতময় বানিয়েছেন। কিন্তু, সারা বিশ্বের সব কিছুর ওপর আলোকপাতকারী এ মহান কেতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা, এর মধ্যে আলোচিত বিষয়াদির তুলনায়

অতি অল্প। মানুষ এসব বিষয় লিখতে চেষ্টা করলে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হতো সীমা সংখ্যাহীন। এর প্রতি ছত্রে রয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের রহস্য ভান্ডার, রয়েছে যুক্তি প্রমাণ ও প্রভাবপূর্ণ কথার এতো সমারোহ যা এর দশগুণ কোনো গ্রন্থের মধ্যেও সংকুলান হয় না, বরং তার থেকেও বহু বহু গুণ বড় পুস্তকেও এ কেতাবের বিষয়াদি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এর কলেবরের দিক দিয়ে বা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার দিক দিয়েও। আর যে কোনো মানুষ এই মহাগ্রন্থের বর্ণনাভংগি অনুকরণ করার জন্যে মনে মনে চিন্তা করেছে অথবা অন্য কাউকে এইভাবে বর্ণনা করতে বলেছে এবং এজন্যে অর্থের সাথে সংগতি রেখে শব্দ চয়নের চেষ্টা করেছে, কখনও বা এককভাবে চেষ্টা করেছে, আবার কখনও সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়েছে, দেখা গেছে নিদারুণভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কোনোভাবেই তারা শব্দ ও অর্থের সমন্বয় ঘটাতে পারেনি। সুতরাং এ দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলেও মহাগ্রন্থ আল কোরআন বরকতপূর্ণ। আর এটাও চিরন্তন সত্য কথা যে, আল কোরআনে আলোচিত বিষয়াদি বর্ণনা করা বা অনুরূপ জ্ঞান দান করা (প্রকৃতি বা পরিমাণ, কোনো দিক দিয়ে) কোনো মানুষের পক্ষে কোনো দিন সম্ভব হয়নি, আর ভবিষ্যতেও কোনো দিন সম্ভব নয়। এ পাক কালামের প্রত্যেকটি যুক্তি প্রমাণ, প্রভাব বিস্তারকারী ও প্রাণসঞ্চারী কথা শ্রোতাদের অন্তরে যে প্রাণ প্রবাহের সৃষ্টি করে তার কোনো তুলনা নাই। এ মহান গ্রন্থের যে কোনো একটি আয়াতে অর্থ, তথ্য এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যে ব্যাপক আলোকপাত দেখা যায় তার নযির মানব রচিত কোনো গ্রন্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর প্রভাব বিস্তারকারী গুণ এতো ব্যাপক যে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এ মহান কেতাব গোটা পৃথিবীর মানব প্রকৃতি ও মানব সত্ত্বার অস্তিত্বকে সরাসরি এক চমকপ্রদ পদ্ধতিতে পেশ করেছে এবং মানব জীবনের প্রতিটি দিক, বিভাগ ও তার সকল সমস্যার আলোচনার পর যে সমাধান দিয়েছে তা অন্য কেউ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। অবশ্য এর কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না, আর তা হচ্ছে এ হচ্ছে শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মহাপবিত্র কালাম। তাঁর হেকমত ও জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করে–এমন সাধ্য আছে কার। তাঁর শক্তি ক্ষমতা সবার চিন্তা কল্পনার বাইরে।

আল্লাহর এ মহান কেতাবের ছবি আঁকতে গিয়ে এর বেশী কিছু বলা বা চিন্তা করার কোনো সাধ্য আমাদের নাই। আমরা যতোটুকু বুঝি তার ওপর শুধু এতোটুকু কথা বলে সাক্ষ্য দিতে পারি, এ কেতাব মহা বরকতপূর্ণ– মোবারক।

'এ কেতাব পূর্ববর্তী সকল আসমানী কেতাবের সত্যায়নকারী।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অন্যান্য যে সব কেতাব রয়েছে, সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে আল কোরআন সাক্ষ্য দেয়, সাক্ষ্য দেয় সেই সব অংশের যেগুলোকে আহলে কেতাবরা বদলাতে পারেনি, আসলে, এটা সত্য কথা যে ওই না-ফরমান আহলে কেতাবরা কিছু মৌলিক আইন কানুন পরিবর্তন করলেও সামগ্রিকভাবে আসমানী কেতাবকে বদলাতে পারেনি, সেই জন্যে এ কেতাব সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দানকারী বলতে বুঝায় এ কেতাব অন্যান্য কেতাবের মতো অপরিবর্তিত অংশের সত্যতার সাক্ষ্য দানকারী। আর ওই অংশগুলো সম্পর্কে আল কোরআন বলেছে 'নিশ্চয়ই তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল কোরআন এই বলে সত্যায়ন করেছে যে, এ কেতাব সত্যসহ এসেছে।' এর দ্বারা বুঝা গেলো যে, যে সত্য সম্পর্কে আল কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে তা হচ্ছে মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, অর্থাৎ এই আকীদা যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এবং তিনিই সর্বময় ক্ষমতার মালিক সুতরাং নতি স্বীকার করতে হবে একমাত্র তাঁর কাছে– এই আকীদায় সমস্ত আসমানী কেতাব একমত। আইন কানুনের প্রশ্নে এটা ঠিক যে তিনি প্রত্যেক জাতিকে অবস্থা

ভেদে বিশেষ বিশেষ আইন ও পদ্ধতি দিয়েছেন এবং এগুলো আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মৌলিক ও প্রধান প্রধান আকীদা যে সব হয়েছে, তার অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক কালের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় লেখক ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন,

এই ইসলামই হচ্ছে প্রথম জীবন ব্যবস্থা যা আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ণাংগ আকীদা নিয়ে এসেছে অথবা রেসালাত ও রসূলের তাৎপর্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ এক বিশ্বাসের ধারণা দিয়েছে, অথবা দিয়েছে আখেরাত ও বিচার দিবস হিসাব নিকাশ ও প্রতিদান বা শাস্তি প্রদানের দিন সম্পর্কে এক পূর্ণাংগ আকীদা। লেখকরা অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই ইসলামের প্রশংসা করতে গিয়ে এই ভাবে তাদের লেখনী পরিচালনা করেছেন। এদের সামগ্রিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, এরা মহাগ্রন্থ আল কোরআন সরাসরি অধ্যয়ন করে না। তারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে অবশ্যই শুনতে পেতো যে, আল্লাহ তায়ালা সকল রসূলকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা সবাই একান্তভাবে এক আল্লাহর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই এসেছেন, আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের প্রশ্নে কোনো প্রকার শেরকের সম্ভাবনাকে মেনে নেয়া হয়নি। অর্থাৎ যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালা। এই অবিচ্ছেদ্য ক্ষমতায় কোনো পর্যায়ে এবং কোনোভাবে কারো ভাগ বসানোর কোনো অধিকার বা সুযোগ নাই। তারা সবাই মানুষকে রসূলের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন, স্পষ্টভাবে তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা মানুষ, পার্থক্য শুধু এই যে তারা বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ কর্তৃক বাছাইকৃত মানুষ। এ ছাড়া তারা কারো মালিক নন, এমন কি নিজেদের উপকার বা অপকার করার মতো ক্ষমতাও তাদের নাই, তারা গায়েবের কোনো খবর রাখেন না এবং মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী (রেযেক) সরবরাহ করা বা সীমিত করারও কোনো ক্ষমতা তাদের নাই। তারা সবাই আখেরাত বা পরকালীন যিন্দেগী সম্পর্কে এবং সেখানে যে অবস্থা হবে সে সম্পর্কে এবং হিসাব দিবসের আগমন অবশ্যম্ভাবী, যেখানে প্রতিদান অথবা শাস্তি দেয়া হবে– এসব বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে গেছেন। আর এটাও অকাট্য সত্য যে, প্রত্যেক রসূল ইসলামের মৌলিক আকীদার যে মূল বিষয়াদি পেশ করেছেন তা সব এক ও অভিন্ন এবং শেষ কেতাব, পূববর্তী সকল কেতাবের সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এসব লেখবার ইউরোপীয় কৃষ্টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন। তাদের ধারণা, আকাশ থেকে যে সব বাণী নাযিল হয়েছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করেছে এবং পৃথিবীর জাতিবর্গের উন্নতির সাথে সাথে আসমানী শিক্ষারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আল কোরআন যে মূলনীতিসমূহ স্থাপন করেছে, সেগুলোকে ভেংগে দিয়ে ইসলামকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ কেতাব ও এর পাঠকদেরকে এ বিপজ্জনক পদস্খলন থেকে বাঁচার জন্যে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

এ কেতাব নাযিলের মূল প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.) যেন মক্কাবাসী 'উম্মুল কুরা' এবং এর আশেপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক করতে পারেন। তাতেই বলা হয়েছে,

'আর যাতে করে তুমি উম্মুল কুরা (মক্কা-নগরী) ও এর আশেপাশের এলাকাবাসীকে সতর্ক করতে পারো।'

মক্কাকে উম্মুল কুরা এ জন্যে বলা হয় যে, এখানে সেই ঘরটি স্থাপিত রয়েছে যা গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যেন পৃথিবীর মানুষ এ ঘরে এসে একলা-শরীক আল্লাহর এবাদাত করতে পারে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর কাছে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এ ঘরকে বানিয়েছেন গোটা সৃষ্টিকুলের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এই ঘর থেকেই পৃথিবীবাসীর জন্যে সাধারণ দাওয়াত বেরিয়ে এসেছে, এ ঘর

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সর্বসাধারণ মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না এবং এই দাওয়াত নিয়েই মোমেনরা হজ্জ করেন যাতে করে তারা সেই ঘরের দিকে ফিরে আসেন যেখান থেকে দাওয়াতী কাজের ধারা প্রথম বেরিয়ে এসেছিলো।

এখানে মক্কাবাসী এবং তার আশেপাশের লোকদের মধ্যে দাওয়াতকে সীমাবদ্ধ করে রাখাই উদ্দেশ্য নয়, অবশ্য প্রাচ্যের অনেক ইসলাম দুশমন এইভাবে মনে করে। তারা আল কোরআনের এই আয়াতটিকে তাদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে তুলে ধরে। তারা বলতে চায় মোহাম্মাদ (স.)-এর প্রথম কাজ ছিলো মক্কা ও তার আশেপাশের কয়েকটি শহরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো। প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণ এই এলাকা থেকে দাওয়াতী কাজের সূচনা হয়েছে এবং এই এলাকার অধিবাসীর মধ্যে এর প্রভাবে যে চরিত্র, যে নিয়ম শৃংখলা এবং যে আদর্শ শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তাই ছড়িয়ে দিতে হবে সারা পৃথিবীর বৃহত্তর পরিসরে– এটাই হচ্ছে এ আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ কারণেই দেখা যায় ধীরে ধীরে এ দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে গোটা আরব উপদ্বীপে এবং তারপর এ দাওয়াত বিস্তার লাভ করে আরব বিশ্বের বাইরে। এই দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলেও যেখানে প্রথম দিকে এ দাওয়াত পৌঁছানো হয়নি। আর মদীনায় হিজরত করার পরপরই দেখা যায় ব্যাপকভাবে ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বরং মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দাওয়াত ছড়ানোর দায়িত্ব পালন করা হয়। এ মহা সত্যটি সবার সামনে থাকা সত্ত্বেও খামাখা একটি মিথ্যা কথা বলা হয়ে থাকে। দেখুন, মক্কী জীবনে দাওয়াতী কাজের সূচনালগ্নেই তো ঘোষণা দেয়া হয়েছে, 'আর অবশ্যই তোমাকে পাঠানো হয়েছে সারাবিশ্বের জন্যে এক রহমত হিসাবে।' (আল-আম্বিয়া ১০৭) আরও বলা হয়েছে, 'তোমাকে গোটা মানব জাতির জন্যে সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠানো হয়েছে।' (সাবা- ৩৮)। তবে, এসব ব্যক্তিদের এই সংকীর্ণ ধারণা গড়ে ওঠার একটা কারণ এই হতে পারে যে, প্রথম প্রথম নানা প্রকার যুলুম অত্যাচারের কারণে ইসলামের এই দাওয়াত মক্কার অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ ছিলো। তাই এরশাদ হয়েছে,

'আর যারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে, তারা এ পাক কালামকেও বিশ্বাস করে এবং তারা নামাযগুলোকে সংরক্ষণ করে।'

সুতরাং, যারা বিশ্বাস করে যে, পরকাল, হিসাব নিকাশ এবং বিচার দিবস সত্য, তারা অবশ্যই বিশ্বাস করে যে, মানব জাতির জন্যে অবশ্যই রসূল প্রেরিত হয়েছেন, যাদের কাছে ওহী নাযিল হয়েছে, আর এই বিশ্বাস আনতে গিয়ে তারা তাদের অন্তরের মধ্যে এতোটুকু সংকট অনুভব করে না, বরং এই সত্যকে বিশ্বাস করার জন্যে তারা তাদের নিজেদের মধ্যেই যেন একজন আহবায়ক রয়েছে বলে অনুভব করে। তাই দেখা যায়, তাদের আখেরাত বিশ্বাস এবং কেতাবের ওপর ঈমানের কারণেই তারা নামাযগুলোকে হেফাযত করে, যাতে এই (আনুষ্ঠানিক) এবাদাতের মাধ্যমে তারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে পারে এবং নামাযের মধ্যেই তাদের প্রতীকী এবাদাত নিয়ে মনিবের অনুগত বান্দা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। এই হচ্ছে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা যার মাধ্যমে সে আখেরাত বিশ্বাস ও দৃঢ় ঈমানের প্রমাণ হাযির করতে পারে, পেশ করতে পারে এই-কেতাব এবং এতে নাযিল হওয়ার বিষয়ের ওপর তার দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কে সে আবদ্ধ একথার এবং তার মধ্যে যে আনুগত্য করার গভীর আকাংখা যেন প্রমাণ দেয় এ কেতাব। আরও উদাহরণ পেশ করেছে এই সত্য সঠিক ও মহান কালামের প্রতি গভীর বিশ্বাসের।

কোরআনের প্রতি সন্দিহানদের মৃত্যুর দৃশ্য

এখানে এ প্রসংগের সমাপ্তি টানতে গিয়ে এমন একটি জীবন্ত দৃশ্য তুলে ধরা হচ্ছে যা মানুষকে হতবাক করে দেয়, গভীর ভাবে হৃদয়ে নাড়া দেয়, দারুণ ভাবে তাকে উদ্বিগ্ন করে এবং তার অন্তরের মধ্যে ভীষণ আতংকের সৃষ্টি করে। আর এ দৃশ্য হচ্ছে যালেমদের প্রতি শাস্তির দৃশ্য। মোশরেকরাই হচ্ছে এই সব যালেম, যারা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা দাবী করে যে, তাদের কাছে ওহী নাযিল হয়েছে, অথচ এ দাবীর পেছনে কোনো সত্যতা নাই, অথবা কখনও কখনও তারা এমনও দাবী করে যে, তারা চাইলে এই কোরআনের মতো বাণী তারাও তৈরী করতে পারে। এ যালেমদের কাছে এরকম যুলুমের আশা করা যায় না, যেহেতু তারা অতি সাধারণ মানুষ, নিছক অহংকার ও স্বার্থপরতার কারণেই তারা এই যুলুম করে, তাই জানানো হচ্ছে মৃত্যুর সময় তারা ভীষণ কষ্টদায়ক যন্ত্রণার মুখোমুখি হবে, তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ফেরেশতাকুল হাত প্রসারিত করবে এবং তাদের আত্মাগুলোকে টেনে হিঁচড়ে জোর করে বের করে নেবে। আর তাদের প্রতি যে ভীষণ তিরস্কার নেমে আসবে তা তাদের চেহারাগুলোকে বিগড়ে দেবে । তাদের অন্যান্য সকল ভালো কাজ তাদের থেকে দূর হয়ে যাবে এবং যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীকদার মনে করতো তারা সবাই তাদেরকে হতাশ করে দূরে সরে চলে যাবে।

'আর আল্লাহ সম্পর্কে যারা মিথ্যা তৈরী করে করে বলে তাদের থেকে বড় যালেম আর কে আছে? অথবা ওই ব্যক্তি থেকেও বড় যালেম কে আছে যে বলে, আমার কাছে ওহী নাযিল হয়েছে, ওর কাছে কোনো ওহী নাযিল হয়নি এবং এমন কথাও বলে, আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছেন ওরকম কথা আমিও রচনা করতে পারি! হায়, মৃত্যুকালীন ওই আযাবের ঝাঁকুনি যদি তারা দেখতে পেতো এবং দেখতে পেতো সেই সব ফেরেশতাকে যারা তাদের জান বের করে নেয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করবে! সেদিন ডাক দিয়ে তাদেরকে বলা হবে, আজকে তোমাদেরকে অতীত কাজের প্রতিদান স্বরূপ ভীষণ অপমানজনক আযাব দেয়া হবে, যেহেতু তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে যতো সব না-হক কথা বলেছিলে এবং তোমরা তাঁর আয়াতগুলো দেখে-শুনে নিছক অহংকারের কারণেই সরে অস্বীকার করেছিলে। আর বাস্তব অবস্থা তোমাদের চিন্তা করা দরকার যে, তোমরা একাকী অবস্থায় এসেছিলে এবং একাকী অবস্থায়ই (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে। আর তোমাদের পেছনে ছেড়ে আসতে হবে সেই সব জিনিস যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলোম। আর আমি তো দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে তোমরা তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী মনে করতে, তারা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। সেদিন সবার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, আর যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবে বলে তারা দাবী করতো, তারা সবাই সেদিন দূরে সরে চলে যাবে।'

কাতাদা এবং ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, উপরোক্ত আয়াতটি মুসায়লামা কাযযাব এবং তার স্ত্রী কুশ্রী কদাকার ও ভীষণ কালো সাজ্জাহ বিনতে আল হারেস সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো, অথচ রসূল (স.)-এর জীবদ্দশাতেই তাদের প্রতি এই তিরস্কারবাণী নেমে আসে। তারা দাবী করে বলেছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি বলেছিলো যে, আমার কাছেও ঠিক ঐরকম কিছু নাযিল হয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদের কাছে নাযিল করেছেন সে হচ্ছে, ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবি সারাহ। অথচ এই হতভাগা ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রসূল (স.)-এর কাছে থেকে ওহী লেখকদের একজন ছিলো বলে জানা যায়। আর যখন এই আয়াত নাযিল হলো,

'অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে পচা মাটির ঠনঠনে শুকনা মাটি থেকে' তখন ওই ব্যক্তির কাছে একথাটা অত্যন্ত কঠিন লাগলো। তারপর যখন নবী (স.) এই আয়াত, 'তারপর

তাকে রূপান্তরিত করলাম অন্য আর একটি সৃষ্টিতে' পর্যন্ত পড়লেন, তখন উক্ত আবদুল্লাহ মানব সৃষ্টির এই বিস্তারিত বিবরণ শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং বলে উঠলো, মহা বরকতময় আল্লাহ তায়ালা, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী (অন্যান্য যারা সৃজনী ক্ষমতার দাবী করে, যে সব ঠুনকো জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তারা নিজেদের মনে করে, মূলত সেগুলো কোনো সৃষ্টি নয়, সেগুলো হলে আবিষ্কার এবং অনেক সময় সে সব আবিষ্কারও ভুল প্রমাণিত হয়)। এসময় রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, হাঁ, এভাবেই আমার কাছে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।' এ কথায় আবদুল্লাহ সন্দেহ করলো ও বললো, মোহাম্মদ যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে আমার কাছেও সেই রকম অনেক কিছু নাযিল হয়েছে। আর সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলেও আমি তাই বলবো যা সে বলেছে এবং একথা বলে সে মুরতাদ হয়ে গেলো অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগ করলো এবং মোশরেকদের সাথে মিলিত হলো। এ কারণেই বলা হয়েছে, 'আর যে বললো, শীঘ্রই আমি নাযিল করবো সেই রকম কিছু যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন (ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে কালবী এই বর্ণনা এনেছেন)।

এ প্রসংগে ওইসব যালেমের শাস্তি সম্পর্কে যে দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে, তা ছিলো আসলে মোশরেকদের সম্পর্কেই আগত বাণী। এ এক ভয়ানক দৃশ্যের বর্ণনা, যা মনের ওপর ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করে এবং অপরাধী যে কোনো ব্যক্তি অন্তরে দারুণ জ্বালা অনুভব করতে থাকে। এসব যালেম মৃত্যুর ভীষণ ঝাঁকুনি এবং বেহুঁশ করে দেয়ার মতো কষ্টের মধ্যে থাকবে। এখানে 'গামারাত' শব্দ দ্বারা বুঝায় মহা দুঃখময় পরিস্থিতি এবং ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাদের হাত ছড়িয়ে দেবেন, তারা ওদের প্রাণগুলো টেনে হিঁচড়ে বের করে নেবেন এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্তও করে তুলবেন। দেখুন এরশাদে রব্বানী,

'আর যদি তুমি দেখতে পেতে সেই সময়ের অবস্থা যখন যালেমরা মৃত্যুর যন্ত্রণাদায়ক খিঁচুনির মধ্যে থাকবে এবং ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে, বের করে দাও তোমাদের জানগুলোকে। আজকের দিনে তোমাদেরকে তোমাদের না-হক কথা ও কাজের কারণে ভীষণ অপমানজনক আযাব দেয়া হবে। আর তোমরা তো আল্লাহর আয়াতগুলো শুনে মানোনি, বরং অহংকার করতে থেকেছো।' বড়াই করার বদলা হচ্ছে অপমানজনক আযাব এবং আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার সাজা হচ্ছে এই ভীষণ তিরস্কার.........এবং এ সব কিছুর বর্ণনা মনের ওপর ভীষণ এক যন্ত্রণাদায়ক চাপ সৃষ্টি করে, এই ভয়ংকর হুমকির কারণে ভীষণ এক ভয়, সংকট ও দুঃখ তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে।

পরিশেষে আবারও বলা হচ্ছে যে, এসব হচ্ছে নবী (স.)-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধমক এবং তিরস্কার এবং চরম ভীতিজনক এই অবস্থা তাদের ছেড়ে ফেলবে এবং এও বলে দেয়া হচ্ছে যে, সে দিনটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ভীষণ চিন্তা ও দুঃখ এবং আসন্ন চরম সংকটের এই অবস্থা তাদের মনকে আজ দুর্বিষহ চিন্তায় ছেয়ে ফেলছে। সাথে সাথে এ ধারণাও দেয়া হচ্ছে,

'অবশ্য তোমরা একাকী অবস্থাতেই আমার দরবারে হাযির হবে (কেউ থাকবে না পক্ষে কথা বলার বা সাহায্য করার) যেমন করে একাকী অবস্থাতে আমি তোমাদের প্রথমবারে সৃষ্টি করেছিলাম। তেমনি করে পুনরায় তোমাদেরকে একাকী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।'

অতএব তোমরা একাকী অবস্থায় যে ভালো কাজ করেছো, তাই তোমাদের সাথে যাবে। তোমাদের প্রতিপালকের সাথে তোমরা একাকী অবস্থায়ই সাক্ষাত করবে– দলবদ্ধভাবে নয়। যেমন করে তোমাদেরকে তিনি প্রথম বারে একাকী অবস্থায় সৃষ্টি করেছিলেন, পয়দা হয়েছিলে মায়ের পেট থেকে একাকী অবস্থায়, ল্যাংটা ও অসহায় অবস্থায়, তেমনি করেই তোমাদেরকে

ফিরে যেতে হবে। তোমাদের থেকে তোমাদের সব কিছু দূরে সরে যাবে এবং সবাই তোমাদেরকে একাকী ফেলে রেখে আলাদা হয়ে যাবে, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে যেসব জিনিস দিয়েছিলেন এবং যে সব জিনিসের ওপর তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, তা আর কখনও তোমরা ফিরে পাবে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, সে সব কিছুকে তোমরা পেছনে ফেলে রেখে আসবে।'

সকল অর্থ সম্পদ ও সুখ সৌন্দর্যের বিষয়াদি তোমরা পেছনে ফেলে একাকী চলে আসবে, তোমাদের সন্তান সন্ততি ও বিষয় আশয়, মান সম্মান সব কিছুই সেখানে পেছনে পরিত্যক্ত হবে, তোমাদের সাথে কিছুই এগুলো যাবে না বা থাকবে না এবং অল্প বিস্তর কোনো কিছুরই তোমরা সেদিন মালিক হবে না।

'আর যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক করতে, তারা তোমাদের জন্যে সুপারিশকারী হবে বলে আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

তোমরা তো ওদেরকে কঠিন সময়ে সুপারিশ করবে বলে মনে করতে এবং তাদেরকে তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদের অংশীদার মনে করতে এবং বলতে যে, তারা তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হবে। যেমন 'আমরা ওদের পূজা পার্বণ বা আনুগত্য শুধুমাত্র এই জন্যে করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে।' এসব পূজনীয় ব্যক্তি কিছু ধর্মযাজক বা কিছু ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হোক অথবা পাথর নির্মিত কোনো মূর্তিই হোক, অথবা পুতুল, কোনো জ্বিন বা কোনো ফেরেশতাই হোক না কেন, অথবা কোনো তারা বা কোনো গ্রহ বা– এসব ছাড়া অন্য কিছু হোক না কেন– যে সব অলীক ও ক্ষমতাহীন জিনিসকে তারকা ক্ষমতাধর মনে করে এবং তাদের জীবন, সন্তান ও সম্পদের ব্যাপারে এদেরকে তারা আল্লাহর অংশীদার মনে করে। এ বিষয়ে সূরার মধ্যে আরো আলোচনা আসছে,

সুতরাং, কোথায় তারা? (কেয়ামতের দিন বলা হবে- কোথায় তোমাদের সেই সব শরীকদার ও শাফায়াত-কারীরা?) কোনো জওয়াব আসবে না– তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন,

অবশ্যই পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিলো তা আজ সব কেটে গেছে।

সেদিন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে যাবে, যা কিছু জিনিস তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী পৌঁছে দেবে বলে তোমরা মনে করতে কোনো মাধ্যম বা কোনো যোগ- সূত্র যা-ই তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে থাকুক না কেন, কোনোটাই সেদিন থাকবে না। তাই বলা হচ্ছে,

'দূর হয়ে যাবে(সেদিন তোমাদের সেই সব যোগসূত্র,) যা তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে বলে তোমরা মনে করতে।

আর তোমরা যে সব বিভিন্ন দাবী করতে তা তোমাদের থেকে দূর হয়ে যাবে- এসব দাবী করা জিনিসের মধ্যে ওই শরীকদাররা (তোমাদের ধারণা মোতাবেক) ও আছে। আল্লাহর কাছে, সেই ভয়ংকর দিনে কারো কোনো সুপারিশের মর্যাদা বা প্রভাব থাকবে না।

সেই মহা ভয়াবহ দৃশ্য সেদিন মানব-হৃদয়কে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তুলবে। এর সাথে কখনও তারা মন্ত্রমুগ্ধের মধ্যে হতবাক ও স্পন্দন বিহীন হয়ে থাকবে এবং কখনও বা প্রচন্ড বেগে নড়তে থাকবে। এই ভয়ের ছাপ তাদের অন্তরের মধ্যে গভীরভাবে বিদ্ধ হবে এবং হৃদয়ের মধ্যে এ ভয়ের পেয়ালা সদাসর্বদা জীবন্ত হয়ে থাকবে। যন্ত্রণাদায়ক এই অনুভূতি লেগেই থাকবে এবং এ ভীষণ ভয়ের ছাপ কোনো সময়ের জন্যেই দূর হবে না।

হাঁ, এই হচ্ছে আল কোরআন -এই হচ্ছে আল কোরআন,

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ

وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ

الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ

مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ

شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ

طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا

রুকু ১২

৯৫. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শস্যবীজ ও আঁটিগুলো অংকুরিত করেন, তিনিই নির্জীব (কিছু) থেকে জীবন্ত (কিছু) বের করে আনেন, (আবার) তিনিই জীবন্ত (কিছু) থেকে প্রাণহীন কিছু নির্গত করেন; এই (সৃষ্টি কৌশলের মালিক) হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, (এরপরও) তোমরা কোথায় কোথায় ঠোকর খাচ্ছো (বলো)! ৯৬. (রাতের আঁধার ভেদ করে) তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনি রাতকে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং (দিন তারিখের) হিসাব কিতাবের জন্যে তিনি চাঁদ ও সুরুজ বানিয়েছেন,, এসব কিছুই হচ্ছে মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ করা (বিষয়)। ৯৭. তিনি তোমাদের জন্যে (অসংখ্য) তারকা বানিয়ে রেখেছেন যেন তোমরা জলে-স্থলের আঁধারে পথের দিশা পেতে পারো, যে সম্প্রদায়ের লোকেরা (এ সব কিছু) জানে, তাদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করেছি। ৯৮. তিনি তোমাদের মাত্র একটি ব্যক্তিসত্তা থেকে পয়দা করেছেন, অতপর তিনি (তোমাদের) থাকার জায়গা ও মালসামান রাখার জায়গা (বানালেন), জ্ঞানী লোকদের জন্যে আমি আমার নিদর্শনগুলো (এভাবেই) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। ৯৯. তিনি আসমান থেকে পানি (-র ধারা) নাযিল করেন, অতপর সে পানি দিয়ে আমি সব রকমের উদ্ভিদ (ও গাছপালা) জন্মানোর ব্যবস্থা করি, তা থেকে সবুজ শ্যামল পাতা উদগত করি, পরে তা থেকে পরস্পর জড়ানো ঘন শস্যদানাও সৃষ্টি করি এবং (ফলের) ভারে নুয়ে পড়া খেজুরের গোছা বের করে আনি, আংগুরের উদ্যানমালা, জলপাই ও আনার পয়দা করি, এগুলো একে অন্যের সদৃশ হয়, আবার (একটার সাথে) আরেকটার গরমিলও থাকে; গাছ যখন সুশোভিত হয় তখন (এক

وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ

لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ

وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ

وَالْاَرْضِ ۗ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ

وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ

شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ

يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾

সময়) তা ফলবান হয়, আবার যখন ফলগুলো পাকতে শুরু করে, তখন তোমরা এই সৃষ্টি-নৈপুণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকো; অবশ্যই এতে ঈমানদার লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। ১০০. তারা জ্বিনকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই জ্বিনদের পয়দা করেছেন, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ তায়ালার ওপর পুত্র-কন্যা ধারণের অপবাদও আনয়ন করে, অথচ আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত, এরা যা বলে তিনি তার চাইতে অনেক মহান ও পবিত্র।

রুকু ১৩

১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের (একক) উদ্ভাবক। (এদের তুমি বলো), তাঁর সন্তান হবে কি ভাবে, তাঁর তো জীবনসংগিনীই নেই, সব কিছু তিনিই পয়দা করেছেন এবং সব কিছু সম্পর্কে তিনি পুরোপুরিই ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ১০২. তিনিই আল্লাহ তায়ালা– তোমাদের মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সব কিছুর (একক) স্রষ্টা তিনি, সুতরাং তোমরা তাঁরই এবাদাত করো, সব কিছুর ওপর তিনি চূড়ান্ত তত্ত্বাবধায়ক বটে। ১০৩. কোনো (সাধারণ) দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পায় না, (অথচ) তিনি সব কিছুই দেখতে পান, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনি সব কিছু সম্পর্কেই খোঁজ-খবর রাখেন। ১০৪. তোমাদের কাছে তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এই) সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান (-এর নিদর্শন) এসেছে, অতপর যদি কোনো ব্যক্তি (এসব নিদর্শন) দেখতে পায়, তাহলে সে তা দেখবে তার নিজের (কল্যাণের) জন্যেই, আবার যদি কেউ (তা না দেখে) অন্ধ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপরই (বর্তাবে। তুমি বলো); আমি তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নই।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ؕ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

১০৫. আমি এভাবেই আমার আয়াতগুলো (তোমাদের কাছে) বিধৃত করি, যাতে করে তারা একথা বলতে পারে, তুমি (এসব কথা ভালো করেই) পড়ে এসেছো এবং যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে যেন আমি তাকে (আরো) সুস্পষ্ট করে দিতে পারি। ১০৬. (হে মোহাম্মদ,) তুমি শুধু তারই অনুসরণ করো– যা তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমার কাছে নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, (এরপরও) যারা শেরেকে লিপ্ত, তাদের তুমি (পুরোপুরিই) এড়িয়ে চলো। ১০৭. আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে এরা কেউই তাঁর সাথে শেরেক করতো না; আর আমি (কিন্তু) তোমাকে তাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠাইনি, (সত্যি কথা হচ্ছে,) তুমি তো তাদের ওপর কোনো অভিভাবকও নও। ১০৮. তারা আল্লাহ তায়ালার বদলে যাদের ডাকে, তাদের তোমরা কখনো গালি-গালাজ করো না, নইলে শত্রুতার বশবর্তী হয়ে না জেনে আল্লাহ তায়ালাকেও তারা গালি দেবে; আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই তাদের নিজেদের কার্যকলাপ সুশোভন করে রেখেছি, অতপর (সবাইকেই) তাদের মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, (তারপর) তিনি তাদের বলে দেবেন, তারা (দুনিয়ার জীবনে) কি করে এসেছে। ১০৯. এরা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তাহলে অবশ্যই তারা তার ওপর ঈমান আনবে; তুমি বলো, নিদর্শন পাঠানো (সম্পূর্ণত) আল্লাহ তায়ালার ব্যাপার, তুমি কি জানো (এদের অবস্থা), নিদর্শন এলেও এরা কিন্তু কখনো ঈমান আনবে না। ১১০. আমি (অচিরেই) তাদের অন্তকরণ ও দৃষ্টিশক্তিকে (অন্যদিকে) ফিরিয়ে দেবো, যেমন তারা প্রথম বারেই এ (কোরআনের) ওপর ঈমান আনেনি এবং আমি (এবার) তাদের অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেবো!

তাফসীর
আয়াত ৯৫-১১৩

এ সূরাটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা এর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করেছি এখানে সেগুলোকে এক এক করে বর্ণনা করার দরকার মনে করছি। হাযির করতে চাই আমরা সেই প্রাণ স্পন্দনকারী বিষয়গুলো যা চেতনায় এক বিপ্লব সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি ধমনীতে আনে উত্তাল প্রবাহ। কেয়ামতের ওই ভয়ংকর দিনে বিস্ময়কর ও ভয়ানক যে সব দৃশ্যের অবতারণা হবে, তার বিশদ বর্ণনা ও কল্পনা যেন জীবন্ত রূপ দিয়েছে ওই কঠিন বাস্তবতাকে।

এ সূরাটি এর মধ্যে আলোচিত মূল বিষয়টিকে এক অনবদ্য ভংগিতে পেশ করেছে। এ আলোচনার প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে এবং এর মধ্যে ব্যক্ত প্রতিটি দৃশ্যে যে ভীতিজনক অবস্থা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে, অনুভূতিকে চাংগা করে দেয়- হৃদয়কেও করে অভিভূত। মনে হয় যেন বর্ণিত দৃশ্যগুলো সামনে ভাসছে এবং যে সব ঘটনা কেয়ামতের দিন ঘটবে তা যেন এ বর্ণনাভংগিতে জীবন্ত রূপ নিয়ে পাঠকের সামনে হাযির হয়ে যায়।

কেয়ামতের দিনের এসব দৃশ্য এবং বিভিন্ন ঘটনার জীবন্ত ছবি এখানের বর্ণনাতে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মানব-হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে তীব্র অনুভূতি জাগে, ভীষণ স্পন্দন এবং এক এক স্থায়ী ভয় তাকে পেয়ে বসে, এমন কি, তীব্র ভয়ে শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় যেন আড়ষ্টতা নেমে আসে।

কেয়ামতের বর্ণনা এমন জীবন্তভাবে এখানে আনা হয়েছে যে মানব হৃদয়ের মধ্যে প্রচন্ড তোলপাড় শুরু হয়ে যায় এবং এ আন্দোলন তার অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে এমন এক ভীতির সঞ্চার করে যা কিছুতেই দূর হতে চায় না, যা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি.... বিভিন্ন দৃশ্যকে প্রাসংগিক ভাবে এবং প্রয়োজন মতো তুলে ধরা হয়েছে। ভ্রান্ত ও আত্ম-বিস্মৃত মানব জাতিকে সত্য পথে পরিচালনার জন্যে এবং অনাগত চির সুন্দর জীবনের সুখ শান্তি লাভের আকাংখা তাদের মনে জাগানোর জন্যে, সাথে সাথে না-ফরমানদের কি কি কঠিন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে- সেগুলো সম্পর্কে যে ছবি আঁকা হয়েছে তাতে পাঠকের মনের প্রত্যেকটি জানালা খুলে যায়, তার অন্তরের জড়তা দূরীভূত হয়, সজাগ হয়ে যায় ঘুমন্ত বিবেক এবং তখন এই জাগ্রত জনতার ভিড় এগিয়ে আসে অসত্যের বাঁধ ভেংগে সত্যকে আলিংগন করার জন্যে। আরও রয়েছে অনেক অনেক তথ্য- বলার মতো আরও অনেক কথা।(১)

আলোচ্য পাঠে এ সব দিককে পূর্ণাংগভাবে এবং সার্বিকভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। পাঠক এ অধ্যায়টুকু অধ্যয়নের সময় গভীরভাবে অনুভব করে যেন কেয়ামতের দিনে অনুষ্ঠিতব্য সকল দৃশ্য জীবন্ত রূপ নিয়ে তার সামনে হাযির হয়ে গেছে , নাড়া দিচ্ছে প্রচন্ডভাবে তার সকল অনুভূতিকে। এ সব কিছুর বিস্তারিত বর্ণনার উদ্দেশ্য মানুষকে ওই দিনের কথা স্মরণ করানো এবং কর্মময় এ জীবনের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করা।

এ দৃশ্যাবলীর মধ্যে প্রত্যেকটি দৃশ্যই যেমন চমৎকার, তেমনি ভীতিজনক, আর তেমনি মনের ওপর দীর্ঘ স্থায়ী ছাপ ফেলার খেদমত আনজাম দেয়, জাগায় মানুষকে অলসতার ঘুম থেকে, ভাংগিয়ে দেয় তার সেই সব ভুল, যার মধ্যে দিবারাত্র সে হাবুডুবু খাচ্ছে। সকল সত্যকে তার অনুভূতি তার অন্তর ও তার বুদ্ধির কাছে স্পষ্ট করে তোলে।

---

(১) এ খন্ডের অন্যান্য জায়গায়ও এ বিষয়ের ওপর আরও আলোচনা এসছে,

আর সূরাটির বর্ণনাধারার প্রতিটি বাক্যই বিস্তারিত বিবরণে ভরা। আর এ বিবরণের মধ্যে যে বাস্তবতা বর্তমান রয়েছে, তা জীবন্ত দৃশ্যাবলীর প্রতীক এবং যুক্তি গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করার শক্তিও বিদ্যমান এবং সব কিছুকে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আর সূরাটির বর্ণনার মধ্যে যুক্তি প্রমাণ সুস্পষ্ট, দৃশ্যাবলী ও বক্তব্যগুলো বড়ই প্রাণবন্ত, যার কারণে মানুষের অনুভূতি এমনিতেই চাংগা হয়ে ওঠে। কিন্তু একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তার মানসিক উদ্বেগ অবশেষে শান্ত হলেও শেষ হবে না। কারণ একবার এ উদ্বেগ শান্ত হয়ে আসলেও নতুন আর এক উদ্বেগ তাদেরকে অস্থির করে ফেলবে। এ অস্থিরতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্যে ইতিপূর্বে আমরা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি।

গোটা সৃষ্টির পাতা সার্বিকভাবে সবার জন্যে খোলা রয়েছে, যে কোনো ব্যক্তি নযর ফেললেই এই মহিমাময় দৃশ্য দেখতে পারে এবং এসব থেকে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতা অনুভব করতে পারে। আমার মনে হয়, এখানে ওখানে যেদিকে তাকাই যেন আল্লাহর করুণারাশি সদাই দেখতে পাই।

সৃষ্টিলোকে যে সৌন্দর্য সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তা এতই মনোমুগ্ধকর যে, চিন্তাশীল যে কোনো ব্যক্তি তা দেখে চমৎকৃত হয়ে যায়। পরম পুলকে ভরে যায় তার মন। প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্যপূর্ণ, এর প্রতিটি দিক এবং প্রতিটি বিভাগের সৌন্দর্য মহাসুন্দর স্রষ্টার মহিমা ও তাঁর অপরিসীম সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে চলেছে এবং এসব কিছুর পেছনে যে পরম করুণাময় আল্লাহর হাত অদৃশ্য ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা যে কোনো বিদগ্ধ চিত্ত বুঝতে পারে। রব্বুল আলামীন-এর সীমাহীন শক্তি ও ক্ষমতা যেসব কিছুর পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে এটাও বুঝতে তাদের কষ্ট হয় না এবং এইভাবে সদা- সর্বদা পরম ও চরম সত্য বিকশিত হয়ে চলেছে। একই ভাবে, সৃষ্টির পরতে পরতে সজ্জিত সৌন্দর্যরাশি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ সৌন্দর্যের খবর ছড়িয়ে যাচ্ছে দিবারাত্র এমনকি আমাদের জীবনের চরম উন্নতি ও অবনতির মধ্যেও মহান আল্লাহর মহিমার বিকাশ দেখা যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'তাকিয়ে দেখো একবার এসব গাছের ফলের দিকে যখন ফল ধরতে থাকে আর যখন তা পাক ধরে।' এই আয়াত দ্বারা আল্লাহর সৌন্দর্যের মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যা যে কোনো চিন্তাশীল হৃদয়ে পুলক জাগায়, ভরে দেয় মনকে কানায় কানায়।(১) তারপর মানুষ যখন সাধারণ এই প্রাকৃতিক ও জীব জগতের সৌন্দর্যের উর্ধের দিকে তাকায় করে, তখন সেখানে মহান আল্লাহর সৌন্দর্যের চূড়ান্ত রূপ দেখে এবং তখন সে আল্লাহকে আসমান যমীন তথা সারা বিশ্বের পরিকল্পনা প্রনেতা ও নির্মাতা হিসাবে দেখতে পায়, দেখতে পায় সব কিছু যেন আল্লাহর গুণ বর্ণনা করে চলেছে, জানিয়ে দেয় এমন এক বার্তা, যার বর্ণনা দিতে মানবীয় ভাষা অক্ষম। একমাত্র আল কোরআনের ভাষাতেই তা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। তাই বলা হচ্ছে,

'তিনি এমন সৌন্দর্যকর সত্ত্বা, যা কোনো চোখ কোনো দিন দেখতে পাবে না, বরং তিনি সকল চোখের চোখকে দেখেন এবং তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

এরপর এ পাঠের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যেন আমি উন্মুক্ত সৃষ্টির খোলা উদ্যানে বসে আছি। এ খোলা উদ্যানের পাশ দিয়ে উদাসীন ব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেছে। কিন্তু এখানে তারা

---

(১) দেখুন, এ প্রসংগের বিস্তারিত বিবররণ '। আল জামালু ফিত্তাসাউউরিল ইসলামী' এবং অন্য আর একটি অধ্যায় 'মাশাহিদু ত্তাবিয়াতু ফিল কোরআন।'– মোহাম্মদ কুতুব রচিত 'মিনহাজুল ফান্নিল ইসলামী।

অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছে না, না দেখতে পাচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে। এর পাশ দিয়ে যাতায়াত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিরাও, তাদের সামনে আল্লাহর এসব রহস্য ভান্ডার কোনো চমক জাগায় না, না দেয় তাদেরকে কোনো অভিনব বার্তা। আর এই হচ্ছে সে আল কোরআনের বিস্ময়কর প্রসংগ, যা আমাদের হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায় মহাবিশ্বের এই মহা বিস্ময়ের দিকে। আর তখন যেন আমরা তাঁর দিকে এগিয়ে যাই এবং দেখতে পাই তাঁর আশ্চর্যজনক নিশানাগুলো। খুলে যায় আমাদের চোখ ওই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য সন্দর্শনে এবং আমরা চরমভাবে অভিভূত হয়ে যাই, অথচ প্রতিনিয়ত উদাসীন লোকেরা এসব বিস্ময়কর জিনিস দেখছে। কিন্তু তাদের মনে কোনো দাগ কাটে না।

বহু অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী দিবারাত্র আমাদের সামনে ঘটে চলেছে এবং আমরা তা দেখছি, দেখছি এমন কিছু বিস্ময়কর জিনিস এই প্রাণহীন প্রকৃতির মধ্যেও যা অবশ্যই কোনো কোনো সময়ে আমাদের চেতনায় সাড়া জাগায়। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না কেমন করে, কার ইশারায় এসব ঘটছে, এ সবের উৎস কোথায়! তবে যখন একথা আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই এগুলো আসছে এবং তাঁরই কুদরতী ইশারায় এসব কিছু পরিচালিত হচ্ছে, তখন আমাদের অস্থির মন প্রশান্ত হয়ে যায়; কিন্তু কোনো মানুষ এ পরিমাপ করতে পারে না যে, কোন, মহা-পরিকল্পনার ভিত্তিতে এসব কিছু গতিশীল রয়েছে। এরপর আমরা থমকে দাঁড়াই আকাশের মধ্যে গ্রহ-উপগ্রহগুলোর বিস্ময়কর আবর্তনের সামনে। এ এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থা, যার কোনো বিকল্প মানুষের কাছে নাই, বা অন্য কিছুর সাথে মানুষ এগুলো তুলনা করতে পারে না। রাত দিন বরং প্রতি মুহূর্তে এ আবর্তন চলছে। আবার আমরা তাকাই মানব সৃষ্টির দিকে; একটি মাত্র মানুষ থেকে আজ বিশ্ব ভরা এই কোটি কোটি মানুষ। তারপর তাকাই গাছ পালা ও তরুলতার দিকে, দেখতে থাকি মুষলধারে বর্ষণ মুখর বৃষ্টির দিকে এবং মাঠভরা ফসলের দিকে, মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি মধুর রসে ভরা পাকা পাকা নানা বর্ণ ও নানা গন্ধের ফলরাশির দিকে। আরও দেখি এ পৃথিবীটি ভরে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির জীবজন্তু ও কীটপতংগে, রয়েছে এর মধ্যে আরও কতো অভিনব দৃশ্য, অন্তরের চোখ দিয়ে যার দিকে খেয়াল করে তাকালে গভীর চিন্তার উদ্রেক করে।

এইভাবে গোটা সৃষ্টির দিকে যখন আমরা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি দিয়ে তাকাই, তখন আমরা পৃথিবীকে এক নতুন আংগিকে দেখতে পাই এবং তখন মনে হয় যেন আমরা এই প্রথম এসব কিছুকে দেখতে পাচ্ছি। এসব জীবন্ত জগৎ, সবাই আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত, আর আমরাও ওদের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো সবই কিন্তু গতিশীল এবং আমরা দেখতে পাই আর না পাই জীব জগতের পাশাপাশি জড় জগতের সব কিছুই ধীর ও মন্থর গতিতে সদা সর্বদা কাজ করে চলেছে। তাদের সবার মধ্যে এমন অদ্ভুত যোগাযোগ রয়েছে যার দিকে তাকালে মন অভিভূত হয়ে যায়, চেতনায় জাগে এক বিস্ময় যার কারণে বাক রুদ্ধ হয়ে যেতে চায়। এসব কিছু এদের মহান স্রষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হৃদয়কে তাঁর নিদর্শনাবলীর দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং তাঁর কুদরত সম্পর্কে আমাদেরকে ওয়াকেফহাল করে।

এ পর্যন্ত আলোচনা শেষে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর সাথে যে শেরেক করা হয়, তার ওপরই এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রসংগ এগিয়ে চলেছে শেরেক ও মোশরেকদের পর্যালোচনা নিয়ে– সেই সব বিস্ময়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যা এ মহাসৃষ্টির স্বভাব ও প্রকৃতিকে ঘিরে রয়েছে সর্বক্ষণ। একমাত্র সেই সব মানুষ এগুলোর রহস্য বুঝতে পারে,

যারা আল্লাহর দেয়া প্রমাণাদি ও তাঁরই দেয়া চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে। বিস্ময়কর এ অস্তিত্ব সম্পর্কে ঈমানের নিরিখে যারা দেখতে চায় তাদের সামনে শেরেক ও মোশরেকদের যুক্তি-তর্ক চরম ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

আল কোরআনের মধ্যে যে বর্ণনাধারা অনুসরণ করা হয়েছে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে চেতনা দেয়ার জন্যে গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং দাসত্ব কি এবং দাসদের কর্তব্য কি সে বিষয়ে তাদেরকে যথাযথ জ্ঞান দান করা হয়েছে। জানানো হয়েছে সৃষ্টির তাৎপর্য ও যে উদ্দেশ্যে গোটা সৃষ্টি জগতকে অস্তিত্বের আনা হয়, তার রহস্য সম্পর্কে। আরও জানানো হয়েছে সেই মালিক মনিব সম্পর্কে, প্রকৃতপক্ষেই যিনি সবার খাদ্য খাবার থেকে নিয়ে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করার দায়িত্ব বহন করে এবং আরো জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাজ্যের মধ্যে তাদের রেযেক আরোহণের পথকে সর্বতোভাবে করে দিয়েছেন সহজ ও সুগম। এ মহান কালামের মধ্যে আরও জানানো হয়েছে সেই মহামহিম ক্ষমতাবান আল্লাহর কথা, যিনি সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের রেযেক দেন এবং গোটা সৃষ্টি জগতে তাঁর নিজের ক্ষমতার পুরোপুরি ব্যবহার করেন এবং এ সব কাজে সহায়তার জন্যে তিনি কাউকে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেন না। এ সব তথ্যকে তিনি বানিয়েছেন প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী। এগুলোকে সুদৃঢ় প্রমাণের ভিত্তিতে মযবুত আরও বানিয়েছেন, যাতে করে মানব জাতিকে এ মহাসত্যের দিকে ডাকার প্রয়োজন এগুলো যথাযোগ্যভাবে মিটাতে পারে। আর এর জন্যে সর্ব প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে দাসত্ব করতে হবে একমাত্র আল্লাহরই, পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে নিরংকুশ ভাবে ও বিনা প্রশ্নে শুধু তাঁরই আনুগত্য করতে হবে (এ ভাবে কোনো চিন্তা ভাবনা না করে বা ভালো মন্দ না বুঝে, অন্য কারো কথা মানা যাবে না।) এই সৃষ্টির পাতা সবার সামনে খুলে দিয়ে, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জানানোর পর এবং তাদের জীবনের প্রয়োজনাদি মেটানো তাদের দেখাশুনা এবং কে কোন পদ্ধতিতে তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে তা জানানোর পর তাদেরকে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করতে আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছে যেন তারা সবাই একমাত্র আল্লাহরই গোলামী করে আর কারো নয় এবং সকল শক্তি, ক্ষমতা ও গুণাবলীর আধার একমাত্র তাঁকেই মনে করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়। আরও জানানো হয়েছে তারা যেন অবশ্যই তাঁকেই একমাত্র শাসন ক্ষমতার মালিক আইনদাতা ও যাবতীয় বিষয়ের বিচার ফয়সালার মালিক মনে করে।

আর এ ভাবেই এই দারসের মধ্যে আল্লাহরই বাণীতে উপরোক্ত বিষয়াদির ওপর আমরা পরিষ্কার নির্দেশনা পাচ্ছি, 'তোমাদের আল্লাহই তোমাদের রব, তিনি ছাড়া সর্বময় ক্ষমতার মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি, আইনদাতা ও নিজ স্বাধীন ইচ্ছা মোতাবেক শাসন কাজ পরিচালনার যোগ্য আর কেউ নাই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অতএব একমাত্র তাঁরই নিরংকুশ দাসত্ব করো এবং (তাঁর ক্ষমতা হচ্ছে) তিনি সব কিছুই, তদারকী ও নির্বাহ করেন।'

আল্লাহর সাথে বান্দার দাসত্ব বন্ধনকে একান্তভাবে মযবুত বানানোর জন্যে এই হচ্ছে আল কোরআনের বর্ণনা ভংগির দৃষ্টান্ত। এখানে পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে যে, সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, তিনি মহা-পবিত্র, যাবতীয় দুর্বলতা বা অক্ষমতার উর্ধে। 'সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা (একমাত্র) তিনি।' 'আর তিনি সকল কিছুর পরিচালক ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী।'

এ দারসের পরিসমাপ্তিতে গোটা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে কথা বলার পর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন (মোজেযা) করার জন্যে দাবী জানানো যে কত বড় অপরাধ তা স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। একই ভাবে না-ফরমান ও মিথ্যা বাদীদের প্রকৃত উন্মোচন করা হয়েছে। তারা প্রমাণাদির অভাব বা

আয়াতগুলো ক্রটিপূর্ণ হওয়ার কারণে ঈমান গ্রহণ করা পিছিয়ে ছিলো তা নয়, বরং একমাত্র না-ফরমানীর কারণে ও দুনিয়ার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণেই তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সত্যকে দেখেও দেখতে পাচ্ছিলো না। যদি তারা এই ভাবে বিরোধিতা না করতো এবং সত্য থেকে পিছিয়ে না থাকতো, তাহলে গোটা সৃষ্টির চেহারা বদলে যেতো, মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হয়ে যেতো।

সৃষ্টি সম্পর্কে নাস্তিকদের ভাবনা ও কোরআনের বক্তব্য

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা দানার আবরণ ভেদ করে অংকুর বের করার মালিক এবং খেজুরের আটির শক্ত খোলসের মধ্য থেকে প্রাণ প্রবাহী চারা নির্গতকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিত (প্রাণ) বের করেনেওয়ালা এবং মুর্দা থেকে বের করেন যিন্দা (প্রাণী)-কে। এই সব ক্ষমতার অধিকারী যিনি তিনিই আল্লাহ, তাহলে বলো কোন্ (অন্ধকারের) দিকে তোমাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার রহস্য কেউ জানে না। আর তাঁর কাজ করার যে ক্ষমতা তা অন্য কারো যে থাকতে পারে না তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। জীবন সৃষ্টি করার ক্ষমতাই হচ্ছে অলৌকিক ক্ষমতা— আর এর অর্থ হচ্ছে, প্রাণীকে সৃষ্টি করা এবং সে সৃষ্টিকে নড়া-চড়ার ক্ষমতা দান করে সচল করে দেয়া। আর পৃথিবীর বুকে এটা প্রতিনিয়ত ঘটছে যে, বীজ-দানা ফেটে যাচ্ছে এবং তার মধ্য থেকে অংকুর বের হয়ে আসছে এবং পুরানো আটি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তাজা গাছের চারা, আর দানা এবং আঁটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা জীবন কিভাবে চলছে এবং কার ইশারায় বেরিয়ে আসছে সুন্দর শ্যামল চারা এবং পরিশেষে পরিণত হচ্ছে সুন্দর, সুঠাম ও মযবুত গাছে এ রহস্যের সন্ধান একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। আর আল্লাহ ছাড়া এসব জীবনের উৎস কোথায় তা আর কেউ বলতে পারে না। জানেও না কেউ এ রহস্য। মানবজাতি যা বাহ্যিক ভাবে দেখে তারই ওপর চিন্তা-ভাবনা করে এবং তারপর নির্ভর করেই কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে যা কিছু পড়াশুনা তারা করে, তারই ওপর ভিত্তি করে তারা 'গায়েবের' রহস্য উদঘাটন করতে চায়। যেমন করে প্রথম মানুষটি নিজের পেশা এবং আত্মপ্রকাশের পথ বেছে নিয়েছিলো এবং ভুলে গিয়েছিলো নিজের জন্মের উৎস এবং যে বস্তুকণা থেকে সে সৃষ্টি হয়েছিলো তার কথা। এভাবে বরাবর জীবন সৃষ্টির কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এইভাবে প্রতিনিয়তই মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ ঘটছে।

আর যে দিন আল্লাহ সোবাহানাহু ওয়া তায়ালা মৃত থেকে যিন্দা প্রাণী বের করার শুরু করলেন, তখন তো জগতের অস্তিত্ব বর্তমান ছিলো, অথবা কমপক্ষে এ পৃথিবী তো বর্তমান ছিলোই, তবে সেখানে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিলো না। তারপর প্রাণীর বসবাস শুরু হয়— যাকে আল্লাহ তায়ালা মুর্দা থেকে পয়দা করলেন। এখন বলুন কেমন করে তিনি পয়দা করলেন? এর জবাব আমরা কেউ দিতে পারবো না, বরং এটাই সত্য কথা, এর জবাব আমাদের কারোই জানা নেই। আর, প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন থেকে মৃত থেকেই তো যিন্দা বেরিয়ে আসছে। তারপর প্রতি মুহূর্তে ওই মুর্দা অণুগুলোর রূপান্তর ঘটছে, ঘটে চলেছে জীবন সঞ্চারের মাধ্যমে এবং জীবন্ত অংশগুলো সংযোজিত হয়ে পরিপূর্ণ জীবন্ত দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে বুঝা গেলো জীবনের রূপান্তর ঘটে, কিন্তু তার মূল সৃজনী উপাদান হচ্ছে মৃত অণুসমূহ। এরপর তৈরী হয় জীবন্ত কোষ, তারপর তৈরী হয় তার বিপরীত বস্তু, মুর্দা কোষ ও জীবন্ত কীট। এইভাবে প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনের এই কাজ এগিয়ে চলেছে মুর্দা থেকে যিন্দা, যিন্দা থেকে মুর্দা এবং কোনো এক সময় এসব যিন্দা প্রাণী সব মুর্দাতে পরিণত হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'তিনি বের করেন মুর্দা থেকে যিন্দা এবং যিন্দা থেকে মুর্দা।'

আর এ কাজটি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। শুরু থেকে সৃষ্টি করে মৃত পর্যন্ত পৌছে দেয়ার এ কাজটি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো করার ক্ষমতা নাই। অন্য কেউ তো দূরের কথা এ কাজ কোনো মানুষও করতে পারে না। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া গোটা সৃষ্টিকে মৃত অণুগুলোর মধ্য থেকে জীবন্ত কোষে রূপদান করা এটাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এখতিয়ারের মধ্যে নেই এবং যিন্দা কোষগুলো থেকে আবার মুর্দা অণুতে রূপান্তরিত করা– তাও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ এক চক্র, কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না, কখন এ সৃষ্টি কাজ শুরু হয়েছিলো এবং কেমন ভাবেই বা এ কাজ শেষ হবে। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সে সব অনুমান, সম্ভাবনা ও কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়!

জীবনের প্রকাশ্য বা বাহ্যিক এই অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মানুষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এই বুনিয়াদকে বাদ দিয়ে যখন অন্য কোনো ব্যাখ্যা দিতে চাওয়া হয়েছে, তখনই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে ইউরোপে মানুষ যখন গীর্জা থেকে পালিয়ে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করেছে বা নাস্তিক হয়ে গেছে, তখনই তাদের অবস্থা এই হয়েছে যে, 'তারা যেন একদল বাঘের তাড়া খেয়ে ফিরছে।' এরা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরে আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির সূচনা কখন হয়েছে এবং কখন শুরু হয়েছে জীবন সৃষ্টির কাজ, তার ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করলেও সে সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে ওই সকল নাস্তিকের অবস্থা হয়েছে এই যে, তারা নিজেরাই ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে মানুষে মানুষে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়ানোর কোনো কাজই তারা করতে পারেনি।

আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার না করে যারা সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে সেই পন্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ এই ব্যর্থতা থেকে তাদের জ্ঞানের অসারতার কথা চিন্তা করেছেন। আমরাও ওই সব হতভাগ্য তরুণ ইউরোপীয়কে সঠিক পথে টেনে আনতে চাই, যারা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এখনও ওই ভ্রান্ত চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা এই সঠিক 'দ্বীন'কে ত্যাগ করেছে। তারা নিজেদেরকে কেতাবধারী পরিচয় দেয়, অথচ তারাই আবার গায়েবের ব্যাখ্যা দিতে চায়। আরো মজার ব্যাপার হলো যে, তারা নিজেদেরকে তারা ধর্মের বাইরে মনে করে না। এ জন্যেই তাদেরকে আমরা সঠিক চিন্তার দিকে টানতে চাই।

আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরাও এইভাবে স্বাধীন চিন্তা করে এবং আল্লাহর হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনা থেকে সৃষ্টিজগত বাস্তবে এসেছে বলে মনে করে।

কানাডার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফ্রাংক এ্যালেন তাঁর রচিত 'বিশ্ব সৃষ্টি– এ কি আকস্মিক কোনো ঘটনা না সুপরিকল্পিত কোনো সৃষ্টি?' কথিকায় বলেন, (কথিকাটি নেয়া হয়েছে 'আল্লাহু য়াতাজাল্লা ফী আস্‌রিল এলম' নামক পুস্তক থেকে। বইটি অনুবাদ করেন ডক্টর দামারদাশ আবদুল মজীদ সারহান।)

... তবে, যদি কোনো সুপরিকল্পনা ও পূর্ব পরিকল্পিত কোনো সংকল্পের ভিত্তিতে জীবন ও জগত সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ করেই এবং ঘটনাক্রমে এসব সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছে। তাহলে চিন্তা করা দরকার, কোন সে ঘটনা যা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হলো ও যাতে করে আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করতে পারি এবং চিন্তা করে দেখতে পারি যে, কেমন করে এই আকস্মিক ঘটনা বাস্তবে এলো?

'আকস্মিকভাবে সৃষ্টিজগত বাস্তবে এসেছে' অথবা 'সম্ভবত আপনা থেকে সৃষ্টির সূচনা হয়েছে' আধুনিক বিজ্ঞান জগতের বেশীর ভাগ মানুষের কাছে এ মতবাদটি একটি সাধারণ ও মৌলিক সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। পৃথিবীর বিশাল এক অংশে এ মতকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে গেছে এবং এ মতবাদটি ক্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে ক্রুটিহীন মনে করা হয় এবং এই মতবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে। অবশ্য এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে, এ মতবাদ ক্রুটিহীন নাও হতে পারে। আর বহু প্রাচীনকাল থেকে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসাটা এক আকস্মিক ঘটনার ফল বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, যার ফলে আমরা কোনো বাহ্যিক দৃষ্টিভংগির অধিকারী ব্যক্তিদের মতবাদ তুলে ধরতে পারছি। তারা বলেন, পৃথিবী ও সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসা এক আকস্মিক ঘটনা বৈ আর কিছু নয়। আর এ জিনিসটি আমরা অন্য কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবো না। (যেমন লুডুর গুটির মধ্যে বাজপড়া)।(১) অবশ্য আমরা আল্লাহর মেহেরবানীতে এ সব বিষয়ের ওপর বেশ কিছু আলোচনা করেছি এবং যথাসম্ভব ওই মতবাদের প্রতিবাদও করেছি যাতে সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বকে আকস্মিক ঘটনার ফল বলা হয়েছে। আর এইভাবে অস্তিত্বে আসা বিস্ময়কর এই বিশ্বের সুসামঞ্জস্য গতি টিকে থাকাটা যে অসম্ভব তাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি। আরও জানিয়ে দিয়েছি যে, নির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত থাকা এটা কোনো আকস্মিকতার ফল হতে পারে না। সুতরাং এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার, সৃষ্টির এই ধারা চালিয়ে যাওয়া কোন আকস্মিক খেলার ফলে সম্ভব হতে পারে!

'সকল জীবকোষের মধ্যে বস্তুর মৌলিক উপাদান হিসাবে ------যে সব প্রোটিন বর্তমান রয়েছে, তা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যেমন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং সালফার (গন্ধক) এবং প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে যে অণুগুলো বর্তমান রয়েছে তার সংখ্য ৪০,০০০। আর প্রাকৃতিক প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে রাসায়নিক অংশ রয়েছে শতকরা বিরানব্বই ভাগ, যদিও এ ভাগগুলো সবই অনুমান ভিত্তিক।(২) তবে এই পাঁচটি উপাদানের সম্মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যাতে করে প্রোটিনের অংশগুলোর মধ্যে কোনো একটি গঠিত হয়। হয়তো এ হিসাব সেই বস্তুর পরিমাণ জানার জন্যে বলা হয়েছে, যে বস্তুকণা সদা সর্বদা পরস্পর মিলিত হয়ে কোনো একটা অংশকে গঠন করে– যাতে করে এই অংশগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে সৃষ্টিকাজকে চালিয়ে নিতে পারে এবং দীর্ঘ এই মহাকালের সব কিছু যে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সুদৃঢ় রশির দ্বারা আবদ্ধ তা বুঝা যায়।

---

(১) আমরা ইসলামী চিন্তাধারার ভিত্তিতে জানি যে, গোটা সৃষ্টির মধ্যে কোনো একটি জিনিসেও আকস্মিকতা বলতে কিছুই নেই। গোটা সৃষ্টির সব কিছুই আল্লাহর পূর্বপরিকল্পনার ফল, যার দিকে ইংগিত দিয়ে তিনি বলছেন, অবশ্যই আমি সব কিছুকে নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পয়দা করেছি এবং সেখানে একটি প্রচলিত পদ্ধতিকে সরাসরি পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর প্রতিবারেই এবং প্রতি নবীর আমলেই কিছু কিছু স্বতন্ত্র পদ্ধতি চালু হয়েছিলো এবং তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই (বিনা যন্ত্রে) চালু করা হয়েছিলো। আর এইভাবে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ব্যবস্থা অলৌকিকভাবে সরাসরি ও দৃঢ়তার সাথে চালূ হয়েছিলো। চালু হয়েছিলো নির্দিষ্ট কিছু যামানায় বিশেষ এক কৌশলে। সুতরাং সাধারণ আইন ও অলোকিক ক্ষমতা দুই-ই এক নির্দিষ্ট নিয়মে চলে এবং প্রতি বারেই সেখানে বিধাতার নিয়ম ক্রিয়াশীল দেখা যায়........ আর আমরা যদি এ বৈজ্ঞানিকদের কোনো একটি কথাকেও গ্রহণ করে বাস্তব অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো তাদের কথা থেকে বাস্তবতা প্রায় সময়ই ভিন্ন।

(২) আর এগুলোও বৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত চিন্তার একটি দৃষ্টান্ত। বাস্তবে, আল্লাহর এ সৃষ্টিজগত সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট এক পরিমাপে সৃষ্টি। কোনো অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো নয় যে, ঘটনাচক্রে হয়ে যেতে পারে বা হয়ে গেছে।

আর সুইজারল্যান্ডের ইউজিনজায় নামক একজন বিশিষ্ট অংকবিদ বিশ্ব কার্য প্রক্রিয়ার এই হিসাব দিয়েছেন। তিনি, তাঁর হিসাব নিকাশে বুঝেছেন যে, এই মহা বিশ্ব কোনো আকস্মিক ঘটনার ফলে বাস্তবে এসেছে তা নয়; বরং যে রের্মমভ দিয়ে এ বিশ্ব সৃষ্টি, তার মধ্যে অণুগুলোর অনুপাত ১ঃ১০ ১৬০, অর্থাৎ ১ঃ১০ ×১৬০ বার আবর্তিত হয়। এ এমন একটা সংখ্যা, যে বিষয়ে আমাদের কথা বলার কোনো উপায় নাই অথবা কোনো ভাষা দ্বারা এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। আর বস্তুর মধ্যে অণু পরমাণুর এই যে আবর্তন ক্রিয়া নিরন্তর চলছে, তার সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি বার। আর পৃথিবীর বুকে এই বস্তুর অংশ বা বস্তুকণার অস্তিত্ব কোটি কোটি বছর ধরে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের মতে ঘটনাচক্রে ঘটে চলেছে, বরং বলা যায় অগণিত বছর ধরে এই আবর্তন-বিবর্তন এগিয়ে চলেছে, যার একটা মোটামুটি হিসাব উক্ত সুইজ বিজ্ঞানী বের করে বলেছেন যে, ১০×২৪৩ বছর ধরে এ আবর্তন চলছে।

নিশ্চয়ই প্রোটন দীর্ঘ ও সুদৃঢ় একগুচ্ছ শেকলের সাথে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে যার মধ্যে একটি অংশ রয়েছে অম্ল অংগারজান। সুতরাং এই অণুগুলো কেমন করে পরস্পর মিলিত হয়ে বিলীন হয়ে যাবে? তবে সম্মিলনের সাধারণ নিয়মের বাইরে যদি এ সব মিলিত হয় সে ভিন্ন কথা। কিন্তু তা জীবনের জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না, বরং কোনো কোনো পর্যায়ে তা বিষাক্ত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে এক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জে, বি, সেদার মনে করেন যে, যে সব পদ্ধতিতে অণুগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে প্রোটনের যে বিশাল সমাবেশে কোনো একটি বস্তু-অংশ গঠন করে তার সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন (১০ ৪৮×৪৮) হবে। এই তথ্য সামনে রেখে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে হঠাৎ করে কোনো এক আকস্মিক ঘটনার ফলে এই প্রোটনগুলো সম্মিলিত হয়ে কোনো বস্তু গড়ে তুলবে– তা যুক্তি-বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয়। এভাবে আসলে কোনো একটি ভূখন্ড গড়ে উঠতে পারে না।

'কিন্তু প্রোটন হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থের যৌগিক নির্যাস, যার মধ্যে কোনো প্রাণ নাই। আর যতোক্ষণ পর্যন্ত না গায়েবের সেই বিস্ময়কর রহস্য সক্রিয় হয়, ততোক্ষণ এর মধ্যে জীবনের কোনো গতির সন্ধান পাওয়া যায় না। সেই রহস্যজনক শক্তির কিছুই আমাদের জানা নাই– অবশ্যই তা হচ্ছে চূড়ান্ত সর্বশেষ বুদ্ধি।(১) আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাঁর চূড়ান্ত জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সে সব কিছুর খবর রাখেন। এই যে প্রোটন জাতীয় বস্তু-কণা, এর কাজ হচ্ছে উপকার সাধন। কারণ এই বস্তুকণাই তো জীবন গঠনের মূল উপাদান। এর দ্বারাই তো আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তাকে সুন্দর রূপ দিয়েছেন এবং তার মধ্যে জীবনের গতি দান করেছেন।'

এরফাঞ্জ উইলিয়াম (তাঁর পরিচয় হচ্ছে, তিনি এভি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন এবং উদ্ভিদবিদ্যায় বিশেষ ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে) 'শুধু বস্তুই যথেষ্ট নয়' নামক কথিকায় বস্তুবাদীদের দাবীকে খণ্ডন করে বলেন,

'বিজ্ঞান আমাদেরকে এ ব্যাখ্যা দিতে পারে না যে, কেমন করে ওই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা সৃষ্টি হলো, যা সকল বস্তুর মৌলিক উপাদান বলে জানা গেছে এবং এর সংখ্যা কতো, তাও বলতে

---

(২) এ ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বুদ্ধির কথা জানায়, যা দার্শনিকদের জ্ঞানের পরিশিষ্ট। এর দ্বারা মানুষ তার জীবন-পথে, অবশ্যই কোনো না কোনো ফায়দা হাসিল করে। কারণ এটিই তার কৃষ্টির ফসল। আর একজন মুসলমান একমাত্র আল্লাহর পবিত্র নামগুলোর মধ্যে যে সব গুণের সন্ধান পায়, সেগুলোর মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য কামনা করে!!!

পারে না। আর এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও তৃপ্তিজনক কোনো ব্যাখ্যাই বিজ্ঞান দিতে সক্ষম নয়। কোনো এক আকস্মিক ঘটনার ফলে এই বস্তুকণাগুলো থেকে কি ভাবে জীবন সৃষ্টি হয়ে গেলো তারও বুদ্ধিগ্রাহ্য জবাব বিজ্ঞান দিতে পারেনি। আর নিসন্দেহে এই যে মতবাদ যে, ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রতিটি কণা উন্নতি করতে করতে আজ উন্নতির এই চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছে– একথাটা হচ্ছে হীনতার জালে আবদ্ধ কান্ডজ্ঞানশূন্য নির্বোধ লোকদের অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়ার সাথে তুলনীয়। আমরা বলবো, অন্ধ ভাবে মেনে নেয়া ছাড়া এ মতবাদ গ্রহণ করা কোনো যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো যুক্তিতর্কের পরিসীমার মধ্যে এ মতবাদটি পড়ে না এবং এ মতবাদ কেউ তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা ও অল্পে তুষ্টির মূল বুনিয়াদের মধ্যে এটা পড়ে না।(১)

আলবার্ট ম্যাকোব ভেনশেস্তার নামক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী 'বিজ্ঞান আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করছে' নামক কথিকায় বলেছেন,

'তিনি বিজ্ঞান অধ্যয়নে একনিষ্ঠভাবে মগ্ন হয়ে গেছেন, অথচ তিনিও পদার্থ বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ ছাত্র। কিন্তু তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীর অধিকারী, সত্যকে সত্য এবং দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে ত্রুটি বলে মেনে নিতে তাঁর কোনো দ্বিধা নাই। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উদ্ভিদবিদ্যা অধ্যয়ন করেছেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমরা যে জগতে বাস করি, তার থেকে ভালো ও সুন্দর আর কোনো জগত নাই।

একবার তাকিয়ে দেখুন ওই গাছ ও তরুলতার দিকে, বিনয়াবনত হয়ে ও খোলা মন নিয়ে এবং চিন্তা ভাবনার পর আপনাকে যে কোনো একটি পথই ধরতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি ভেবে দেখুন, মানুষ যতো সুন্দর সুন্দর জিনিস ও যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে, সেগুলোর কোনো একটি কি বৈশিষ্ট্রে দিক দিয়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোনো বস্তুর সাথে তুলনীয়? আল্লাহর সৃষ্টি যাবতীয় সরঞ্জাম সবই যিন্দা ও সচল। এগুলোর কোনোটির গতিও রাত দিনের মধ্যে কোনো সময় থেমে যায় না। দেখুন মানব সৃষ্টির দিকে, কতো হাজারো প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া তার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে, তার প্রকৃতি কতো বিচিত্র এবং প্রটোপ্লাজমের উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে দেহের পরিপূর্ণতা আসে। এ প্রটোপ্লাজম তো হচ্ছে এমন একটি বস্তুকণা, যা সমগ্র জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যে বর্তমান রয়েছে।

এখন বলুন, কোত্থেকে এলো এই জীবন্ত উপাদানটি, যা সব কিছুর সাথে জড়িত রয়েছে? অবশ্যই এ বস্তুটিকে আল্লাহ তায়ালা এককভাবে সৃষ্টি করেননি। তিনি পূর্ণাংগ জীব সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে উক্ত প্রটোপ্লাজম একটি উপাদান মাত্র। যদিও জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ও সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্যে এ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যুগের পর যুগ ধরে সদা সর্বদা জীবনকে সক্রিয় রেখে চলেছে। আর খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, গাছ পালা ও অন্যান্য জিনিস থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা দান করে সেগুলোকে তিনি সযত্নে সংরক্ষণও করে চলেছেন। জীব জগতের প্রতি প্রাণীর মধ্যে বেশী চাওয়া-পাওয়ার প্রতিযোগিতা এই জীব জগতের অন্যান্য সকল বৈশিষ্ট্য থেকে বেশী উজ্জ্বল, যার অধিকাংশ আল্লাহর কুদরতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বংশ বৃদ্ধির জন্যে নির্ধারিত রয়েছে বিশেষ কিছু কোষ, যার দ্বারা নতুন চারার উদ্ভব হয়, ছোট অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে গাছ শক্ত হয়ে যায়। তখন এই গাছকে কাজে লাগাতে বেশ কষ্ট করা লাগে। আর আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, যখন এ গাছ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়,

(১) তাঁর এই কথিকায় তিনি ইতিপূর্বে বার্ট্রান্ড রাসেল–এর ক্রমবিবর্তনবাদ ও বর্তমান সৃষ্টি আকস্মিক ঘটনার ফল– এই মতবাদের দিকে ইশারা করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন শিল্প বিপ্লবের কথা।

তখনও এর মধ্যে চারাগাছের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে যায়, থাকে এর মধ্যে আর্দ্রতা, আঁশ, শাখা প্রশাখা, কান্ড এবং প্রত্যেকটি শেকড় ও পাতা সব কিছু মিলে গাছটিকে পূর্ণতা দান করা হয়। মনে হয়, দক্ষ কিছু সংখ্যক প্রকৌশলীর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক অত্যন্ত জটিল অধ্যবসায়ের সাথে এ গাছটির পরিচর্যা করা হয়েছে, যার কারণে এ গাছের কোটরগুলোর মধ্যে প্রয়োজনীয় রস সিঞ্চন করা হয়েছে যাতে করে চারা গাছটি আজ বৃদ্ধি পেয়ে এই পূর্ণত্ব লাভ করেছে। বৃক্ষের মধ্যে বিদ্যমান এই ক্রোমজোম একজন প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করে একটি বৃক্ষ হতে অন্য আরও বহু বৃক্ষ উৎপন্ন করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করে এবং এ কাজটি সচল জীবদের বংশ বৃদ্ধি ও ওয়ারিসদের প্রদত্ত মীরাস বা উত্তরাধিকারের অনুরূপ। (উত্তরাধিকার হস্তান্তরকারী)।(১) আর এখানে তাকদীরের নিয়ম অনুসারে আমরা আল কোরআনের মধ্যে রক্ষিত শুভ্র সমুজ্জ্বল পথে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি।

'তোমাদের যিনি আল্লাহ, তিনিই তোমাদের রব'-(বাদশাহ- আইনদাতা)।

আল্লাহ তায়ালাই গুপ্ত ও অদেখা এবং অলৌকিক বস্তুসমূহ সৃষ্টিকারী। তিনিই আল্লাহ, তিনিই আমাদের সেই রব, একমাত্র যাঁর সামনে বিনয়ের সাথে ও আনুগত্যভরা মন নিয়ে তোমরা মাথা নতো করবে।(২)

'অতএব, তোমাদেরকে কোথায় পথভ্রষ্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

সুতরাং কেমন করে তোমরা সেই স্পষ্ট সত্য থেকে সরে যাচ্ছ যা তোমাদের বুদ্ধি, তোমাদের অন্তর এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার!

নিশ্চয় প্রাণহীন বস্তু থেকে জীবিত প্রাণী বেরিয়ে আসা- এ বিষয়ের ওপর বহু আলোচনা কোরআনুল কারীমে এসেছে। যেমন 'সৃষ্টির প্রথম সূচনা কিভাবে হলো?' এ বিষয়ে শীঘ্রই আরও বিশদ আলোচনা আসছে। এ পর্যায়ে 'উলুহিয়্যাত'-এর ওপরও আলোকপাত করা হবে এবং জানানো হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সেই সমস্ত বহিঃপ্রকাশের কথা যা তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে, যাতে করে একমাত্র তাঁর মাবুদ -মওলা হওয়ার কথা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ হয়। যেন সেই মাবুদ-মওলার সামনেই দুনিয়ার সকল মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ এ কথা বুঝতে পেরে তাঁর সামনে মাথা নতো করতে পারে। তিনিই একমাত্র বাদশাহ, আইনদাতা ও প্রতিপালক, তাঁর যাবতীয় হুকুম মানতে পারে, পুরোপুরি দাসত্বের চেতনা নিয়ে তাঁর দিকে ভালোবাসার সাথে এগিয়ে যেতে পারে, জীবনের যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি পালনের মাধ্যমে তাঁর দিকেই সবাই রুজু করে এবং একমাত্র তাঁরই বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে।

আল কোরআনে এ সব প্রমাণাদি অনুমানভিত্তিক অথবা অবাস্তব কোনো দার্শনিক চিন্তাধারা আকারে পেশ করা হয়নি! এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুমান ভিত্তিক বা অবাস্তব দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে বহু উর্ধের জিনিস। এ জীবন ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে সঠিক আকীদা বিশ্বাস দান করে মানুষের ধারণা কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট ও মযবুত ভিত্তির ওপর পরিচালনা করা, যাতে করে তার জীবনের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়গুলো মযবুত হতে পারে।

---

(১) আল্লাহরই অনুমতিক্রমে, যিনি প্রতি জিনিসকে তার বিশেষ রূপ দিয়েছেন, তারপর তাকে তার চলার পথ জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিসকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নড়াচড়ার ক্ষমতাও দিয়েছেন।

(২) 'রব' শব্দটির অর্থ আরও পরিস্কারভাবে জানার জন্যে দেখুন, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'আল মুসতালেহাতুল আরবায়াতু লিল কোরআন'- 'আল কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা'।

আর মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করা ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতোক্ষণ তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ না করা হয় এবং বান্দার বন্দেগী থেকে তাদেরকে বের করে না আনা হয়, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে একমাত্র আল্লাহর আইনের অনুগত না বানানো হয় এবং দৈনন্দিন জীবনের সব ব্যাপারে তারা একমাত্র আল্লাহর নিয়ম বিধান না মেনে চলে। আল্লাহর কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বত্র নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষকে তাদের আনুগত্য করতে বাধ্য করেছে এবং নানা দেব-দেবীর পূজা করার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থই চরিতার্থ করতে চেয়েছে, এ জন্যে মানব জীবনে স্থায়ীভাবে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চালু রাখতে চেয়েছে। প্রকারান্তরে এইভাবে তারা নিজেরাই ক্ষমতার মিথ্যা দাবীদার সেজে নিজেরাই তারা দেব দেবীর আসন দখল করে নিয়েছে এবং আল্লাহর দাসত্বের বাইরে মানুষকে টেনে নিয়ে এসে নিজেরাই তাদের মনিব বনে গেছে। ফলে গোটা জীবনকে করে ফেলেছে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত!

মানুষ যখন এইভাবে অক্ষম হয়ে যায় সমাজপতি ও ক্ষমতাসীনদের চাপে পড়ে অন্যায় করতে বাধ্য হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় তাদেরকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ডাক দেয়া হচ্ছে,

'যাঁকে তোমরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলে জেনেছ, তিনিই তোমাদের বাদশাহ– আইনদাত, যাবতীয় প্রয়োজন সরবরাহকারী এবং মালিক-মনিব। এমতাবস্থায় তোমাদেরকে কোন ভুল পথে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা বলে যাকে তোমরা জেনেছো, একমাত্র তিনিই তোমাদের প্রতিপালনের অধিকারী। তিনিই শাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী, আর তিনিই আইনদাতা। এতে বুঝা যায় যে, এ সকল অর্থে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ 'রব' হতে পারে না।

সৃষ্টির পরতে পরতে স্রষ্টার পরিচয়

'রাতের অন্ধকারের পর্দা চিরে শুভ্র প্রভাতের সূচনাকারী তিনি এবং তিনিই বানিয়েছেন রাত্রিকে আরামদায়ক এবং (তোমাদের সময়ের) হিসেবের জন্যে তিনিই চাঁদ ও সূর্যকে বানিয়েছেন। এটাই তো মহাজ্ঞানী মহাশক্তিমান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা।'

যিনি শষ্যের দানা বিদির্ন করে তা থেকে আরো শষ্য সৃষ্টি করেন, তিনিই তো আঁধারের পর্দা চিরে সুন্দর স্নিগ্ধ প্রভাত আনেন। আর তিনিই নিশ্চুপ নিঝুম রাতকে বানিয়েছেন আরামদায়ক ও শান্তি আনয়নকারী। আরও তিনি বানিয়েছেন সূর্য ও চাঁদকে এবং তাদেরকে রেখেছেন মহাশূন্যে নিরন্তর সাঁতার কেটে বেড়ানো অবস্থায় তাঁরই নির্ধারিত গতি-পথে আবর্তন করা অবস্থায়। একমাত্র তাঁরই কুদরত বা ক্ষমতাবলে তাদেরকে সচল রেখে একমাত্র তিনিই তাদের তদারকি করে চলেছেন। আর এসব কিছু তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে– অর্থাৎ সব কিছু, কোথায় কে কী করছে, সবই তাঁর জানা রয়েছে।

আর রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের সূচনা করার এই অবস্থাটি বীজ-দানা ও আঁটির খোলস ভেংগে অংকুর ও চারা বের করার সাথে যথাযথভাবে তুলনীয়। আর এই দুটি অবস্থার মধ্যে বহু বিষয়ে চমৎকার মিল রয়েছে, যেমন নড়াচড়া, জীবন্ত হওয়া এবং সজীব ও সুন্দর হওয়ার দিকগুলো। আরও যে দিকগুলো এ দুই-এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে তা হচ্ছে, রাতের নিস্তব্ধতা, যেমন মাটির নীচে বীজের মধ্যে চারার অংকুর নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। এ বিশ্বের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা হওয়া, নড়াচড়া, স্থির হয়ে থাকা, আবার এই পৃথিবীর মধ্যে গাছপালা ও জীবনের মধ্যেও অনুরূপ নিবিড় সম্বন্ধ বর্তমান।

এ পৃথিবীর যে বিভিন্ন গতি রয়েছে, তার মধ্যে একটি তো হচ্ছে এই যে, সূর্যের সামনে দিনে রাতে গোটা পৃথিবী একবার নিজ অক্ষরেখার ওপর ঘুরে আসে। আর এই মহাকাশে চাঁদও পৃথিবী থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এই ভাবে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। আবার সূর্যও যে স্থির রয়েছে তা নয়। সেও নিজ কক্ষপথে এইভাবে তার নিজস্ব তাপের কারণে সবার সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে সর্বদা আবর্তন করে চলেছে। এ সব কিছু মহা শক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিয়ন্ত্রণে থেকে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সর্বজ্ঞ ও সব কিছু করতে সক্ষম। এ সব কিছু গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে যদি আল্লাহপাক মানুষের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ না করতেন, তাহলে পৃথিবীতে জীব-জানোয়ার, পশুপাখি, গাছ পালা, তরুলতা কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারতো না।

এই গোটা সৃষ্টি পূর্ব নির্ধারিত এক সূক্ষ্ম নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। যতো জীব জানোয়ার এখানে বাস করবে মহান আল্লাহর কাছে তার পুরোপুরি হিসাব রয়েছে। কতো শ্রেণীর, কতো প্রকার এবং কতো সংখ্যক জীব এ পৃথিবীতে বাস করবে, সব কিছুরই হিসাব মহান স্রষ্টার কাছে যথাযথভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। কারো সাধ্য নাই এই হিসাবের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করার। যে যতো চেষ্টাই করুক না কেন, অবশেষে মওলা পাকের নির্ধারিত নিয়মের কাছে সবাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।

তারা বলে, এ জীব জগত এক আকস্মিক ঘটনার ফলে অস্তিত্বে এসেছে এবং গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে এই জীব জগত উদ্দেশ্যহীন ভাবে বিচরণ করছে। একবার মৃত্যুর পর বিশ্ব এদের কাউকে পুনরায় আর একত্রিত করবে না, বরং এটা হয়তো হবে যে, জীবনকে সেইখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যেখান থেকে এরা এসেছিলো। আর পথহারা বা ছিটকে পড়া সেই তারার দিকেই এ জীব জগত ফিরে যাবে, যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এ সব কিছু। বরং তারা কেউ কেউ এতোদূর বলে যে, বিশেষ কোনো নক্ষত্রকে একথা বলা হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের কোনো স্রষ্টা ও মালিক যদি থাকতো, তাহলে তাকে এই কষ্ট দেয়া হতো না। এসব ফযুল কথার শেষ কথা হচ্ছে– এসব বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, এগুলোর পিছনে আলাপ আলোচনা আর জ্ঞানের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর থেকে অনুমান ধারনা আর অলিক কল্পনা ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নাই।

বৈজ্ঞানিকরা তাই বলেন, যা তাদের মনের মধ্যে উদগত হয়। আর তাদের আন্দায অনুমান ভিত্তিক তথ্যাদি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্ত দেন না। মানুষ যখন তাদের কাছে আল কোরআন পেশ করে, তখন তারা তাদের বাপ দাদাদের অনুসরণে সত্য থেকে দূরে পালায়। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ থেকেই পালাতে চায়! অথচ তিনি তাদের সামনে পেশ করেছেন তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য প্রমাণাদি, হাযির করেছেন তাদের কাছে তাঁর একত্বের কথা ও সবখানে বিরাজমান তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ। আর যখন যে পথেই তারা চলেছে, সেখানেই তারা এ মহান সত্যের মুখোমুখি হওয়া থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু যতোই তারা পালাতে চেষ্টা করেছে এবং যেদিকেই গিয়েছে, সবখানেই অবশেষে তারা মহাশক্তিমান আল্লাহকে পেয়েছে এবং তাঁর মুখোমুখি হয়েছে। তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় অন্য রাস্তায় ধাবিত হয়ে পরিশেষে মহান আল্লাহর সামনেই হাযির হয়েছে।

আসলে এরা ফকীর- মেসকীন বা সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এরা বিপদগ্রস্ত। কোনো এক সময়ে তারা তাদের এবাদাতখানা থেকে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের ধর্মযাজকরূপী যে মাবুদরা তাদেরকে জোর করে বশীভূত করে রেখেছিলো, তাদের থেকে সরে

এসেছে। এমনভাবে তাদের থেকে তারা পালিয়েছে যেন তারা 'বাঘের ভয়ে পলাতক একদল গর্দভ'। তারপর তৎকালীন তাদের ধর্মের এই যুলুম থেকে তারা এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সর্বদাই দূরে সরে থাকতে চেয়েছে। এ সময়ে তারা বরাবর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে যেন আবার গীর্জার কর্তৃক তারা ঘেরাও না হয়ে যায়।(১)

সর্বহারা ও বিপদগ্রস্ত এসব মানুষ তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিক্ত ফল আজকে তাদেরকেও ভোগ করতে হচ্ছে, এখন তারা এর প্রতিক্রিয়া থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? প্রকৃতি বিজ্ঞানী ফ্রাংক এ্যালেন বলেনঃ জীবনের ক্রমবিবর্তনের ওপরে রচিত পুস্তকের মধ্য থেকে আমরা মাত্র কয়েকটা ছত্রই পড়াশুনা করেছি, যার বিবরণী ইতিমধ্যেই কিছু এসেছে।

'পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী বানানোর জন্যে যে সব বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো, তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া এই জন্যে সম্ভব নয় যে, তাতে আকস্মিক ঘটনার ফলে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং নিছক আন্দায অনুমানের ভিত্তিতেই সৃষ্টির সূচনা হয়েছিলো বলে বলা হয়েছে। ওই ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, পৃথিবী হচ্ছে মহাশূন্যের মধ্যে এক ঝুলন্ত গোলক, যা রাতদিন নিজ অক্ষরেখার ওপর ঘুরছে এবং পরিক্রমণ করছে সূর্যের চারপাশে বছরে একবার। এইভাবে চিরদিন এই একই নিয়মে চলছে এসব গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের পরিভ্রমণ এবং এসব কিছুর প্রভাব এসে পড়ছে এই পৃথিবীবাসীর প্রতি। এগুলো যদি স্থির হতো, তাহলে যে নানা প্রকার গাছপালা পয়দা হতো, আবর্তন-বিবর্তনের ফলে তার থেকে আজ অনেক বেশী প্রকারের গাছপালা ও প্রয়োজনীয় ফসলাদি পয়দা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এসবের ফলে জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় গ্যাসের স্তর উৎপন্ন হচ্ছে এবং এ গ্যাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বহু উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে (যার পরিমাণ অন্যূন ৫০০ মাইল উর্ধে)।

ঘনত্বের দিক দিয়ে হিসাব করলে গ্যাসের এই ভান্ডার গ্যাস কূপ থেকে নির্গত কোটি কোটি বাতি থেকেও বেশী হবে যা প্রতিদিনই মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসছে। এর পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও মোটামুটি যে আন্দাজ করা যায় তাতে প্রতি সেকেন্ডে বেরিয়ে আসা গ্যাসের তীব্রতা ৩০ মাইল উর্ধে উঠে যায়। আর পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে গ্যাসের ভান্ডার এখনও ঘুমন্ত অবস্থায় মজুদ রয়েছে যার তাপে পৃথিবী বাসোপযোগী হয়ে রয়েছে। এ গ্যাসের কারণে মহাদেশগুলোতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বাষ্প সৃষ্টি হয় তা উর্ধে উঠে মেঘের সৃষ্টি হয় এবং এই মেঘের পাতলা স্তর ঘনীভূত হয়ে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হয়, যার ফলে শুষ্ক পৃথিবী প্রাণ ফিরে পায় এবং নানা প্রকার গাছপালা ও ফসল উৎপন্ন হয়ে জীবজন্তুর প্রয়োজন মেটায়। আরও খেয়াল করুন, বৃষ্টির পানি থেকেই মিষ্টি পানি পাওয়া যায়, অর্থাৎ সুপেয় পানির যাবতীয় উৎসই হচ্ছে এই বৃষ্টির পানি। বৃষ্টি না হলে গোটা পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেতো এবং গাছপালা, তরুলতা ও মানুষ সহ সকল জীবজন্তুর কোনোটাই আর বেঁচে থাকতো না। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আভ্যন্তরীণ মজুদ ও পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু বর্তমান রয়েছে এ দুই-এর মধ্যে (প্রকৃতপক্ষে) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এমন ভারসাম্যের সাথে বিরাজ করছে যার মধ্যে সামান্যতম তারতম্য হলেও গোটা জীবজগতই ধ্বংস হয়ে যেতো।

সৃষ্টি জগতের বাস্তবে আসা এক আকস্মিক ঘটনার ফল– এই মতবাদ যে সম্পূর্ণ অন্তসারশূন্য এটা বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণিত করেছেন এবং সৃষ্টির টিকে থাকা এবং পরবর্তীতে যতো প্রকার অগ্রগতি হয়েছে তাও হঠাৎ করে হয়ে যায়নি এটাও প্রতিষ্ঠিত সত্য। তারপর, সব কিছুর মধ্যে যে এক নিপুণ ভারসাম্য বিরাজ করছে এটাও যে অপরিকল্পিত কোনো খেয়ালিপনার ফসল নয়, তাও

(১) 'আল মুসতাকবিলু লি-হাযাদ্দীন' নামক পুস্তকের 'আলফিসামুন্নাকিদু' নামক অধ্যায়

জানা গেছে। যে সব জিনিসের মধ্যে পারস্পরিক মিল রয়েছে, সে বিষয়ে একজন প্রকৃতি বিজ্ঞানী বলেছেন এটা কখনোই অপরিকল্পিত হতে পারেনা এবং এর চতুর্দিকে রয়েছে বহু প্রকার জিনিস। সুতরাং এসব কিছুই রক্ষা করছেন একমাত্র মহাশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালা ,যিনি সব জিনিসের আকৃতি দান করেছেন, এরপর তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর যিনি সব কিছুকে সৃষ্টি করার পর সুনির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন বলে স্থির করেছেন।

'আর তিনিই তো বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে তারকারাজি, যাতে করে এগুলোর সাহায্যে তিনি স্থল ও পানি ভাগের অন্ধকারের মধ্যে তোমাদেরকে পথ দেখাতে পারেন। অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি আয়াতগুলোকে সেই জাতির জন্যে, যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায়।'

ওপরের আয়াতটিতে সম্পূরক হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, এই মহাকাশকে আল্লাহ তায়ালা চাঁদ-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা পরিপূর্ণতা দান করেছেন। শুধু তাই নয়, চমৎকার এই মহাবিশ্বের সব কিছুর পূর্ণত্বপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে টিকিয়ে রাখা ও তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা এবং সার্বিক ভাবে তার জীবনকে উন্নতি ও কল্যাণের বিষয়াদি দান করা। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যিনি তোমাদের অসংখ তারকারাজি বানিয়েছেন যার দ্বারা জলে-স্থলের আঁধারে তোমরা সঠিক পথ খুজে পেতে পারো।'

জনমানবহীন বিয়াবানে, ভূধরে, সাগরে ও অজানা অচেনা পথে মানুষ যখন পথ হারিয়ে ফেলে, রাতের অন্ধকারে অথবা মেঘলা দিনে যখন সে গতি নির্ণয় করতে পারে না, তখন বিশেষ বিশেষ তারার সাহায্যে সে সঠিক ভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। প্রাচীনকালে এবং এখনও একই ভাবে পথহারা, দিকহারা মানুষকে তারকারাজি পথ দেখিয়ে আসছে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ তারা দ্বারা দিক নির্ণয়ের কাজ বিভিন্ন উপায়ে গ্রহণ করা হয় এবং যতোই জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে, ততই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নানা প্রকার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারকামন্ডলীর ব্যবহার আরও ব্যাপক ভাবে হচ্ছে......... তবে যে বিষয়টি অপরিবর্তিত অবস্থায় টিকে থাকছে তা হচ্ছে এই যে, জল ভাগ ও স্থল ভাগে অন্ধকারের মধ্যে দিক-নির্ণয়ের কাজে এ সৌরমণ্ডল ও তারকারাজির ব্যবহার। এ অন্ধকার হতে পারে অনুভূতিতে, ধারণায় অথবা চিন্তা-চেতনায়। পূর্ণাংগ কেতাব মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আয়াতসমূহ গোড়া থেকেই এ বিষয়ে পথ নির্দেশ দিতে গিয়ে মানুষকে সরাসরি সম্বোধন করেছে। সুতরাং আল কোরআনের এ দিক নির্দেশনার সত্যতা বাস্তবে সত্য বলে দেখতে পেয়েছে।

আল কোরআনের বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের নিজেদের মধ্যে এবং দিগন্ত বলয়ের সবখানে মূল যে বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে, সে রহস্যের দ্বার পুরোপুরি খুলে গেছে, যার কারণে আলোচিত বিষয়টিকে তারা তাদের জীবনে সত্য বলে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে অজস্র রহস্যপূর্ণ জিনিস রয়েছে এক এক করে সেগুলো তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা কিছু তত্ত্ব দিয়েছেন তাই নয়, বরং বাস্তব আকারে সেগুলো তুলে ধরেছেন। এমন মন মোহিনী সে চিত্র যার ইংগিতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর নির্ধারিত নিয়তি, তাঁর রহমত এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা, সবই বুদ্ধি ও অন্তরের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। আল্লাহর'এ রহস্য ভরা বিশ্বের সব কিছু বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল চিত্তকে উজ্জীবিত করে ও তার অনুভূতিকে চাংগা করে তোলে। এর ফলে সে আরও বেশী চিন্তা ভাবনা করতে ও শিক্ষা গ্রহণ

করতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সঠিক জ্ঞান আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার মহা সৌভাগ্যের দিকে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই সে সেই তারকারাজির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, যাদেরকে মানুষের খেদমতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা পয়দা করেছেন। তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ যে জ্ঞান হাসিল করে, আল্লাহরই রহমতে সেই জ্ঞান পৃথিবীর সাগরে, ভূধরে, জংগলের অন্ধকারে তাকে পথ দেখায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আমি মহান আল্লাহ নিদর্শনগুলোকে বুদ্ধি যারা কাজে লাগায় সেই জাতির জন্যে সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।'

সুতরাং স্থল ও পানিভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে ও সেই কঠিন অবস্থায় তারকামন্ডলী দ্বারা সঠিক দিক-নির্ণয়ের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে এসব তারার গতি ও আবর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা। এ তারাগুলো কোন অবস্থা থেকে কোন পর্যায় অতিক্রম করে এগুলোর পরিক্রমার হিসাব-নিকাশ সঠিক ভাবে জানলেই গিয়ে এর খেদমত যথাযথভাবে নেয়া সম্ভব। আর এই সব থেকে সঠিক ও প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী মোমেন ব্যক্তি অনুভব করে যে, এই পথ দেখানো বা দিক-নির্ণয়ের কাজ আসলে আল্লাহ তায়ালাই করেন যেহেতু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে সবকিছু এবং দয়াময় সে আল্লাহ তাঁর অদৃশ্য হাতের ইশারায় সব কিছুকে মানুষের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু, আফসোস, আল্লাহর এমন সুনিপুণ ব্যবস্থা নিজেদের চোখে দেখা সত্ত্বেও বহু না-ফরমান এমন আছে যারা এসব থেকে শিক্ষা নিতে চায় না। হঠকারী ওই নাদানের দল দেখেও দেখে না কী নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে এ বিশাল সৃষ্টি ও তার স্রষ্টার মধ্যে, দেখেও দেখে না তারা এই সৃষ্টির নিদর্শনাবলী এবং এগুলোর বিরাট খেদমতকে।

একই সত্ত্বা থেকে মানবজাতির বিস্তার

'আর তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা- যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে পয়দা করেছেন । তারপর কোথায় সে বাস করবে এবং কোথায় তাকে সমাহিত করা হবে, তাও তিনি পূবাহ্নেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি নিদর্শনাবলীকে সেই জাতির জন্যে যারা নিজেদের বুঝ শক্তিকে কাজে লাগায়।'

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মানুষকে লক্ষ্য করে কথা বলেছেন। এ কারণে বান্দা প্রেমময় স্রষ্টার ভালোবাসার গভীর স্পর্শ অন্তরের গহীন কোণে অনুভব করে।

একজন মানুষ(১) থেকে গোটা মানব জগত সৃষ্টি। তার সৃষ্টির গভীরে সুপ্ত রয়েছে সৃষ্টিকর্তার একত্বের কথা। আর জীবনের সূচনা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে একজন পুরুষ এবং নারী থেকে। এই দুই-এর সম্মিলনের ফলে শুক্র-বীজ পূর্ণ করে তার সাথীর মধ্যে মানব গঠনের জন্যে নির্ধারিত কোষটি। সুতরাং পুরুষের পিঠে সংরক্ষণ করা হয়েছে ওই শুক্র বীজের আধার এবং এই ব্যক্তি মানুষকেই স্থির হতে বলা হয়েছে নারী দেহের রক্ষিত বাচ্চাদানীতে। এরপর সেখানে বাচ্চা বৃদ্ধি পায়, তার দেহ প্রশস্ত হয় এবং সেখানেই পুরুষ ও নারী এবং বিভিন্ন বর্ণ নির্ধারিত হয়, তার আকৃতি ও ইচ্ছা ব্যক্ত করার মতো ইংগিত বা ভাষাগত যোগ্যতা গড়ে ওঠে। এরপর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ

(১) যতোটা পড়াশুনার সুযোগ আমার হয়েছে তাতে আদম (আ.)-এর কেসসা থেকে আমি অন্তরের মধ্যে খুব নির্ভরযোগ্যভাবে বুঝতে পারিনি যে, বিবি হাওয়া-কে আদম (আ.) থেকে পয়দা করা হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার বাণী 'এক ব্যক্তি থেকে' এই আয়াত-এর তাফসীর সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বিবি হাওয়াকে আদম (আ.)-এর থেকে পয়দা করা হয়েছিলো। আমার কাছে মনে হয়েছে উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্মিলনের ফসলই মানুষ, অতএব মানুষ বলতে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও নারী উভয়কেই বুঝায়।

হয়ে বিভিন্ন দল, গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সব বিষয়ে এতো বেশী উদাহরণ দেয়া যায় যা গুণে শেষ করা যাবে না। আর যতোদিন জীবন চলতে থাকবে, ততোদিন সব কিছুরই উন্নতি হতে থাকবে। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি মহান আল্লাহ বিস্তারিতভাবে আয়াতগুলোকে বর্ণনা করেছি সেই জাতির জন্যে, যারা বুঝে (নিজেদের বুঝ-শক্তিকে কাজে লাগায়)।'

আল্লাহর কর্মকান্ডকে বুঝার জন্যে এই 'একজন ব্যক্তিকে' সৃষ্টির কাজ ভালোভাবে বুঝা প্রয়োজন। এর থেকেই পৃথিবীতে আরও বহু মানুষের সৃষ্টি। এছাড়া ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে পৃথিবীতে অগণিত পুরুষ ও নারী সৃষ্টির যে ধারা চলেছে, তার বাইরে আর এই ধরনের বহু আশ্চর্যজনক জিনিস মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে যেগুলো নিয়ে মানুষের চিন্তা করা দরকার। বৈবাহিক জীবনের মাধ্যমে মানুষের জন্ম ও বংশবৃদ্ধি হোক এটাই আল্লাহর ইচ্ছা, আর বাচ্চাদেরকে গড়ে তোলার মাধ্যমে সেই নৈতিকতা সৃষ্টি করতে চাওয়া হয়েছে যার ফলে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ পয়দা হয়েছে।

এ তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর এই স্থানে আলোচ্য প্রশ্নে আমরা বিষয়টির ওপর খুব বেশী কথা রাখতে পারবো না। এর জন্যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। (১)

এ পর্যায়ে আমরা শুধু পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে শুক্রবীজ পয়দা হয় এবং আল্লাহর গায়েবী ইচ্ছায় কিভাবে এগুলো ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে পুরুষ ও নারীদের দেহ থেকে স্খলিত হয় এবং সর্বক্ষণ কার্যক্ষম মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখার এবং তাদের প্রসার ঘটানোর খেদমত আনজাম দেয় সেই বিষয়ে আমরা কিছু কথা রাখতে চাই।

'আর তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না'– এ আয়াতের তাফসীরে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, পুরুষ বা নারীর মধ্যে যিনি ডিম্বকোষ তৈরী করেন, সেই মহান আল্লাহ তায়ালাই তাঁর মরযী মোতাবেক কিছু সংখ্যক জ্যান্ত শুক্রবীজ বা ক্রোমজম ডিম্বকোষের সাথে মিলিত করে দেন। এ সময় তিনি কোনো পুরুষ ক্রোমজমকে বিজয়ী করেন, আবার কখনও নারী ক্রোমজমকে বিজয়ী করেন। এইভাবে আল্লাহর ইচ্ছাতেই বাচ্চা পুরুষ বা নারী হয়। এসব প্রক্রিয়া আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর গায়েবী হাত দ্বারা সম্পাদন করেন। এ বিষয়ে তাঁর ওপর হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কারও নাই।

পূর্ব নির্ধারিত এই কাজকে আল্লাহ তায়ালা সব সময়েই জারি রেখেছেন। এর দ্বারাই তিনি কাউকে পুরুষ সন্তান দেন এবং কাউকে দেন কন্যা সন্তান। এই প্রক্রিয়াতেই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বক্ষণ পুরুষ ও নারীর ভারসাম্য কায়েম রেখেছেন। সুতরাং কতো পুরুষ জন্ম নেবে এবং দুনিয়ায় কতো জন আসবে নারী– সবই তাঁর জানা এবং সবই তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোটা মানবমণ্ডলীর মধ্যে ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো উপায় নাই। এভাবেই সেই মহান মালিক মানবমণ্ডলীকে বৃদ্ধি এবং প্রসার দান করে চলেছেন। আর এই বিধান অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট এই সময় পর্যন্ত তিনি বৈবাহিক জীবনের স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখেন। উদ্দেশ্য যেন সাধারণ জীব জানোয়ারের অবস্থা থেকে মানুষের অবস্থা ভিন্ন হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই নিয়ম কানুনই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এই নিয়মের বাইরে যারা চলে, তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যের বাইরে কাজ করে তাঁর মূল লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায়। বিপর্যস্ত হয় তারা নিজেরা, বিপর্যস্ত হয় তাদের দাম্পত্য-জীবন, স্থিতি-শান্তি। এই দাম্পত্য জীবনের স্থিতি

(১) 'খাসাইসু ত্তাসাব্বুরিল ইসলামী ওয়া মোকাব্বিমাতিহী' কেতাবের অধ্যায়। 'হাকীকাতুল হায়াত' দেখুন।

রক্ষায় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পারিবারিক পরিবেষ্টনীতে পিতামাতার স্নেহ মায়া মমতাময় পরিচর্যায় বাচ্চাদের প্রতিপালন হয়, যার ফলে তারা তাদেরকে সঠিকভাবে এবং বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং এ কাজটা জীবজন্তুর মতো তাদের মুখে খাবার তুলে দেয়া ও তাদেরকে নিরাপত্তা দান থেকে বহু উর্ধের কাজ। আর সঠিক ও সুন্দর মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনে কর্মক্ষম হওয়া পর্যন্ত বাচ্চার দেখাশুনার যে দায়িত্ব পালন করে তার থেকে দীর্ঘতর সময়কাল পর্যন্ত পারিবারিক পরিবেশে রেখে তাদের লালন পালন করা জরুরী মনে করেন মা বাপ তাঁদের শিশুদেরকে।(২)

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এই যে ভারসাম্য– এটাই তাঁর মহিমা ও ক্ষমতা বুঝবার জন্যে যথেষ্ট সেই জাতির জন্যে যারা বুঝে বা বুঝতে চায়। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্যই আমি নিদর্শনগুলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে, যারা বুঝে (বা বুঝবার চেষ্টা করে)।'

চোখ থাকতেও যারা অন্ধ, তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে গেছে। এসব অন্ধের সারিতে প্রথম হচ্ছে বিজ্ঞানী বা 'বিজ্ঞান'-চর্চাকারীরা, যারা 'গায়েব'-এর কথা শুনলে নাক সিটকায়, উপহাস বিদ্রূপ করে। তারা অহরহ প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত এসব নিদর্শন দেখছে, কিন্তু হঠকারিতার কারণে তাদের চোখের ওপর এমনই পর্দা পড়ে রয়েছে যে, তারা দেখেও দেখে না এসব রহস্যরাশি। তাই বলা হচ্ছে,

'আর যতো নিদর্শনই তারা দেখুক না কেন, তার ওপর তারা ঈমান আনবে না।'

গাছপালা ও ফলমুল উৎপাদনে আল্লাহর কুদরতি নিয়ন্ত্রন

এরপর আলোচনা প্রসংগ এগিয়ে চলেছে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মানুষের জীবনের নানা দৃশ্যের দিকে। সত্যদর্শী চোখ এসব দৃশ্য দেখে, তার স্বচ্ছ অনুভূতি প্রদীপ্ত হয় এবং তার অন্তর চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়। এসব প্রকৃতির বিচিত্র রহস্যরাজি যারা প্রত্যক্ষ করে, তারা ভক্তি-শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। এরপর এ প্রসংগে সৃষ্টির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি সৌন্দর্যকে ভক্তবৃন্দের মুগ্ধ নয়নের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এর বিচিত্র প্রকার বর্ণ, গন্ধ ও শোভা সন্দর্শনে পুলকিত ও অভিভূত হয়। তাদের হৃদয় আবেগমুগ্ধ হয়ে যায় এই সুপ্রশস্ত প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে উন্নতি, অগ্রগতি ও সক্রিয়তা দেখে যা মহামহিম স্রষ্টার কুদরতের কথা স্মরণ করায়। একই ভাবে এসব অনুগত ভক্ত বান্দার অন্তর ভাবে গদগদ হয়ে ওঠে চির সুন্দর রাব্বুল আলামীনের বিশ্ব-জোড়া এই সৌন্দর্যের মেলার সমারোহ অবলোকনে । তাই বলা হচ্ছে,

'তিনিই তো সেই মহান সত্ত্বা, যিনি আকাশ থেকে পানির ধারা বর্ষণ করেছেন, তারপর তার থেকে আমি তৈরী করেছি সর্বপ্রকার শাক সব্জি, গাছ পালা, তরুলতা। এরপর বের করেছি তার থেকে এমন ঘন পত্র পল্লব বিশিষ্ট সবুজ শ্যামল ফসল, যার দানাগুলো পরতে পরতে সাজানো । আর থরে থরে সজ্জিত খেজুরের কাঁদি, আরও বানিয়েছি আংগুর, যায়তুন ও ডালিমে ভরা মনোহরী বাগ বাগিচা সদৃশ ও অসদৃশ .... তাকিয়ে দেখো বাগিচার এ সব ফলের দিকে যখন গাছে নেমে আসে ফলের সম্ভার আর যখন তাতে পাক ধরে। অবশ্যই তোমাদের এই সব বাগিচার মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন তাদের জন্যে যারা বিশ্বাস করে'।

(১) দেখুন, পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর (প্রাক্তন) মাওলানা আবুল আলা মওদূদী রচিত 'আল হিজাব'। এ তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন-এ দেখুন। (১১ থেকে ১৪ পর্যন্ত)

আর আল কোরআনের বেশীর ভাগ জায়গায় জীবন ও গাছপালার পাশাপাশি প্রচুর বর্ষণমুখী পানির কথা এসেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনিই ত সেই সত্ত্বা, যিনি বর্ষণ করেছেন আকাশ থেকে পানি, যার দ্বারা তিনি বের করেছেন সর্বপ্রকার গাছ পালা।'

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও গাছপালা উৎপন্ন করায় পানির ভূমিকাটা ভালোভাবেই বুঝে। মূর্খ ও জ্ঞানী সবাই এর প্রয়োজন সম্পর্কে জানে। কিন্তু এই সাধারণ ব্যবহার ছাড়া এর প্রকৃত প্রয়োজন আরও কতো গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও কতো ব্যাপক। যার কারণে কোরআনুল করীম পানি সম্পর্কে সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলেছে। প্রথমত পানির ব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে, যার দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন করার উদ্দেশ্য জানানো হয়েছে। পৃথিবীর মৃত মাটি কাঠফাটা রৌদ্রে যখন মাটি ঠনঠন করে সেই মাটি-কে তিনি এই বৃষ্টির পানি দ্বারা নতুন জীবন দান করেন এবং মাটিকে উর্বর করে ফসল তৈরীর উপযোগী করে দেন। একবার কল্পনার চোখে যদি দেখা হয় কেমন করে পৃথিবী পৃষ্ঠ যখন উত্তপ্ত হয়ে আগুনের চাংড়ার মতো হয়ে যায় এং মসৃণ পাথরের রূপ নেয়! এর মধ্যে এমন কোনো মাটি থাকে না যাতে কোনো গাছপালা বা ফসল উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু এ অবস্থার অবসান তখনই হয়ে যায়, যখন পানি ও আকাশের মধ্যে বিরাজমান আবহাওয়ার সহযোগিতায় নরম হয়ে যায় ওই কঠিন মাটি। তারপর এই পানির সহযোগতিায় প্রচুর ফসল ও ফল মূলে যমীন ভর্তি হয়ে যায়। এটা কেন এবং কেমন করে হয়? এর কারণ হচ্ছে নাইট্রোজেন যা শূন্যলোকে বিজলী চমকানোর সাথে সাথে তার থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ আলো আকারে নির্গত হয়। এই নাইট্রোজেন উর্ধাকাশেই থাকে। নাইট্রোজেন পানিকে দান করে আর্দ্রতাই বৃষ্টির পানির সাথেই এই নাইট্রোজেন ভূমিতে যমীনে পড়ে, যাতে ভরে যায় যমীন ফল মূল ফসলাদিতে। এই সার বা উর্বরতা (ফসল উৎপাদনের যোগ্যতা)-ই মানুষকে তার সমস্ত কাজ কর্মের মধ্যে কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছে, যার কারণে নিজে সে কিছু কিছু পদ্ধতি বের করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই উর্বর মাটি থেকে যদি পৃথিবী পৃষ্ঠ শূন্য হয়ে যায়, তাহলে কোনো ফসলাদি আর জন্মাবে না। তাই দেখুন এরশাদে রব্বানীর ইংগিত,

'তারপর আমি বের করেছি এই যমীন থেকে থরে ...... অসদৃশও বটে!

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসব গাছপালা যখন চারা আকারে গজায়, তখন এগুলো সবই থাকে সবুজ। 'খাযেরুন' শব্দটির মধ্যে যে শ্যামলিমার অর্থ আসে, তা 'আখযার' শব্দটি থেকে 'হালকা সবুজ' অর্থ ব্যক্ত করে। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে স্নেহভরা গভীর এক মাধুর্য। এই নয়নাভিরাম কোমল সবুজ চারা গাছ বড় হয় এবং যখন ফলদায়ক হয়, তখন তার থেকে আল্লাহ তায়ালা বের করেন থরে থরে সজ্জিত বীজ-দানা, যেমন যব, ধান বা গমের শীষ এবং এই রকম আরও অনেক কিছু। 'আরও দিয়েছি কাঁদি ভরা খেজুর, যার ফলের ভারে কাঁদিটা নুয়ে পড়ে নীচের দিকে।' আর 'কেনওয়ানুন' কেনবুন শব্দের বহু বচন। কেনবুন-এর অর্থ খেজুরের ছোট কাঁদি বা ছোট শাখা। খেজুর গাছে কাঁদি ভরে খেজুর আসে। এখানে 'কেনওয়ানুন' (কাঁদিসমূহ) এবং এগুলোর বিশেষণ বা গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'দানিয়াতুন'– অর্থাৎ এগুলো নুয়ে পড়া অবস্থায় থাকে। এ দুটি শব্দের মধ্যে একাধারে দুটি অর্থ ব্যক্ত হয়েছে, 'সুকোমল হালকা সবুজ' এবং 'দেখতে বড়ই নাযুক'। এই কচি কচি খেজুরের হালকা হালকা সবুজের দৃশ্য এমনই সুন্দর যে, দেখতে চোখ জুড়িয়ে যায়, আরও দেখতে ইচ্ছা হয়। কেমন যেন এতে স্নেহের এক কোমল পরশ মাখানো রয়েছে। এরপর বলা হয়েছে 'আংগুরের বাগিচাসমূহ'......... যার মধ্যে রয়েছে 'যায়তুন এবং

মনোলোভা ডালিমের সমারোহ।' এ সমস্ত গাছ পালার চারা একই জাতীয় ফল হওয়ার দিক দিয়ে এবং বিভিন্ন জাতীয় ফল হওয়ার কারণে পরস্পর যেমন 'সাদৃশ্যপূর্ণ', তেমনি বৈসাদৃশ্যপূর্ণও বটে। তাই আল্লাহ তায়ালা চিন্তাশীল লোকদেরকে চিন্তা করতে আহ্বান জানিয়ে বলছেন, তাকিয়ে দেখো তোমরা একবার ওই ফলগুলোর দিকে– যখন গাছভর্তি হয়ে ফল আসে আর এগুলোতে পাক ধরে।' দেখো অনুভূতির চোখ দিয়ে এবং জাগ্রত হৃদয়ে। চেয়ে দেখো এসব ফলের দিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। যখন এগুলো সুন্দর দেখায় এবং তখন আরও খেয়াল করে দেখো যখন এগুলোর রং মলিন হয়ে যায়। আরও নয়ন ভরে তাকাও এগুলোর দিকে, যখন এগুলো পুরোপুরি পেকে যায়, তখন কী যে শোভা বেড়ে যায়, অতি সুন্দর সমগ্র এ বাগিচায়। অপলক চোখে তাকাও আবার এবং হৃদয়ের কান দিয়ে শোনো, কী বার্তা বয়ে এনেছে সারা বাগিচা জুড়ে! দেখুন, আল্লাহ তায়ালা এখানে একথা বলছেন না, 'যখন ফল পাকে তখন তোমরা খাও', বরং বলছেন, 'তোমরা দেখো একবার এর ফলগুলোর দিকে যখন গাছভর্তি ফল আসে এবং তখনও দেখো যখন এগুলো পেকে ওঠে।' এর কারণ হচ্ছে, এ ক্ষেত্রটি সৌন্দর্য ও সম্পদের, আর একই সাথে এ ক্ষেত্রটি হচ্ছে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার নিদর্শনসমূহের ওপর চিন্তা ভাবনা করার এবং জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অতি সুন্দর এ কারখানার চমৎকারিত্বের ওপর গভীরভাবে ভাববারও বটে।(১) এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন সেই জাতির জন্যে, যারা বিশ্বাস করে।'

সুতরাং ঈমানই হৃদয় দ্বার খুলে দেয়, দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ আলো দান করে এবং ইসলামের আহ্বান পাওয়ার পর সাগ্রহে তাকে স্বাগত জানানো এবং হৃদয়-মন দিয়ে তা গ্রহণ করার জন্যে হুশিয়ার করে দেয়। আর এই ঈমানই গোটা সৃষ্টির সাথে মানব জাতির যোগাযোগ স্থাপন করে এবং সবার যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর ওপর সমস্ত হৃদয়ের আবেগ ঢালা ভক্তি ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্যে আহ্বান জানায়। এই ঈমান যাদের মধ্যে নেই, যারা আল্লাহকে সর্বময় মালিক এবং একমাত্র অধিপতি বলে মানে না, তাদের অন্তর জাহেলিয়াতের আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে, দৃষ্টি তাদের হয়ে গেছে আচ্ছন্ন এবং তাদের মানব-প্রকৃতি হয়ে গেছে বিপর্যস্ত। এরা আল্লাহর মহা বিস্ময়কর এ বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির চমৎকারিত্ব অহরহ দেখছে, কিন্তু দেখেও তারা এগুলো দেখে না, খেয়াল করে না আল্লাহর নিদর্শনাবলীর দিকে, যার কারণে আল্লাহর কোনো ক্ষমতাই তারা অনুভব করে না এবং আল্লাহর ডাকে তারা সাড়া দেয় না। 'সাড়া একমাত্র তারাই দেয় যারা তাঁর কথা খেয়াল করে শোনে।' অবশ্যই এই নিদর্শনগুলোর চমৎকারিত্ব তারাই বুঝতে পারে, যারা বিশ্বাস করে!

পৌত্তলিকদের বিকৃত চিন্তাধারা

বিভিন্ন প্রমাণাদিসহ যখন আলোচনা প্রসংগ এ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে যে, মানব হৃদয়ের ওপর আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর ক্ষমতার বিবরণ এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার কথা ও ...... সৃষ্টিকুলের এই সৌন্দর্যের মেলা অবশ্যই কিছু না কিছু সাড়া জাগায়, তখন অবশ্যই হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়ার মতো এসব বিবরণ বিপুল এক আবেগের সৃষ্টি করে। এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তাতে গোটা সৃষ্টির স্পন্দনশীল প্রত্যেকটি হৃদয়ে সাড়া জাগে এবং আল্লাহর কীর্তিসমূহের পক্ষে এরা সবাই যেন কথা বলতে থাকে। ঠিক একই সময়ে যখন মোশরেকদের শেরকের কথা ও তার ভোতা যুক্তিগুলো সামনে আসছে, তখন সেগুলো যে কোনো ব্যক্তির কাছে অন্তসারশূন্য। অলীক ও ক্রোধ উদ্রেককারী ও বাজে বিতর্ক বলে মনে হচ্ছে এবং মানুষের সুস্থ যুক্তি-বুদ্ধি

(১) দেখুন, মোহাম্মদ কুতুব রচিত পুস্তক 'মিনহাজুল ফান্নিল ইসলামী–এর আত্তাবিয়াতু ফীল কোরআন' অধ্যায়।

সেগুলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছে, ঝরে পড়ছে ওই সব বাজে তর্কের ওপর উপেক্ষা ও ঘৃণা এবং বলতে কি, শেরকের ওই পরিবেশটা মোমেনদের পরিবেশের সামনে পুরোপুরিই ঘৃণার পরিবেশ। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে, অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন– আর না জেনে তাঁর ছেলে ও মেয়ে আছে বলে মিথ্যা দাবী করে। পবিত্র, মহাপবিত্র মহান আল্লাহ ওই সব জিনিস থেকে যা ওরা তাঁর সম্পর্কে আরোপ করে। তিনিই তো আসমান সমূহ ও যমীনের অস্তিত্ব দানকারী, তাঁর আবার সন্তান আসবে কোত্থেকে, তাঁর তো কোনো সংগিনী নাই! আর সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছুর ব্যাপারে তিনিই সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

আরবের কিছু কিছু মোশরেক ব্যক্তি জ্বিনদের পূজা করতো, অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, জ্বিন যে কি জিনিস তা তারা জানতো না, বরং এটা ছিলো পৌত্তলিকতাপূর্ণ মনোভাবেরই এক বিকৃত বহিপ্রকাশ। আর মানুষের প্রবৃত্তি যদি একবার তাওহীদের পথ থেকে এক বিঘৎ পরিমাণও সরে যায়, তখন তার এই সত্য-বিমুখতা তাকে কোন রসাতলে নিয়ে ডুবাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। আর সত্যের যে বিন্দু থেকে সে সরে যায় তখন সে সত্য থেকে সে এতো দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ে যে, কোনো দৃষ্টি তাকে আর খুঁজে পায় না। আহ্, এই সব মোশরেক তো ইসমাঈলেরই ধর্ম ও জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলো.... সে দ্বীন ছিলো ওই তাওহীদী জীবন ব্যবস্থা যা ইবরাহীম (আ.) নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজ ওরা সেই তাওহীদ থেকেই সরে গেছে। তবে এটা হয়তো সত্য যে, প্রথম প্রথম ইসমাঈল (আ.)-এর অনুসারীরা তাওহীদ থেকে সামান্য কিছু দূরে চলে গিয়েছিলো, কিন্তু কালের আবর্তনে তারা শেরেকের এমন ঘৃণ্য পংকে ডুবে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসার আর কোনো পথ তাদের সামনে নেই, যে কারণে আজ তারা আল্লাহর সাথে জ্বিনদেরকে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা এটা ভালো করেই জানে যে, ওই সব জ্বিনকে আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারা আল্লাহর সাথে জ্বিনদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছে অথচ (তারা জানে যে,) তিনিই ওদেরকে সৃষ্টি করেছেন।......'

জাহেলী যামানায় বিভিন্ন মূর্তিপূজারী গোষ্ঠী জানতো যে, বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে দুষ্ট এক দল সৃষ্টি আছে, যারা শয়তানের ধ্যান ধারণার সাথে তুলনীয়, আর এসব দুষ্ট সৃষ্টিকে তারা ভয় করতো, তা এরা প্রেতাত্মাই হোক বা দুষ্ট চরিত্রের জ্বিনই হোক। এরা জ্বিনদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে এবং তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে কিছু মাধ্যম ধরতো, যাদেরকে তারা মনে করতো যে, ওরা ওই জ্বিনদের প্রিয়পাত্র। এরপর তাদেরকে পূজা করতো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এসব অপবিত্রতা থেকে বহু উর্ধে! কেতাবুল আসনামে কালবী বলেন, খুযায়া গোত্রের বনু সলীম বংশের লোকেরা জ্বিনদের পূজা করতো।

আল কোরআনের বাণী অত্যন্ত ক্রোধের সাথে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মোকাবেলা করেছে। মোকাবেলা করেছে একটা মাত্র কথা দ্বারা,

'অতচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।'

ওপরের কথাটা একটা শব্দ মাত্র। কিন্তু ওই মিথ্যা ধারণার প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করার জন্যে ওই একটা শব্দই যথেষ্ট। পবিত্র আল্লাহ তায়ালাই যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাপারে এবং বাদশাহ ও প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ওরা শরীক হয় কেমন করে?

আর ওই অসভ্যদের এটাই যে একমাত্র দাবী ছিলো তাই নয়, যখন কারো মধ্যে পৌত্তলিকতার মনোভাব এসে যায়, তখন সে সত্য থেকে কতোটা দূরে চলে যাবে তার কোনো সীমা নিরূপণ করা যায় না, বরং তারা তো আরো অগ্রসর হয়ে যে নিকৃষ্ট অলীক ধারণা করতো তা হচ্ছে, পাক পরওয়ারদেগারের বহু ছেলেমেয়ে আছে– 'নিছক অজ্ঞানতার কারণেই তারা এসব বাজে ও মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতো যে, তিনি নিজের জন্যে কিছু ছেলেমেয়ে বানিয়ে নিয়েছেন।' এখানে 'খারাকূ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ওরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা বলতো। শব্দটির মধ্যে এক বিশেষ ঘৃণা বিজড়িত রয়েছে– যার মধ্যে রয়েছে সত্যের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্যে জেনে-বুঝে মিথ্যা তৈরী করে বলা!

তাঁর জন্যে মিথ্যা দাবী করতো যে, তিনি নিজের জন্যে ছেলে বানিয়ে নিয়েছেন। ইহুদীরা বলত, ওযায়র আল্লাহর ছেলে, নাসারাদের কথা ছিলো মসীহ ঈসা আল্লাহর ছেলে। ওরা তাঁর জন্যে আবার কিছু কন্যা সন্তানও ঠিক করে ফেলেছিলো। মোশরেকদের ধারণায় ফেরেশতারা আল্লাহর মেয়ে। তারা মনে করতো মেয়ে হিসাবেই তিনি ফেরেশতাদের গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেন যে আল্লাহর জন্যে ওরা মেয়ে বাছাই করলো– এটা তাদের কেউ জানে না। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে,যে সব দাবী তারা করতো, তার মূলে কোনো ভিত্তিই ছিলো না। এসব কিছুই ছিলো, না জেনে বলার কথা।

'সুমহান আল্লাহ তায়ালা তারা যা বলতো, তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।'

তারপর তাদের ধোকাবাজির কথা এবং প্রকৃত মালিক সম্পর্কে তারা যে ধারণা রাখতো সে বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে এবং যে ভয়-ভীতির কারণে তারা ওই সব ভুল ধারণার মধ্যে পড়েছিলো তার অসারতার কথাও জানানো হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর তো কোনো সংগিনী নাই।'

তাঁর আবার সন্তান আসবে কোত্থেকে? তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে আর তিনি সকল কিছুই জানেন। যিনি অস্তিত্ব দান করলেন সেই সব জিনিসের যাদের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না তাঁর আবার উত্তরাধিকারীর কী প্রয়োজন? উত্তরাধিকারী তো তারই প্রয়োজন, যার ধ্বংস আছে, যাতে করে তার মৃত্যুর পরও কাজটাকে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, প্রয়োজন হয় দুর্বলদের জন্যে এবং তাদের আনন্দ বর্ধনের জন্যেও প্রয়োজন যারা সৃষ্টি করতে পারে না।

তারপর এই সব মিথ্যা ক্ষমতার দাবীদাররা বেশী বেশী পাওয়ার প্রতিযোগিতার নিয়ম কানুন। তারা মনে করে যে, অধিক কিছু লাভ করার প্রয়োজনে নিজ প্রকৃতির মধ্য থেকে সৃষ্ট নারীকুল থেকে তাদের কোনো সংগিনী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যার কোনো সংগিনী নাই তাঁর আবার সন্তান হয় কেমন করে? তিনি সকল দুর্বলতা থেকে উর্ধে, তিনি একক– তিনি একা। তাঁর মতো কেউ নেই, কিছুই নেই। সুতরাং বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বংশ বৃদ্ধির কথা কেমন করে আসে?

আর এটা হচ্ছে একটা অকাট্য সত্য, কিন্তু নিছক কল্পনার ওপর ভরসা করেই এসব বাজে কথা বলা হয়েছে। আর তাদেরকে তাদের জীবন এবং তাদের অভিজ্ঞতার উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে।

এখানে সৃষ্টির তাৎপর্য ও রহস্য তাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে করে তারা শেরকের অসারতা সঠিকভাবে বুঝতে পারে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, কোনো সৃষ্ট জীব স্রষ্টার সাথে কখনও কোনো ব্যাপারেই অংশীদার হতে পারে না। অর্থাৎ, যে নিজে সৃষ্টি সে কখনো স্রষ্টা হতে পারে না– একমাত্র স্রষ্টাই সৃষ্টি করেন সব কিছুকে। সুতরাং একমাত্র স্রষ্টাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টিকর্তার

যে ক্ষমতা এমন ক্ষমতা দ্বিতীয় আর কারো নেই। কাজেই তাঁর জ্ঞানের অধিকারীও আর কেউ হতে পারে না। যারা আল্লাহর জ্ঞান থেকে কিছু পেয়েছে বলে দাবী করে, তাদের এ দাবী নির্জলা মিথ্যা ও অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'আর তিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে এবং তিনি সব কিছু সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল।'

মোশরেকদেরকে সম্বোধন করে আল কোরআন যে মহা সত্যটি জানাচ্ছে, তা হচ্ছে, 'আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন সব কিছুকে।' একথা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ওই হতভাগাদের কল্পনার অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার পুত্র কন্যা ও বহু সন্তান আছে, অথবা জ্বিনদের মধ্য থেকে তাঁর বহু শরীকদার আছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যারা এসব কথা বলে তারা একথাও স্বীকার করে যে, ওই জ্বিনদের আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান আয়াতগুলো এ সত্যটাকে পুনরায় ব্যক্ত করছে, যাতে করে একথাটার যৌক্তিকতা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া যায় যে, পূর্ণাংগ, চূড়ান্ত ও বিনা কৈফিয়াতে আনুগত্য করা যায় একমাত্র তাঁরই, মাথা নত করা যায় একমাত্র তাঁর সামনেই এবং একমাত্র তাঁরই আইন কানুন বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া যায়– যিনি সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং মালিক মনিব ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নয় এবং তিনি ছাড়া প্রতিপালক ও বাদশাহও আর কেউ নাই। তাই এরশাদ হয়েছে,

'এই আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী (ইলাহ) আর কেউ নাই। অতএব তাঁরই এবাদাত করো এবং তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম।'

সৃষ্টির কাজে যদি একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই কর্তা হয়ে থাকেন, তাহলে সকল কিছুর ওপর বাদশাহী একচ্ছত্র আধিপত্য করার অধিকারীও একাই তিনি। এইভাবে সৃষ্টি করা ও আধিপত্য করার ক্ষমতা এককভাবে যাঁর, রেযেক দান করার (জীবনের যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ করার) মালিকও একমাত্র তিনিই। তিনিই তাঁর সৃষ্টির যেমন সৃষ্টিকর্তা, তেমনি তাদের মালিকও বটে। তাঁর সেই রাজ্য থেকে একই কারণে একমাত্র তিনিই তাদের রেযেক সরবরাহ করেন, যার মধ্যে অন্য কারো অংশীদারিত্ব নাই। সুতরাং গোটা সৃষ্টি যে সব খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য যে সব জিনিস ব্যবহার করে, সে সব কিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই। সুতরাং এসব সত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো.........অর্থাৎ যখন জানা গেলো সৃষ্টি, বাদশাহী ও রেযেক দান করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর, তখন সাথে সাথে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, রবুবিয়্যাত (প্রতিপালন ও আইন দান করার অধিকার)-ও একমাত্র সেই পবিত্র আল্লাহর। একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে রবুবিয়্যাতের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব। তিনি সব কিছুর ওপর পরিচালক, তিনি কৈফিয়ত নেয়ার মালিক এবং সেই ক্ষমতারও মালিক যার সামনে সবাই মাথা নত করতে বাধ্য এবং স্বতস্ফূর্তভাবে যার অনুগত্য করা হয়। আর সেই সংগঠনের মালিক ও পরিচালকও তিনি, যার কাছে মানুষ একত্রিত হয়ে যায়, হতে বাধ্য হয় এবং সকল যুক্তি প্রমাণ সহকারে চূড়ান্তভাবে তাঁর হুকুম মানে। আর এইভাবে পরম ভক্তি ভরে তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর সামনে নত হয়ে থাকে এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

সমাজ ব্যবস্থার মোড়কে শেরেকের উপস্থিতি

আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা একথা জাহেলী যুগের আরবরাও অস্বীকার করতো না। তারা জানতো ও মানতো যে, তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর সেই রাজ্য থেকে তাদের রেযেক সরবরাহকারী, যার বাইরে এমন আর কোনো রাজ্য নাই যেখানে গিয়ে কেউ আশ্রয় নিতে পারে। ....এমনিভাবে আরও কিছু জাহেলিয়াত আছে যার ধারক বাহকরা হচ্ছে গ্রীসের

অধিবাসীরা। তারা এসব সত্য অস্বীকার করে, অস্বীকার করে সেই সব তুচ্ছ বস্তুগত দৃষ্টিভংগি বা দার্শনিক চিন্তাধারার কারণে, যার স্থায়িত্ব বলতে কিছুই নাই। অবশ্য, আরও কিছু সংখ্যক জাহেলিয়াতের পন্ডিত আছে, যারা এসব সত্যকে অস্বীকার করে না। বস্তুবাদী পন্ডিতদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। পূর্বে একমাত্র গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে যে বস্তুবাদী চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ ছিলো, তা বর্তমানে বহু দেশে ও এলাকায় প্রসারিত হয়েছে। এজন্যে দেখা যায়, ইসলাম জাহেল আরবদের এজন্যেই সমালোচনা করেছে যে, তারা অন্ধভাবে দেব-দেবীর পূজা করতো। তারা দেব-দেবীদেরকে শুধু মাধ্যম মনে করেই ক্ষান্ত হতো। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর যোগ্যতা তাদের নাই, যেহেতু ফেরেশতাকুল আল্লাহর মেয়ে এবং দেব-দেবী-মূর্তি তাদের প্রতিভূ, তাদের কাছে আরয করতো যেন ওরা তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অস্তিত্বে কাউকে শরীক করতো না। আইন কানুন মানার ব্যাপারে তারা আল্লাহর কেতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে নিজেদের বুঝ মতো আইন তৈরী করে নিতো। কিন্তু আজকের নাস্তিকদের মতো আল্লাহর অস্তিত্বকেই তারা পুরোপুরি অস্বীকার করতো না। আজকের নাস্তিকরা তো বিনা যুক্তিতে, বিনা প্রমাণে বা সঠিক কোনো জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং এতেই তারা আনন্দ পায়!

অবশ্য এটাও সত্য যে, আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারীদের সংখ্যা অতি অল্প এবং সর্বকালে কমই থাকবে। আসলে আল্লাহ থেকে মৌলিকভাবে ফিরে যাওয়ার মূল বিষয়টা হচ্ছে, (যা জাহেলিয়াতের যুগেও ছিলো) বাস্তব জীবনের জন্যে রচিত আল্লাহর আইন কানুনকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্যে তারা নিজেরাই আইন কানুন তৈরী করে নিতো। প্রকৃতপক্ষে এবং মৌলিকভাবে এটাই শেরক অর্থাৎ আইন তৈরীর কাজে, নিজেদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠীকে দায়িত্বশীল মনে করাই এমন শেরক– যা জাহেলী যামানায়ও ছিলো, এখনও আছে। এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ প্রদত্ত আইন মানুষের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয় বলেই নিজেদের মধ্যে আল্লাহ থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তারা আইন তৈরীর কাজ সোপর্দ করে। এই শেরকের কাজে সব জাহেলরাই একজোট। আর এখানেই আল্লাহর আপত্তি। এর কারণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন তাঁর রাজ্যে তাঁর সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজন কী এবং যেহেতু তিনি সমস্ত প্রয়োজন ও স্বার্থের উর্ধে, এজন্যে সবার জন্যে নিরপেক্ষভাবে একমাত্র তিনিই আইন দিতে সক্ষম। মানুষ, সে যেই হোক না কেন, বিশেষ সময়ের, বিশেষ এলাকার এবং বিশেষ জনপদের মানুষ সে। অতএব তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সে কোনো না কোনোভাবে কোনো স্বার্থের সাথে জড়িত। সুতরাং তার রচিত আইন সকল যামানার, সকল মানুষের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না এবং জ্ঞানের অভাবে তার রচিত আইন সর্বাংগীণ সুন্দরও হতে পারে না। তার নির্মিত আইন অবশ্যই পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার ত্রুটি থেকে মুক্তও নয়।

নাস্তিকতার অন্ধগলি

আজকের যামানায় যে সামান্য সংখ্যক লোক আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে, প্রকৃতপক্ষে তারা কোনো জ্ঞান বা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই বাতুলতা দেখাচ্ছে না, এটা তাদের নিজেদেরই মনগড়া দাবী। সুতরাং বলতে হবে, মানুষের জ্ঞান এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা রাখে না, পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো দলীলও পেশ করে না, বা প্রাকৃতিক কোনো জিনিস থেকেও তাদের মতের সপক্ষে কোনো প্রমাণ হাযির করতে পারে না। তবু যে মূল দ্বীন থেকে তারা ফিরে গেছে, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায় যে, তারা (রোমান ক্যাথলিকদের) এবাদাতখানা বা গীর্জার

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ধর্ম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো এবং পরিশেষে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলো– যেহেতু ধর্মগুরু ওই পোপরা মূল দ্বীনকে বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে নিজেদের ইচ্ছার গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলো। তারপর ওই ধর্মত্যাগীরা স্বভাবতই হীনমন্যতার শিকার হয়ে নিজ নিজ পেশা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে এবং সর্বক্ষেত্রে তারা পরিত্যক্ত হয়ে যায়।(১)

এর সাথে বর্তমান প্রসংগে আল কোরআন সৃষ্টি ও তাকদীরের তাৎপর্য বর্ণনা করেছে, যেমন করে বর্ণনা করেছে জীবনের বিস্তৃতি সম্পর্কে। এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করা। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বাদ দিলে আল কোরআনের অন্যান্য আলোচনার কোনো গুরুত্বই নাই। এ পাক কালামের উদ্দেশ্য, মানুষকে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে নেয়া, যেন তাদের জীবনে তারা একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করে। প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে রব, প্রতিপালক, বাদশাহ, পরিচালক এবং বিচারক হিসাবে। সর্বোপরি তারা যেন একমাত্র তাঁরই গোলামী করে এবং তাঁর বন্দেগীতে অন্য কাউকে অংশীদার না বানায়।

এর সাথে আল কোরআন সৃষ্টির তাৎপর্য এবং তাদের পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং বিতর্ককারীদের দিকে এমন সব যুক্তি-প্রমাণ ছুঁড়ে মেরেছে যার জওয়াব দিতে ব্যর্থ তারা হয়েছে। কারণ ভাসা ভাসা চিন্তা করা ছাড়া কোনো কিছুর গভীরে পৌঁছানোর ক্ষমতা তাদের নাই। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, অহংকারের কারণে তারা সঠিক জিনিসটা বুঝে না, বরং সেখানে কোনো ভাবনা-চিন্তা না করে অন্ধভাবে কোনো কিছুর অনুসরণ করে।

'এ নশ্বর বিশ্বে মানুষ'(২) এবং .... 'মানুষ নিজে নিজেই অস্তিত্বে এসেছে'– এ দুটি পুস্তকের লেখক জুলিয়ান হাক্সলে হচ্ছেন, ওই সব অহংকারী ও অন্ধ অনুসারীদের একজন, যিনি মনগড়া কিছু কথা নিজ খুশী মতো লিখেছেন, যার মধ্যে না আছে কোনো যুক্তি, আর না আছে তার মধ্যে কোনো দলীল-প্রমাণ। 'আল ইনসান ফী আলামিল হাদীস' (এ নশ্বর বিশ্বে মানুষ) পুস্তকের একটি অধ্যায় 'আদ্দীনু কামাসআলাতি মওযুয়িয়্যাহ' (ধর্ম মনগড়া একটি বিষয়) নামক অধ্যায়ে উক্ত কথাটা লিখেছেন। আর অবশ্যই আমরা বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ও জীব বিজ্ঞানের যুক্তিগুলো যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাতে আল্লাহর পরিচয় দান আশা করি একেবারে নিষ্ফল হয়ে যায়নি এবং আমাদের অন্তর থেকে বিজ্ঞানের খোঁড়া যুক্তিগুলোও দূরীভূত হয়ে গেছে। তবে এ সত্যটা ভেসে উঠেছে, বৈজ্ঞানিকদের অনেকে স্বেচ্ছাচারী কোনো শাসকের মতো প্রকৃত সত্যটা গোপন করে গেছে এবং প্রথম কারণ, বরং বলা যায় মৌলিক বিষয়ের দিক থেকে তারা চোখ বন্ধ করে নিয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে সত্য থেকে সরে গেছে।

আর অলডেওরান্ট নামক একজন লেখক তার পুস্তক 'মাবাহিজুল ফালসাফা' (দর্শন শাস্ত্রের চমক) বইটিতে লেখেন (৩) 'নিশ্চয়ই দর্শন শাস্ত্র আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করে। তবে যিনি সকল বাদশার বাদশাহ, যাঁর সম্পর্কে সবার ধারণা যে তিনি প্রাকৃতিক জগতের ঊর্ধে বাস করেন, সেই বাদশাহ সম্পর্কে দর্শন শাস্ত্র গবেষণা চালায় না। বরং দার্শনিকদের পূজনীয় মনিব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে। আর এ মনিব হচ্ছে বিশ্বের নিয়ম কানুন এবং তারই অনুরূপ বিধান দাতা গীর্জা। দর্শন শাস্ত্র চিন্তা করে পৃথিবীবাসীর জীবন মৃত্যু নিয়ে এবং পৃথিবীতে বসবাস করা কালীন তাদের জীবন ব্যবস্থা কী হবে তা নিয়ে। এটা এমন একটা বিষয়, যা কেউ স্থির ভাবে ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু বিষয়টা এমন যার ওপর সাধারণ ভাবে কথা বলা হয়ে থাকে।

---

(১) আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে দেখুন, 'খাসাইসুত্তাসাব্বুরিল ইসলামী ওয়া মুকাবিবমাতিহী' গ্রন্থের ২য় খন্ড, 'উলুহিয়্যাত ওয়া উবুদিয়্যাত' অধ্যায়।

(২) ইনি হচ্ছেন বিবর্তনবাদ–এর প্রবক্তা ডারউইন–এর সমকালীন ও সহযোগী ইংরেজ লেখক।

(৩) ডারউইন এর সমসাময়িক দর্শন শাস্ত্রের একজন আমেরিকান। আত্মপ্রকাশ নামক বই থেকে।

আর আমরা আমাদের কোরআনে ওই কল্পনাবিলাসী দার্শনিকদের বাজে বকাবকির ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামাতে চাই না। যেহেতু তারা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো চিন্তা ভাবনা করে এবং আমাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমরা আল কোরআনের প্রদর্শিত পথে যে বুদ্ধি পেয়েছি তা দিয়ে আমরা ওদের বিষয়ে কোনো ফয়সালা করতে চাই না। আমরা তাদেরকে তাদের বৈজ্ঞানিক দোসরদের কাছে ছেড়ে দিতে চাই এবং ওদের বিষয়টাকে সেই বিজ্ঞানীদের কাছে সোপর্দ করতে চাই যারা এ বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে।

রসায়ন বিজ্ঞানী ও অংকবিদ জন ক্লিফল্যান্ড কোতরান (কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট করেছেন এবং ডাল্লাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক সময় প্রকৃতি বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ছিলেন) তাঁর 'অবশ্যম্ভাবী ফল' নামক একটি কথিকায় (১) বলেছেন,

'এখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি কল্পনা করবে, অথবা চিন্তা করবে, অথবা বিশ্বাস করবে যে, আমাদের দেখা সকল দিক দিয়ে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল ও সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ এ জগত নিজে নিজেই কোনো এক ঘটনাচক্রে বাস্তবে এসেছে? অথবা কোনো এক আকস্মিক ঘটনা গোটা এ সৃষ্টিকে এবং সর্বত্র বিরাজমান এসব নিয়ম-কানুনকে বাস্তবে এনেছে? তারপর কোনো পরিচালক ছাড়া নিজে নিজেই এগুলো চলছে? নিসন্দেহে এর জবাবে যে কেউ না-সূচক কথা বলবেন বরং বলতে বাধ্য হবেন যে, বস্তু যখন রূপান্তরিত হয়ে শক্তিতে পরিণত হয় অথবা শক্তি যখন বস্তুর রূপ নেয়, তখন বুঝতে হবে সব কিছু নির্দিষ্ট একটি বিধানের অধীন পর্যায়ক্রমে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর শক্তি বস্তু রূপে পরিণত হয়ে সেই নিয়ম কানুন অনুসারেই কাজ করে যাচ্ছে, যার কাছে ইতিপূর্বে গঠিত যে কোনো বস্তু নতি স্বীকার করে চলেছে।

দেখুন, রসায়ন শাস্ত্র আমাদেরকে একথা জানাচ্ছে যে, কোনো কোনো বস্তু ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে অথবা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনো কোনোটা এমনও আছে যে, খুব দ্রুতগতিতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে এবং কোনো কোনোটা খুব ধীরে ধীরে এগোয়। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বস্তু স্থায়ী নয়। আর এর অর্থ অবশ্যই এটাও হতে বাধ্য যে, এটা অন্তহীনও নয়। কারণ এর তো শুরু আছে। আর রসায়ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, যে বস্তুর শুরু আছে তা পর্যায়ক্রমে আসেনি, বরং তা এসেছে হঠাৎ করে এক দিনে। আর এসব বস্তু ঠিক কোন্ সময় পয়দা হয়েছিলো তার সুনির্দিষ্ট সময়ও কেউ বলতে পারে না। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে এটা অবশ্যই বুঝা যায় যে, এসব বস্তু অবশ্যই সৃষ্টি।

যে দিন এই বস্তু সৃষ্টি হয়েছে সেই দিনই এটা একটা নিয়ম ও সৃষ্টির সীমা বা নিয়ামক কোনো একটা বিধানের কাছে অনুগত হয়েই এসেছে। কাজেই হঠাৎ করে কিছু চলে আসার সুযোগ এখানে নাই।'(২)

'তারপর যখন বস্তুজগত নিজেকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে গেলো এবং যে সব আইন-কানুনের কাছে এটা নত থাকতে বাধ্য তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারলো না, তখনই তার জন্যে জরুরী হয়ে গেলো এমন কোনো সত্ত্বার কাছে নিজেকে সোপর্দ করা যিনি বস্তুর উর্ধে। আর সৃষ্টির মধ্য থেকে সকল প্রকার সাক্ষী এ কথা স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে, এই সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি অবশ্যই বুদ্ধিমান ও সর্ব প্রকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। তবে বস্তুজগতেও সবখানে বুদ্ধি কাজ করে না, যেমন শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুধু সদিচ্ছা কাজে লাগে না। যা ইচ্ছা করা হবে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

---

(১) কথিকাটি নেয়া হয়েছে 'আধুনিক বিজ্ঞানে আল্লাহর আত্মপ্রকাশ' নামক বই থেকে।

(২) ইতিপূর্বে আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত শেষ পরিণতি সবটুকুই অনুমান ভিত্তিক। আর আমরা এ কথা থেকে ইসলামের সত্যতার দলীল গ্রহণ করতে পারি না। আমরা তো এর দ্বারা তাদের দিকেই মুখ ফেরাচ্ছি, যারা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর এবং তার থেকে যুক্তি– প্রমাণও পেতে চায়।

আর এমনি করে, যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে অবশ্যই যদি এই পরিণতি আসে যে, যুক্তি-বুদ্ধি আমাদেরকে বলে দেয় যে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তাহলেই যথেষ্ট। তবে যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি অবশ্যই জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা– সব কিছুরই অধিকারী হবেন এবং অবশ্যই তিনি সব কিছু করতে সক্ষম হবেন। এমন কি তাঁর এ গোটা বিশ্বকে হুকুম বলে সৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে, একে সুসংগঠিত এবং সুসংহত ভাবে চালানোর যোগ্যতাও তাঁর থাকতে হবে এবং চিরস্থায়ী ভাবে এ যোগ্যতা বর্তমান থাকতে হবে, যাঁর শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন ছড়িয়ে থাকবে সর্বত্র। এরপর আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব না মেনে পালাবার কোনো জায়গা নাই। তিনিই এ বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা এবং তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে– ইতিপূর্বে এই বক্তব্যের শুরুতে এই দিকেই ইংগিত করেছি।

লর্ড কেলফিন-এর যুগ থেকে বিজ্ঞানের অর্বাচীন দাবী থেকে প্রত্যাবর্তনের যে মতবাদ উদ্ভব হয়েছে, তা আমাদেরকে এমন কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করছে যার কোনো নযীর ইতিপূর্বে নাই। এর আগে কেউ এ ধরনের কথা বলে নাই। এ বিষয়ের ওপর আমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি। তাই আমরা আশা করছি, খুব শীঘ্র 'আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাসের' কাছে বাধ্য হয়ে সবাইকে ফিরে আসতে হবে।'

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ফ্রাংক এ্যালেন তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে বলেন, 'বিশ্ব সৃষ্টি কি আকস্মিক কোনো ঘটনার ফল– না কোনো সুচিন্তিত ইচ্ছার ফসল?'

খুব বেশী বেশী যে কথাটা বলা হয়, তা হচ্ছে নিশ্চয়ই এই বস্তুগত সৃষ্টির জন্যে কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন আমরা মেনে নিয়েছি যে, এই সৃষ্টিটা বর্তমান আছে, তাহলে এর বর্তমান থাকার ব্যাখ্যা কিভাবে করবো?

এ প্রশ্নের জবাবে চারটি সম্ভাবনার কথা বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ এ বিশ্ব কি শুধু কাল্পনিক এবং খেয়ালী বস্তু– এ বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের মনেও এ সব প্রশ্ন জাগে। অথবা এ বিশ্ব নিজে নিজেই 'না' থেকে এমনিতেই 'হাঁ'-তে এসেছে, অথবা এ বিশ্ব চিরন্তন। কাজেই এটা পয়দা হওয়া বা শুরু হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না, অথবা এর কোনো স্রষ্টা আছে– এ প্রশ্নও আসে না।

প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে, আমাদের সামনে যে জটিলতা রয়েছে, তা একমাত্র অনুভূতির পর্যায়েই বিরাজ করছে। এ বিষয়ে আমাদের অনুভূতি হচ্ছে, এ বিশ্ব যখন বাস্তবে এসেছে এবং আমরা নিজেদের চোখে একে দেখতে পাচ্ছি, তখন এটা শুধু ধারণা-কল্পনার বস্তু নয় এবং বাস্তবতার কোনো প্রতিচ্ছবিও এটা নয়। আমাদের সাথে প্রকৃতি বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনস এই বিষয়ে একমত।(১) এদের মত হচ্ছে এ বিশ্বের বাস্তব কোনো অস্তিত্বই নাই। এটা আমাদের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত কিছু খেয়ালী চিত্র ছাড়া আর কিছু নয়। স্বভাবতই এই মতকে কেন্দ্র করে আমরা বলতে পারি, আমরা একটা খেয়ালী বিশ্বে বসবাস করছি। যেমন, এই যে অসংখ্য উটের ওপর আমরা সওয়ার হয়ে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করি এবং এগুলোকে স্পর্শ করি, ধরে নিতে হবে যে এগুলো সবই কল্পনা এবং যারা এগুলোতে আরোহণ করি, তারা সবাই খেয়ালী মানুষ। এরপর যে নদী-নালা আমরা পার হই– এগুলোর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নাই এবং পুলের ওপর দিয়ে যে চলাফেরা করা হয়– এগুলো কোনো বস্তু নয় .... শেষ অবধি।

–এসবই হচ্ছে খেয়ালী রায় বা পাগলের প্রলাপ– এ নিয়ে আলোচনা করা বা তর্ক-বিতর্ক করার কোনো প্রয়োজন নাই।

---

(১) এই জেমস জীনস হচ্ছেন প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং আধুনিক কালের একজন অংকবিদও বটে। তিনি 'রহস্যময় প্রকৃতি' পুস্তকটির লেখক– বা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত একমাত্র তিনিই ব্যক্ত করেছেন তা নয়, বরং ইতিপূর্বে প্লেটোও তাঁর দর্শনে একথাটা বলেছেন। অতপর বিভিন্ন দর্শন-গবেষণাগারে প্রায় দেড়শত বছর ধরে এ বিষয়ের ওপর চিন্তা-ভাবনা চলেছে। এ বিষয়ে আদর্শবাদী প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীলদের মধ্যে বিতর্ক চলেছে এবং তারা ঐকমত্যে আসতে পারেননি!

দ্বিতীয় মত হচ্ছে, বক্তা এখানে এই মহাবিশ্ব নিজেই। তার মধ্যে বস্তু রয়েছে এবং আছে বিরাজমান শক্তি। এ বিশ্ব অস্তিত্বে এসেছে সম্পূর্ণ 'না' থেকে। এ বিশ্ব তার পূর্ব অবস্থা থেকে কোনো দুর্বলতা বা বেওকুফীর কারণে বর্তমান অবস্থায় আসেনি। বা বর্তমান অবস্থায় আসার ব্যাপারে সে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। অথবা অস্তিত্বে আসার ব্যাপারে কারো সাথে কোনো আলোচনা করার দরকারও মনে করেনি।

তৃতীয় মত হচ্ছে, একদল লোক মনে করে যে, এ বিশ্ব চিরন্তন, এর কোনো শুরু নাই বা শুরুর কোনো প্রশ্নই আসে না।(১) এরা ঐ মতের সাথে শরীকদার, যারা বিশ্বের স্রষ্টা একজন আছেন- একথা বিশ্বাস করে। এ দলটি অবিনশ্বরবাদীদের একটা শাখা। এমতাবস্থায় আমরা হয়তো এই মরণশীল বিশ্ব সম্পর্কে চিরন্তনবাদীদের সাথে সুর মিলিয়ে একে চিরন্তন বলব। অথবা আমরা বিশ্ব সম্পর্কে বলব যে, এর ওপর সেই চিরন্তন মওলার মালিকানা সদা প্রতিষ্ঠিত- যিনি সৃষ্টি করেছেন। আর এ দুটি চিন্তার যে কোনো একটি গ্রহণ করায় কোনো জটিলতা নাই। সুতরাং তৃতীয় কিছু ভাবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু উত্তাপ নিরূপণকারী ডায়নামার আইন এ কথা জানায় যে, বিশ্বের তাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। আর অবশ্যই এটা হবে।(২) এইভাবে কমতে কমতে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন সীমা থেকেও নেমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তাপশূন্য মাত্রায় পৌঁছে যাবে। আর সেই দিনই বিশ্বের গতিশক্তি খতম হয়ে যাবে, যার ফলে তার বেঁচে থাকা হয়ে যাবে অসম্ভব। এ অবস্থা একদিন আসবেই, এর থেকে রেহাই পাওয়ার কারও কোনো উপায় নাই। যেহেতু তাপহীন বিন্দুতে পৌঁছানোর পর এক সময় আসবে, যখন সকল গ্রহ-উপগ্রহ ঠান্ডা হয়ে যাবে। ধার করা আলো সম্পন্ন জোতিষ্ক সূর্য, জ্বলন্ত তারকারাজি এবং নানা প্রকার জীবজন্তুতে ভরা এ পৃথিবী- সব কিছু এ কথাই প্রকাশ করছে যে, গোটা বিশ্ব একটি নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু ঘটনার মধ্যে এটা অবশ্যই একটি ঘটনা মাত্র। আর এর অর্থ হচ্ছে সৃষ্টির মূলে অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন, যার কোনো শুরু নাই। মহাজ্ঞানী তিনি, তিনিই সকল জ্ঞানের আধার, এমন এক শক্তি যার কোনো সীমা-শেষ নাই। আর অবশ্যই সারা বিশ্ব তাঁরই হাতে সৃষ্টি।

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা, তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলতে আর কেউ নাই।

এটাই হচ্ছে সেই মূলনীতি, যার ওপর আল কোরআন দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র যাঁর নিরংকুশ আনুগত্য অবশ্যকরণীয়। বাদশাহী একমাত্র তাঁর- রবূবিয়্যাতের যতো বৈশিষ্ট আছে, যেমন শাসন-ক্ষমতা, প্রতিপালন, তাঁর মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তাঁর পরিচালক হওয়া- এসকল অর্থেই তিনি রব। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমাদের যিনি আল্লাহ, তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সকল কিছুর স্রষ্টা তিনি। অতএব তাঁরই ইবাদত নিরংকুশ গোলামী করো- মেনে চলো তাঁর যাবতীয় হুকুম বিনা দ্বিধায়, আর তিনি সব কিছুর ওপর দায়িত্বশীল, কর্ম নির্বাহক।'

---

(১) এটা হচ্ছে রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী একটা দলেরও মত। হিন্দু এবং বৌদ্ধদেরও মত এটাই

(২) তারা নিরূপক ডায়নামা দ্বারা ইংগিত পাওয়া যায় যে, দিনে দিনে তাপ অবশ্যই কমতে থাকবে- এটা কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। সুতরাং তাকে মোটেই নিশ্চিত মনে করা যায় না। বিশ্বের গতি-বিধি সম্পর্কে যারা চিন্তা করে, তারা অনুমান ভিত্তিক এ কল্পনা করে। আজকে যে কথাটা আন্দাজ করা হয়, আগামী কাল সেটা একেবারেই বদলে যায়। এটাই তো মানুষের জল্পনা-কল্পনার চিরন্তন এক রীতি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমরা ইসলাম ও ইসলাম প্রদর্শিত পথের সঠিকতা জানার জন্যে কখনও বিজ্ঞানের সাহায্য নেবো না, যা ইতিপূর্বে বারবার বলা হয়েছে, না ইসলামের সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞান দ্বারা সত্যায়িত করবো। বিজ্ঞানের এসব গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের দিকে তখনই তাকাবো, যখন দেখবো এগুলোর সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তথ্যের মিল রয়েছে............. জুলিয়ান হাক্সলের কথার গুরুত্ব যারা দেয়, তাদের মাবুদের কথাও এটাই।

গোটা মানব জাতির তিনিই একমাত্র পরিচালক। অবশ্য শুধু মানুষই নয়, বরং একইভাবে অন্যান্য সকল সৃষ্টিরও একমাত্র তিনিই পরিচালক, যেহেতু সবার স্রষ্টা একমাত্র তিনি। মূলনীতি আলোচনা হলো এই গুলোই হচ্ছে বর্তমান আলোচিত আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে জাহেলী যুগের মোশরেকরাও অস্বীকার করতো না। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর দাবী তারা বাস্তবে মানতে পারতো না। আর সে দাবী হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র মালিক। তাঁরই শাসন-ক্ষমতা মেনে নিয়ে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করতে হবে এবং তাঁর দেয়া জীবন পদ্ধতি অনুসারে জীবন যাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না– অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আইন মানা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কারো আইন মানা– এটা চলবে না।

আল্লাহর গুণের কিঞ্চিৎ বিবরণ

এরপর আসছে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার গুণাবলীর বিবরণ। তাঁর গুণাবলীর কথা চিন্তা করলে কাঁধ ও পাঁজরের হাড্ডিগুলো যেন দুমড়ে-মুষড়ে পড়তে চায়। কোনো মানুষের ভাষাও তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা যথাযথভাবে দিতে পারে না। সুতরাং বিনয়ের সাথে আমাদের ঐ সমস্ত গুণ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়াস পরিহার করা দরকার। তবে তাঁর সৃষ্টির যে সব দৃশ্য আমাদের সামনে ভেসে রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আমরা তাঁর শক্তি-ক্ষমতার যে সব চমৎকার নিদর্শন দেখতে পাই, তাই আমাদেরকে তৃপ্ত করে, নিশ্চিন্ত করে দেয় আমাদের মনকে এবং অন্তরে এনে দেয় প্রশান্তির বারিধারা, যেহেতু এসবের মধ্যেই আমরা দেখি তাঁর নূরের ঝলক। তাই এরশাদ হচ্ছে,

(মানবীয়) দৃষ্টিগুলো তাঁকে দেখতে পায় না, অবশ্য তিনি (সকল) চোখগুলোকে দেখেন। আর তিনিই সুক্ষদর্শী এবং সব বস্তু সম্পর্কে খবর রাখেন।

নিশ্চয়ই যারা সকল প্রকার সাধারণ বস্তুর মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে চায়, তারা হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি, যারা তাঁকে জানার জন্যে অতি নগণ্য জিনিস থেকে বস্তুগত প্রমাণ পেতে চায়। ওরা এবং ঐ অর্বাচীনরা যা বলে আসলে তা পায় না এবং তা পাবেও না।

মানুষের চোখ, অনুভূতি ও মানসিক গ্রহণ-শক্তি অতি দুর্বল, ...এসব ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে এমনই দুর্বল ও অক্ষম করে রাখা হয়েছে যে, এই সৃষ্টির মধ্যে যে কর্মতৎপরতা ও সঞ্চালন-শক্তি রয়েছে, সেইগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করেই তারা কোনো কিছুকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করতে পারে এবং এই ভাবেই তারা পৃথিবীতে খেলাফতের (আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর আল্লাহ তায়ালাকে অনুভব করার জন্যে বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট যে অজস্র জিনিস রয়েছে তাই যথেষ্ট। তবে স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সরাসরি দেখার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। কারণ নশ্বর দেহ-বিশিষ্ট প্রাণীকে অবিনশ্বর স্রষ্টার দর্শন পাওয়ার শক্তি দেয়া যেতে পারে না। তাছাড়া মালিকের প্রতিনিধিদের জন্যে মালিককে দেখা কোনো জরুরী বিষয় নয়। খেলাফত এমন এক দায়িত্ব বা পেশা, যার হক যদি কেউ আদায় করতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে এবং যে কাজ তাকে দেয়া হয়েছে, তা পালন করার যোগ্যতাও তাকে দেয়া হবে।

প্রাচীনকালে যারা শেরক করতো তাদের মধ্যে কিছু সরলতাও ছিলো– এটা মানুষ বুঝতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যারা বিজ্ঞান চর্চা করে, পন্ডিত হয়েছে বলে মনে করে, তাদের দাম্ভিকতা বুঝা মুশকিল। কারণ যে সব জিনিস নিয়ে তারা দম্ভ করে, তা তাদেরকে সাময়িকভাবে দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের কে কতোটুকু নিজ চোখে দেখেছে? বুকে হাত দিয়ে তারা বলুক, এই যে অণু-পরমাণু, বিদ্যুৎ, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা বলে, এগুলোর কোনোটাকেই কি

তারা দেখেছে? কখনই তারা এগুলোর কোনোটাকে সারা যিন্দেগীতেও দেখেনি। তারপরও তারা মনে করে, তারা সৃষ্টির অনেক কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। তাদের এ দম্ভ কি প্রকৃতপক্ষে সত্য? বরং তারা নিজেরাই প্রাকৃতিক বিষয়াদির কাছে অসহায়। তারা ধরে নেয় যে, অমুক অমুক জিনিসের ওপর তারা নিয়ন্ত্রণ রাখে। এটা সত্য হলে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো; কিন্তু কেউ তা পারে না । বরং যখন এসব বিপদ আসে, তখন এ সবের কাছে সে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে যায়। তারা তাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করে এসব বিপদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্যে সর্ব প্রকার প্রস্তুতিও নিতে, কিন্তু তাই হয়- যা রব্বুল আলামীন-এর মনযুর হয়। এতদসত্ত্বেও যখন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়, এবং বিশ্ব-প্রকৃতির বুকে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নিদর্শনের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে বলা হয়, তখন তারা সঠিক জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ ও সঠিক কোনো দিক-নির্দেশনা না থাকা সত্তেও নানা প্রকার বাজে তর্ক করতে থাকে। তারা চোখে দেখা যায় এই ধরনের নানা প্রকার বস্তুগত প্রমাণ দিতে চায়। ভাবখানা এই যে, তাদের এই অস্তিত্বই সব আর সকল বৈচিত্রসহ এই জীবন যেন দলীল হিসাবে যথেষ্ট নয়।

সমগ্র অস্তিত্বের পাতায় পাতায় এবং মানুষের মন-মগজের মধ্যে অতি সংগোপনে যে সব ভাবধারা এগিয়ে চলেছে, সে সবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার শক্তি-ক্ষমতার যে সব নির্দশন দেখা যায়, সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে আল কোরআনের ভাষণ এগিয়ে চলেছে। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অস্তিত্ব সম্পর্কেও মনের মধ্যে নিশ্চিন্ততা জাগে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'চোখগুলো তাঁকে দেখে না, বরং তিনিই দেখেন ঐসব চোখকে।' আর তিনিই সুক্ষ্মদর্শী এবং তিনিই সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখেন সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম বস্তু সম্পর্কে।'

মানুষের তৈরি কোনো অভিধান, এই ছোট্ট আয়াতটির মধ্যে যে ব্যাখ্যা ব্যক্ত হয়েছে, তা দিতে পারে না। সেই প্রসংগেই আল্লাহ তায়ালার বাণী জানাচ্ছে, ...'অবশ্যই তোমাদের কাছে, তোমাদের চোখ খুলে দেয়ার মতো বহু নিদর্শন এসেছে। যে এগুলো খেয়াল করে দেখেছে, অবশ্যই এই দেখা তার নিজের উপকারে লেগেছে। আর যে দেখেও দেখে নাই, অন্ধ হয়ে থেকেছে সে তার নিজেরই ক্ষতি করেছে। এমতাবস্থায় আমি (এই আচরণের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি থেকে) বাঁচানেওয়ালা নই।'

এই যে কথাটা হচ্ছে, 'বাসায়ের' (চোখ খুলে দেয়ার মতো নিদর্শনাবলী)। এইসব নিদর্শনকে যে খেয়াল করে দেখে, তার যেমন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, তেমনি সে অপরকেও পথ দেখাতে পারে। আর এ বিশ্ব নিজেই চক্ষু উন্মীলনকারী, যা পথ দেখায়। এখন এসব নিদর্শন থেকে যে ব্যক্তি শিক্ষা নেয়, নিজের কল্যাণার্থেই সে এ শিক্ষা নেয়। সে এসব থেকে সঠিক পথের দিশা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে সত্য পথের আলো দেখতে পায়। আর বাইরে যা কিছু আছে, এগুলো যে দেখে না বা দেখতে চায় না, সে চোখ থাকতেও অন্ধ। এ নিদর্শনাবলী (বাসায়ের) এসে যাওয়ার পর একমাত্র অন্ধ ছাড়া অন্য কেউ পথহারা হয় না। এগুলো থেকে শিক্ষা যে না নেয়, তার অনুভূতি-শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেছে মনে করতে হবে। বন্ধ হয়ে গেছে চেতনা এবং চাপা পড়ে গেছে তার বিবেক।

নবী (স.)-কে সম্বোধন করে ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে যে, এসব দেখেও যারা সঠিক পথ গ্রহণ করবে না, ঈমান-ইসলামের পথে এগিয়ে আসবে না, তারা হবে পরিত্যক্ত। তাই কঠোর ভাষায় আল্লাহর তরফ থেকে আসা ঘোষণায় তাদেরকে বলা হয়েছে,

'আর আমি তোমাদের হেফাযতকারী নই।'

আমরা অবশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতি ফী-যিলালিল কোরআন-এর এই প্রসংগে এবং ইতিপূর্বেকার আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার গুণাবলী বুঝতে ব্যর্থ হই নাই। সেখানে

বলা হয়েছে, মানুষের চোখ তাঁকে দেখতে পায়না। বরং তিনি সকল মানুষের চোখকে দেখেন। ছোট থেকে আরও ছোট জিনিসের খবরও তিনি রাখেন। পরবর্তী আয়াতেই বলা হয়েছে, 'অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে চোখ খুলে দেয়ার মতো বহু নিদর্শন। অতএব, যে এসব নিদর্শন দেখবে নিজের উপকারের জন্যেই সে তা দেখবে। আর যে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্ধ হয়ে থাকবে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। এখানে চোখ ও চোখ উন্মীলনকারী এবং চোখ ও অন্ধ শব্দগুলো এক সুতায় গাঁথা। তাই সবার কাছ থেকে একই প্রকার খেদমত নেয়া হয়ে থাকে।

অবান্তর প্রশ্নের মুখে আল্লাহর পথে আহবানকারীরা

এরপর, আলোচনার গতি ফিরে যাচ্ছে রসূল (স.)-এর দিকে। বলা হচ্ছে, এসব আয়াতের ব্যবহার সম্পর্কে নবী (স.)-এর নিরক্ষরতার (যে অবস্থা, তার) সাথে করা হয়েছে, এই জ্ঞানগর্ভ আয়াতগুলোতে তার উল্লেখ যেন বে-মানান মনে হয়। অবশ্য, অপরদিকে এটাও বুঝা যায় যে, অবশ্যই এমন চমৎকার ভাষা ও জ্ঞানগর্ভ কথার উৎস বিশ্ব-প্রভু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এ কথা সেই বুঝবে যার চোখ আল্লাহর ইচ্ছায় খুলে যাবে। কিন্তু মোশরেকরা এই আয়াতগুলো ধৈর্য ধরে শুনতে পারেনি, যার কারণে তারা বলে উঠেছে, মোহাম্মদ এইসব বিশ্বাসগত কথা, বিশ্ব রহস্য সম্পর্কিত মূল্যবান এসব বাণী নিশ্চয়ই কোনো একজন আহলে কেতাবের সাথে থেকে পড়াশুনা করে শিখেছে। অথচ ওরা জানে না যে, আহলে কেতাবরা এসব বিষয় কিছুই জানে না যা মোহাম্মদ পেশ করছেন। শুধু তাই নয়, সারা দুনিয়ার অন্য কোনো ব্যক্তিই এসব কথার খবর রাখে না। আর কেউ এই দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছে বা রাখার চেষ্টা করেছে বলে কেউ জানেও না। আর রসূল (স.)-কে সেই সব জিনিস অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যা তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে। আর সেখানে মোশরেকদের থেকে তাঁকে মুখ ফিরিয়ে নিতেও বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর এমনি করে আমি মহান আল্লাহ বিস্তারিতভাবে আয়াতগুলো বর্ণনা করি। আর (আমি চাই) যেন ওরা বলে, 'তুমি পড়েছ'। (এসব আয়াত থেকে) আরও আমি জানাতে চাই সেই জাতিকে যারা জানে (জ্ঞানকে কাজে লাগায়)। তোমার কাছে তোমার রব-এর নিকট থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তুমি (আপোষহীনভাবে) তার অনুসরণ করো এবং মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। আর আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে ওরা শেরক করতো না। আর তোমাকে তাদের ওপর পাহাড়াদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি কার্যনির্বাহক হিসাবে ওদের জন্যে দায়ী নও।'

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে তাঁর আয়াতগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করছেন, যা অন্য কোনো আরব করেনি, বা কেউ এ দায়িত্ব বোধও করে নাই। কারণ, কোনো আরববাসীর আরবের সাধারণ অধিবাসীর ওপর এমন কোনো প্রভাব ছিলো না, যার বলে এইভাবে সে কথা বলতে পারতো, যেমন মোহাম্মদ (স.)-এর গোটা মানব জাতির জন্যে (প্রথম প্রথম) সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ছিলো না। এরপর দেখা যায় তখনকার ঐ এলাকার গোটা পরিবেশে সংঘর্ষশীল দুটি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এক ঃ যারা হেদায়াত পেতে চায় না, কোনো জ্ঞানের পথও অনুসরণ করতে চায় না এবং সত্য-সঠিক পথ পাওয়ার জন্যে কোনো চেষ্টাও করে না তাদেরকেই তুমি দেখতে পাবে যে, তারা এ মহান লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে শুধু কারণ তালাশ করবে যে, কোন দিকে এবং কেন মোহাম্মদ (স.) তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন। অথচ তারা তো ভাল ভাবেই জানে যে, তিনি তাদেরই একজন। আর যেটা সত্য বলে তারা জানে তবু সে ব্যাপারে বিরোধ করতে থাকবে। রেসালাত-এর পূর্বে বা পরে মোহাম্মদ (স.)-এর জীবনের কোনো একটা দিকও তাদের কাছে গোপন ছিলো না। কিন্তু তবু তারা বলতো, 'কোনো আহলে কেতাবের কাছে তুমি এগুলো পড়েছো

না? এবং তাদের কাছ থেকে তুমি শিখেছো না? অথচ আহলে কেতাবদের কেউ এসব বিষয়ে কিছুই জানতো না। আর আহলে কেতাবদের মধ্যে যে সব কেতাব বর্তমান ছিলো, সে সব তো তাদের সামনেই ছিলো, যেমন আজকে আমাদের সামনে সেগুলো বর্তমান রয়েছে। কিন্তু এসব কেতাব ও আল কোরআনের মধ্যে কতো বিরাট পার্থক্য তা যে কেউই জানে। তাদের কাছে যা কিছু আছে, তা কিছু বর্ণনামূলক কথা ও ঘটনাপঞ্জী মাত্র। এগুলো নবীদের ইতিহাসের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেখানে দেখা যায় রাজা-বাদশাহদের গল্প এবং এমন সব লোকের অলীক কল্প-কাহিনীর সমাবেশ, যাদেরকে কেউ চেনে না, জানে না। প্রাচীনকালের কেতাবগুলোর এই ছিলো বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগে যে কেতাবগুলো তারা দেখায় তা হচ্ছে নিউ টেষ্টামেন্ট বা। নতুন নিয়ম। এগুলো ঈসা মসীহ (আ.)-এর শিষ্যদের বর্ণিত কিছু কথা, যা ঈসা (আ.) -এর অন্তর্ধানের দশ বছর পরে রচিত হয়েছিলো। আবার সেগুলোও যেভাবে রচিত হয়েছিলো সেভাবে আজকে নাই। বহু শতাব্দী ব্যাপী সেগুলো পরিবর্তন হতে হতে আজ সেগুলো মূল অবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কখনও পরিবর্তন করা হয়েছে, কখনও করা হয়েছে পরিবর্ধন, আবার কখনও কিছু ভুল-ভ্রান্তিও তার মধ্যে এসে গেছে। এগুলো ঐ সময়ের আহলে কেতাবদের হাতে যা পাওয়া গেছে, তারই সমাহার। এমনি করে এগুলো পরিবর্তন হতেই থাকবে, যেহেতু এসব পরিবর্তনের পথ বন্ধ করার মতো কোনো রক্ষাকবচ নাই। তাহলে বলুন, আল কোরআনুল করীমের সাথে এগুলোর কোনো তুলনা হতে পারে কি? তবু ঐ জাহেলী যামানায় মোশরেকরা এইভাবে বলতো, আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আজকের প্রাচ্যবিদরা এবং যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তারাও এসব কথা বলে এবং বলে এসব নাকি এখন বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক কথা, নাকি তর্ক শাস্ত্রের কথা বা এগুলোই নাকি গবেষণালব্ধ সত্য, যা প্রাচ্যবাদীরা ছাড়া আর কেউ বুঝে না।

অতপর যারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান রাখে, তারা এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে সত্যের দিকেই এগিয়ে যায় এবং সত্যকে তারা চিনতে পারে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যাতে করে এ মহাগ্রন্থকে বর্ণনা করতে পারি সেই জাতির জন্যে, যারা জানে এবং জ্ঞানকে কাজে লাগায়।'

এরপর যারা সঠিক জ্ঞান রাখে এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তাদের এবং অন্ধ ও অজ্ঞান জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখানো হচ্ছে।

আর নবী করীম (স.)-এর নিকট সব থেকে বড় ও মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পেশ করা হচ্ছে এবং আল্লাহ পাক সমস্ত আয়াতকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। অতপর তিনি মানুষকে তাদের দৃষ্টিভংগি বিবেচনায় দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নবী (স.)-কে জানাচ্ছেন, তা হচ্ছে তিনি যেন (নিজে) তাই অনুসরণ করেন, যা তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে এবং মুখ ফিরিয়ে নেন মোশরেকদের থেকে। তাদের সাথে যেন ওঠা-বসা না করেন এবং যে সব বাজে কথা তারা বলাবলি করে তা নিয়ে যেন কোনো চর্চা না করেন। আর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলছে, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং তাঁকে নানা প্রকার কূট তর্কে লিপ্ত করার চেষ্টা করছে– এসবের মধ্যে তিনি যেন জড়িয়ে না পড়েন। তাঁর পথ হচ্ছে, তাঁর কাছে তাঁর রবের কাছ থেকে যা নাযিল হয়েছে, ব্যস, তিনি তারই অনুসরণ করবেন। তাঁর জীবন পরিচালিত হবে এই মূলনীতির ভিত্তিতেই এবং সেইভাবেই তা চলতে থাকবে এবং তাঁর অনুসারীরাও এইভাবেই জীবন যাপন করবে। এতে মোশরেকরা কী ভাবল, বা কী করল, সেগুলো তার দেখার দরকার নাই। তাঁর কাজ হচ্ছে আল্লাহর ওহীর অনুসরণ করা, যিনি ছাড়া চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক আর কেউ নাই। এতে কোনো গোলাম কী ভাবলো তাতে কী আসে-যায়?

'তোমার রব-এর পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ কর এবং মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।'

আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের জন্যে হেদায়াতপ্রাপ্তি বাধ্যতামূলক করতে চাইতেন, তাহলে অবশ্যই তা তিনি পারতেন। আর যদি একেবারে গোড়া থেকে তিনি চাইতেন যে, তারা সবাই হেদায়াত (সরল-সঠিক পথ) ছাড়া আর কিছুই চিনবে না, তাহলে তাই হতো, যেমন ফেরেশতাদের অবস্থা। কিন্তু পবিত্র আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত অথবা গোমরাহী– এ দুটি পথের যে কোনো একটি তারা পছন্দ করবে, তাই তারা নিতে পারবে–এই যোগ্যতা দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাদেরকে এই স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের পছন্দমতো পথ গ্রহণ করবে এবং সেই অনুযায়ী তার ফল পাবে। শুধু মাত্র বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তিনি এই নিয়ম চালু করে দিয়েছেন যে, যে সীমার মধ্যে তাদেরকে তিনি চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেই সীমার মধ্যেই তারা চলবে। কিন্তু মানুষকে হেদায়াত অথবা গোমরাহী– এ দুটির কোনো একটিকেও গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করেন নাই। তিনি এইভাবে বিশেষ এক হেকমত-এর ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, যা একমাত্র তিনিই জানেন এবং প্রত্যেকে বেঁচে থাকাকালীন নিজ নিজ সেই কাজ করবে, যা তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তায়ালাই জানেন কার কী যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তাহলে অবশ্যই ওরা শেরক করতো না।'

রসূলুল্লাহ (স.) তাদের কাজের জন্যে মোটেই দায়ী নন এবং তাদের অন্তরকে পরিবর্তন করার জন্যেও তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয় নাই। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র দিল পরিবর্তনকারী ও কর্মনির্বাহক।

'(হে রসূল) তোমাকে ওদের ওপর পাহারাদার নও। আর তুমি ওদের কর্ম-নির্বাহক নও।'

রসূলুল্লাহ (স.)-কে এইভাবে সকল কাজের কারণ ও তাঁর দায়িত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়ার পর তাঁর কর্মক্ষেত্র স্বচ্ছন্দ ও প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিলো। এইভাবে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বও তাঁকে আল্লাহ তায়ালা ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন – বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দাওয়াত দানকারীদের দায়িত্ব-সীমা প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি এলাকায় কোথায় কতোটুকু।

দ্বীনের দায়ীদের ঐ সব মানুষের অন্তর, আশা-আকাংখা ও কাজকে ধরে-বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করতে বলেননি (এবং এটা তিনি জায়েযও রাখেননি) যে, সব বিরোধীর কাছে অবশ্যই তারা দাওয়াত পৌঁছাবে। এ সব মানুষের অন্তর তো একমাত্র আল্লাহর হেদায়াতের আলোতেই উদ্ভাসিত হবে, হেদায়াতের যুক্তিপূর্ণ কথায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং ঈমানের সঞ্জীবনী সুধায় উজ্জীবিত হবে। হ্যাঁ, দাওয়াত দানকারীর কর্তব্য হচ্ছে, সে তার অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করবে দোষত্রুটিমুক্ত করবে, যারা শুনতে ও দাওয়াত কবুল করতে চাইবে, তাদের দিকে আন্তরিকতার সাথে মনোযোগ দেবে। হ্যাঁ, এই আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্যেই প্রয়োজন, যে দ্বীনকে তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, তার ভিত্তিতে তাদের গোটা অস্তিত্বকে গড়ে তুলবে, তাদের আকীদাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবে, ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের বুনিয়াদ রচনা করবে। দাওয়াত দানকারীর নিজের খাসলাত-চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সত্যপন্থীদের ছোট্ট একটি দল গড়তে হবে। আর এ সব কিছুর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে চরম প্রচেষ্টা, কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম এবং সার্বক্ষণিক সতর্কতা। আর অপর প্রান্তে উপবিষ্ট যারা, যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হচ্ছে, তারা যদি তাচ্ছিল্য করে এ মহান দাওয়াতকে, উপেক্ষা ও ঔদাসীন্যের মাধ্যমে যদি সত্যপ্রাপ্তির এ সুযোগ তারা হারায়, তাহলে তাদের জন্যেও সমুচিত প্রতিদান রয়েছে। তারপর হক পথের প্রসার ঘটবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ব্যবস্থা ও নিয়ম চালু করে দেবেন। আর তখনই সত্যকে বাতিলের ওপর বিজয়ী করে দেবেন এবং তখন মিথ্যা ও মিথ্যার ধ্বজাধারীদের ময়দান ছেড়ে পালাতে হবে।

সত্য পথ ও সত্যপন্থীদের কাজ হচ্ছে সমমনা লোকদেরকে খুঁজে বের করা। যখন সত্যকে তার পরিপূর্ণ সুন্দর রূপে একবার জনগণের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে, তখন মিথ্যা ব্যবস্থার কদর্যতা ও অকল্যাণকারিতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং এইভাবে তার কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

শালীনভাবে মোশরেকদের পরিত্যাগ করো

এর সাথে রসূলুল্লাহ (স.) মোশরেকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে এবং তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সম্পর্কচ্ছেদ হবে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মর্যাদাপূর্ণভাবে এবং সুন্দরভাবে যা মোমেনদের মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ। মোমেনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মোশরেকদের দেব-দেবীদেরকে গালিগালাজ না করে। কারণ এতে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সঠিকভাবে না বুঝার কারণে তারাও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালাকেই গালি দিয়ে বসবে। ফলে ওদের দেব-দেবীদের নিন্দা-মন্দ বলাটাই আল্লাহর প্রতি নিন্দার কারণ হয়ে যাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ওরা (সাহায্যের জন্যে) ডাকে, তাদেরকে গালি দিয়ো না। তার ফল দাঁড়াবে এই যে, ওরা না জানার কারণে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। এমনি করে আমি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের কাজকে সুন্দর করে দিয়েছি। তারপর তারা তাদের রব-এর ফিরে যাবে, তখন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সব বিষয়ে যা ওরা পৃথিবীর বুকে করত।

মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে, সে যা করে, তা ভালো মনে করেই করে এবং এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ভালো কিছু করলে তাকেই ভাল মনে করে এবং তার বিরুদ্ধাচারীদেরকে প্রতিরোধ করতে চায় এবং মন্দ করলেও অনুরূপভাবে তাকেই ভালো মনে করে এবং তার বিরোধীদেরকে প্রতিরোধ করতে চায়। তবে সঠিক পথে কাজ করলে তাকে সে ভালোই জানে আর ভুল পথে কাজ করলেও সেটাকে সে ভালোই জানে। এটাই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি। আর ওরাই তো আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিলো, যদিও তারা জানতো ও মানতো যে, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা ও সকল কিছুর রেযেকদাতা। তবু মুসলিমরা ওদের মাবুদদের গালি দিলে তারা ক্ষেপে যেতো এবং ভীষণ শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতো, যেহেতু তাদের মাবুদদের প্রতি তারা ভক্তি-শ্রদ্ধার আকীদায় ভরপুর ছিলো। যেহেতু, তাদের পূজা-অর্চনা করাকে তারা পছন্দ করতো, তাই তার ধ্যান-ধারণা ও কার্যকলাপও অনুসরণের ব্যাপারে জাহেলী বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ছিলো। .... সুতরাং মোমেনদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা যে অবস্থায় আছে, তার ওপর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া।

'তারপর তাদের (আসল) রব-এর কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন-স্থল আর তখনই তিনি তাদেরকে তাদের অতীতের সকল কাজ সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।'

এটাই মোমেনদের জন্যে উপযুক্ত ব্যবহার এবং তাদের মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ আদব, যেহেতু সে তার নিজ দ্বীন-এর ওপর টিকে থেকে সে নিশ্চিন্ত। যে হকের ওপর সে টিকে আছে, তার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তার অন্তর তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করছে। সে জানে যে, এর বাইরে চলে যাওয়াতে তার কোনো ফায়দা নাই। সুতরাং ওদের মাবুদদেরকে গালি দেয়ায় তার নিজের বা তার দ্বীন-এর জন্যে কোনো উপকার হবে না, বরং উল্টা ক্ষতি হবে– ওরা যখন আল্লাহকে গালি দেবে, তখন কষ্ট লাগবে। আর তার নিজের গালিই শেষোক্ত গালির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং মোমেনদের এটা কখনও করা উচিত নয় এবং এটা তাদের মর্যাদারও খেলাফ কাজ। এতে মোশরেকেরা শেরক ত্যাগ করবে না, বরং তাদের বিদ্বেষ আরও বাড়বে। অপরদিকে মোমেনদেরও এই আচরণের মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই, বরং এই আচরণ তাদেরকে এমন কিছু শুনতে বাধ্য করবে, যা তাদের ভাল লাগবে না এবং তা হবে মোশরেকদের পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে গালি।

পরিশেষে, এ দারসটি এখানে শেষ হতে চলেছে, যার মধ্যে গোটা সৃষ্টিকুলের ওপর আলোচনা এসেছে। মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়ের ওপর কথা বলতে গিয়ে সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাত-দিন প্রতি মুহূর্তের অবস্থাকেই তুলে ধরা হয়েছে মহান আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ। এ দারস শেষ করতে গিয়ে মোশরেকদের প্রসংগ তুলে বলা হচ্ছে যে, তারা বলে, যদি তাদের সামনে আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ কোনো অলৌকিক ঘটনা বা কাজ দেখানো হতো, তাহলে তারা অবশ্যই ঈমান আনতো। তারা সেই প্রকারের অলৌকিক ঘটনা (মোজেযা) দাবী করতো, যেমন পূর্ববর্তী নবী-রসূলদেরকে দেয়া হয়েছিলো। এ ব্যাপারটা ছিলো এমন যে, এসব কথা শুনে কোনো কোনো ঈমানদাররাও রসূল (স.)-কে অনুরূপ মোজেযা দেখানোর পরামর্শ দিচ্ছিলো। বলছিলো, তিনি যেন আল্লাহকে বলেন, পূর্ববর্তী রসূলদেরকে যে সব অলৌকিক ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো, তাঁকেও যেন ঐ রকম কিছু দেয়া হয়। এর জবাবে মোমেনদেরকে চূড়ান্ত কথা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এসব হচ্ছে মিথ্যাবাদী কাফেরদের হীন প্রকৃতি– ওরা কিছুতেই ঈমান আনবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা অত্যন্ত কঠিন ভাবে কসম খেয়ে বলে যে, যদি ঐ রকম মোজেযা দেখানো হয়, তাহলে অবশ্যই তারা ঈমান আনবে। (হে রসূল!) বলে দাও নিদর্শনাবলী সবই আল্লাহর কাছে রয়েছে। জেনে রেখো, ওদের দাবী অনুযায়ী যদি মোজেযা দেখানোও হয়, তবু ওরা ঈমান আনবে না। আমি ওদের অন্তর এবং ওদের চোখগুলোকে তেমনি করে ঘুরিয়ে দেবো যেমন তারা পূর্বে ঈমান আনে নাই এবং তাদেরকে তাদের অহংকার ও বিদ্রোহাত্মক কাজের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেবো। আর আমি যদি ওদের কাছে ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃত ব্যক্তিরাও যদি ওদের সাথে কথা বলতো এবং ওদের দাবী অনুযায়ী সব কিছুই তাদের নিকট একত্রিত করে দিতাম, তাহলেও ওরা ঈমান আনতো না। তবে যদি কারও বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা চান যে, সে ঈমান আনবে, তবে সে ভিন্ন কথা। আসলে ওদের অধিকাংশই জেহালতের মধ্যে ডুবে রয়েছে'।

গোটা সৃষ্টির বুকে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলী দেখেও যে অন্তর ঈমান আনে না, বিশ্বাস করে না এই মহান বিস্ময়ে ভরা ধরাধামের নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ এ মহান কেতাবের ওপর, আর মানুষের মধ্যে এবং দিগন্ত বলয়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা অজস্র নিদর্শনাবলী দেখেও যে অন্তরে আল্লাহর দিকে ছুটে যাওয়ার প্রেরণা আসে না এবং তাঁর মেহেরবানী পাওয়ার আকাংখা জাগে না, সে হৃদয়ের দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহর তরফ থেকে মোমেনদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে মোজেযা দেখালেই তারা ঈমান এনে ফেলবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের আসল অবস্থা জানেন। তিনি ঐ সব মিথ্যাবাদী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তাদের নাফরমানী ও অহংকারের মধ্যে থেকে বিভ্রান্ত হয়ে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন ঐ সব মিথ্যারোপকারীর উচিত সাজা হওয়া প্রয়োজন, যেমন করে তিনি এও জানেন যে, তারা সত্যের ডাকে সাড়া দেবে না, কিছুতেই তারা সাড়া দেবে না, এমনকি তাদের দাবী অনুযায়ী তাদের কাছে যদি ফেরেশতাদেরকেও পাঠানো হয়, অথবা তাদের কাছে যদি মৃত ব্যক্তিরা উঠে এসেও কথা বলতে থাকে, তবু তারা সাড়া দেবে না– যেমন এ দাবীও তারা করেছিলো।

আর যদি সৃষ্টির সকল কিছু একত্রিত হয়ে এসেও তাদের সামনে হাযির হয় এবং ঈমানের দিকে আহবান জানায়, তবু তারা ঈমান আনবে না। তবে যদি কারও সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা (নিজেই) চান যে, সে ঈমান আনুক, তাহলে সে ভিন্ন কথা। তবে এই হঠকারীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা চাইবেন না যে, তারা ঈমান আনুক, যেহেতু ওরা আল্লাহর পথে আসার জন্যে কোনো প্রকার চেষ্টাই করে না এবং ওরা চায় না যে, আল্লাহ তায়ালা ওদের হেদায়াত করেন। আর এই সত্যটিকেই মানুষ তাদের অন্তরের মধ্যে ভুলে যায়।

অবশ্যই যারা গোমরাহীর মধ্যে থাকা পছন্দ করে, সত্যকে তালাশ করে না এবং সত্যকে পাওয়ার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা-সাধনাও করে না, তাদের ভ্রান্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই কম করবেন না এবং তাদের সামনে সত্যের পক্ষে যতো দলীল প্রমাণই থাকুক না কেন, তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না, গ্রহণ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরের ওপর এনে দেবেন এক মহাবিপদ, তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অকেজো করে দেবেন এবং তাদের বিবেককে করে দেবেন অবরুদ্ধ।

আর হেদায়াত হচ্ছে একটি পুরস্কার। তারাই এ পুরস্কার পায়, যারা এর জন্যে মনোযোগী হয় এবং যারা এ প্রতিদান পাওয়ার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা করে।

৮ম পারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা

এ পারা দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমাংশে রয়েছে সূরা আনয়ামের শেষাংশ। এ সূরার প্রথমাংশ ৭ম পারায় অতিক্রান্ত হয়েছে। ৮ম পারার দ্বিতীয় অংশ জুড়ে রয়েছে সূরা আরাফের প্রথমাংশ।

সূরা আনয়ামের পরিচিতি দেয়া হয়েছে ৭ম পারায়। ৮ম পারার তাফসীর অধ্যয়নকারীদের জন্যে ওই পরিচিতি এখানে সংক্ষেপে পুনরালোচিত হলো। আর সূরা আরাফের পরিচিতি যথাস্থানে আলোচিত হবে।

সূরা আনয়ামের শেষাংশের আলোচ্য বিষয় কী, তাও ৭ম পারায় সূরার পরিচিতিতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে,

সামগ্রিকভাবে 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব' এ সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রাকৃতিক জগতে, সামাজিক জীবনে, মনমানসিকতায়, বিবেকবুদ্ধিতে, দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের অজানা অচেনা পরিমন্ডলে, অতীত জাতিসমূহের মৃত্যুর ঘটনাবলীতে এবং তাদের উত্তরসূরীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে আল্লাহর এই সার্বভৌমত্বের অভিব্যক্তি ঘটে। অনুরূপভাবে, বিশ্ব প্রকৃতি, তার ঘটনাবলী, তার দুঃখ দুর্বিপাকের বর্ণনা এবং তার বাস্তব দৃশ্যাবলীও আল্লাহর নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য জীবনের ওপর আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লক্ষণগুলোর ভেতর দিয়ে এবং মানুষের বাস্তব ও সম্ভাব্য অবস্থার মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। সর্বোপরি, এ সূরা কেয়ামতের দৃশ্য এবং কেয়ামতের দিন মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সামনে তাঁর বান্দাদের আনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্য বর্ণনা করার মধ্য দিয়েও ফুটিয়ে তোলে দোর্দন্ড প্রতাপ বিশ্ব সম্রাট আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্বের চিত্র।

এভাবেই সূরাটি মানুষের মনকে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করায় ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠের মুক্ত প্রান্তরে ও মহাশূন্যের অসীম দিগন্তে। এই সমস্ত আলোচনায় সে কোরআনের মক্কী সূরাগুলোর বাচনভংগি অনুসরণ করে। এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

এ সূরা আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো মতবাদ আলোচনা করে না বা অদৃশ্য জগত সংক্রান্ত কোনো দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে মন মগয ও চিন্তা চেতনাকে ভারাক্রান্ত করে না। এ সূরা মানুষের কাছে সাবলীল ভাষায় তার সত্যিকার প্রতিপালকের পরিচয় তুলে ধরে, যাতে করে সে এই পরিচয়ের মাধ্যমে মানব জাতিকে তাদের সত্যিকার প্রতিপালকের অনুগত গোলাম হয়ে থাকতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাদের বিবেক ও আত্মাকে তাদের চেষ্টা সাধনা ও কর্মতৎপরতাকে, তাদের চেতনা ও ঐতিহ্যকে এবং তাদের সমগ্র বাস্তব ও কর্মময় জীবনকে আসমান ও যমীনের একক ও অদ্বিতীয় সম্রাট আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার অনুগত করে দিতে পারে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার গোটা আলোচনা সামগ্রিকভাবে এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসরমান। সূরার সাদামাঠা বক্তব্য এই যে, আল্লাহ একাই যখন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা,

রেযেকদাতা, মালিক এবং সর্বময় ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মুক্তির আধার, তিনিই যখন অজানা ও অদৃশ্য যাবতীয় রহস্যের একমাত্র সবজান্তা, দিন ও রাতকে এবং দৃষ্টি ও মনকে যখন তিনিই আপন ইচ্ছামতো আবর্তন করান, তখন বান্দাদের জীবনের ওপর একমাত্র তাঁরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও নিরংকুশ শাসন চলা উচিত, তিনি ছাড়া আর কারো অধিকার থাকতে পারে না তার বান্দাদের ওপর কোনো আদেশ ও নিষেধ জারী করার, কোনো আইন ও শাসন চাপিয়ে দেয়ার এবং কোনো জিনিসকে তার জন্যে হারাম বা হালাল তথা সিদ্ধ বা নিষিদ্ধ করার। কেননা এ কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে ইলাহসুলভ বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইলাহ (এবাদাত ও আনুগত্য লাভের যোগ্য এবং আইন ও শাসন জারী করার অধিকারী) নয় এবং ইলাহসুলভ ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও কর্তৃত্বের অধিকারীও নয়, যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা, জীবনদাতা ও জীবন সংহারক নয়, তিনি ছাড়া আর কেউ উপকারী ও অপকারী নয়, তিনি ছাড়া আর কেউ দাতাও নয়, বঞ্চনাকারীও নয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের বা অন্য কারো মংগল বা অমংগল সাধনকারী নয়, তাই তিনি ছাড়া আর কেউ বান্দার সর্বময় অভিভাবক, শাসক ও মনিব হবার যোগ্যও নয়। সূরা এই বিষয়ে অকাট্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করে সব রকমের সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটায়।

'সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটির সমাধান এই সূরা থেকে পাওয়া যায়, তাহলো আকাশ ও পৃথিবীসহ সমগ্র বিশ্ব লোকের' 'একক ও সর্বময় খোদা এবং তাঁর আনুগত্য ও গোলামীর' প্রশ্নটি। তবে তৎকালীন মুসলমানদের জীবনে এই বিরাট ও সর্বব্যাপী মূলনীতির বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে যে প্রেক্ষাপটটি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো, সেটি ছিলো জাহেলিয়াতের অধীনে বসবাসকারী আরব সমাজ কর্তৃক খাদ্য ও জীব জন্তুর ক্ষেত্রে হালাল হারামের বিধি রচনার ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগ এবং যবাই করা জন্তু, ক্ষেতের ফসল ও সন্তানাদির মধ্য থেকে নিজেদের ইচ্ছামত মান্নত মানার অধিকার প্রয়োগ। সূরার শেষ ভাগের ১১৮ থেকে ১২১ নং এবং ১৩৬ থেকে ১৪০ নং পর্যন্ত আয়াতগুলোতে এই প্রসংগ নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম জাতি ও তার আশপাশে বিরাজিত জাহেলী সমাজের জীবনের যে প্রেক্ষাপটে এ সূরা নাযিল হয়েছিলো, এটাই সেই প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বটা সেদিন সমাধানের অপেক্ষায় ছিলো, তা ছিলো সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও অধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্বের আড়ালে নিহিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটা ছিলো 'একক ও সর্বময় আল্লাহ এবং তাঁর আনুগত্য ও গোলামী' সংক্রান্ত। এ সমস্যার সমাধানে সমগ্র সূরা আনয়াম শুধু নয়, বরং কোরআনের সমগ্র মক্কী অংশই ব্যাপৃত। এমনকি কোরআনের মাদানী অংশেও যখনই শাসন ও আইন প্রণয়নের প্রসংগ এসেছে, তখন সেই অংশেও এ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে।

'পালিত পশু, যবাই করা পশু এবং মান্নতের ব্যাপারে জাহেলী সমাজের বিধিব্যবস্থা প্রসংগে এই সূরায় যে বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্তমূলক ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, তা ইসলামের স্বভাব প্রকৃতিতে বিদ্যমান আসল তত্ত্বটি মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়। সেই আসল তত্ত্বটি এই যে, মানব রচিত যে কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধিকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্বের পূর্ণ অনুগত হতে হবে। এই সার্বভৌমত্ব আল্লাহর তৈরী আইনে বিদ্যমান। তা না হলে সেই ক্ষুদ্র বিধিতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব লংঘিত হওয়ার কারণে গোটা বিধিটি ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহের শামিল বলে গণ্য হবে। পশু ও মান্নত সংক্রান্ত জাহেলী রসম রেওয়াযের বর্ণনা থেকেই সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকারের প্রসংগটি এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। শুধু আলোচিতই হয়নি, বরং তাকে আকীদা বিশ্বাসের সাথে অর্থাৎ প্রভুত্ব ও দাসত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসের সাথেও জড়িত করা হয়েছে এবং তাকে ঈমান ও কুফরের এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সমস্যার রূপ দেয়া

হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্তমূলক ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের কিছু নমুনা নিয়ে আমি সূরার এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে আলোচনা করবো। এ দ্বারা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আয়াতে বিষয়টির বিস্তারিত উল্লেখের তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই বিপুল সংখ্যক বিষয়ের সমাবেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম মানব জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বাইরে রাখা কেন এতো দূষণীয় মনে করে, তা সে যতো ক্ষুদ্র বা বড় ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক না কেন। কেনইবা সে জীবনের প্রতিটি বিষয়কে ইসলামের প্রধান মূলনীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে যুক্ত করে, তাও এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এমন একটা মৌলিক জিনিস, যা পৃথিবীতে ও সমগ্র বিশ্বজগতে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিয়ামক।

এই বিষয়টি মুসলিম জাতির জীবন এবং তাদের আশপাশের জাহেলী সমাজে উপস্থিত ছিলো ব্যাপকভাবে। সে জন্যেই তা এই সূরায় যথাযথ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে, যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিষয়টি আলোচ্য সূরার বাকী অংশেও স্থান পেয়েছে এবং তা নিয়ে আমি এই পারায় যথাস্থানে আলোচনা করবো। সূরার প্রথমাংশ জুড়ে প্রভুত্ব ও দাসত্ব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। অতপর তা এই বাস্তব প্রসংগে এসে শেষ হয়েছে। এখানে এসে এর সাথে সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রভুত্ব ও দাসত্বের সাথে জোরদার ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

কিছু কিছু খাদ্যকে হারাম ও কিছু কিছু খাদ্যকে হালাল ঘোষণা এবং ফসল, পশু ও সন্তানদের ব্যাপারে মান্নত মানা সংক্রান্ত জাহেলী রীতি ও ঐতিহ্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে সূরার এই অংশে সিদ্ধান্তমূলক ও উদ্দীপনামূলক বহু সংখ্যক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে, এগুলোকে ইসলামের তত্ত্ব ও তার মৌলিক নীতিমালার সাথে যুক্ত করা হয়েছে, এগুলোর ওপর বিরাট বিরাট ভূমিকা ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে এবং এ সব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গোটা মানব জীবনকে জাহেলিয়াতের আধিপত্যমুক্ত করা ও তাকে সর্বতোভাবে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের আওতাধীন করা ইসলামের দৃষ্টিতে কতো বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে এক পর্যায়ে এসে জানানো হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা জ্বিন ও মানব নির্বিশেষে তার সকল বান্দার ওপর পরিব্যাপ্ত। তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই মহা বিশ্বে অনেক কিছু সংঘটিত হয়, জ্বিন ও মানব বংশোদ্ভূত নবীর দুশমনদেরকে তিনি পর্যায়ক্রমে পতনের দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে অবকাশ দেন, যাতে তারা তাদের পাপাচারের পরিমাণ আরো বাড়াতে পারে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে তাদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে হেদায়াতের পথে চালিত করতে পারতেন, গোমরাহী থেকে ফেরাতে পারতেন, সত্য পথে পরিচালিত করে তাদের মন থেকে সকল সন্দেহ-সংশয় ও অস্থিরতা দূর করে দিতে পারতেন, অথবা রসূল (স.) ও মোমেনদেরকে উৎপীড়ন করা জোর করে বন্ধ করতে পারতেন, ফলে তারা আর তাদের সাথে শত্রুতা করতো না এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে পাপাচারে লিপ্ত হতো না। বস্তুত, আল্লাহর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করার কোনো ক্ষমতাই কাফেরদের থাকতো না যদি আল্লাহ তায়ালা তা চাইতেন। আল্লাহ তায়ালা নিজেই স্বেচ্ছায় তাদেরকে হেদায়াত ও গোমরাহীর যে কোনো একটা বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। অথচ তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে। (আয়াত ১১২-১১৩)

সুতরাং যখন প্রমাণিত হলো যে, জ্বিন ও মানুষ বংশোদ্ভূত শয়তানদের পক্ষ থেকে রসূলদের শত্রুতা করাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড় দেয়া একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে এবং এই সমস্ত শয়তান, যাই কিছু করুক না কেন, তারা আল্লাহর মুঠোর মধ্যে রয়েছে, তখন রসূল (স.) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অর্থাৎ কোনো বিষয়েই কাউকে বিচারক হিসাবে মানতে রাযী হলেন না। কেননা এই সব খাদ্যবস্তু সম্পর্কে

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে বিচারক মানা সকল বিষয়ে বিচারক মানারই শামিল। আর এর সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ ছাড়া অন্যকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ, যা রসূল (স.) প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর বলা হয়েছে যে, এই শরীয়ত ও কেতাবের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রত্যক্ষ বক্তব্য প্রদান সমাপ্ত হয়ে গেছে। কাজেই এরপর আর কোনো মানুষের বিচার ফয়সালা মানা যাবে না। উপরন্তু রসূল (স.)-কে সাবধান করা হয়েছে যেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো মানুষের আনুগত্য করো না। কেননা অধিকাংশ মানুষ কেবল আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলে ও কাজ করে। তাদের কাছে কোনো নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস নেই। যে ব্যক্তি তাদের কথা শুনবে তার গোমরাহ হওয়া অবধারিত। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং কে পথভ্রষ্ট। এই সব কথা ভূমিকা হিসাবে বলার পর আদেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানরা যথার্থ মোমেন হলে তারা যেন কেবল আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে যবাই করা পশুর গোশত খায় এবং আল্লাহর নাম ছাড়া যবাই করা পশুর গোশত যেব না খায়। তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, কোনো কিছু হারাম বা হালাল করার ব্যাপারে তারা যেন শয়তানের বন্ধুদের অনুসরণ না করে। নচেত তারাও মোশরেক বলে গণ্য হবে। এই পর্বটি শেষ করা হয়েছে ঈমান ও কুফরের প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এবং কাফেররা যে সব জিনিস থেকে পাপ কাজের উৎসাহ পায় তার বিবরণের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

হে নবী তুমি বলো! আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক খুঁজবো?..... (আয়াত ১১৪ - ১২৪)

১২৫ আয়াত থেকে পুনরায় একই বিষয়ে বক্তব্য রাখা শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হেদায়াতপ্রাপ্তি এবং বিপথগামিতা দুটোই আল্লাহর পরিকল্পনা ও ফায়সালা অনুসারে হয়ে থাকে। উক্ত উভয় মানব গোষ্ঠী আল্লাহর মুঠোর মধ্যে অর্থাৎ কঠোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং তাঁর ইচ্ছা ও ফায়সালার আওতাধীনই চলে তাদের যাবতীয় তৎপরতা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যে বক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।.......' (আয়াত ১২৫)

১২৬ ও ১২৭ নং আয়াতে এই বলে উপসংহার টানা হয়েছে যে, যে সমস্ত আদেশ নিষেধ এবং যে আকীদা-বিশ্বাস ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা আল্লাহর সোজা ও সঠিক পথ। এ দ্বারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও অদৃষ্টে বিশ্বাসের নীতিমালাকে এক সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। এই উভয় জিনিসের সমন্বয়ে যে জিনিসটি গঠিত হয়, সেটাই আল্লাহর সিরাতুল মুস্তাকীম বা সোজা পথ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে এই সোজা পথেই চলার আদেশ দেন, যাতে তারা তাদের পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী আল্লাহর নির্মিত দারুস সালামে অর্থাৎ শান্তির ভবনে গিয়ে পৌছতে পারে। (আয়াত ১২৬-১২৭)

কিন্তু যবাই করা জন্তুর গোশত খাওয়া সংক্রান্ত আদেশ নিষেধ নিয়ে উপসংহার টানা ততোক্ষণ শেষ হবে না, যতক্ষণ এ ব্যাপারে মোমেনদের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত জ্বিন শয়তান ও মানব শয়তানদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা সম্পন্ন না হয়। এই শয়তানের গোষ্ঠী সর্বশক্তিমান ও পরিণাম সংক্রান্ত যাবতীয় ফয়সালার মালিক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। অনুরূপভাবে, নতুন উত্তরাধিকারীদের হাতে পৃথিবীর দায়িত্ব হস্তান্তর এবং যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করতে চান তাদেরকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রকাশ না করা পর্যন্ত এর উপসংহার টানা সম্পন্ন হতে পারে না। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে

পরীক্ষামূলকভাবে নিজের চলার পথ নিজেই নির্বাচন করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা যখন দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষুদ্র জীবন শেষ হওয়ার হুমকি দিয়ে নিজের প্রতাপ ও পরাক্রম প্রদর্শন করেন। এভাবে এই উপসংহার সম্পন্ন হয়। (আয়াত ১২৮-১৩৫)

মৌলিক আকীদা বিশ্বাস এবং দৃশ্যাবলী, নীতিমালা ও উদ্দীপনামূলক বক্তব্যের এই বিপুল সমাবেশ আল্লাহর ইচ্ছা, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব হৃদয় সংক্রান্ত তত্ত্বাবলীর এই বিবরণ, মানব জীবনের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়সমূহ এবং আকাশ ও পৃথিবীতে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে আর মানব জীবনের প্রকাশ্য ও গোপন অংশে আল্লাহর ক্ষমতা ও পরাক্রম সংক্রান্ত এই সর্বব্যাপী বিবরণসমূহের মধ্য দিয়ে কোরআন জাহেলিয়াতের হাজারো বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকে একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ যবাই করা কোন জন্তু খাওয়া যায় এবং কোন জন্তু খাওয়া যায় না, সে সংক্রান্ত জাহেলী রীতিকে প্রতিহত করতে চেয়েছে। কেন? কারণ এটা ইসলামের একটা মৌলিক বিষয় সার্বভৌমত্বের সাথে জড়িত। এই সার্বভৌমত্ব কার হবে? মহা বিশ্বের প্রভু ও প্রতিপালক যিনি তাঁর। এ জন্যেই এই সামান্য একটা শাখা বিধিকে কেন্দ্র করে এতো বিপুল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অবিকল এরূপ বিপুল আয়োজন করা হয়েছে ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানাদি মান্নত মানা সংক্রান্ত আর একটি জাহেলী রীতিকে কেন্দ্র করে।

জানা কথা যে, আরবের জাহেলী সমাজ আর যাই করুক, আল্লাহকে অস্বীকার অবশ্যই করতো না এবং তাঁর সাথে কাউকে তার সমমর্যাদা সম্পন্ন মেনে নিয়ে শরীকও করতো না। তার চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন কিছু বস্তু বা প্রাণীকে তাঁর সাথে শরীক মানতো। তারা বলতো যে, এই সব দেবদেবীকে তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করেই তাদের পূজা করে। তাদের বিশ্বাস যে, ওরা তাদেরকে আল্লাহর নিকবর্তী করে দেবে। এই উদ্দেশ্যেই তারা শেরক করতো এবং এজন্যেই তারা ছিলো মোশরেক।

তাদের শেরকের আর একটা দিক ছিলো এই যে, তাদের ধর্মীয় পুরোহিত ও যাজকরা তাদের জীবন যাপনের জন্যে মনগড়া আইন-কানুন, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য তৈরী করতো, অতপর দাবী করতো যে, এ সব আইন তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই বানিয়ে দিয়েছেন ও তা মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন। তারা এও দাবী করতো যে, তাদের হাতে আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে এবং তা প্রয়োগ করে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আওতার বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে আইন কানুন তৈরী করতে পারে। অবশ্য আজকের যুগের যে মোশরেকরা আল্লাহর অধীনতা স্বীকার করে না, তাদের বড়াই ও স্পর্ধার খবর তারা রাখতো না। তারাও এভাবেই শেরক করতো এবং মোশরেক বলে গণ্য হতো।

ক্ষেতের ফসল ও পালিত পশুকে দেব দেবীর উদ্দেশ্যে মান্নত মানা, তাদের বেদীতে বলি দেয়া, মনগড়া দেব দেবীর উদ্দেশ্যে সন্তানদেরকে মান্নত মানা, মেয়ে শিশুকে গোত্রীয় প্রথা অনুসারে হত্যা করা পশু ও ফসলকে এই মনে করে আটকে রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে চান সে ছাড়া ওগুলো খেতে পারবে না, অতপর তাদের ইচ্ছে মতোই কাউকে খাওয়ার যোগ্য মনোনীত করা, বিশেষ বিশেষ পশুকে সওয়ারীর অযোগ্য ঘোষণা করা, বিশেষ বিশেষ পশুকে আল্লাহর নামে যবাই নিষিদ্ধ করা এবং এই নিষেধাজ্ঞা স্বয়ং আল্লাহর বলে দাবী করা, বিশেষ বিশেষ পশুর গর্ভস্থ সন্তান মেয়েরা নয় শুধু পুরুষরা খেতে পারবে বলে ঘোষণা করা, একটিকে হালাল ও একটিকে হারাম বলে আখ্যায়িত করা, কিছু কিছু মৃত জন্তুকে আল্লাহর যবাই করা বলে হালাল ঘোষণা করা

এ সবই ছিলো জাহেলী যুগের জঘন্য শেরকী প্রথা। কোরআন এই সব ক'টি অপপ্রথার বিরুদ্ধে একটা জোরদার আক্রমণ চালিয়েছে। সমগ্র সূরা জুড়ে ঈমান ও শেরকের বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে, এখানেও সে সেই সব যুক্তি-প্রমাণের সমাবেশ ঘটিয়েছে। কেননা এখানেও সে কার্যকরভাবে একই শেরক ও ঈমানের বিষয়ের সম্মুখীন।

এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ বিষয়টি ইসলামেরই বিষয় এবং একই সাথে তা আকীদা বিশ্বাসের সাথেও সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত রীতিপ্রথাকে আসলে মোশরেকদের সামনে তাদের শরীকরাই সুশোভিত করে পেশ করেছে এবং এগুলোকে রচনা করে তারা তাদের জীবনকে ধ্বংস ও তাদের ধর্মকে সন্দেহ যুক্ত করতে চেয়েছে। ধর্মকে ভেজালযুক্ত করা ও জীবনকে ধ্বংস করা উভয়টি পরস্পরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর আইন ও শরীয়ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত। আর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের আইন সব সময়ই অস্পষ্ট এবং তাতে মানব জীবন ধ্বংসের ঝুঁকি রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এভাবে অনেক মোশরেকের জন্যে তাদের শরীকরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দেখিয়েছে, যাতে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে এবং তাদের ধর্মকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে।'

এখানে থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আইন ও শরীয়ত থেকে মানুষকে বিপথগামী করার এই অপচেষ্টার পেছনে শয়তানের হাত রয়েছে। প্রকাশ্য দুশমন শয়তান মোশরেকদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের দিকে চালিত করে। 'আল্লাহ তায়ালা যে জীবিকা দিয়েছেন তা খাও ....।'

এখান থেকে আরো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর শরীয়ত অগ্রাহ্য করে কোনো কিছুকে হালাল ও হারাম তথা বৈধ ও অবৈধ ঘোষণা করা এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা উভয়ই সমান ও অভিন্ন। এটাও এক ধরনের স্পষ্ট শেরক। এ ধরনের কোনো বিধি তৈরী করে দাবী করা যে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই হয়েছে, সকল যুগের মোশরেকদের রীতি। আসলে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষামূলকভাবে মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাই শেরকের ওপর তিনি কোনো জোর খাটান না, চাই তা যে ধরনের শেরকই হোক না কেন। শেরক এক ধরনের পরীক্ষা। তবে তারা কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মোশরেকরা বলবে, আল্লাহ চাইলে আমরা শেরক করতাম না..... আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত করে দিতেন।' (আয়াত ১৪৮-১৪৯)

এরপর আমরা দেখতে পাই, (১৫০ নং আয়াত) আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, তারা যে জিনিসকে হারাম ঘোষণা করে তা যে আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এসো। এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ তিনি সূরার শুরুতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য ইলাহ সম্পর্কেও দিয়েছেন। আসলে এই দুটো একই ধরনের জিনিস। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ইলাহ বা খোদাসুলভ সার্বভৌম ক্ষমতার আওতাভুক্ত জিনিস। (আয়াত নং ১৫০ দ্রষ্টব্য) এই আয়াতের শেষের 'ইয়াদিলুন' (স্বীয় প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার গণ্য করে) শব্দটি হুবহু এই সূরার প্রথম আয়াতেরও শেষ শব্দ। সেখানে এই শব্দটি ইলাহ সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। সূরার ভূমিকায় এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এই পর্বটি শেষ হয়েছে যে আয়াত দিয়ে, তার বক্তব্য হলো, ফসল, পশু ও সন্তানাদির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন সেইটেই সিরাতুল মুসতাকীম তথা সঠিক ও নির্ভুল পন্থা। অবিকল এই ধরনের উক্তি ইতিপূর্বে যবাই করা পশুর হালাল হারাম হওয়ার বিধান সংক্রান্ত আলোচনায়ও এসেছে। অনুরূপভাবে সূরার শুরুতে ইলাহ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগেও এসেছে।

সূরার ভূমিকা দেখুন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। ....' (আয়াত ১৫৩)

সূরার এ অংশটিতে অতপর মূসা (আ.) আনীত কেতাবের প্রসংগও আলোচিত হয়েছে। অতপর এই কেতাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের অনুসরণের জন্যে এই কেতাব আল কোরআনকে নাযিল করা হয়েছে এতে তাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। এ কেতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো কেউ যেন এমন ওজুহাত দিতে না পারে যে, কেতাব তো কেবল ইহুদী ও নাসারাদের কাছে এসেছিলো। আমাদের কাছে তো আল্লাহর আইন ও বিধান সম্বলিত কোনো কেতাব আসেনি, যাতে তারা বুঝতে পারবে কোনটা যথার্থ আল্লাহর আইন এবং কোনটা তাঁর নামে মিথ্যা ও মনগড়া মানব রচিত আইন।

এরপর যারা রসূল (স.)-এর আনীত বিধান অনুসরণ করে না, জাহেলী আইন ও রীতিনীতি অনুসরণ করে ও তাকে মিথ্যেমিথ্যি আল্লাহ রচিত আইন বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে এবং যারা অলৌকিক ঘটনাবলী দেখানোর দাবী জানায়, তাদেরকে এই বলে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, এই সব অলৌকিক ঘটনা যেদিন ঘটবে সেদিন আর কোনো কথা বলার অবকাশ থাকবে না এবং তার পর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। 'তারা কি এ জন্যেই অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসুক।' ..... (আয়াত ১৫৮)

এরপর রসূল (স.) তাঁর আনীত দ্বীন ও মুসলিম উম্মাহর সাথে যারা আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা না করে মনগড়া আইন প্রণয়ন করে, যা খুশী হালাল ও যা খুশী হারাম ঘোষণা করে এবং তাকে আল্লাহর আইন বলে প্রচার করে তাদের চূড়ান্ত সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যারা তাদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক নেই।' (আয়াত ১৫৯)

বাহ্যত খুটিনাটি বিধি বলে মনে হয়, এমন একটি প্রসংগ নিয়ে আল্লাহর গোটা বিধান ও তাঁর সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার শেষ পর্যায়ে গোটা দ্বীন ও তার আকীদাগত বিষয়সমূহ, হৃদয়ে ও বিবেকে প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং যে দ্বীন এই গোটা আকীদা ও আদর্শকে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপ দেয়, তার বিবরণ দিয়ে সূরার উপসংহার টানা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বলো, আল্লাহ আমাকে সরল ও সঠিক পথে চালিত করেছেন.... (আয়াত ১৬১ - ১৬৫)

এ হচ্ছে ইসলামের দুনিয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত সমগ্র আকীদা ও বিধি বিধানের সংক্ষিপ্তসার। জীবনে মরণে, কর্মে ও কর্মফলে, এবাদাতে এবং সামাজিক আচরণ ও লেনদেন, এক কথায় সর্ব বিষয়ে ইসলামের যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব থেকে শুরু করে দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত বিধি পর্যন্ত বিস্তৃত। কেননা এটা আল্লাহর বিধান এবং এর কর্মক্ষেত্র সর্বাধিক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এই হচ্ছে ইসলাম এবং একে এর মহান উৎস কোরআনে এভাবেই পেশ করা হয়েছে।

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

রুকু ১৪

১১১. (এমনকি) আমি যদি তাদের কাছে (আমার) ফেরেশ্তাদেরও পাঠিয়ে দেই এবং (কবর থেকে) মৃত ব্যক্তিরাও যদি (উঠে এসে) তাদের সাথে কথা বলে, কিংবা আমি যদি (দুনিয়ার) সমুদয় বস্তুও এনে তাদের ওপর জড়ো করে দেই, তবু এরা (কখনো) ঈমান আনবে না, অবশ্য (এদের কারো ব্যাপারে) যদি আল্লাহ তায়ালা (ভিন্ন কিছু) চান (তা আলাদা কথা। আসলে), এদের অধিকাংশ ব্যক্তিই মূর্খের আচরণ করে। ১১২. আমি এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্যে (যুগে যুগে কিছু কিছু) দুশমন বানিয়ে রেখেছি মানুষের মাঝ থেকে, (কিছু আবার) জ্বিনদের মাঝ থেকে, যারা প্রতারণা করার উদ্দেশে একে অন্যকে চমকপ্রদ কথা বলে, তোমার মালিক চাইলে তারা (অবশ্য এটা) করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, তারা যা পারে মিথ্যা রচনা করে বেড়াক! ১১৩. যারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে না, তাদের মন এর ফলে শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়ে, যাতে করে তারা তার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, (সর্বোপরি) তারা যেসব কুকর্ম চালিয়ে যেতে চায়, তাও এর ফলে নির্বিঘ্নে তারা চালিয়ে যেতে পারে।

তাফসীর
আয়াত ১১১-১১৩

'এমনকি আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম .... *(আয়াত ১১১-১১৩)*

প্রথম আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত অর্থাৎ ৭ম পারার শেষ আয়াতটির সাথে সম্পৃক্ত। আরবের মোশরেকরা রসূল (স.)-এর কাছে যে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাবলী দেখানোর দাবী জানাতো, আর বারবার কসম খেয়ে বলতো যে, ওই ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী দেখালে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো। তাদের এই সব কথা শুনে মুসলমানদের মনেও এরূপ ধারণা ও বাসনা জন্মাতো যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের দাবী মেনে নিতেন, তবে ভালো হতো। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা রসূল (স.)-এর কাছেও আবদার জানাতো যে, আপনি আল্লাহর কাছে ওদের দাবীগুলো মেনে নেয়ার জন্যে আবেদন জানান। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তাদের দাবী মেনে নিয়ে সব রকমের অলৌকিক কান্ড ঘটালেও তাঁরা ঈমান আনবে না। আয়াত ১০৯, ১১০ ও ১১১ মিলিয়ে এই জবাবটি তৈরি হয়েছে।

আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা

৭ম পারার শেষ ভাগে এই আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এই আয়াতগুলোর প্রধান প্রধান শিক্ষা তুলে ধরছি, যা সেখানে তাফসীর প্রসংগে আলোচনা করা হয়নি।

প্রথম শিক্ষা এই যে, ঈমান বা কুফর এবং হেদায়াত বা গোমরাহী সত্যের যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনের ওপর নির্ভর করে না। সত্য নিজেই একটা অকাট্য প্রমাণ। মানুষের বিবেক ও মনের ওপর সত্যের এতো প্রভাব রয়েছে যে, তা তাকে গ্রহণ করিয়ে শান্ত ও পরিতৃপ্ত করে দিতে সক্ষম। কিন্তু সত্য ও বিবেকের মাঝে অন্য কতকগুলো জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে ঐ বাধাগুলো সম্পর্কে বলেছেন,

'কে তোমাদের বুঝিয়ে দেবে যে, ওই সব জিনিস (অলৌকিক ঘটনা) যখন আসবে, তখনও তারা ঈমান আনবে না? তারা যেমন প্রথমে ঈমান আনেনি, তেমনি আমি তাদের মন ও দৃষ্টিকে আবর্তিত করি এবং তাদেরকে তাদের গোমরাহীর মধ্যে উদভ্রান্ত রেখে দেই।'

অর্থাৎ প্রথমবারের হেদায়াতের আহবানে তাদের সাড়া না দেয়ার পেছনে যে কারণ ছিলো, অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটার পরও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এবং তাদেরকে তা আবারও ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে।

বস্তুত প্রত্যেক মানুষের মনে যেমন ঈমানী প্রেরণা প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি সত্যের আহবানেও থাকে দুরন্ত আকর্ষণ। এর কোনোটিই বহিরাগত কার্যকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এজন্যে রুগ্ন মন ও বিবেকের চিকিৎসা করে তাকে বাধামুক্ত ও রোগমুক্ত করার চেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয় শিক্ষা: আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী শক্তি ও উপকরণ। আল্লাহর ইচ্ছার দাবী অনুসারে তিনি বান্দাদের প্রথম নির্বাচন ও প্রথম সাড়া দেয়ার স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। আর এই স্বাধীনতাকে মানুষের পরীক্ষার বিষয় হিসাবে স্থির করেছেন। যে ব্যক্তি এই স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে হেদায়াতের দিকে মনোনিবেশ করে, আগ্রহী হয় এবং তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়, সে যদি নাও জানে যে, হেদায়াত কোথায় আছে, তবু আল্লাহর ইচ্ছার দাবী হবে, তার হাত ধরে তাকে হেদায়াতের পথে এগিয়ে দেয়া এবং তাকে সাহায্য করা। আর যে ব্যক্তি এই স্বাধীনতাকে, হেদায়াতের আহবানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা এবং এর অন্তর্নিহিত যুক্তি-প্রমাণ ও প্রেরণাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছার দাবী হবে তাকে বিপথগামী করা, সত্যের পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং তাকে অন্ধকারে উদভ্রান্ত রেখে দেয়ার পক্ষে। আর আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা বান্দাকে প্রতি মুহূর্তে ঘিরে রাখে এবং সেটাই তার সর্বশেষ ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে। এই বিষয়টি আল্লাহ ১১০, ১১১, ১০৬, এবং ১১২ নং আয়াতে ব্যক্ত করেছেন।

উক্ত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটিরই প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল। তারা প্রথমে হেদায়াতের উপকরণগুলো গ্রহণ না করার কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়াত না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতাটুকু পরীক্ষা স্বরূপ দেয়া হবে এটাও আল্লাহরই ইচ্ছা ও ফয়সালা ছিলো। আবার হেদায়াতের জন্যে যারা সাধনা করে তাদেরকে হেদায়াত করা এবং গোমরাহীকে যারা বেছে নেয় তাদেরকে গোমরাহ করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও নীতি। এতে ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু নেই। আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালার অবাধ ও উন্মুক্ত অবস্থান এবং মানুষের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ প্রদত্ত সীমিত নির্বাচনী

স্বাধীনতার কোনো বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। (তিনি যদি হেদায়াতে আগ্রহী ব্যক্তির ওপর গোমরাহী ও গোমরাহীতে আগ্রহী ব্যক্তির ওপর হেদায়াত চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তবেই বিরোধ দেখা দিতো এবং যুলুম হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন সিদ্ধান্ত কখনো নেন না।– অনুবাদক)

তৃতীয় শিক্ষা: অনুগত ও অবাধ্য লোকেরা সমভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রতাপের কার্যকারিতা তাদের ওপর সমান। বান্দাদের পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর স্বীয় নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে ফয়সালা গ্রহণ ও ইচ্ছা না করলে তারা সবাই মিলেও কিছু ঘটাতে পারে না। মানুষকে যে সীমিত স্বাধীনতাটুকু তিনি দিয়েছেন, সেটা কাজে লাগিয়ে মোমেনরা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজেদের ইচ্ছার সমন্বয় ঘটায়। তাদের দেহে ও মন মগযে, তাদের শরীরের প্রতিটি কোষে, শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে এবং তাদের অংগপ্রত্যংগের গঠন সৌষ্ঠবে কার্যকর আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য শক্তির যে বাধ্যতামূলক আনুগত্য তাদের করতে হয়। আর আল্লাহর সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান, তাঁর হেদায়াতের আহবান ও প্রেরণার ভিত্তিতে যে স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যকে মোমেনরা নিজেদের জন্যে বাধ্যতামূলক আনুগত্যে পরিণত করে এই উভয় প্রকার আনুগত্য মোমেনদের জীবনে একীভূত হয়ে যায়। এতে তারা নিজেদের সত্ত্বার অভ্যন্তরে শান্তিময় জীবনের গ্যারান্টি লাভ করে। কেননা তাদের সত্ত্বার ভেতরে বাধ্যতামূলক আনুগত্য ও স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য একীভূত হয়ে একই প্রাকৃতিক ও নৈতিক নির্দেশ মেনে চলে, একই শক্তির অনুসরণ করে এবং একই সরকারের অধীন হয়। কিন্তু অন্যরা একদিকে আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মের বাধ্যতামূলক অনুসরণ করে। কেননা তা করতে তারা বাধ্য। শারীরিক গঠন প্রকৃতিতে ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণে প্রাকৃতিক নিয়মের আনুগত্য না করে তাদের কোনো উপায় থাকে না। অপরদিকে, যে দিকটাতে তাদেরকে খানিকটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সেখানে তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও পরাক্রমকে বুড়ো আংগুল দেখানোর ধৃষ্টতা দেখায়। সেখানে তারা আল্লাহর শরীয়তী বিধানকে অমান্য করে। তাদের একই ব্যক্তি সত্ত্বার অভ্যন্তরে এই দোমুখো নীতি চালু হওয়ার কারণে শুধুই তারা কষ্ট পায়। অথবা যতো অবাধ্যতাই করুক, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা যেতে পারে না, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে ব্যর্থ ও পরাভূত করার ক্ষমতা তাদের নেই, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা এক চুল পরিমাণও কোনো কিছু ঘটাতে পারে না।

সূরার অবশিষ্টাংশে এই তৃতীয় শিক্ষাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় ও ভংগিতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আমি আগেই বলেছি যে, সূরার যে অংশটি এই পারায় রয়েছে, তার পুরোটা জুড়েই রয়েছে মানুষের জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তথা আইনদাতা ও হুকুমদাতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা এবং তাঁর আইন ও বিধান সংক্রান্ত আলোচনা। এ জন্যে এখানে অত্যধিক গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে যে, শাসন ও বিচার ফয়সালার সর্বময় ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। এমনকি যারা আল্লাহর হুকুম ও বিধান মানে না, তাদেরও দৈহিক ও মানসিক সত্ত্বায় আল্লাহর ক্ষমতা কার্যকর রয়েছে। তারা আল্লাহর বন্ধুদেরকে পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কষ্ট দিতে পারে না। নিজেদের ওপরই যাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব নেই, মোমেনদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব হবে কোত্থেকে? বাধ্য ও অবাধ্য উভয় গোষ্ঠীকে আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছামত যেমন খুশী তৈরি করেন।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী ১১১ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মোহাম্মদ (স.)-কে বলেছেন, 'ওহে মোহাম্মদ, যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে নানা দেবদেবীকে

সমকক্ষ গন্য করে এবং তোমাকে বলে যে, তুমি একটা নিদর্শন দেখালে আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান আনবো, তাদের মুক্তির ব্যাপারে তো তুমি নিরাশ হয়ে গেছো। শোনো, আমি যদি তোমার নবুওত্তের প্রমাণ স্বরূপ ওদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাই এবং তারা তাদেরকে স্বচক্ষে দেখে, আর আমি যদি মৃত লোকদেরকে জীবিত করি এবং সেই মৃত লোকেরা জীবিত হয়ে তাদের সাথে কথা বলে, এবং তাদেরকে নিশ্চিত করে যে, তুমি যা বলো এবং যা তাদের কাছে বহন করে এনেছো, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, আর আমি যদি তাদের সামনে যাবতীয় জিনিস জড়ো করি এবং তা তোমার সামনে মুখোমুখি অবস্থান করে, তাহলেও তারা ঈমান আনবে না, তোমার কথায় বিশ্বাস করবে না এবং তোমাকে অনুসরণ করবে না। অবশ্য কারো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অন্য রকম ইচ্ছা করলে সেটা ভিন্ন কথা। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, অধিকাংশ মোশরেক এটা জানে না। তারা মনে করে যে, ঈমান ও কুফর তাদের মুঠোর মধ্যে। যখন ইচ্ছা ঈমান আনবে, যখন ইচ্ছা কুফরী করবে। অথচ আসলে তা নয়। ওটা সম্পূর্ণ আমার হাতে। আমি যাকে হেদায়াত করবো এবং হেদায়াত গ্রহণের শক্তি ও প্রেরণা দান করবো, সে ছাড়া কেউ ঈমান আনতে পারবে না। আর যাকে গোমরাহ করবো ও হেদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে দিবো, সে ছাড়া কেউ কাফের হবে না।'

এখানে ইবনে জারীর যে কথা বলেছেন, মূলনীতি হিসাবে তা সম্পূর্ণ সঠিক। তবে এর একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, যা আমি আগেই করেছি। আমি হেদায়াত ও গোমরাহী এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মানুষের চেষ্টা সংক্রান্ত কোরআনের আয়াতগুলো একত্রিত করে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি। আসলে আল্লাহর এই সৃষ্টিজগতে ঈমান ও গোমরাহী দুটোই এক একটা নতুন সৃষ্টি। আল্লাহর বরাদ্দ ও সৃষ্টিকর্ম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস যেমন সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি ঈমান এবং গোমরাহীও সৃষ্টি হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা কামারে বলেছেন, 'আমি প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।' এখন এই কোন নীতির ভিত্তিতে এই পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং কোন নীতির ভিত্তিতে কেউ ঈমান আনে এবং কেউ গোমরাহ হয়? এই নীতিটা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই আয়াতগুলোর মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ নির্দিষ্ট পরিমাণে ইচ্ছার স্বাধীনতার অধিকারী এবং এটা তার জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। সে যখন হেদায়াত লাভের ইচ্ছা করে এবং তার জন্যে চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত করেন, তার হেদায়াত সৃষ্টি হয় এবং তা আল্লাহর মঞ্জুরী অনুসারে কার্যকরী হয়। আর যখন গোমরাহীর ইচ্ছা করে এবং হেদায়াতকে অপছন্দ করে, তখন তিনি তাকে বিপদগামী করেন, তখন তার গোমরাহী জন্মলাভ করে এবং আল্লাহর মঞ্জুরী অনুসারে তা কার্যকর হয়। এই উভয় অবস্থায় বান্দা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে। তার জীবন আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা অনুযায়ী, তাঁর ফয়সালা ও মঞ্জুরী অনুসারে এবং তাঁর অবাধ ইচ্ছার সৃষ্ট নীতি অনুসারে চলতে থাকে।

জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান

এরপর সূরার দুটি আয়াত আসছে, এক হিসাবে এ দুটো আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক। আরেক হিসাবে তা শাসকসূলভ ক্ষমতা, আইন বিধান ও সার্বভৌমত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট আকীদাগত বিষয়গুলোর ভূমিকা স্বরূপ। এই আকীদাগত বিষয়গুলো এই সূরার বাকী অংশের পুরোটা জুড়ে বিস্তৃত। আয়াত দুটো হলো,

'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে একজন শয়তান নিয়োগ করেছি ...... (আয়াত ১১৩-১১৪)

'এভাবে'... অর্থাৎ যেভাবে আমি স্থির করেছি যে, যে সমস্ত মোশরেক অলৌকিক ঘটনাবলী দেখলে ঈমান আনবে বলে ঘোষণা করে এবং নিজের সত্ত্বায় ও পারিপার্শ্বিক জগতে হেদায়াতের এত প্রমাণ ও প্রেরণা বিদ্যমান থাকা সত্তেও তা উপেক্ষা করে, তাদের কাছে তাদের দাবীকৃত প্রতিটা অলৌকিক নির্দশন এসে গেলেও তারা ঈমান আনবে না, ঠিক তেমনিভাবে আমি এও স্থির করেছি যে, প্রত্যেক নবীর পেছনে জ্বিন ও মানুষ বংশোদ্ভূত শয়তানদের মধ্য থেকে শত্রু থাকবে, তারা রসূল ও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পরস্পরকে প্ররোচনা দেবে এবং এই প্ররোচনায় আখেরাতে অবিশ্বাসী লোকদের মনও প্ররোচিত হবে, আনন্দিত হবে, আর রসূল ও ইসলামের শত্রুতা এবং পৃথিবীতে অরাজকতা, দুর্নীতি ও গোমরাহী ছড়াবে।

এ সব কিছু শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা, ফয়সালা ও মঞ্জুরী অনুসারেই সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা পরস্পরকে প্ররোচনা দিতো না, এসব ছাড়াই আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতো এবং ইসলামের যে শত্রুতা সংঘটিত হয়েছে, তা সংঘটিত হওয়া ছাড়াই আল্লাহর ফয়সালা কার্যকরী হতো। বস্তুত এসবের কোনকিছুই নিছক কাকতালীয় ব্যাপার নয় কিংবা তা মানুষের ক্ষমতা বলেও সংঘটিত হয়নি।

যখন স্থির হলো যে, রসূলরা ও তাদের আনীত ইসলামের সাথে জ্বিন ও মানব বংশোদ্ভূত শয়তানদের ও তাদের বহণ করা বাতিল মতবাদের যে সংঘাত সংঘর্ষ বেধে গেছে তা কোনো দিনও থামবার নয়। সে সংঘাত সংঘর্ষ একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও মঞ্জুরী অনুসারেই বেধেছে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের উচিত পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে চলেছে, তার পেছনে আল্লাহর কী মহৎ উদ্দেশ্য হচ্ছে, তা বুঝতে চেষ্টা করা। আর এটাও তার বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে, পৃথিবীতে যা ঘটে চলেছে, তার ধরন ও প্রকৃতি কী এবং তার পেছনে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে তা কোথা থেকে এসেছে।

১১৩ নং আয়াতের প্রথমাংশের মর্মার্থ এই যে, আমার ইচ্ছা ও ফয়সালার ভিত্তিতেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শয়তানদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। শয়তান শব্দটার ধাতুমূল হলো 'শয়তানত্', যার অর্থ বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, উচ্ছৃংখলা, পথভ্রষ্টতা এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্যে নিবেদিত হয়ে যাওয়া। এ বৈশিষ্ট্যগুলো জ্বিন ও মানুষ উভয়ের মধ্যে থাকতে পারে। জ্বিনের মধ্যে এ দোষগুলো থাকলে যেমন তার নাম হয় শয়তান, তেমনি মানুষের মধ্যে থাকলেও তার নাম শয়তান হবে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অতিমাত্রায় থাকলে কখনো কখনো কোনো পশুকেও শয়তান বলা হয়। যেমন একটি আরবী প্রবাদে কালো কুকুরকে শয়তান বলা হয়েছে।

এই সব জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তান, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা স্থির করেছেন যে, তারা নবীদের দুশমন হবে, পরস্পরকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করে এবং একে অপরকে আল্লাহদ্রোহিতা, ভ্রষ্টতা ও পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষ শয়তানদের কর্মকান্ড কেমন তা আমরা বিলক্ষণ জানি। নবীদের, মোমেনদের ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা সর্বকালে সকলের কাছে সুবিদিত। যে কেউ ইচ্ছা করলে চোখ মেলে তাকালেই তা দেখতে পারে।

কিন্তু জ্বিন শয়তানরা এবং সমগ্র জিন জাতি আল্লাহর অদৃশ্য সৃষ্টিগুলোর অন্যতম। অদৃশ্য জ্ঞানের একমাত্র মালিক আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু আমাদেরকে জানিয়েছেন, ততোটুকু ছাড়া এদের সম্পর্কে এক কণাও আমাদের জানা নেই। যে সব মতবাদে মহাবিশ্বের কোথাও না কোথাও পৃথিবীতে বিদ্যমান মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী ও বস্তু ছাড়াও অন্যান্য ধরনের সৃষ্টিরও অস্তিত্ব থাকতে

পারে বলে মত ব্যক্ত করা হয়, তার আলোকে আমরা নীতিগতভাবে বলতে পারি যে, সেই সব অজানা ও অদেখা সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যা বলেন তা বিশ্বাস করি এবং যে চৌহদ্দীর মধ্যে তার অবস্থানের কথা বলেন, সেই চৌহদ্দীর মধ্যে তা স্বীকার করি। কিন্তু 'বিজ্ঞান'-এর দোহাই পেড়ে যারা আল্লাহর স্বীকৃত জিনিসগুলোকে অস্বীকার করে, তারা কোন যুক্তিতে ও কিসের ভিত্তিতে তা করে জানি না। মানবীয় ক্ষমতার আওতায় তারা যে বিজ্ঞানের অধিকারী হয়েছে, তাতো এমন দাবী করে না যে, তারা এই পৃথিবী নামক গ্রহের সব রকমের প্রাণীর সন্ধান পেয়ে গেছে। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে কী আছে না আছে, সে সম্পর্কেও তাদের 'বিজ্ঞান' অজ্ঞ। বিজ্ঞান শুধু এতোটুকু অনুমান করতে সক্ষম হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব আছে, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রে তার অস্তিত্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এমনকি তার অনুমানগুলো সঠিক প্রমাণিত হলেও সে আরো নানা ধরনের প্রাণ ও নানা জাতের প্রাণীর অস্তিত্ব মহাবিশ্বের অন্যান্য অংশেও থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করতে পারে না, যার সম্পর্কে এই বিজ্ঞানের হাতে বিন্দুমাত্র কোনো তথ্য নেই। 'বিজ্ঞানের' নামে এই ধরনের প্রাণী জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা নিছক ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়।

এবার জ্বিন নামক সৃষ্টির প্রসংগ আসা যাক। এর একাংশ ইবলিস ও তার বংশধর খারাপ ও অকল্যাণকর কাজে নিরংকুশভাবে নিয়োজিত। মানব জাতির মধ্যেও কেউ কেউ শয়তান সুলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও অতিমাত্রায় দুষ্কর্ম প্রবণ রয়েছে। জ্বিন নামক এই সৃষ্টির স্বভাব-প্রকৃতি ও চালচলন কেমন, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে পাওয়া নির্ভুল তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমরা এই নির্ভুল সূত্র থেকে এর সম্পর্কে যেটুকু জানি তাহলো, এই এরা আগুনের সৃষ্টি। তাদেরকে ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে এবং পৃথিবীর বাইরেও বসবাস করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত অঞ্চলে সে মানুষের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলতে সক্ষম। এদের মধ্যে মোমেন ও পরহেযগার এবং খোদাদ্রোহী শয়তান উভয় শ্রেণীর লোক রয়েছে। তারা মানুষকে দেখতে পায়, কিন্তু মানুষ তাদেরকে তাদের আসল আকৃতিতে দেখতে পায় না। মানুষকে দেখতে পায় কিন্তু মানুষের দৃষ্টির নাগালের বাইরে এমন কতো যে সৃষ্টি আছে, কে তার ইয়ত্তা রাখে। জ্বিন জাতির মধ্যে যারা শয়তান শ্রেণীর, তারা মানুষকে ধোকা দেয়া ও পথভ্রষ্ট করার কাজে নিয়োজিত। এ কাজটা তারা এমন এমন উপায়ে করতে সক্ষম যে, আমরাও তা জানি না। তবে যে সব মোমেন আল্লাহকে মনে রাখে, তাদের ওপর তাদের জোর চলে না। শয়তান মোমেনের সাথে লেগে থাকে বটে। কিন্তু মোমেন আল্লাহকে স্মরণ করলেই সে পালায় ও লুকায়। আর উদাসীন হলেই আবার ফিরে আসে ও কুপ্ররোচনা দেয়। আল্লাহকে স্মরণকারী মোমেন শয়তানের চক্রান্তের চেয়ে শক্তিশালী। শয়তান তার কাছে দুর্বল। কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে জ্বিনরাও হাযির হবে। হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হবে এবং মানুষের মতো বেহেশত ও দোযখের অধিবাসী হবে। ফেরেশতাদের চেয়ে জ্বিনরা দুর্বল ও অক্ষম।

আলোচ্য ১১৩ নং আয়াতের মাধ্যমে আমরা এই তথ্যটা জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রত্যেক নবীর জন্যে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের মধ্য থেকে শত্রু নিয়োগ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে এই শয়তানদের সকল অপতৎপরতা স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। তারা যাতে খোদাদ্রোহিতায়, সত্যদ্রোহিতায় ও অসৎ কর্মে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত না হয়, রসূলের শত্রুতা ও মোমেনদের ক্ষতি ও দুঃখ দুর্দশার কারণ না হতে পারে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত

করতে না পারে, সে ব্যবস্থা তিনি করতে পারতেন। তিনি তাদেরকে জোর করে হেদায়াতের পথে আনতে পারতেন, হেদায়াতের দিকে মনোযোগী হলে হেদায়াত করতে পারতেন এবং নবী, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা না করে তাদেরকে এতোটুকু স্বাধীনতা দিলেন, আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদেরকে নির্যাতন করার শক্তি দিলেন এবং ইসলামের দুশমনদের নির্যাতন দ্বারা নিজের প্রিয়জনদেরকে এবং নির্যাতনের ক্ষমতা দিয়ে দুশমনদেরকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মোদ্দা কথা এই যে; আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছাড়া তারা আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদেরকে কোনো রকম কষ্ট দিতে সক্ষম নয়। আল্লাহ তায়ালা এ একথাই বলেছেন এভাবে, 'আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা এ সব করতে পারতো না।'

এ আয়াতগুলো থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

প্রথম শিক্ষা এই যে, যারা নবীদের শত্রুতায় নিয়োজিত থাকে এবং নবীর অনুসারীদের ওপর যুলুম নির্যাতন চালায়, তারা শয়তান। তা সে জ্বিন জাতীয় শয়তান হোক কিংবা মানুষ জাতীয়। উভয় শ্রেণীর শয়তান একই কাজ করে। সে কাজ হলো, কুপ্ররোচনা দেয়া, ধোকা দেয়া, বিভ্রান্ত করা, খোদাদ্রোহিতা ও দর্মদ্রোহিতা করা, গোমরাহী জড়িয়ে থাকা এবং আল্লাহর প্রিয়জনদের শত্রুতা করা।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, এই শয়তান তাদের নিজস্ব শক্তি বলে নবীদের শত্রুতা ও তাদের অনুসারীদেরকে নির্যাতন করতে পারে না এবং করেও না। কেননা তারা আল্লাহর কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীন। এ দ্বারা আসলে তিনি তাঁর প্রিয়জনদেরকে পরীক্ষা করতে চান। এই পরীক্ষার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তাঁর এই প্রিয়জনদের ঈমানী দৃঢ়তা পরীক্ষা করা, তাদের অন্তরকে পবিত্র করা এবং যে সত্যের রক্ষক ও আমানতদার তাদেরকে বানানো হয়েছে সেই সত্যের ওপর তাদের ধৈর্য পরীক্ষা করা। পরীক্ষায় পাস করলেই পরীক্ষা বন্ধ করবেন এবং তাদের শত্রুদেরকে প্রতিহত করবেন। এই শত্রুরা তখন আর তাদেরকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও পরিমাণের অতিরিক্ত কষ্ট দিতে পারবে না। আল্লাহর দুশমনরা দুর্বল ও পরাজিত হবে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নির্যাতন করার দায় বহন করতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় শিক্ষা এই যে, আল্লাহর নির্ভেজাল প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার দাবী ছিলো এই যে, তিনি জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে শয়তানী করার ক্ষমতা দেবেন এবং তাদেরকে দেয়া ক্ষমতা ও স্বাধীনতার এই গন্ডির মধ্যে তাদেরকে পরীক্ষা করবেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তার প্রিয়জনদেরকে কষ্ট দেয়া ও নির্যাতন করার সুযোগ দেবেন এবং দেখবেন, তারা ধৈর্যধারণ করে কিনা, সত্যের ওপর অটল থাকে কিনা। এই ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চান এই জন্যে যে, বাতিল শক্তি তাদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী নিপীড়ন চালাতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা দেখতে চান যে, তারা আল্লাহর পথে নিজেদের জানমাল বিক্রির যে চুক্তি আল্লাহর সাথে করেছে, বিপদে-আপদে ও সুখে-শান্তিতে একইভাবে তার ওপর বহাল থাকে কিনা। নচেত এসব বিপদ-আপদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা তাদের ওপর থেকে সম্পূর্ণরূপে হটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহর ছিলো।

চতুর্থ শিক্ষা হলো, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের দুর্বলতা এবং তাদের চক্রান্ত ও নির্যাতনেরও ব্যর্থতা। একদিকে যেমন তারা নিজস্ব শক্তির বলে ঔদ্ধত্য দেখায় না, অপরদিকে তেমনি আল্লাহ তায়ালা যে সব ঘটনা তাদের হাতে ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন, তা তারা এড়িয়েও

যেতে পারে না। যে মোমেন জানে যে, তার প্রতিপালকই সব ক্ষমতার মালিক এবং সব কিছুর অনুমতি দানের অধিকারী, সে শয়তান গোষ্ঠীভুক্ত তার শত্রুদেরকে পরোয়া করে না। তা তাদের বাহ্যিক ক্ষমতা ও পরাক্রম যতোই বেশী হোক না কেন। এই দৃষ্টিভংগি থেকেই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'সুতরাং তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে অগ্রাহ্য করো।'

অর্থাৎ তাদের ও তাদের মিথ্যাচারের পরোয়া করো না, কেননা আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে সক্ষম এবং তাদের কর্মফল তাদের জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

শয়তান সৃষ্টির রহস্য

শয়তানদের পরীক্ষা ও মোমেনদের পরীক্ষা ছাড়া এর পেছনে আরো একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ স্থির করে রেখেছেন যে, তাঁর নবীদের বিরুদ্ধে এই শত্রুতা, শয়তানদের মধ্যে পরস্পরকে প্ররোচনাদানের এই অভিযান এবং এই পরস্পরকে প্রতারণার অপচেষ্টা চলবেই এবং তার পেছনে ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য থাকবে। সেই উদ্দেশ্য হলো,

'যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যাতে এদিকে আকৃষ্ট হয় ... (আয়াত ১১৩)

অর্থাৎ আখেরাতে যারা বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন এই সব প্রতারণাপূর্ণ ও প্ররোচনাপূর্ণ কথাবার্তা শ্রবণ করে। আখেরাতে অবিশ্বাসীরা তাদের যাবতীয় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে দুনিয়ার ওপর। অথচ তারা দেখতে পায় শয়তানরা প্রত্যেক নবীর পেছনে ওঁৎ পেতে আছে এবং নবীর অনুসারীকে কষ্ট দেয় ও নির্যাতন করে। তারা একে অপরের সামনে কথা ও কাজ সাজিয়ে পেশ করে। ফলে তারা শয়তানদের অনুগত হয় শয়তানদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথায় ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তারা অভিভূত হয়ে যায়। অতপর গুনাহ, না-ফরমানী ও দুষ্কৃতিতে ব্যাপকভাবে লিপ্ত হয়ে যায়। তাদের মন এদিকে আকৃষ্ট হওয়া ও পরস্পরকে প্ররোচনা দেয়াই এর কারণ।

এটাও আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ফল। পরীক্ষা করে যোগ্য লোক বাছাই করাই এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া প্রত্যেককে তার উপযুক্ত কাজ করার সুযোগ দান এবং তার যথোচিত কর্মফল প্রদানও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই প্রক্রিয়ার আরো উদ্দেশ্য হলো, প্রতিরোধের মাধ্যমে জীবনকে বিশুদ্ধ করা, সত্য ও বাতিলের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টির মাধ্যমে সত্যকে ভেজালমুক্ত করা, ধৈর্যের মাধ্যমে নিটল সততা সৃষ্টি করা, কেয়ামতের দিন শয়তানদের ওপর সমস্ত পাপের বোঝা অর্পণ করা এবং বন্ধু ও শত্রু নির্বিশেষে সকলের ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়িত করা। এটাই আল্লাহ তায়ালা চান এবং আল্লাহ তায়ালা যা চান তা সফল করেন।

জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের গোষ্ঠী একপক্ষ, নবীরা ও তাঁদের অনুসারীগণ দ্বিতীয় পক্ষ এবং আরেক দিকে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর কার্যকর ও অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত তৃতীয় পক্ষ– এই তিন পক্ষের মধ্যে সংঘটিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যে চিত্র কোরআন অংকন করে, আমি তার একটা সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করতে চাই।

এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে সারা বিশ্বের সমস্ত অসৎ ও দুষ্কৃতিপরায়ণ শক্তি তথা জ্বিন শয়তানরা ও মানুষ শয়তানরা ঐক্যবদ্ধ হয়। নবীদের বিরুদ্ধে ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে তারা পূর্ণ সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তারা যে কৌশল অনুসরণ ও যে উপায় উপকরণ ব্যবহার করে তা হলো এক কথায় 'পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করা ও পরস্পরকে আকর্ষণীয় কথা দ্বারা প্ররোচিত করা।'

অর্থাৎ ধোকা ও জালিয়াতের যাবতীয় কৌশল ও উপকরণ প্রয়োগ করা এবং একই সাথে একে অপরকে বিপথগামী করা। এটা হক ও সত্যের নিশানবাহীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে বাতিলপন্থী ও অসৎ লোকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য। শয়তানরা পরস্পরের মধ্যে গোমরাহীর জন্যে সাহায্য ও সহযোগিতার আদান প্রদান করে। তারা কখনো পরস্পরকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায় না। বরং সত্যের বিরুদ্ধে শত্রুতা, লড়াই ও দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলে।

তবে এই অপকৌশল ও চক্রান্তের ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আল্লাহর ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা তথা ভাগ্যের অক্টোপাসে তারা বন্দী। আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ছকের বাইরে এখানে শয়তানেরও কিছু করার নেই। তাই এ ষড়যন্ত্র যতো বড়ই হোক এবং সারা বিশ্বের অপশক্তিগুলো যতোই তার ওপর ঐক্যবদ্ধ হোক তা শৃংখলিত। তারা যা ইচ্ছে তা অবাধে করতে সক্ষম নয় এবং যাকে যেমন খুশী আঘাত হেনে পার পেয়ে যেতে পারে না। দুনিয়ার তাবৎ স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো তাদের উপাসনাকারী ও বন্দনাকারী মানুষদের মনে এই ধারণা ঢুকিয়ে ত্রাসের সঞ্চার করতে চায় যে, তারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, যাতে সবাই তাদের ইচ্ছাকে ও সিদ্ধান্তকে তোয়াজ করে ও ভয় পায়। তাদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত কখনো পুরোপুরি স্বাধীন ও লাগামহীন নয়। তার গর্দানে আল্লাহর ইচ্ছার শেকল পরানো রয়েছে। তাদের শক্তি আল্লাহ তায়ালাকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। আল্লাহ তায়ালা কেবল পরীক্ষার সীমার মধ্যে যতোটুকু নিপীড়ন তার প্রিয়জনদেরকে করার অনুমতি দেন, ততোটুকু ছাড়া তাদের আর কোনো ক্ষতি সাধন করতে কেউ সক্ষম নয়। আর এটুকুরও শেষ ফল আল্লাহর হাতে ন্যস্ত।

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে শয়তানী শক্তিগুলোর ঐক্যের যে দৃশ্য তুলে ধরা হলো, তা হকপন্থীদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বাতিল শক্তির ষড়যন্ত্র ও ঐক্যের স্বরূপ ও তার উপায় উপকরণগুলো তাদের চিনে রাখা জরুরী। সেই সাথে শয়তানী শক্তির চক্রান্ত ও ঐক্য যে আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শৃংখলিত, সে কথা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হওয়া দরকার। যাতে তাদের মন দৃঢ় প্রত্যয়, সান্ত্বনা ও আশাবাদে উজ্জীবিত থাকে, তাদের হৃদয় ও দৃষ্টি যাতে আল্লাহর অপরাজেয় শক্তি, অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত ও বিশ্ব প্রকৃতিতে তাঁর আসল ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার কাছে আশান্বিত থাকে। যাতে তাদের বিবেক ও চেতনা শয়তানী শক্তিগুলোর ইচ্ছা অনিচ্ছার বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকে এবং প্রথমে নিজেদের মন মানসে ও বাস্তব জীবনে ও পরে পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা যেন বেপরোয়া ও আপোষহীনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। শয়তানদের চক্রান্ত ও শত্রুতা নিয়ে ভাবনার প্রয়োজন নেই। এ দুটো জিনিসকে আল্লাহর সর্বব্যাপী ইচ্ছা ও অপ্রতিরোধ্য সিদ্ধান্ত তথা অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো নিজেই বলেছেন,

'তোমার প্রতিপালক যদি চাইতেন তবে তারা এটা করতো না। কাজেই তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাচারকে অগ্রাহ্য করো।' (আয়াত ১১৪-১২৭)

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ط

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ط لَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ج وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾ فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ

عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ط وَإِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ

১১৪. (তুমি বলো,) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো ফয়সালাকারী সন্ধান করবো, অথচ তিনিই হচ্ছেন সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের কাছে সবিস্তারে কিতাব নাযিল করেছেন; (আগে) যাদের আমি আমার কিতাব দান করেছিলাম তারা জানে, তোমার মালিকের পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়েই এটা (আল কোরআন) নাযিল করা হয়েছে, অতএব তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১১৫. ন্যায় ও ইনসাফ (-এর আলোকে) তোমার মালিকের কথাগুলোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং তাঁর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১১৬. (হে মোহাম্মদ,) দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের কথা যদি তুমি মেনে চলো, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে; কেননা এরা নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই চলে, (অধিকাংশ ব্যাপারে) এরা মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছু বলেই না। ১১৭. তোমার মালিক নিসন্দেহে (এ কথা) ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হচ্ছে, (আবার) কে সঠিক পথের অনুসারী– তাও তিনি সম্যক অবগত রয়েছেন। ১১৮. যদি আল্লাহ তায়ালার আয়াতের ওপর তোমরা বিশ্বাস করো, তাহলে তোমরা (শুধু) সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) খাবে, যার ওপর (যবাই করার সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে। ১১৯. তোমাদের এ কি হয়েছে! তোমরা সেসব (জন্তুর গোশ্‌ত) কেন খাবে না, যার ওপর (যবাইর সময়) আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়েছে, (বিশেষ করে যখন) আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের ওপর কোন্ কোন্ বস্তু হারাম করেছেন– সে কথা অবশ্যই আলাদা যখন তোমাদের তার কাছে একান্ত বাধ্য (ও নিরুপায়) করা হয়। অধিকাংশ মানুষ সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো (মানুষকে)

عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ

বিপথে চালিত করে; নিসন্দেহে তোমার মালিক সীমালংঘনকারীদের ভালো করেই জানেন। ১২০. তোমরা প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, (বেঁচে থাকো) তার গোপন অংশ থেকেও; নিসন্দেহে যারা কোনো গুনাহ অর্জন করবে, তাদের কৃতকর্মের যথাযথ ফল তাদের প্রদান করা হবে। ১২১. (যবাইর সময়) যার ওপর আল্লাহ তায়ালার নাম নেয়া হয়নি, সে (জন্তুর গোশ্ত) তোমরা কখনো খাবে না, (কেননা) তা হচ্ছে জঘন্য গুনাহের কাজ; শয়তানের (কাজই হচ্ছে) তার সংগী-সাথীদের মনে প্ররোচনা দেয়া, যেন তারা তোমাদের সাথে (এ নিয়ে) ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো, তাহলে অবশ্যই তোমরা মোশরেক হয়ে পড়বে।

রুকু ১৫

১২২. যে ব্যক্তি (এক সময়) ছিলো মৃত, অতপর আমি তাকে জীবিত করলাম, (তদুপরি) তার জন্যে এমন এক আলোকবর্তিকাও আমি বানিয়ে দিলাম, যার আলো দিয়ে মানুষের সমাজে সে চলার (দিশা) পাচ্ছে, সে কি কখনো সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এমন অন্ধকারে (পড়ে) আছে, যেখান থেকে সে (কোনোক্রমেই) বেরিয়ে আসতে পারছে না; এভাবেই কাফেরদের জন্যে তাদের কর্মকাণ্ডকে শোভনীয় (ও সুখকর) বানিয়ে রাখা হয়েছে। ১২৩. এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার কিছু কিছু বড়ো অপরাধী নিযুক্ত করে রেখেছি, যেন তারা সেখানে (অন্যদের) ধোকা দিতে পারে; (আসলে) এসব কিছুর মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদেরই প্রতারিত করছে, অথচ তারা নিজেরা এ কথাটা মোটেই উপলব্ধি করতে পারছে না। ১২৪. তাদের কাছে যখনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আয়াত আসে তখন তারা বলে উঠে, আমরা এর ওপর কখনো ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না

نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٤﴾ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

আমাদেরও তাই দেয়া হয় যা আল্লাহর রসূলদের দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রেসালাত তিনি কোথায় রাখবেন; যারা এ অপরাধ করেছে তারা অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে অপমান ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে কেননা তারা আল্লাহ তায়ালার সাথে প্রতারণা করছিলো। ১২৫. আল্লাহ তায়ালা কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্যে খুলে দেন, (আবার) যাকে তিনি বিপথগামী করতে চান তার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, (তার পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা এমন কঠিন হয়) যেন কোনো একজন ব্যক্তি আকাশে চড়তে চাইছে; আর যারা (আল্লাহর ওপর) বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদের ওপর (অপমানজনক লাঞ্ছনা ও) নাপাকী ছেয়ে দেন। ১২৬. (মূলত) এটিই হচ্ছে তোমার মালিকের (দেখানো) সহজ সরল পথ; আমি অবশ্যই আমার আয়াতসমূহ উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্যে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। ১২৭. তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (তাদের) জন্যে শান্তির এক সুন্দর নিবাস, আল্লাহ তায়ালাই তাদের অভিভাবক, (দুনিয়ায়) তারা যা করতো এটা হচ্ছে তারই বিনিময়।

তাফসীর

আয়াত ১১৪-১২৭

এবার এখান থেকে শেষ পর্যন্ত সূরার অবশিষ্টাংশের প্রধান আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। এ বিষয়েরই ভূমিকা বিস্তৃত ছিলো গোটা সূরা জুড়ে। পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে ইসলামের সর্বপ্রধান আকীদা বিশ্লেষণ ও এই আকীদাকেন্দ্রিক সুদীর্ঘ লড়ায়ের বিবরণের মধ্য দিয়ে এর সর্বশেষ ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের মধ্যে ও নবীদের মধ্যে সংঘটিত লড়াইতে আল্লাহর মহাপ্রতাপান্বিত ক্ষমতার ভূমিকা বর্ণনা এবং হেদায়াত ও গোমরাহী সংক্রান্ত আল্লাহর নীতিমালা ও চিরস্থায়ী বিধান, যার আলোকে হেদায়াত ও গোমরাহী কার্যকর হয়ে থাকে, এসব কিছুর বিবরণ এবং ইতিপূর্বে আর যা যা আলোচনা করেছি, তার মধ্য দিয়ে এই অংশটির ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে।

এবার আমরা সেই বিষয়টির প্রসংগে আসছি, যার জন্যে উল্লেখিত যাবতীয় আলোচনা ভিত্তি হিসাবে বিরাজ করছে। এই বিষয়টি হলো আল্লাহর নাম নিয়ে ও আল্লাহর নাম ছাড়া যবাই করা জন্তুর বৈধতা ও অবৈধতা। ইসলামের সর্বপ্রধান মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই মূলনীতিটি হলো আল্লাহর নিরংকুশ ও সর্বাত্মক শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকার এবং এই অধিকারের দাবী করা বা কোনো না কোনো উপায়ে তা প্রয়োগ করা থেকে মানুষের সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। যেহেতু বিষয়টি এই মূলনীতির আওতাভুক্ত, তাই এই মূলনীতির বাস্তবায়ন বা লংঘনের কারণে ক্ষুদ্র জিনিসও বিরাট জিনিসে পরিণত হয়। বিষয়টি কোনো যবাই করা জন্তু খাওয়ার যোগ্য বা অযোগ্য হওয়া সংক্রান্ত কিনা, কিংবা কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা সংক্রান্ত কিনা, তাতে কিছু এসে যায় না।

নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়টি একই রকম। উভয়টির অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ তথা মাবুদ ও হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নিতে অথবা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

কোরআনের বর্ণনা ভংগির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, তা প্রত্যেকটি প্রসংগে এই মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এর ওপর অনেক বেশী জোর দেয়। ছোট কিংবা বড় যে কোনো ধরনের আইন প্রণয়নের জন্যে যেখানেই এ প্রসংগটি এসে পড়ে এই মূলনীতিটার পুনরাবৃত্তি করতে কখনো কুণ্ঠিত হয় না। কারণ এ মূলনীতিটাই হলো আসল আকীদা-বিশ্বাস, এটাই দ্বীন এবং এটাই ইসলাম। এর বাইরে যা কিছু আছে, তা খুঁটিনাটি বিধি বা নীতি মাত্র।

আমরা সূরার এই অংশে এবং এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত নানাভাবে এই মূলনীতির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। জাহেলী রীতিনীতি ও রসম-রেওয়াযের উল্লেখ প্রসংগে এ মূলনীতির উল্লেখ বারবার করা হয়েছে। আর ওই সমস্ত জাহেলী রীতিনীতি ও রসম রেওয়াযের সংযোগ রয়েছে শেরক ও ইসলাম বিমুখতার সাথে এবং ওই সমস্ত জাহেলী রীতিপ্রথার উদ্ভব ঘটেছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের প্রভুত্ব কায়েমের ধারণা থেকে। এজন্যেই কোরআন তার বিরুদ্ধে এত তীব্র ও এতো রকমারি আক্রমণ পরিচালনা করে থাকে এবং তাকে ইসলামের মৌল আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করে।

পরবর্তী আয়াত থেকে শুরু করা হয়েছে মানব জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের ওপর সার্বভৌমত্বের বিশ্লেষণ। এটি করা হয়েছে যবাই করা জন্তু জানোয়ারের কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম, সে ব্যাপারে আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে, তা স্থির করার জন্যে। কেননা এই ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা মোশরেকরাই প্রয়োগ করে থাকে। আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ ও তাঁর ক্ষমতায় অনধিকার হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যেই তারা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে আমরা এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ ভূমিকা দেখতে পাই। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করবো?' (১১৪, ১১৫, ১১৬ ও ১১৭ আয়াত দ্রষ্টব্য) এই ভূমিকার পুরোটাই মূল আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বেই এসেছে। অতপর একে প্রত্যক্ষভাবে ঈমান ও কুফরীর সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। যেমন,

'অতএব, যে জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা থেকে খাও.... (আয়াত ১১৮ - ১২০)

হালাল হারাম একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ার

ভূমিকার পর হালাল ও হারাম সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করার আগেই উক্ত দুটি বিষয়ের মাঝে অন্য কয়েকটি নির্দেশ ও মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোরদার ভাষায় আদেশ নিষেধ ও হুশিয়ারী ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর ১২১ আয়াতে পুনরায় হালাল হারামের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাকে সরাসরি ইসলাম ও শেরকের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, 'তোমরা খেয়ো না যে জানোয়ারের ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা থেকে..........' এরপর আবার ঈমান ও কুফর সম্পর্কে এমনভাবে নীতিগত কথাবার্তা বলা হয়েছে, যা দেখে হালাল ও হারাম ঘোষণা সংক্রান্ত নির্দেশের উপসংহার বলে মনে হয়।

এই ধারাবাহিক বিস্তৃত আলোচনা থেকে বুঝা যায় আইন প্রণয়ন ও সার্বভৌমত্ব এই দুটি জিনিসকে দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ডে কতো গুরুত্বপূর্ণ বলে ইসলাম মনে করে।

১১৪ আয়াতটি .... প্রকৃতপক্ষে রসূল (স.)-এর মুখ দিয়ে প্রশ্নের আকারে একটি অস্বীকৃতি ব্যক্ত করানো হয়েছে। জীবনের কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো বিচার ফয়সালা যে গ্রহণযোগ্য নয়, সেটাই এ প্রশ্নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেই সাথে ইতিবাচকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, বিচার ফয়সালা ও আইন প্রণয়নের সর্বময় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। আয়াতের প্রথমাংশে শুধু প্রশ্ন তুলেই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কি আমি বিচারক অনুসন্ধান করবো ....?'

পরক্ষণেই এই বিষয়ে আরো বিশদ বক্তব্য এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিচারক ও আইন প্রণেতা হিসাবে না মানার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কোনো বিষয়কেই অস্পষ্ট রাখেননি এবং বান্দাদেরকে অন্য কোনো উৎসের মুখাপেক্ষী বানিয়ে রাখেননি বা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে জীবন সমস্যার সমাধানদাতা হিসাবে মেনে নিতে হয় এমন অবস্থায়ও ঠেলে দেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অথচ তিনিই তোমাদের কাছে কেতাব নাযিল করেছেন বিস্তারিতভাবে ....'

প্রকৃতপক্ষে কোরআন নাযিল হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিলো এই যে, তা মানব জাতির মধ্যকার যাবতীয় মতভেদের নিরসন করে দেবে এবং তাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আল্লাহর ইলাহসুলভ গুণবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবে। এই কেতাব বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত। এতে আছে সেই মৌলিক নীতিমালার বিবরণ, যার ওপর গোটা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া এতে সেই সব বিষয়ের বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি আলোচনাও রয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, চাই তার অর্থনৈতিক, বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক স্তরে যতোই পার্থক্য থাক না কেন। এ জন্যে এই কেতাব নাযিল হওয়ার পর জীবনের কোনো ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো নির্দেশ, বিধান ও বিচার ফয়সালার প্রয়োজন থাকে না। এ হচ্ছে আল্লাহর এই কেতাব সম্পর্কে আল্লাহর নিজের বক্তব্য। এখন কেউ যদি বলতে চায় যে, মানব জাতি এই কেতাবে তার জীবনের সব সমস্যার সমাধান পায় না, তবে তা সে বলতে পারে। তবে সেই সাথে তাকে এ কথাও বলতে হবে যে, নাইযুবিল্লাহ, সে আল্লাহর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং সে আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকারকারী কাফের।

আরো একটি কারণ হচ্ছে, যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক ও আইন প্রণেতা হিসাবে মানা যায় না, সেটি এই যে, যারা ইতিপূর্বে আসমানী কেতাব পেয়েছে তারা জানে

যে, এ কেতাব আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আর স্বভাবতই তারা অন্যদের তুলনায় আসমানী কেতাব সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ। আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন,

'যাদেরকে আমি কেতাব দিয়েছি তারা জানে যে, এ কেতাব আল্লাহর কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে।'

মক্কায় ও আরব উপদ্বীপে এ যুক্তিটি অত্যন্ত লাগসই ছিলো। আহলে কেতাব স্বীকার করুক বা না করুক তারা যে জানতো এ কেতাব আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কথাটাই আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদেরকে জানিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহর কথা যে অকাট্য সত্য, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আজও ইহুদী খৃষ্টানরা জানে যে, এই কেতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ইসলামের সমস্ত শক্তির উৎসও এই কেতাব, আর জানে বলেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ লড়াই কখনো থামবার নয়। এ লড়াই-এর সবচেয়ে জঘন্য অধ্যায় হলো এই কেতাবের আইনের কাছ থেকে দেশ শাসনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তা মানব রচিত আইনের কাছে সোপর্দ করা এবং মানুষকে আইন প্রণেতা বানানো যাতে আল্লাহর কেতাব ও ইসলামের কোনো অস্তিত্ব না থাকে। এই লড়ায়ের মধ্য দিয়ে তারা সেই সব দেশে ইসলাম বিরোধী আইন ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে এক সময় শুধুমাত্র আল্লাহর কেতাব, আল্লাহর আইন ও শরীয়ত ও শুধুমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এই পরিবর্তনের পেছনে আহলে কেতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানদেরই ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিলো।

এই কেতাব আল্লাহর কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে এবং সে কথা ইহুদী খৃষ্টানদেরও জানা আছে একথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে বলছেন, 'অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' এ কথাটা রসূল (স.)-কে বলার সাথে সাথে মোমেনদেরকেও বলা হলো। আর এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এ কথাই বুঝানো হলো যে, সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ও অস্বীকার করা বা জেনে শুনে গোপন ও অস্বীকার করা কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। প্রথম দুটো মোশরেকদের এবং শেষের দুটো ইহুদী খৃষ্টানদের কাজ।

বস্তুত রসূল (স.) কখনো সন্দেহ পোষণ করেননি। হাদীসে আছে যে, যখন সূরা ইউনুসের এই আয়াতটি নাযিল হয় যে, 'তুমি যদি সন্দেহ পোষণ করো ... তাহলে আহলে কেতাবকে জিজ্ঞাসা করো ....। তখন রসূল (স.) তাৎক্ষণিকভাবে বললোন, 'আমি সন্দেহও পোষণ করি না, জিজ্ঞাসাও করবো না। ....'

তবে এ ধরনের নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম কী সাংঘাতিক রকমের বিরোধিতা প্রত্যাখ্যান, একগুঁয়েমি ও চক্রান্তের সম্মুখীন ছিলেন এবং এই নির্দেশ দ্বারা আল্লাহ রসূল (স.) ও মোমেনদের ওপর কত অনুগ্রহ করেছেন।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী অটল ও অকাট্য। তা কেউ বদলাতে পারবে না। তা সে যতো ষড়যন্ত্রই করুক। 'তোমার প্রভুর বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার দিক দিয়ে......'। (আয়াত ১১৫)

অর্থাৎ বর্ণনা হিসাবে আল্লাহর বাণী সত্য এবং আইন ও ফয়সালা হিসাবে তা ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী। তাই এর পরে আর কারো কোনো সুযোগ নেই কোনো আকীদা, আদর্শ, মতবাদ, মূল্যবোধ, মানদন্ড আইন কানুন বা রীতিনীতি প্রদানের। তার হুকুমকে কেউ প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে না।

'তিনি সর্বশ্রোতা, সবজ্ঞ।'

অর্থাৎ তাঁর বান্দাদের কথা শোনেন, কথার আড়ালে কী মনোভাব রয়েছে তা জানেন এবং তাদের জন্যে কী কী উপকারী তাও জানেন।

সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির অনুসরণ এক ধরনের গোমরাহী

আল্লাহর নাযিল করা কেতাবে যা কিছু আছে সবই নির্ভুল, এ কথা বলার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে যে, মানুষের প্রণীত সব কিছুই আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক এবং তার অনুসরণে গোমরাহী ছাড়া আর কোনো লাভ হয় না। নির্ভুল জ্ঞানের উৎস এই কেতাবের আলোকে মানুষ যা বলে তা ছাড়া মানুষের আর সবই বাতিল ও ভুল। রসূল (স.)-কে সতর্ক করা হয়েছে যেন তিনি মানুষের রচিত কোনো কিছুর অনুসরণ না করেন, যতোক্ষণ তা কোরআন ও ওহীভিত্তিক না হয়, চাই এ ধরনের মানব রচিত জিনিসের পক্ষে যতো বেশী জনসমর্থন থাক না কেন। জাহেলিয়াত জাহেলিয়াতই, চাই তার ভ্রষ্ট অনুসারীদের সংখ্যা যতোই হোক না কেন।

'তুমি যদি অধিকাংশ দুনিয়াবাসীর অনুসরণ করো, তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে.........। (আয়াত ১১৬)

তৎকালে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই জাহেলিয়াতপন্থী ছিলো। এ যুগেও প্রকৃত অবস্থা একই রকম। তারা তাদের জীবনের সকল ব্যাপারে শুধু আল্লাহর বিধানের অনুসারী হতে হবে- এ কথা মানতো না। আল্লাহর আইনকে তারা নিজেদের আইনে পরিণত করেনি। তাদের চিন্তাধারা ও জীবন ব্যবস্থাকে তারা আল্লাহর হেদায়াত ও নির্দেশ থেকে গ্রহণ করেনি। এ জন্যেই তারা জাহেলিয়াতের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলো এবং আজও আছে। যারা তাদের অনুসরণ করতো, তাদেরকে তারা বিপথগামীই করতো। তারা নির্ভুল জ্ঞান পরিত্যাগ করে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে চলতো। আর আন্দাজ অনুমান দ্বারা গোমরাহী ছাড়া আর কিছু কপালে জোটে না। আল্লাহ তায়ালা তাই রসূলকে তাদের অনুসরণ থেকে সতর্ক করেছেন। এটা করেছেন সামগ্রিক ভাবে। নচেত সে সময়ে এ আলোচনার উপলক্ষ ছিলো কিছু কিছু জন্তুকে হালাল ও কিছু কিছু জন্তুকে হারাম ঘোষণা করা। যেমন একটু পরেই এ বিষয়ে আলোচনা আসছে।

অতপর ১১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কে গোমরাহ, কে সুপথপ্রাপ্ত সেটার স্থির করার অধিকারী শুধু আল্লাহ। কেননা তিনিই বান্দাদের সঠিক অবস্থা জানেন এবং গোমরাহী ও হেদায়াত কী জিনিস তা তিনিই স্থির করেন,

'তোমার প্রভুই সবচেয়ে ভালো জানেন........ (আয়াত ১১৭)

সুতরাং মানুষ যাতে খেয়ালখুশীমত কাউকে গোমরাহ, কাউকে হেদায়াতপ্রাপ্ত না বলতে পারে, সে জন্যে তাদের আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, ধ্যান ধারণা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত স্থির করা ও রায় দেয়ার জন্যে একটা বিধির প্রয়োজন। কোনটা হক, কোনটা বাতিল , তা স্থির করতে হবে। তা ছাড়া এই সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মানদন্ড স্থাপনের একটা কর্তৃপক্ষ থাকা চাই এবং সেখান থেকেই বান্দাদের ও মূল্যবোধসমূহের মান নির্ণয়ের সুযোগ থাকা চাই। এখানে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, হেদায়াত ও গোমরাহী স্থির করার অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি বলবেন কে হেদায়াতপ্রাপ্ত, কে পথভ্রষ্ট। প্রচলিত পরিবর্তনশীল পরিভাষার আলোকে এ সব বিষয় নির্ণয় করার দায়িত্ব সমাজের ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি, মূল্যবোধ, নিয়ম বিধি নিত্য পরিবর্তনশীল। যেমন কৃষিভিত্তিক সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ এক রকম, শিল্পভিত্তিক সমাজের চরিত্র ও মূল্যবোধ অন্য রকম। অনুরূপ পুঁজিবাদী ও

সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চরিত্র ভিন্ন রকম, এমন কি এই সব সমাজের পরিভাষা অনুসারে মানুষের মূল্যবোধও পাল্টে যায়।

অথচ ইসলাম এই বিভিন্নতা স্বীকার করে না। সে যে মূল্যবোধ নির্ধারণ করে তা সকল সমাজে সর্বাবস্থায় বহাল থাকে। যে সমাজ এই মূল্যবোধ পরিত্যাগ করে তা ইসলামী নামধারী হলেও অনৈসলামী সমাজ, জাহেলী সমাজ এবং মোশরেক সমাজ। কেননা সে সমাজ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদেরকে তথা গায়রুল্লাহকে আল্লাহর নির্ধারিত মূল্যবোধ, আদর্শ, চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থা পাল্টানোর ক্ষমতা ও সুযোগ দেয়। সকল সমাজ, আখলাক ও মূল্যবোধকে ইসলাম মাত্র দুইভাগে বিভক্ত করে, ইসলামী ও অনৈসলামী, ইসলামী ও জাহেলী বা ইসলাম বিরোধী, চাই তার আকৃতি যতোই বিভিন্ন হোক না কেন।

জন্তু জানোয়ার যবেহ সংক্রান্ত আইন

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর জন্তু জানোয়ার সংক্রান্ত বিধি নিয়ে আলোচনা আসছে। এই বিধি উক্ত ভূমিকায় স্থির করে দেয়া হয়েছে।

'অতএব তোমরা খাও যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা থেকে....'(আয়াত ১১৮-১২১)

এই আয়াতগুলোতে যে সমস্ত আইনগত বিধি আলোচিত হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করার আগে এতে বর্ণিত মৌলিক আকীদাগত নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

এতে আল্লাহর নাম পাঠ বা উচ্চারণ করে যবাই করা হয়েছে এমন জন্তু খাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই পাঠ বা উচ্চারণ মানুষের মনকে স্থির ও দৃষ্টিভংগিকে নিয়ন্ত্রিত করে আর মানুষের ঈমানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই আদেশের অনুগত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

'অতএব, তোমরা খাও ..... ।' (আয়াত ১১৮)

এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যে সব জন্তুকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে, সেগুলোকে তো আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন, তথাপি তোমরা তা খাওনা কেন? তিনি তো হারাম খাদ্য কী কী তাও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, যা অনন্যোপায় অবস্থায় ছাড়া তোমরা খেতে পারো না? এ পর্যন্ত এসে আপাতত হালাল ও হারাম খাবার সম্পর্কে এবং তা খাওয়া ও না খাওয়া সম্পর্কে বক্তব্য শেষ হলো। ১১৯ আয়াতের প্রথমাংশ দেখুন,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা খাওনা ....'

আয়াতটির শেষাংশ তৎকালীন সমাজের একটা বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। সেটি এই যে, মোশরেকরা আল্লাহর হালাল করা জন্তুর গোশত খেতো না এবং তাঁর হারাম করা জন্তুর গোশত খেতো, আর দাবী করতো যে, এটাই আল্লাহর বিধান। আল্লাহর নামে এই সব মিথ্যা অপপ্রচারকারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, তারা কোনো কিছু না জেনে শুনে নিছক মনগড়া হালাল হারামের ফিরিস্তি দিয়ে থাকে, নিজেদের খেয়ালখুশীমতো আইন প্রণয়ন করে থাকে, তা দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করে এবং বান্দা হয়েও আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করে।

'আর অনেকেই নিজেদের খেয়ালখুশী দ্বারা মানুষকে গোমরাহ করে ....'

অতপর ১২০নং আয়াতে তাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় গুনাহকে পরিত্যাগ করার জন্যে। মনগড়া আদেশ নিষেধ দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করাও এর আওতাভুক্ত। যা আল্লাহর আইন নয় তাকে আল্লাহর আইন বলে ভাঁওতা দেয়ার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।

'পরিত্যাগ করো প্রকাশ্য গুনাহ ও গোপন গুনাহ ....'

অতপর ১২১ আয়াতে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে সেই সব জন্তুর গোশত খাওয়ার ওপর, যা আল্লাহর নাম নিয়ে নয় বরং বাতিল দেব দেবীর নামে যবাই করা হয় অথবা জুয়া বা লটারীর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হয়, আর মৃত জন্তুর গোশতের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, যার হারাম হওয়া নিয়ে তারা মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করে এবং দাবী করে যে, এগুলোকে আল্লাহ তায়ালাই যবাই করেছে। তারা বলতো যে, মুসলমানরা আল্লাহর যবাই করা জন্তু খায় না, অথচ নিজেদের যবাই করা জন্তু খায়। এ কেমন কথা? এটা আসলে একটা জঘন্য জাহেলী প্রথা। জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানরা এ ধরনের নিকৃষ্ট বিষয়ে মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করতে তাদেরকে প্ররোচিত করতো।

মানবরচিত আইন মানা সুস্পষ্ট শেরেক

'তোমরা খেওনা সেই সব জন্তু, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়নি .... আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই মোশরেক হবে।' (আয়াত ২১১)

শেষের এই বাক্যটি নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা এখানে প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণ বিষয়ে ইসলামের বিধি অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

কোরআনের এই বাক্যটিতে খুবই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে প্রণীত হয়নি এমন যে কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিধিতে কোনো মুসলমান যদি কোনো মানুষের আনুগত্য ও অনুসরণ করে তবে তা তাকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে মোশরেকে পরিণত করবে। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর বলেন,

'তোমরা যদি তাদের অনুসরণ করো, তবে তোমরা অবশ্যই মোশরেক।' আল্লাহর এই উক্তির অর্থ এই যে, তোমাদের জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত কোনো হুকুম বা আইনকে বাদ দিয়ে তোমরা যখন অন্য কারো হুকুম পালন করবে, তখন আল্লাহর হুকুমের ওপর অন্যের হুকুমকে স্থান দেয়া হবে। এটাই হচ্ছে শেরক। যেমন আল্লাহ বলেছেন, 'তারা তাদের ধর্মীয় নেতা ও সংসার ত্যাগীদেরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু মেনে নিয়েছে। .... ' এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, আদী বিন হাতেম রসূল (স.)-কে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা তো তাদের ধর্মীয় নেতা ও সংসার ত্যাগীদেরকে পূজা করে না। রসূল (স.) বললেন, অবশ্যই পূজা করে। ওই সব ধর্মীয় নেতা তাদের জন্যে আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল এবং আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম করে। আর তারা তাই মেনে নেয়, এই মেনে নেয়াই তাদেরকে পূজা করার শামিল।'

ইবনে কাসীর উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে সুদ্দীর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন,

'তারা মানুষের উপদেশ চাইতো, আর আল্লাহর কেতাবকে পেছনে ফেলে রাখতো। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তাদেরকে শুধু এক আল্লাহর এবাদাত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জিনিস নিষিদ্ধ করেন, তখন তা নিষিদ্ধ ও হারাম, আর যখন কোনো জিনিসকে হালাল করেন, তখন তা হালাল। যখন কোনো হুকুম বা আইন জারী করবেন, তখন তা মানা হবে, আর যখন কোনো নির্দেশ দেবেন, তখন তা কার্যকরী হবে।'

সুদ্দী ও ইবনে কাসীরের এই উভয় ব্যাখ্যা কোরআনের আয়াত ও রসূল (স.) কর্তৃক প্রদত্ত তার তাফসীরের মতোই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ও কথা ব্যক্ত করে যে, যে ব্যক্তি কোনো মানুষের

মনগড়া কোনো আইন অনুসারে কাজ করে, চাই তা একটি ক্ষুদ্র উপবিধিই হোক না কেন, সে মোশরেক। সে যদি শুরুতে মুসলমান থেকে থাকে এবং পরে এই কাজ করে, তাহলেও সে এই কাজের দরুন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং মোশরেক হয়ে যাবে, চাই এর পরে সে যত দীর্ঘকালই মুখে মুখে সাক্ষ্য দিতে থাকুক যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। অথচ সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের হুকুম গ্রহণ ও অনুসরণ করে চলেছে।

উল্লেখিত কঠোর বক্তব্যের আলোকে যখন আজকের পৃথিবীর অবস্থার দিকে তাকাই, তখন চারদিকে শেরক ও জাহেলিয়াত ছাড়া আর কিছুই দেখি না। কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোক এমন রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এই জাহেলিয়াত ও শেরক থেকে রক্ষা করেছেন। তারা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা স্বীকার করে না এবং কারো প্রণীত আইন বা নির্দেশ জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া ছাড়া তাকে মানে না।

আল্লাহর নামে যবাই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা

এবার যে বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন, তাহলো 'যে সব জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাই করা হয়েছে, তা তোমরা খেয়ো না। এটা পাপ।' আল্লাহর এই উক্তি থেকে যে আইনগত বিধি বেরিয়ে আসে, তা ইবনে কাসীর তার তাফসীরে সংক্ষেপে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন,

'যাদের অভিমত এই যে, যবাইকারী যদি মুসলমানও হয়, তবু আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে যবাই করলে সেই জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম, তারা এই আয়াত থেকে প্রমাণ দর্শান।

এই বিধি সম্পর্কে ইমামদের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। প্রথম মতটি এই যে, যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ বাদ পড়ে গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না, চাই ইচ্ছাকৃতভাবেই বাদ পড়ুক কিংবা ভুলক্রমে। ইমাম মালেক, দাউদ যাহেরী এবং শাফেয়ী মাযহাবের কিছু ইমাম এই মতের প্রবক্তাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তারা এই মতের সপক্ষে এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। অনুরূপভাবে তারা সূরা মায়েদার আয়াত 'শিকার ধরা জন্তু যে শিকার ধরবে তা খাও ও তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো', এই আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে 'এটা পাপ ' এই কথাটা দ্বারা এই বিধির গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। 'এটা' এই সর্বনাম দ্বারা খাওয়া– মতান্তরে, আল্লাহ ছাড়া 'অন্যের নামে' যবাই করা বুঝানো হয়েছে এই মতের সমর্থনে যবাই করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণের আদেশ সম্বলিত কতিপয় হাদীসকেও পেশ করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে দুটো হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি বোখারী ও মুসলিম শরীফে আদী ইবনে হাতেম ও আবু সা'লাবা থেকে বর্ণিত। 'রসূল (স.) বলেন, 'যখন তোমার প্রশিক্ষিত কুকুরকে শিকার ধরতে পাঠাবে এবং তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, তখন সে যা ধরে আনবে তা খাও।' দ্বিতীয় হাদীসটিও বোখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে এবং তা রাফে ইবনে খাদীজ থেকে বর্ণিত। রসূল (স.) বলেন, 'যার রক্ত ঝরেছে ও যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা খাও।'

দ্বিতীয় মতটি হলো, যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা শর্ত নয়। এটা মোস্তাহাব। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবেই হোক বা ভুলক্রমেই হোক, আল্লাহর নাম উচ্চারণ বাদ পড়লে কোনো ক্ষতি নেই। এটি প্রধানত ইমাম শাফেয়ীর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, এতে শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ বাদ পড়া বুঝানো হয়নি বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি কোরআনের অন্য আয়াতের বরাত দেন, যাতে 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা জন্তু খাওয়া নিষিদ্ধ' বলা

হয়েছে। ইবনে জুরাইজ বলেন, এ আয়াতে দেব দেবীর বেদিতে কোরায়শরা যে জন্তু যবাই করতো এবং অগ্নি-উপাসকরা যে জন্তু যবাই করতো, তার কথা বলা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর অনুসৃত এই মত যথেষ্ট শক্তিশালী।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি,' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেছেন যে, এদ্বারা মৃত জন্তু বুঝানো হয়েছে। তিনি এই ব্যাখ্যার সপক্ষে একটি হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রসূল (স.) বলেছেন, 'মুসলমানের যবাই করা জন্তু মাত্রেই হালাল- চাই তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক বা না করুক। কেননা সে কারো নাম উচ্চারণ করলে আল্লাহর নামই উচ্চারণ করবে- আর কারো নয়।' দারাকুতনীতে বর্ণিত এই হাদীসটি দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করেই কোনো জন্তু যবাই করে, তখন তা খাওয়া উচিত। কারণ মুসলমানের ভেতর আল্লাহর কোনো না কোনো নাম থাকেই।'

তৃতীয় মত এই যে, জন্তু যবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে তা বাদ দিলে জন্তু হালাল হবে না। এই মতটা ইমাম মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মত হিসাবে ইতিপূর্বে উল্লেখিত মতের চেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ। আর ইমাম আবু হানীফা ও তার শিষ্যগণের মতও এটাই।

ইবনে জারীর বলেন, এই আয়াতে বর্ণিত বিধিটির কোনো অংশ পরে রহিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, হয়নি। মোজাহেদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মনীষীর অভিমত এটাই। কিন্তু হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে তোমরা মোমেন হয়ে থাকলে আল্লাহর নামে যবাই করা জন্তু খাও এবং আল্লাহর নামে যবাই করা হয়নি এমন জন্তু খেওনা এবং ওটা পাপের কাজ, বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, অতপর তা থেকে আহলে কেতাবের যবাই করা জন্তুকে ব্যতিক্রমী ঘোষণা করে বললেন, 'আহলে কেতাবের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্যে হালাল। অনুরূপভাবে মাকহুল থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে কোরআনে নাযিল করলেন 'আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়নি এমন জন্তু খেয়ো না' অতপর মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে ওই আয়াতের বিধি রহিত করলেন এবং বললেন, আজ তোমাদের জন্যে যাবতীয় পবিত্র খাদ্য হালাল করা হলো, আর আহলে কেতাবের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্যে হালাল। শেষোক্ত এই আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতকে রহিত করলেন এবং আহলে কেতাবের খাদ্যকে হালাল করা হলো। অতপর ইবনে জারীর মন্তব্য করেন যে, আহলে কেতাবের খাদ্য হালাল হওয়া এবং আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাই করা জন্তু হারাম হওয়া এই দুটোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ইবনে জারীরের এই উক্তি যথার্থ। যারা প্রাচীন মনীষী ও ইমামদের পক্ষ থেকে উক্ত আয়াতদ্বয়ের একটি দ্বারা অপরটি রহিত হওয়ার পক্ষে মত দেন, তারা আসলে একথাই বলতে চান যে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ ব্যতিরেকে যবাই করা জন্তুর গোশত বাদে আহলে কেতাবের অন্য সব খাদ্য হালাল।

ঈমান ও কুফুরের স্বরূপ

এরপর শুরু হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ আলোচনা। এতে রয়েছে ঈমান ও কুফরের প্রকৃতি, বড় বড় অপরাধীকে প্রত্যেক জনপদে ষড়যন্ত্র করে বেড়ানোর সুযোগ প্রদান সম্পর্কে আল্লাহর নীতি এবং এই সমস্ত বড় বড় অপরাধীর ঈমান আনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো পুঞ্জীভূত অহংকারের

পর্যালোচনা। এ আলোচনার উপসংহারে ঈমানের অবস্থা ও কুফরীর অবস্থা এই দুটি অবস্থার চমকপ্রদ ছবি অংকন করা হয়েছে। এতে ঈমানকে বক্ষের প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা এবং কুফুরকে বক্ষের সংকীর্ণতা ও শ্বাসরুদ্ধতার আকারে চিত্রায়িত করা হয়েছে। আর এই আলোচনাটাকে যবাই করা জন্তুর হালাল ও হারাম হওয়া সংক্রান্ত আলোচনার সাথে এভাবে যুক্ত করা হয়েছে যে, একটিকে মূল এবং অপরটিকে শাখা হিসাবে দেখানো হয়েছে। সেই সাথে এ আয়াতে উক্ত শাখার গভীরতা ও বৃহৎ মূলের সাথে তার সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রতিফলিত হয়েছে। (আয়াত ১২৩-১২৬)

এ আয়াতগুলো হেদায়াত ও ঈমানের প্রকৃতি বর্ণনা প্রসংগে একটা বাস্তব অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছে। এ আয়াতে যে রূপক ও উপমা ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই বাস্তব অবস্থাটাকেই অধিকতর উদ্দীপনাময় ও প্রেরণাদায়ক বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য ঠিকই রয়েছে।

যে ধরনের বাস্তব অবস্থা এ আয়াতগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে এভাবে মর্মস্পর্শী দৃশ্যের আকারে চিত্রায়িত করার যথার্থই প্রয়োজন ছিলো। অবস্থাটা বাস্তব হলেও আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক। এ অবস্থাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু বলে বুঝানো যায় না। অবশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ স্বাদ ও অনুভূতিকে স্মরণ করিয়ে দিলে বুঝানো যায় বটে, তবে তা সেই ব্যক্তিকেই বুঝানো যায় যে ইতিপূর্বে বাস্তবিক পক্ষে তার স্বাদ গ্রহণ করেছে।

কোরআন যে আকীদা ও মতাদর্শ পেশ করে, তা মানুষের হৃদয়ে নির্জীবতার অবসান ঘটিয়ে নবজীবনের আবির্ভাব ঘটায়, অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে হৃদয়কে আলোকে উদ্ভাসিত করে। এমন জীবনের আবির্ভাব ঘটায়, যার আওতায় সব কিছুর নতুন স্বাদ অনুভব, নতুন রূপ দর্শন ও নতুন মূল্য উপলব্ধি করা হয়। অথচ এই নবজীবন লাভের আগে এরূপ উপলব্ধি করা হতো না। এমন আলোয় হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে, যার রশ্মিতে ও আওতায় সব কিছু স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। অথচ হৃদয় ঈমানের আলোচ আলোকিত হওয়ার আগে এমন দিব্য দর্শনের সুযোগ কখনো ঘটেনি।

এই বিষয়টি আসলে বলে বুঝানো সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি নিজে তা অর্জন করে, কেবল সেই বুঝতে পারে। কোরআনের ভাষা এই অভিজ্ঞতার তথ্য হস্তান্তরের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ও বাহন। কেননা কোরআনের ভাষা এই তথ্যকে বহু বিচিত্র রূপে চিত্রিত করে।

কুফুর সেই আসল শাশ্বত জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়, যে জীবনের কোনো শেষ নেই। এ সম্পর্কচ্ছেদ এক ধরনের মৃত্যু। মানুষের সহজাত শক্তি ও প্রতিভাকে বিকৃত ও নিষ্ক্রিয় করে বিধায় কুফুর এক ধরনের মৃত্যু। আর ঈমান হলো সংযোগ, কর্মপ্রস্তুতি ও দাওয়াতকে গ্রহণের নামান্তর। তাই এটা হলো জীবন।

কুফুর হচ্ছে আত্মা ও বিবেকের ওপর আবরণ ও আচ্ছাদণ বিশেষ। এর ফলে আত্মা ও বিবেক জ্ঞানার্জন করতে পারে না এবং জ্ঞানের জন্যে উৎসুক হয় না। তাই এটা এক ধরনের অন্ধকার এবং ইন্দ্রিয় ও অনুভূতির নিষ্ক্রিয়তার সিল। ঈমান মানুষের সামনে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দেয় এবং নতুন দৃষ্টি, উপলব্ধি ও দৃঢ়তা দান করে। তাই এটা একটা পূর্ণাংগ আলো। কুফুর হচ্ছে এক ধরনের সংকোচন ও বিশুস্কতা। তাই এটা সংকীর্ণতার নামান্তর। এটা সহজ স্বভাবিক পথ থেকে বিচ্যুতির নামান্তর। সুতরাং এটা একটা জটিল ও কঠিন পথ। কুফর শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হওয়ার নাম। সুতরাং তা এক ধরনের উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা। আর ঈমান হলো বক্ষের প্রশস্ততা, হৃদয়ের প্রশান্তি, সহজ ও সরল পন্থা এবং দীর্ঘ সুশীতল ছায়া।

কাফের কে? সে তো একটা শেকড়বিহনী শেওলা। বিশ্বস্রষ্টার সাথে সম্পর্কহীন এবং সে জন্যে গোটা সৃষ্টি জগতের সাথে সম্পর্কহীন এক ব্যক্তি, এ জন্যে সে বাস করে এক সংকীর্ণ পরিসরে। এতো সংকীর্ণ পরিসরে, যা সাধারণ জীব জানোয়ারের বসবাসের যোগ্য।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নশ্বর মানুষকে চিরস্থায়ী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে। অতপর তাকে দৃশ্যমান জীবন ও ভৌত জগতের সাথেও সম্পৃক্ত করে। অতপর তাকে আবহমানকাল ব্যাপী জগত জুড়ে বিদ্যমান ঈমানী কাফেলার সাথে যুক্ত করে। ফলে তার অস্তিত্ব শধু তার সীমিত আয়ূষ্কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

ঈমান আনয়নের ফলে মানুষের হৃদয় উল্লেখিত ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত হয়। ফলে তার কাছে ইসলামের সকল তত্ত্ব ও তথ্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। আর বাস্তব জীবনের জন্যে ও তৎপরতার জন্যে তার বিধান বিস্ময়করভাবে প্রেরণার সঞ্চার করে। মানুষ যখন এই ঈমানী নূর বা আলো লাভ করে, তখন তার হৃদয়ে এক চমকপ্রদ ও নযিরবিহীন অবস্থার উদ্ভব হয়। তখন তার ইসলামী আকীদা, আদর্শ ও কর্মের মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ঘটে। ইসলাম তখন তার কাছে শুধু কতিপয় আকীদা, এবাদাত, আইন ও উপদেশের সমষ্টি থাকে না, বরং সব কিছুর সাথে তার সুষ্ঠু সমন্বয় ও একাত্মতার সৃষ্টি হয়।

এই নূর বা আলোতে যখন তার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়, তখন জগত, জীবন, মানবমন্ডলী এবং বিশ্বজগতে ও মানব সমাজে সংঘটিত ঘটনাবলী সংক্রান্ত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য তার সামনে প্রতিভাত হয়। তার সামনে প্রতিভাত হয় চমকপ্রদ দৃশ্য। প্রতিভাত হয় সৃষ্টিজগত পরিচালনা সংক্রান্ত আল্লাহর সূক্ষ্ম নীতি– যার বিধিব্যবস্থা স্থিতিশীল, কিন্তু স্বাভাবিক ও সহজ সরল। প্রতিভাত হয় আল্লাহর প্রবল ও অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছা, যা আল্লাহর উক্ত জগৎ পরিচালনা নীতির পরিচালকশক্তি হিসাবে সদা সক্রিয় রয়েছে এবং উক্ত নীতিকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। তার সামনে আরো প্রতিভাত হয় আল্লাহর প্রাকৃতিক নীতি ও তাঁর ইচ্ছার অধীন মানব সমাজ ও তার ঘটনাবলীর প্রকৃত স্বরূপ। হৃদয় এই ঈমানী নূরে আলোকিত হলে মানুষ সব কিছুতে স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা দেখতে পায়। স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা দেখতে পায় নিজের ইচ্ছায়, মনের ভাবান্তরে, পরিকল্পনায় ও সকল কাজকর্মে। স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা দেখতে পায় তার আশপাশে যা যা সংঘটিত হয় তাতেও-চাই তা আল্লাহর জগত পরিচালনার নীতি সংক্রান্ত হোক, মানব সমাজের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা সংক্রান্ত হোক, অথবা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য পরিকল্পনা সংক্রান্ত হোক। এই ঈমানী নূরের ঝলকানিতে সে তার নিজের সত্ত্বায়, বিবেক বুদ্ধিতে ও মনমানসে এবং পারিপার্শ্বিকতায় সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ ও ইতিহাসের এমন ব্যাখ্যা লাভ করে, যেন সে কোনো পুস্তকে তা পাঠ করছে।

মানুষের হৃদয় এই আলোতে উদ্ভাসিত হলে সে নিজের মনমগযে, আবেগ অনুভূতিতে ও প্রজ্ঞায় দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের সন্ধান পায়। সে তার মন-মগযে, পরিস্থিতি-পরিবেশে ও পরিণতিতে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ করে এবং সকল অবস্থায় ও সকল সময় শান্তি, তৃপ্তি, বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা, উদারতা ও পেলবতা লাভ করে।

এভাবে কোরআন তার অপূর্ব প্রকাশভংগিতে সেই তত্ত্বটিকে অত্যন্ত উদ্দীপনাময় করে তুলে ধরে।

‘যে ব্যক্তি মৃত ছিলো, অতপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি, যা দ্বারা সে মানব সমাজে চলাফেরা করে, সে কি সেই ব্যক্তির সমান, যে এমন অন্ধকারে থাকে যা থেকে সে বেরুতে পারে না? (আয়াত ১২৩)

ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানরা এ রকমই ছিলো। তাদের আত্মায় ঈমানের প্রাণশক্তি ফুঁকে দিয়ে তাকে সজীব করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের হৃদয় ছিলো মৃত এবং তাদের আত্মা ছিলো অন্ধকারে

আচ্ছন্ন। ঈমানের আলোর পরশে তা এমন জীবিত ও প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো যে, তা দিয়ে তারা মানব সমাজে চলাফেরা করে পথভ্রষ্ট মানুষকে সুপথ দেখাতে লাগলো, পংগু হয়ে পড়ে থাকা মানুষকে তুলে সবল করতে লাগলো, ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে ভীতিমুক্ত করতে লাগলো, পরাধীন মানুষকে স্বাধীন করতে লাগলো, মানব জাতির সামনে তাদের চলার পথ চিহ্নিত করতে লাগলো এবং পৃথিবীতে নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘোষণা করতে লাগলো, যে মানুষ স্বাধীন, প্রদীপ্তমনা এবং আল্লাহর গোলামদের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীতে নিয়োজিত।

আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করছেন যে, যার আত্মায় আল্লাহ তায়ালা ঈমানী প্রাণশক্তি ফুঁকে দিয়েছেন এবং যার হৃদয়কে ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন, সে কি সেই ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তা থেকে তার বেরিয়ে আসার উপায়ও তার নেই?

এই দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ দুই জগতের বাসিন্দা। এই দুই জগতের মাঝে অনেক ব্যবধান।

এখন প্রশ্ন এই যে, চারিদিকে আলোর বন্যা বইতে থাকা সত্তেও অন্ধকারে আচ্ছন্নদেরকে কে আটকে রাখে?

এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এভাবেই কাফেরদের কাছে তাদের কর্মকান্ডকে সুশোভিত করে তুলে ধরা হয়ে থাকে।'

বস্তুত এটাই অন্ধকারকে আঁকড়ে ধরে রাখার মূল রহস্য। কুফর, অন্ধকার ও আত্মার মৃত্যুকে সুশোভিত করার প্রবণতা রয়েছে কোনো কোনো মহলে।

এই সুশোভিতকরণের প্রথম উদ্যোক্তা হলো আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর এই ইচ্ছাই মানুষের জন্মগত স্বভাবকে আলো ও অন্ধকার উভয়কে ভালোবাসার যুগপৎ যোগ্যতা দান করে। এই যুগপৎ যোগ্যতা দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় সে আলোকে বেছে নেয়, না অন্ধকারকে। যখন সে অন্ধকারকে বেছে নেয়, তখন সেই অন্ধকারকে তার জন্যে সুশোভিত করা হয় এবং সে অন্ধকারের প্রতি অনুরক্ত ও আসক্ত হয়ে পড়ে, যাতে সে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে না আসে। তা ছাড়া জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানরা পরস্পরের প্রতি কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে প্রতারিত করে এবং কাফেরদের কর্মকান্ডকে বাহবা দিয়ে সুষমামন্ডিত করে। আর যার মন ঈমান থেকে, আলো থেকে ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা অন্ধকারে ডুবে গিয়ে হেদায়াত ও গোমরাহী বাছবিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কুপ্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। 'এভাবেই কাফেরদের কাছে তাদের কর্মকান্ড সুশোভিত করা হয়'-এ কথার মর্মার্থ এটাই।

পাপিষ্ঠদের সাথে মোমেনদের সংঘাত অনিবার্য

একই পন্থায়, একই কারণে ও একই নিয়মে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শহরে তার বড় বড় অপরাধীকে সুযোগ করে দেন যেন তারা চক্রান্ত করে বেড়ায়, যাতে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়, আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়, আল্লাহর সূক্ষ্ম, প্রাজ্ঞ ও মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়, প্রত্যেকে সহজে নিজের সাধ্যমতো কাজ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের নির্ধারিত পরিণতি ভোগ করে। ১২৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথাই বলেছেন। ....

বস্তুত এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বড় বড় শহর, বন্দর ও রাজধানীতে বড় বড় অপরাধীকে নিয়োগ করেন। তারা আল্লাহর দ্বীনের শত্রু হিসাবে অবস্থান করে। যে ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বলে তারা মানুষের ওপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, মানুষের ওপর প্রভুত্ব ফলায়, মানুষকে গোলাম বানায়, তা সবই আল্লাহর একান্ত অধিকার, সেই ক্ষমতা ও পদমর্যাদা হতে ইসলাম তাদেরকে উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর। কেননা মানুষের আসল মনিব, বাদশাহ ও মাবুদ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।

আল্লাহর চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, তিনি তাঁর রসূলদেরকে সত্য ও হেদায়াতের বাণী দিয়ে পাঠান। সেই বাণী দুনিয়ার সমস্ত খোদায়ীর দাবীদার, প্রভুত্বের দাবীদার ও সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদারদেরকে খোদায়ী থেকে, প্রভুত্ব থেকে ও সার্বভৌমত্ব থেকে উৎখাত করতে চায়। এ জন্যে তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রসূলদের বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগে যায়। তারপর বড় বড় শহরে, বন্দরে ও রাজধানীতে শুরু করে তাদের ষড়যন্ত্রের তান্ডব। পরস্পরকে চক্রান্তপূর্ণ ও প্রতারণাপূর্ণ কথা দিয়ে বশীভূত করে রাখে। এই মানুষ শয়তানরা জ্বিন শয়তানদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে সত্য ও হেদায়াতকে রুখে দাঁড়ায় ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে, বাতিল ও গোমরাহী প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত হয় এবং এই সব গোপন ও প্রকাশ্য চক্রান্ত দ্বারা মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

এটা একটা চিরায়ত রীতি এবং একটা অনিবার্য যুদ্ধ। কেননা ইসলামের প্রাথমিক স্তম্ভ সার্বভৌমত্বকে আল্লাহর একক ও নিরংকুশ অধিকার ঘোষণার সাথে এই সব নগর মহানগর ভিত্তিক অপরাধীদের উচ্চাভিলাষ এমনকি তাদের অস্তিত্বের ঘোরতর বিরোধকে কেন্দ্র করেই এই অনিবার্য যুদ্ধের উদ্ভব।

এ যুদ্ধ থেকে হাত গুটানো তো দূরের কথা-এর শেষ পরিণতিতে না পৌঁছে রসূল (স.) ও মোমেনদের গত্যান্তর নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জনদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, বড় বড় অপরাধীর ষড়যন্ত্র যত বড় এবং যতো মারাত্মক হোক না কেন, তা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে তাদেরই ধ্বংস সাধন করবে। কেননা এ যুদ্ধে মোমেনরা একা নয়। এ যুদ্ধে তাদের সংগী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনিই তাদের জন্যে এবং তাদের শত্রুদের চক্রান্ত বিনাশ করার জন্যে যথেষ্ট। তাদের ষড়যন্ত্র তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে কার্যকর হচ্ছে। অথচ তারা জানে না।

সুতরাং মোমেনদের বিচলিত হবার কিছু নেই। তাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত।

দুরাচার কাফেরদের ঔদ্ধত্য

পরবর্তী আয়াত আল্লাহর রসূল ও তাঁর দ্বীনের দুশমনদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। তাই এই ঔদ্ধত্য ও অহংকার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। তাদের আশংকা, ইসলাম গ্রহণ করলে অন্য সকল বান্দার মতো আল্লাহর সাধারণ বান্দা হয়ে যেতে হবে। তারা চায় তাদের অনুসারীদের মধ্যে তাদের বিশিষ্টতাকে ধরে রাখতে। এ জন্যে নবীর প্রতি ঈমান আনা তাদের পক্ষে কষ্টকর। সেটা হবে তাঁর কাছে সবিনয়ে আত্মসমর্পণের শামিল। অথচ তাদের অভ্যাস গড়ে উঠেছে আপন অনুসারীদের খোদার আসনে বসার, তাদের জন্যে আইন প্রণয়ন করার ও অনুসারীদের পক্ষ থেকে সেই আইন গ্রহণ করতে দেখার এবং তাদেরকে হুকুম দিয়ে তাৎক্ষণিক আনুগত্য লাভ করার। এ জন্যেই তারা এমন জঘন্য প্রলাপোক্তি করতে পেরেছিলো, 'আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়, আমাদেরকেও সেরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনবো না।' (আয়াত ১২৪)

ওলীদ বিন মুগীরা বলেছিলো, নবুওত যদি সত্য হতো, তাহলে ওটা পাওয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমারই অগ্রাধিকার থাকতো। কেননা তোমার চেয়ে আমার বয়সও বেশী, ধনসম্পদও বেশী।' আর আবু জাহল বলেছিলো, 'মোহাম্মদের কাছে যা আসে, আগে আমাদের প্রত্যেকের কাছে তা আসুক। তা না হলে আমরা তাঁর ওপর সন্তুষ্টও হবো না। তাঁর অনুসারীও হবো না।'

অহংকার ও দাম্ভিকতা, অনুসারীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ এবং তাদেরকে আদেশ দিতেই তাদের পক্ষ থেকে আদেশ পালন- এই জিনিসগুলোই যে তাদের কাছে কুফরীকে সুশোভিত ও

প্রিয় করে রেখেছিলো, তা সুস্পষ্ট। এই জিনিসগুলোতেই তাদের কাছে তাদের ইসলামের ও রসূলের শত্রুতাকে মজার জিনিস বানিয়ে রেখেছিলো।

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রলাপোক্তির জবাব দিয়েছেন। প্রথম জবাবে বলেছেন যে, রেসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করার কাজটা আল্লাহর এ কথা জানার সাথে জড়িত যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি কে। দ্বিতীয় জবাবে ধিক্কার দিয়েছেন এবং ভয়ংকর পরিণতির হুমকি দিয়েছেন, 'আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন রেসালাতের দায়িত্ব কাকে দেবেন..... '

রেসালাত একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। পৃথিবীতে বিরাজমান আল্লাহর বহু সংখ্যক কাজের মধ্য হতে একজন বিশিষ্ট বান্দার তৎপরতার সাথে মহান আল্লাহর শাশ্বত ইচ্ছা ও সংকল্পের যখন সংযোগ ঘটে, সীমাবদ্ধ মনুষ্যজগতের সাথে আল্লাহর ঘনিষ্ঠতম ফেরেশতাদের যখন সংযোগ ঘটে, আখেরাতের সাথে দুনিয়ার যখন সংযোগ ঘটে, মানুষের হৃদয়ে, মানব সমাজে ও ইতিহাসের আবর্তনের বিশিষ্ট স্তরে যখন মহাসত্যের আবির্ভাব ঘটে, মানব সত্ত্বা এক অভাবিত সৌভাগ্যের পরশে যখন শুধু আল্লাহর জন্যে উৎসর্গিত হতে সংকল্পবদ্ধ হয়, শুধু ইচ্ছায় ও কর্মে নয় বরং যে স্থানে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হবে সেই স্থানও যখন আল্লাহর জন্যে উৎসর্গীকৃত হতে চায়, কেবল তখনই রসূলের সত্ত্বা এই মহাসত্য ও তার উৎসের প্রত্যক্ষ ও পূর্ণাংগ যোগসূত্রে আবদ্ধ হয়। রসূলের সত্ত্বা স্বীয় জন্মগত উপাদানের দিক দিয়ে অবাধে ও অসংকোচে প্রত্যক্ষভাবে ও পরিপূর্ণভাবে এই মহাসত্যকে গ্রহণের যোগ্য না হলে তা এই সংযোগের আওতায় আসে না।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন কোথায় তিনি তাঁর রেসালাতের এই গুরু দায়িত্ব স্থাপন করবেন এবং কার ওপর এই গুরুভার অর্পণ করবেন। একমাত্র তিনিই সেই ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করতে পারেন, যাঁকে কোটি কোটি মানুষের মধ্য হতে এই দায়িত্বের যোগ্যতম বিবেচনা করেন এবং তাকে বলেন, এই গুরু দায়িত্বে তোমাকে নিয়োগ করা হলো।

যারা রেসালাতের দায়িত্বের জন্যে উৎসুক হয় অথবা রসূলকে যা দেয়া হয়েছে তদ্রূপ জিনিস নিজের জন্যেও কামনা করে, তারা প্রথমত স্বভাবগত ও জন্মগতভাবে এই দায়িত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা তাদের সত্ত্বাকে প্রাকৃতিক জগতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ও পার্থিব স্বার্থোদ্ধারের হাতিয়ার মনে করে। অথচ রসূলরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি রেসালাতের অর্পিত দায়িত্বকে গ্রহণ করেন মাত্র। এ জন্যে তিনি নিজের সত্ত্বাকে সমর্পণ করেন এবং নিজের স্বার্থকে ভুলে যান। তিনি নিজের ইচ্ছা ও কামনা বাসনা ছাড়াই এ দায়িত্ব লাভ করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন, 'তোমার ওপর কেতাব নাযিল হোক এটা তুমি আশা করোনি। এটা নিছক আল্লাহর রহমত হিসাবে এসেছে।' তা ছাড়া যারা রেসালাতের পদ লাভের প্রত্যাশী হয়, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। এই দায়িত্বের গুরুত্ব তারা বোঝে না। তারা এও জানে না এ কাজের উপযুক্ত লোক নির্বাচনে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তা শুধু আল্লাহরই আছে এবং এ জন্যে নির্বাচনের ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই কঠোর জবাব দেন,

'আল্লাহই ভালো জানেন, তাঁর রেসালাতকে তিনি কোথায় রাখবেন।'

আল্লাহ তায়ালা এটাকে যেখানে রাখার যোগ্য বলে জানতেন, সেখানেই রেখেছেন। এর জন্যে তিনি তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে মহৎ ও মহান এবং সবচেয়ে নিষ্ঠাবান ও সৎ ব্যক্তিদেরকেই নির্বাচন করেছেন। নবীদেরকে তিনি সেই মহত্তম মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করেছেন, যার শেষ রসূল হলেন সৃষ্টির সেরা মোহাম্মদ (স.)।

এরপর দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তির হুমকি,

'অপরাধে যারা লিপ্ত হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা ও তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে নিজের অনুসারীদের ওপর প্রভুত্ব ও খবরদারী চালানোর বদলা স্বরূপ, দম্ভ ও ধৃষ্টতা দেখিয়ে সত্যকে প্রত্যাখ্যানের বিনিময় স্বরূপ, আল্লাহর রসূলের পদ দখল করার স্পর্ধাপূর্ণ বাসনার শাস্তি স্বরূপ এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র, রসূলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ এবং মোমেনদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর প্রতিশোধ স্বরূপ।

ইসলাম মানা যখন আকাশে চড়ার মতো কঠিন

এই পর্বের শেষ আয়াতটিতে দেখানো হয়েছে মোমেনদের অন্তরে হেদায়াত ও ঈমানের অবস্থার প্রকৃত চিত্র,

'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন .....' (আয়াত ১২৫)

অর্থাৎ হেদায়াত লাভে আগ্রহী এবং পরীক্ষা স্বরূপ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীন নির্বাচনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে হেদায়াত লাভের জন্যে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তিকে হেদায়াত প্রদানের যে স্থায়ী নীতি আল্লাহ অনুসরণ করে থাকেন, সেই নীতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত করার সিদ্ধান্ত নেন, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। ফলে তার বুক ইসলামের জন্যে প্রশস্ত হয়ে যায়, সে স্বতস্ফূর্তভাবে ও সাগ্রহে ইসলামকে স্বাগত জানায় এবং ইসলামকে পেয়ে তার হৃদয়মন প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়।

আর হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং হেদায়াতকে গ্রহণের সহজাত ইচ্ছা ও যোগ্যতাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া মানুষকে বিপথগামী করার যে স্থায়ী নীতি আল্লাহ তায়ালা অনুসরণ করেন, সেই নীতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা যাকে বিপথগামী করার সিদ্ধান্ত নেন, তার বুককে এতো সংকুচিত করে দেন যে, সে যেন অতি কষ্টে আকাশে আরোহণ করছে। অর্থাৎ তার মন ও বিবেক এমন বিকৃত ও বদ্ধ হয়ে যায় যে, ইসলাম গ্রহণ করা তার পক্ষে আকাশে আরোহণের মতোই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এখানে একটি মানসিক অবস্থাকে একটি দৈহিক অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। মনের সংকীর্ণতা ও বুকের সংকোচনকে আকাশে আরোহণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাফসের কেরাত অনুসারে এখানে যে 'ইয়াস্‌সায়াদু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার উচ্চারণ খুবই কষ্টকর। আর এই শব্দটি দ্বারা আকাশে আরোহণের কষ্ট এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতাকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

অতপর অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সংগত মন্তব্য করা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে,

'যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ এভাবেই লাঞ্ছনার শিকার করেন।'

'এভাবেই' অর্থাৎ আল্লাহ যাকে হেদায়াত করতে চান, তার যেমন বুক খুলে দেন এবং যাকে গোমরাহ করতে চান তার জন্যে যেমন হেদায়াত লাভকে কষ্টকর করে দেন, তেমনিভাবে যারা ঈমান আনে না তাদেরকে লাঞ্ছনা প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট শব্দ 'রিজ্‌স্'-এর এক অর্থ লাঞ্ছনা এবং আরেক অর্থ শাস্তি। আযাব বা শাস্তির দৃশ্যের মধ্যে এই উভয় অর্থেরই সমাবেশ ঘটেছে। শাস্তির মধ্যে এই লাঞ্ছনা ও অবমাননারও সমাবেশ ঘটেছে এবং তা কখনো তা থেকে দূর হয় না। বস্তুত এই উভয় অর্থের সমাবেশই এখানে কাংখিত।

আলোচ্য ১২৫ আয়াতটি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বাকী রয়েছে। কোরআনের এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং মানুষের ইচ্ছা ও চেষ্টার মাঝে সম্পর্ক ও

সংযোগ নিয়ে, মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী নিয়ে এবং মানুষের কর্মফল নিয়ে আলোচনা করে, এই সব আয়াত দ্বারা যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা যথাযথভাবে বুঝতে হলে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির উর্ধে উঠে মানবীয় বিবেকের অন্য একটা দিককে কাজে লাগাতে হবে। মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি বলতে আমরা বুঝি এই বিষয় সংক্রান্ত সেই সব বিতর্কিত মতবাদ, যা ইসলামী দর্শনের ইতিহাসে বিশেষত মো'তাযেলা, আহলে সুন্নাহ ও মরজিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে কিংবা অন্যান্য অদৃশ্য তত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে যে সব চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে সেগুলোকে।

এই বিষয়টাকে বুঝার জন্যে একদিকে যেমন মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির বাইরে মানবীয় বিবেকের অন্যান্য দিককে ব্যবহার করা প্রয়োজন,অপরদিকে তেমনি 'মনস্তাত্ত্বিক বিতর্ক' নিয়ে নয় বরং বাস্তব সত্য নিয়ে আলোচনা করা জরুরী। কোরআন মানবসত্ত্বায় ও বাস্তব জগতে একটা বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে। কিন্তু এই সত্যটির ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা এবং মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের মাঝে বিরোধ দেখা দেয় বলে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়। অথচ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে এটা বুঝা যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ যখন বলা হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা মানুষকে প্রবলভাবে হেদায়াত বা গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয়, তখন এটা বাস্তব সত্য হয় না। আবার যদি বলা হয় যে, মানুষের ইচ্ছাই তার পুরো ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, তবে সেটাও বাস্তব সত্য হয় না। বাস্তব সত্যটা এই উভয়ের মাঝখানে অবস্থিত একটা সূক্ষ্ম জিনিস, এটা আল্লাহর অবাধ ইচ্ছা ও কার্যকর ক্ষমতা এবং বান্দার স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও সেচ্ছামূলক চেষ্টার মধ্যবর্তী ব্যাপার। এই উভয়ের মাঝে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই।

কিন্তু এই বাস্তব সত্যকে যথাযথভাবে বুঝা মনস্তাত্ত্বিক যুক্তির আওতায় সম্ভব নয়। সত্যের একটি বিশেষ প্রকারই নির্দিষ্ট করে দেয় কী পদ্ধতিতে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং কোন পন্থায় সে ব্যাপারে মত প্রকাশ করতে হবে। মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি বা বিতর্কিত মতবাদসমূহ দ্বারা এই সত্যের আলোচনা করা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে এই সত্যকে যথাযথভাবে বুঝার জন্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এর পূর্ণাংগ স্বাদ গ্রহণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে সক্রিয়ভাবে ও স্বতস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হয়, সে নিজের বুকে তার জন্যে প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা অনুভব করে। এটা নিসন্দেহে আল্লাহর সৃষ্টি। এটা এমন একটা জিনিস, আল্লাহর সিদ্ধান্ত ছাড়া যার সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। এই সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশ বান্দা সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা থেকেই উৎসারিত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির সহজাত স্বভাব গোমরাহীর দিকে ধাবিত হয়, তার বুক সংকীর্ণ এবং হৃদয় কঠিন ও পাষাণ হয়ে যায়। আর এটাও যে আল্লাহই সৃষ্টি করে দেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা ছাড়া কার্যকরভাবে সংঘটিত হতেই পারে না। আল্লাহ তায়ালা তার সিদ্ধান্ত দ্বারা একে সৃষ্টি ও চালু করেন। এই দুটো কাজই বান্দা সম্পর্কে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়। তবে আল্লাহর এই ইচ্ছা বান্দার ওপর বল প্রয়োগ করে না। এটা হলো আল্লাহর সেই ইচ্ছা, যা মানুষ নামক এই সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে পরীক্ষা করার রীতি চালু করেছে। আর বান্দার হেদায়াত বা গোমরাহীর দিকে ধাবিত হওয়ার এই ইচ্ছাটুকুকে বান্দা যদি স্বেচ্ছায় প্রয়োগ ও ব্যবহার করে, তবে সেই প্রয়োগ ও ব্যবহারের স্বাভাবিক ফলাফলকে আল্লাহই সৃষ্টি ও কার্যকর করেন। এভাবে বান্দার ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল হয়। আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে কার্যকর ও সফল না করতেন, তবে তা সফল হতো না।

যখন একটি মানসিক সমস্যা দিয়ে অপর একটি মানসিক সমস্যার মোকাবেলা করা হয় এবং এ সব সমস্যার প্রতিকার করা হয়, অথচ আসল সত্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করা হয় না এবং সত্যের সন্ধানে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করা হয় না, তখন সত্যকে যথাযথভাবে

উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। ইসলামের আকীদা শাস্ত্রীয় বিতর্কিত দর্শনে এবং অনৈসলামী দর্শনেও এটাই ঘটেছে।

তাই এই মহাসত্যের পর্যালোচনার জন্যে ভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন ও প্রত্যক্ষ স্বাদ গ্রহণ আবশ্যক।

এবার পরবর্তী আয়াতের পর্যালোচনায় মনোনিবেশ করছি।

আলোচ্য পর্বটি সামগ্রিকভাবে যবাই করা জন্তু জানেয়ার সংক্রান্ত উপসংহার হিসাবে এসেছে। ওই আলোচনা আগেই সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং উভয় বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং উভয়টি মিলিত হয়ে ইসলামের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। জন্তু জানোয়ারের যবাই সংক্রান্ত আলোচনা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিষয়ক আলোচনারই নামান্তর। আর আইন প্রণয়নের ক্ষমতাটাই হচ্ছে প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব। আর এই সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসের নামই ঈমান। এ জন্যেই ঈমান সংক্রান্ত আলোচনা যথাস্থানে এভাবেই করা হয়।

পরবর্তী আয়াতটি এই পর্বের শেষ উপসংহার। এতে এই উভয় আলোচনাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। উভয়টি মিলিত হয়ে আল্লাহর সেরাতুল মুস্তাকীম তথা সঠিক ও সরল পথ বিনির্মাণ করে। এই দুটি অর্থাৎ আইন প্রণয়নের নিরংকুশ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব যে আল্লাহর– এই আকীদা ও এই আকীদা থেকে নির্গত আইন ও শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হওয়া সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার শামিল। আর এই দুটোর ওপর স্থির থাকার নামই শান্তির ভুবন অভিমুখী পথের ওপর স্থির থাকা এবং এরই আরেক নাম আল্লাহকে স্মরণকারী বান্দাদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ও সখ্যতা। আল্লাহ ১২৭ আয়াতে বলেন,

'এ হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের সরল ও সঠিক পথ.......'

শুধু সরল ও সঠিক পথ না বলে তোমার প্রতিপালকের সঠিক পথ বলার উদ্দেশ্য হলো অধিকতর আস্থা সৃষ্টি ও পরিশেষে সুসংবাদ প্রদান। এ হচ্ছে হেদায়াত ও গোমরাহীতে আল্লাহর নীতি। আর ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে হালাল ও হারাম সম্পর্কে আল্লাহর বিধি। উক্ত নীতি ও বিধি উভয়ই আল্লাহর মানদন্ডে সমমান সম্পন্ন এবং উভয়টি কোরআনে একই সূত্রে গাঁথা।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এ দ্বারা উপকৃত হয় তারাই, যারা এগুলোকে মনে রাখে, ভুলে যায় না ও উদাসীন হয় না। মোমেনের অন্তর সব সময় আল্লাহকে ও তাঁর বিধি-বিধানকে স্মরণ রাখে এবং কখনো উদাসীন হয় না। মোমেনের অন্তর খোলামেলা, প্রশস্ত ও উদার এবং জীবন্ত। প্রত্যেক কল্যাণকর জিনিসকে সে স্বাগত জানায় ও গ্রহণ করে।

আর যারা সদা সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণ রাখে ও স্মরণ করে, তাদের জন্যে তাঁর কাছে শান্তির বাসভবন রয়েছে, রয়েছে নিরাপত্তা ও সুখের বাসভবন। তিনিই তাদের অভিভাবক, বন্ধু, সাহায্যকারী, রক্ষক ও প্রতিপালক। এটা তাদের সৎকর্মেরই সুফল। এটা তাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রতিদান।

এখানে আমরা আর একবার এই আকীদার একটি বিরাট বৈশিষ্টের সাক্ষাত পাই। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর রচিত শরীয়তকে সেরাতুল মুস্তাকীম বলে আখ্যায়িত করার মধ্য দিয়েই এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে। এর মধ্য দিয়েই ঈমান ও আকীদার প্রতিফলন ঘটে। এটাই আল্লাহর এই দ্বীনের স্বভাব। বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহই এটা নির্ধারণ করেছেন। (আয়াত ১২৮ - ১৩৫)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ

أَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيٓ

أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ

وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ

الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ ذٰلِكَ أَنْ

لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّأَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا

১২৮. (স্মরণ করো,) যেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, (তখন তিনি শয়তানরূপী জ্বিনদের) বলবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা তো (বিভিন্ন সময়) অনেক মানুষকেই গোমরাহ করেছো, (এ সময়) মানুষের ভেতর থেকে (যারা) তাদের বন্ধু (তারা) বলবে, হে আমাদের মালিক, আমাদের এক একজন এক একজনকে (ব্যবহার করে) দুনিয়ার জীবনে প্রচুর লাভ কামাচ্ছিলাম, আর এভাবেই আমরা চূড়ান্ত সময়ে এসে হাযির হয়েছি, যা তুমি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে; আল্লাহ তায়ালা বলবেন, (হাঁ, আজ সে গোমরাহীর জন্যে) তোমাদের ঠিকানা (হবে জাহান্নামের) আগুন, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যা কিছু চাইবেন (তা আলাদা); তোমার মালিক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবহিত। ১২৯. আমি এভাবে একদল যালেমকে তাদেরই (অন্যায়) কার্যকলাপের দরুন আরেক দল যালেমের ওপর ক্ষমতাবান করে দেই।

রুকু ১৬

১৩০. (আল্লাহ তায়ালা সেদিন আরো বলবেন,) হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় (বলো), তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে আমার (এমন এমন) সব রসূল আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদের কাছে বর্ণনা করতো, (উপরন্তু) যারা তোমাদের ভয় দেখাতো যে, তোমাদের আজকের এ দিনের সম্মুখীন হতে হবে; (সেদিন) ওরা বলবে, হাঁ (এসেছিলো, তবে আজ) আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, (মূলত) দুনিয়ার জীবন এদের প্রতারিত করে রেখেছিলো, তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই একথার সাক্ষ্য দেবে যে, তারা (আসলেই) কাফের ছিলো। ১৩১. এটা এ জন্যে, তোমার মালিক অন্যায়ভাবে এমন কোনো জনপদের মানুষকে ধ্বংস করেন না, যার অধিবাসীরা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) সম্পূর্ণ গাফেল থাকে। ১৩২. তাদের নিজস্ব কর্ম অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই

عَمِلُوْا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَآ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ أٰخَرِيْنَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

(তার) মর্যাদা রয়েছে, তোমার মালিক তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন। ১৩৩. তোমার মালিক কারো মুখাপেক্ষী নন, দয়া ও অনুগ্রহের মালিক তিনি; তিনি যদি চান তাহলে তোমাদের (এই জনপদ থেকে) সরিয়ে নিতে পারেন, এবং তোমাদের পরে অন্য যাদের তিনি চান এখানে (তোমাদের জায়গায়) বসিয়েও দিতে পারেন, যেমনি করে তোমাদেরও তিনি অন্য সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছেন। ১৩৪. তোমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে, আর তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ব্যর্থ করে দেয়ার ক্ষমতা রাখো না। ১৩৫. (তাদের তুমি বলে দাও,) হে আমার জাতি, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় (যা যা করার) করে যাও, আমিও (আমার করণীয়) করে যাবো, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, কার জন্যে পরিণামের (সুন্দর) ঘরটি (নির্দিষ্ট) রয়েছে; (এও জানতে পারবে যে,) যালেমরা কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে না।

তাফসীর

আয়াত ১২৮-১৩৫

এই পর্বটি সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী পর্ব থেকে পৃথক নয়, বরং তারই সম্প্রসারণ। এক হিসাবে এটা জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের পরিণতি সংক্রান্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা। আল্লাহর সরল ও সঠিক পথের ওপর অবিচল মোমেনদের পরিণাম বর্ণনার অব্যবহিত পরই এ বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অন্য এক হিসাবে এটা ঈমান ও কুফরের আলোচনার ধারাবাহিকতা। আইন প্রণয়ন ও সার্বভৌমত্ব বিষয়ক আলোচনা প্রসংগেই এটা উত্থাপিত হয়েছে। আর এই আইন প্রণয়ন ও সার্বভৌমত্বের বিষয়টাকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এই পর্বে। এই মৌল তত্ত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে আখেরাতে কর্মফল লাভ। এ সম্পর্কে সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের প্রক্রিয়া যথারীতি অব্যাহত রাখার পর অনুরূপ কর্মফল প্রাপ্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এই মৌল তত্ত্বগুলোর মধ্যে আর একটি এই যে, আল্লাহ তায়ালা শয়তানদেরকে, তাদের সাংগোপাংগদেরকে এবং সমগ্র মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্য সৃষ্টিকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর আযাবের সামনে মানব জাতি সামগ্রিকভাবেও দুর্বল ও অসহায়। এই মৌল তত্ত্বগুলোর সবই আকীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত এবং তা যবাই করা জন্তু জানোয়ারের হালাল হারাম বিষয়ক আলোচনার পরপরই এসেছে। অতপর পুনরায় এসেছে ফসল,

পশু ও সন্তানদের নিয়ে মান্নত মানা সংক্রান্ত আলোচনা। এসেছে জাহেলী রীতিপ্রথা ও মতাদর্শ সংক্রান্ত বক্তব্য। তাই সমগ্র আলোচনা এই সমস্ত বিষয়ের সমন্বিত রূপেই এবং ইসলামের নির্ধারিত স্বাভাবিক রূপেই প্রকাশ পাবে। সেই রূপটি এই যে, আল্লাহর মানদন্ডে এবং আল্লাহর মহান কেতাবে এই সবগুলোকেই আকীদা বিষয়ক বলে গন্য করা হয়েছে।

জ্বিন ও মানুষ শয়তানদের সখ্যতা

পূর্ববর্তী পর্বে সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাদের বুককে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ফলে তাদের অন্তর সব সময় আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, উদাসীন হয় না, তারা শান্তির ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহর সাথে বজায় থাকে তাদের বন্ধুত্ব। এবার এর ঠিক বিপরীত দৃশ্যটি তুলে ধরা হচ্ছে। কেয়ামতের দৃশ্যসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে এটাই কোরআনের সর্বাধিক প্রচলিত রীতি। এখানে সেই সব জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যারা পরস্পরকে বিভ্রান্তিকর ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, প্রত্যেকে নবীর শত্রু হিসাবে এক অপরকে সাহায্য করে এবং পরস্পরকে মুসলমানদের সাথে হালাল হারাম বিষয়ে তর্ক করতে প্ররোচিত করে। তাদেরকে অত্যন্ত জীবন্ত দৃশ্যের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। মনে হয়, তারা সেখানেও বেশ বাকপটু। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফয়সালা ও হুমকিও উচ্চারিত হয়েছে। পুরো আলোচনাটা অত্যন্ত সজীব এবং কেয়ামতের জ্বলন্ত দৃশ্যে ভরপুর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যেদিন তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে ...' (আয়াত ১২৮ - ১৩০)

'যেদিন তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন'। এখানে দৃশ্যটা তুলে ধরা হয়েছে ভবিষ্যতের। কিন্তু তা শ্রোতার সামনে এসেছে এমনভাবে যেন সে তা সরাসরি এক্ষুণি দেখতে পাচ্ছে। একটি মাত্র শব্দ উহ্য রেখে দৃশ্যটাকে এরূপ সজীব করা হয়েছে। মূল কথাটা ছিলো এরকম, 'যেদিন তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে বলবেন, হে জ্বিন ও মানুষ জাতি.......'।

'তাদেরকে বলবেন' এই কথাটা উহ্য রেখে ভবিষ্যতের ঘটনাকে বর্তমান চাক্ষুষ ঘটনায় পরিণত করেছেন। এটা কোরআনের বাচন ভংগির একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'হে জ্বিন জাতি, তোমরা মানব জাতির অনেককে নিজেদের অনুসারী বানিয়েছিলে...'

অর্থাৎ অনেক মানুষকে তোমাদের তাবেদার বানিয়েছিলে, তারা তোমাদের যাবতীয় উপদেশ ও প্ররোচনা শুনতো এবং তোমাদের অনুকরণ করতো। কথাটা জ্বিনদেরকে জানানোর জন্যে বলা হয়নি। জ্বিনরা এমনিতেই জানতো যে, তারা বহু মানুষকে তাদের অনুসারী বানিয়েছে। আসলে এ কথা দ্বারা তাদের এতো বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিপথগামী করার এই অপরাধকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও সেজন্যে তাদেরকে ভর্ৎসনা করাই এর উদ্দেশ্য। এ জন্যে এখানে জ্বিনদের কোনো জবাব উদ্ধৃত করা হয়নি। বরং শয়তানের কু-প্ররোচনাকে যারা তেমন গুরুত্ব দিতো না সেই সরলমতি শয়তানভজা মানুষেরা জবাব দেয়।

'তাদের তাবেদার মানুষেরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা পরস্পরের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছিলাম এবং আমাদের জন্যে তুমি যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছো, তা আমরা পূর্ণ করেছিলাম ...'

এই জবাব থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, শয়তানের অনুসারী মানুষগুলো কী সাংঘাতিক রকমের সরলতা ও বোকামিতে ভোগে। অনুরূপভাবে এ জবাব থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শয়তান কিভাবে মানুষকে ধোকা দেয়। মানুষকে জ্বিনরা বিভ্রান্ত করতো, তাদের বাতিল চিন্তাধারা, ধৃষ্টতা

এবং গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহকে বাহবা দিয়ে উৎসাহিত করতো ও ভালো কাজ হিসাবে চিহ্নিত করতো। আর এতে মানুষেরা আহলাদে আটখানা হয়ে যেতো এবং আনন্দে গদগদ হতো। আর এই আনন্দ-উল্লাসের সুযোগেই শয়তান তাদের দেহের শিরায় শিরায় ঢুকে যেতো। এই সব বেকুফ ও আত্মভোলা মানুষ দ্বারা শয়তানও লাভবান হতো। শয়তান তাদেরকে নিয়ে খেলা করতো, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো, আর এসবই করতো মানব জাতির মধ্যে ইবলীসের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে। এই সমস্ত সরল ও আত্মভোলা মানুষেরা একে মনে করতো পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা ও লাভের বিনিময়। এ লাভ ও সুবিধা তাদের পার্থিব জীবনের মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকতো। অবশেষে সেই মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কেয়ামতের দিনই শুধু টের পাবে যে, ওই আয়ুষ্কালের মেয়াদটা আল্লাহই দিয়েছিলেন এবং সেই মেয়াদকালে তারা আল্লাহর মুঠোর মধ্যেই ছিলো।

অবশেষে সেই শেষ বিচারের দিন ন্যায়সংগত কর্মফল ঘোষণা করে বলা হবে,

'আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আগুনই আজ তোমাদের ঠিকানা। সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যাকে বাঁচিয়ে দিতে চান, তার কথা ভিন্ন ....।

বস্তুত আগুনই স্থায়ী ঠিকানা হবে। 'অবশ্য আল্লাহ যা চান ...' একথাটার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর ইচ্ছা সব রকমের ধ্যান ধারণা এবং আকীদা বিশ্বাসের উর্ধে। কেননা আল্লাহর অবাধ ও উন্মুক্ত ইচ্ছার বিষয়টি ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের অন্যতম স্তম্ভ। আল্লাহর ইচ্ছা কোনো কিছুতেই সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি আল্লাহর ইচ্ছা একবার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয়।

'নিশ্চয় তোমার প্রভু মহাবিজ্ঞানী ও মহাজ্ঞানী।'

অর্থাৎ তিনি নিজের জ্ঞান এবং গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞার বলে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা ও কার্যকর করেন। এতো জ্ঞান ও এমন প্রজ্ঞা তাঁর ছাড়া আর কারো নেই।

দৃশ্যটা পূর্ণ করার জন্যে সংলাপ পুনরারম্ভ করার আগে এই দৃশ্যের যে অংশটা শেষ হলো, তার ওপর উপসংহার টানা হয়েছে এভাবে,

'এভাবেই আমি যালেমদেরকে পরস্পরের বন্ধু বানাই ....'

অর্থাৎ জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যেমন বন্ধুত্ব ও তাবেদারীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এ ধরনের বন্ধুত্বের যেমন পরিণতি হয়, ঠিক তেমনি আমি যালেমদেরকে তাদের অপকর্মের পরিণতি স্বরূপ পরস্পরের বন্ধু বানাই। কেননা তাদের মধ্যে স্বভাবে ও বাস্তবতায় সাদৃশ্য রয়েছে এবং উদ্দেশ্যে লক্ষ্যে ও পরিণতিতেও মিল রয়েছে।

এটা শুধু সংশ্লিষ্ট স্থান ও কালের চিত্র নয়, বরং সর্বকালেই জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের মধ্যে এ ধরনের সখ্য ও বন্ধুত্ব বিরাজ করে। যালেমরা অর্থাৎ কোনো না কোনো পর্যায়ে যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, তারা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিহত করার জন্যে পরস্পরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে এবং নবী ও মোমেনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করার লক্ষ্যে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে। একেতো তারা জাতে এক এবং চরিত্রে এক, যতোই তাদের আকার আকৃতি ভিন্ন হোক না কেন, তদুপরি তাদের স্বার্থও অভিন্ন। একদিকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌত্বের আনুগত্যের কোনো তোয়াক্কা না করে প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী অনুসারে চরম স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করা, অপরদিকে মানুষের ওপর খোদা ও প্রভু হয়ে চেপে বসা হচ্ছে উক্ত স্বার্থের ভিত্তি।

আমরা তাদেরকে সফল যুগে একই গোষ্ঠীরূপে দেখতে পাই, যদিও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও স্বার্থের সংঘাত থাকে। কিন্তু সংঘাতটা যখন আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর প্রিয়

বান্দাদের সাথে হয়, তখন তারা পরস্পরকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করে। তাদের স্বভাব ও লক্ষ্যের ঐক্যের কারণে তারা সত্যের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে তাদের গুনাহ ও অপকর্মের কারণে আখেরাতে তাদের পরিণতিও একই রকম হয়, যেমনটি একটু আগে ১২৮ আয়াতের শেষ ভাগে দেখলাম।

আমরা এ যুগে এবং বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে ইহুদী খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও কমিউনিষ্ট নামক মানুষ শয়তানদের মধ্যে বহু বিষয়ে পারস্পরিক মতভেদ থাকা সত্তেও ইসলামের বিরুদ্ধে ও পৃথিবীর সকল অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বিরাট জোটের আকারে সংঘবদ্ধ হতে দেখছি। এ জোট নিসন্দেহে ভয়াবহ। এদের কাছে শুধু যে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার শত শত বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে তা নয়, বরং তাদের কাছে রয়েছে প্রয়োজনীয় সকল বস্তুগত ও সাংস্কৃতিকর বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি এবং জোটের শয়তানসুলভ চক্রান্ত ও কুমতলব সিদ্ধ করা ও সমগ্র এলাকাকে পদানত করার যোগ্য সাজ সরঞ্জাম। অপশক্তির এই বিশাল জোটের কথাই ১২৯ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে যে, 'এভাবেই আমি যালেমদেরকে পরস্পরের বন্ধু ও সহায়ক বানাই ....' তবে এ ধরনের জোটের ক্ষেত্রে আল্লাহর স্বীয় নবীকে প্রদত্ত নিম্নের আশ্বাসবাণীও প্রযোজ্য,

'আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তারা এ কাজ (পরস্পরকে বিভ্রান্তিকর কথা দ্বারা উস্কানি ও কুপ্ররোচনা দান) করতো না। কাজেই তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা প্রচারণার পরোয়া করো না।' তবে এই আশ্বাসবাণী শুধু আবৃত্তি করলে কাজ হবে না, এর দাবী এই যে, হুবহু রসূল (স.)-এর পদাংক অনুসারী ঈমানদার ও সৎলোকদের একটি সংগঠন থাকতে হবে এবং এই সংগঠনকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল অপশক্তির পরিচালিত এই সর্বাত্মক যুদ্ধের মোকাবেলায় সে রসূল (স.)-এরই স্থলাভিষিক্ত।

জ্বিন ও মানবজাতির কাছে প্রশ্ন

এরপর ১৩০ আয়াতে যে প্রশ্নোত্তরের দৃশ্যটি তুলে ধরা হয়েছে, আমরা সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি,

'হে জ্বিন ও মানব জাতি, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা আসেননি?...' পৃথিবীতে তাদের কাছে রসূলদের আগমন ও তাদের সাথে কাফেরদের আচরণের কথা আল্লাহর অজানা নয়, তথাপি তাদের কাছে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছে তাদের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে। তাদের জবাব দ্বারা আখেরাতে তাদের শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু প্রশ্নটা জ্বিন ও মানুষ উভয়কেই করা হয়েছে, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ তায়ালা কি মানুষের মতো জ্বিনদের কাছেও রসূল পাঠিয়েছেন? মানব জাতির দৃষ্টির আড়ালে অবস্থানকারী এই সৃষ্টির খুটিনাটি খবর আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে আয়াতটার ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, জ্বিনেরা নবীদের কাছে আসা ওহীর বাণী শুনতো এবং নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে তা জানাতো এবং তাদেরকে সতর্ক করতো। যেমন সূরা আহকাফে জিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমি তোমার দিকে জ্বিনদের একটি দলকে কোরআন শুনতে পাঠালাম। তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে পরস্পরকে বললো, চুপ করে শোনো। কোরআন শোনার পালা শেষ হলে তারা তাদের স্বজাতির কাছে সতর্ককারী হিসাবে ফিরে গেল। তারা বললো, হে আমাদের জাতি, মূসার পর মূসার কেতাবের সমর্থনকারী এক কেতাব শুনে এসেছি। এ কেতাব সত্যের দিকে এবং সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের জাতি, আল্লাহর আহবায়কের আহবান গ্রহণ করো এবং তার ওপর ঈমান আনো। .. সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, মানুষের সাথে

সাথে জ্বিনদের সাথেও এই প্রশ্নোত্তরটা হয়তো উপরোক্ত পটভূমিতেই হয়ে থাকবে। তবে বিষয়টা সংক্রান্ত আসল জ্ঞান আল্লাহর কাছেই রয়েছে। এ বিষয় নিয়ে এতটুকু আলোচনা করাই যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী আলোচনা নিরর্থক।

যাই হোক, জিজ্ঞাসিত জ্বিন ও মানুষেরা বুঝতে পেরেছে যে, প্রশ্নটা প্রশ্ন করার জন্যে করা হয়নি বরং তাদের স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে ও ধমকানোর জন্যে করা হয়েছে। এ জন্যে তারা পুরো স্বীকারোক্তি দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের অবস্থার যথাযথ বিবরণ দিয়েছে,

'তারা বললো, আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি।'

এই পর্যায়ে বিবরণের মাঝখানে মন্তব্য করা হচ্ছে, জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে দিয়েছিলো। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা কাফের ছিলো।'

এখানে তাদের দুনিয়ার অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে দুনিয়ার জীবন ধোকা দিয়েছিলো এবং কুফরীতে লিপ্ত করেছিলো। এক্ষণে কেয়ামতের ময়দানে যেখানে অস্বীকার করে ও দম্ভ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, তাই নিজেদের অপরাধ খোলাখুলি স্বীকার করছে। মানুষের জন্যে এর চেয়ে খারাপ পরিণতি আর কিছু হতে পারে না যে, সে আত্মপক্ষ সমর্থন বা অস্বীকার করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না।

এখানে আমরা কোরআনের এক বিস্ময়কর প্রকাশভংগির সাক্ষাত পাই যে, সে কেয়ামতের দৃশ্যকে বর্তমান এবং বর্তমান দুনিয়ার অবস্থাকে সুদূর অতীতের ঘটনার আকারে তুলে ধরছে।

কোরআন চলমান পৃথিবীতে পঠিত। অথচ তা আখেরাতের ঘটনাবলীকে বর্তমানের এবং দুনিয়ার ঘটনাকে অতীতের ঘটনার আকারে তুলে ধরে। ফলে আমরা যেন ক্ষণেকের জন্যে হলেও ভুলে যাই যে, কেয়ামত ভবিষ্যতের ব্যাপার। বরং মনে হয় যেন ওটা এই মুহূর্তেই আমাদের সামনে উপস্থিত। আর দুনিয়ার জীবন যেন আমাদের কাছে অতীতের এক ফেলে আসা ইতিহাস বলে মনে হয়। এটা কোরআনের এক অনুপম প্রকাশভংগি বটে।

কেয়ামতের দৃশ্যের বর্ণনা শেষে কোরআন রসূল (স.), মোমেনরা ও সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তানদের কর্মফল সংক্রান্ত এই ঘোষণার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেছে। উক্ত ঘোষণায় কাফের জ্বিন ও মানুষদেরকে দোযখে পাঠানোর রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনার আওতায় এসেছে রসূলদের আগমন, রসূলদের দাওয়াত, সতর্কীকরণ সব কিছু সম্পর্কেই কাফেরদের স্বীকারোক্তি। এই পর্যালোচনা ও মূল্যায়নে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করার আগে তাঁর বান্দাদেরকে পাকড়াও করেন না এবং শাস্তি দেন না। শাস্তি দেয়ার আগে তাদের কাছে তাঁর আয়াত পাঠ করানো হয় এবং সতর্ককারীরা গিয়ে সতর্ক করে,

'কারণ তোমার প্রতিপালক জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে তার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকা অবস্থায় ধ্বংস করেন না।' (আয়াত ১৩১)

মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের দাবী এই যে, তাদের কাছে কোনো না কোনো রসূলকে না পাঠানো পর্যন্ত তারা কুফর ও শেরকে লিপ্ত হওয়া সত্যেও তাদেরকে যেন শাস্তি না দেন।

একথা যদিও সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের সহজাত মন ও বিবেককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেই সৃষ্টি করেছেন, তথাপি তার মধ্যে বিপথগামী হবার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। মানুষকে তিনি যেমন বিবেক ও বোধশক্তি দিয়েছেন, তেমনি তার বিবেকের বিভিন্ন কামনা-বাসনার

ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। অনুরূপভাবে, আল্লাহর এই মহাবিশ্বরূপী গ্রন্থে অনেক উজ্জ্বল নিদর্শন থাকা সত্তেও মানব সত্ত্বায় বিদ্যমান গ্রহণযন্ত্রগুলো ওইসব নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণে বিকল বা অক্ষমও হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা মানব সত্ত্বার অভ্যন্তরে নিহিত এই সব সাজ-সরঞ্জামকে তথা বিবেক বুদ্ধি, মন ও অন্যান্য গ্রহণযন্ত্রকে মরিচামুক্ত করা, এগুলোর বৈকল্য ও বিকৃতি সারানো, এবং তার অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনা অনুভূতিকে শানিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রসূলদের ওপর। রসূলরা আল্লাহর বাণীকে যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেয়া ও মানুষকে সতর্ক করার পর যারা তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে ও দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের জন্যে তিনি আযাব নির্ধারিত করে রেখেছেন।

এ দ্বারা একদিকে যেমন বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এই মানব জাতির ওপর কতো দয়ালু যে, তার হেদায়াতের জন্যে এতো সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, অপরদিকে তেমনি এটাও জানা যায় যে, মানুষের সহজাত বিবেক বুদ্ধি ও মনকে তিনি কতো গুরুত্ব ও মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে এই সহজাত বিবেক, মন ও অন্যান্য অন্তর্নিহিত শক্তি এককভাবে মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা, সত্যের দিকে পরিচালিত করা এবং প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। একমাত্র আকীদা বিশ্বাস ও ধর্মের সহায়তা ও সমর্থন পেলেই এগুলো মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করতে পারে।

পরবর্তী আয়াতে কর্মফল সম্পর্কে আর একটি তথ্য জানানো হয়েছে, মোমেনদের ও শয়তানদের উভয়ের বেলায় একই রকম,

'প্রত্যেকের কৃতকর্মের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ...... ' (আয়াত ১৩২)

অর্থাৎ মোমেনদের জন্যে যেমন বিভিন্ন স্তর রয়েছে একটার চেয়ে আর একটা উচ্চতর, তেমনি শয়তানদের জন্যেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে একটার চেয়ে আর একটা নিকৃষ্টতর। এই স্তর বিন্যাস্ত হবে প্রত্যেকের কর্মের মান অনুপাতে। আর প্রত্যেকের কৃতকর্মের ওপর কঠোর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। ফলে একটি কর্মও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারবে না। 'তোমার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন।'

সত্যবিমুখদের প্রতি ক্রমাগত হুমকি

এরপর ১৩৩ আয়াতের বক্তব্য হলো, আল্লাহ তায়ালা কেবল তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবশতই নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি নিজে তাদের ঈমান ও এবাদাতের মুখাপেক্ষী নন। তারা সৎকাজ করলে তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। অনুরূপভাবে তিনি যে মোশরেক ও পাপাচারী প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখছেন, সেটা তাঁরই দয়ার আলামত। নচেত তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে সক্ষম,

'তোমার প্রতিপালক অভাবশূন্য, অমুখাপেক্ষী ও দয়াময়। ...' (আয়াত ১৩৩)

সুতরাং মানুষের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা কেবল আল্লাহর দয়াতেই বেঁচে আছে, তাদের জীবন আল্লাহর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল, তাদের হাতে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম তা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত। ওটা তাদের নিজস্ব নয় এবং আপনা থেকেই তা হয়নি। সুতরাং তাদের ওপর এবং তাদেরকে যা কিছু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কোনো হাত নেই এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই। তাদেরকে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত করা এবং অন্যদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা তার জন্যে সহজ কাজ। ইতিপূর্বেও তিনি তাদেরকে আরেকটি প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। একমাত্র নিজের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ক্রমেই এটা করেছেন।

যে সব অত্যাচারী ও দুরাচারী জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান ষড়যন্ত্র ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে লিপ্ত থাকে, নিজেদের ইচ্ছামতো হালাল-হারাম স্থির করে এবং নিজেদের তৈরী আইন দেখিয়ে আল্লাহর আইন নিয়ে তর্ক করে, অথচ তারা আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, নিজ দয়ায় তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যখন ইচ্ছা তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যাদেরকে চান তাদের স্থলাভিষিক্ত করেন, সেই সব অত্যাচারী দুরাচারী শয়তানদের মনের ওপর এ আয়াতগুলো হাতুড়ির আঘাত স্বরূপ। একই সাথে এ আয়াতগুলো ওই শয়তানদের অত্যাচার উৎপীড়ন, ও চক্রান্তের শিকার মুসলমানদের মনে সান্ত্বনার প্রলেপ স্বরূপ। শয়তানরা যতো বাড়াবাড়ি ও চক্রান্ত চালাক না কেন, তারা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ও দুর্বল।

এরপর ১৩৪ আয়াতে আরেক দফা হুমকি উচ্চারিত হয়েছে, 'তোমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে তা আসবেই আসবে। তোমরা তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না।'

অর্থাৎ ওহে স্পর্ধিত জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের গোষ্ঠী, তোমরা আল্লাহর মুঠোর মধ্যে ও তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছ, তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বজ্র কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ আছো, কাজেই তাঁর পাকড়াও ও শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। কেয়ামতের দিন তোমাদের জন্যে অবধারিত। সেই দিন মহাশক্তিধর আল্লাহর পাকড়াও তোমরা এড়াতে পারবে না।

পরবর্তী আয়াতে আরেকটি হুমকি রয়েছে। তবে তা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন।

'বলো, হে আমার জাতি, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ করতে থাকো...'

(আয়াত ১৩৫)

এটা এমন এক ব্যক্তির হুমকি, যিনি সত্যের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল। যে সত্য জীবন বিধান তিনি সাথে করে এনেছেন, যে মহাসত্য জগত ও মহাসত্য সত্ত্বা মানব জাতির দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে আর সেই সত্যের যে দুর্জয় শক্তি রয়েছে, সেই সত্য ও তার শক্তির ওপর তাঁর অবিচল আস্থা বিদ্যমান। এই আস্থার ভিত্তিতেই রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে হুমকি উচ্চারিত হয়েছে যে, তিনি মোশরেকদের দায়দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি কারো পরোয়া করেন না। কারণ তিনি নিজে সত্যের ওপর আছেন এবং তাঁর কাছে নাযিল হওয়া বিধান আগাগোড়া অকাট্য সত্য। আর তাঁর বিরোধীরা যে গোমরাহীতে নিমজ্জিত এবং তাদের পরিণাম যে ভয়াবহ, সে ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত।

'অত্যাচারী দুরাচারীরা কখনো সফল হয় না।'

অর্থাৎ এটা একটা চিরন্তন ও অমোঘ বিধি যে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো বন্ধু ও সহায়ক নেই, যারা আল্লাহর হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে না, অথচ আল্লাহর পথের বাইরে গোমরাহী ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নেই, সেই সব মোশরেক কখনো সফল হবে না।

সূরার পরবর্তী পর্ব ১৩৬ থেকে ১৫২ আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ দীর্ঘ পর্বটি শুরু করার আগে বর্তমান পর্বটির আলোচিত বিষয়গুলোর ওপর একটা সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি বুলানোর প্রয়োজন মনে করছি। কেননা এই পর্বটি এর পূর্ববর্তী পর্বদ্বয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ স্বরূপ। পূর্ববর্তী পর্বটির প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা জন্তুর হালাল হওয়া এবং আল্লাহর নাম ছাড়া যবাই করা জন্তুর হারাম হওয়া সংক্রান্ত। আর এর পরবর্তী পর্বটিতে রয়েছে ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানদের নিয়ে মান্নত মানা সংক্রান্ত বিধি। এ দুই পর্বের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী বর্তমান পর্বটিতে আলোচিত হয়েছে কিছু মৌলিক আকীদা বিশ্বাস,

আখেরাতের কিছু দৃশ্য, ঈমান ও কুফরের স্বভাব প্রকৃতি, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের সাথে আল্লাহর নবী ও মোমেনদের সংঘাত সংগ্রাম এবং সার্বিক প্রেক্ষাপটে ঈমান ও আকীদা সংক্রান্ত আরো কিছু প্রেরণাদায়ক ও উদ্দীপনাময় তত্ত্ব ও তথ্য।

মধ্যবর্তী এই পর্বটি নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা দেখতে চাই কোরআনী বিধান মানব জীবনের এই সব খুঁটিনাটি সামাজিক রীতিনীতির প্রতি কতোখানি দৃষ্টি দেয়, আর এই সমস্ত রীতিনীতি আল্লাহর আইন ও শরীয়ত মোতাবেক হোক এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক, সে ব্যাপারে কতোখানি মনোযোগী।

কোরআনী বিধান এ বিষয়টির দিকে কেন এতো মনোযোগী?

মনোযোগী এ জন্যে যে, এটি নীতিগতভাবে ইসলামের সমগ্র 'আকীদা' তথা মৌল তত্ত্বের এবং গোটা 'দ্বীনের' সংক্ষিপ্ত-সার। ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের মূলকথা হলো 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই'– এই সাক্ষ্যদান। এই সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে একজন মুসলমান তার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার প্রভুত্ব উচ্ছেদ করে এবং শুধুমাত্র আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর এ কারণে সে সবার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে এবং সমস্ত সার্বভৌমত্বকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে। এই সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের ক্ষমতা ও অধিকার যেমন বড় আইন রচনায় ব্যবহার করতে হয়, তেমনি ছোট আইন বা বিধি উপবিধি রচনায়ও। সুতরাং আইন প্রণয়ন ও হুকুম দেয়া বলতেই প্রভুত্ব তথা খোদায়ীর অধিকার প্রয়োগ বুঝায়। আর এই অধিকার ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো থাকতে পারে– এটা কোনো মুসলমান স্বীকার করতে পারে না। ইসলামের 'দ্বীন' শব্দের অর্থই হলো জীবনের প্রতিটি কাজে, চিন্তায় ও বিশ্বাসে বান্দা কর্তৃক আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য এবং গায়রুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো হুকুমদাতার হুকুম প্রত্যাখ্যান। আইন প্রণয়ন বা হুকুম দান যেমন প্রভুত্ব ও খোদায়ী, তেমনি আইন বা হুকুমের আনুগত্য হচ্ছে গোলামী বা এবাদাত। এ জন্যে এ ক্ষেত্রে মুসলমান শুধু আল্লাহর হুকুম পালন ও শুধু আল্লাহর আনুগত্য করে এবং প্রত্যেক গায়রুল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করে।

এ কারণেই সমগ্র কোরআন জুড়ে এই মৌলিক আকীদার ওপর জোর দেয়া হয় এবং এর ওপর এতো বেশী নির্ভর করা হয়, যেমনটি আমরা এই মক্কী সূরায় এবং কোরআনের মক্কী অংশের সর্বত্র দেখতে পাই। কোরআনের মক্কী সূরাগুলো মুসলমানদের সামষ্টিক জীবনের নিয়ম বিধি ও আইন কানুন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেবল আকীদাগত ও তাত্ত্বিক বিষয়টির ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখে। এই হচ্ছে প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত এই মৌল আকীদার ওপর কোরআনের এতো জোর দেয়ার পটভূমি। (আয়াত ১৩৬-১৫২)

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ

১৩৬. স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে শস্য উৎপাদন করেছেন ও গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, এ (মূর্খ) ব্যক্তিরা তারই এক অংশ আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখে এবং নিজেদের খেয়ালখুশীমতো (একথা) বলে, এ অংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, আর এ অংশ হচ্ছে আমাদের দেবতাদের জন্যে, অতপর যা তাদের দেবতাদের জন্যে (রাখা হয়) তা (কখনো) আল্লাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না, (যদিও) আল্লাহর (নামে) যা (রাখা হয় তা শেষতক) তাদের দেবতাদের কাছে গিয়েই পৌঁছে; কতো নিকৃষ্ট তাদের এ বিচার! ১৩৭. এভাবে বহু মোশরেকের ক্ষেত্রেই তাদের শরীক (দেবতা)রা তাদের আপন সন্তানদের হত্যা করার (জঘন্য) কাজটিকেও একান্ত শোভনীয় করে রেখেছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের ধ্বংস সাধন করা এবং তাদের গোটা জীবন বিধানকেই তাদের কাছে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করে দেয়া, অবশ্য আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা (কখনো) এ কাজ করতো না, অতএব তুমি তাদের ছেড়ে দাও, মিথ্যা রচনা নিয়ে (তাদের তুমি কিছুদিন ব্যস্ত) থাকতে দাও। ১৩৮. তারা বলে, এসব গবাদিপশু এবং এ খাদ্যশস্য নিষিদ্ধ (তালিকাভুক্ত), আমরা যাকে চাইবো সে ছাড়া অন্য কেউ তা খেতে পারবে না, এটা তাদের (মনগড়া একটা) ধারণা মাত্র (আবার তারা মনে করে), কিছু গবাদিপশু আছে যার পীঠ (আরোহণ কিংবা মাল সামান রাখার জন্যে) নিষিদ্ধ, আবার কিছু গবাদিপশু আছে যার ওপর (যবাই করার সময়) তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, আল্লাহর ওপর মিথ্যা রচনা করার উদ্দেশেই (তাদের) এসব অপচেষ্টা; অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তাদের এ মিথ্যাচারের জন্যে তাদের (যথাযথ) প্রতিফল দান করবেন। ১৩৯. তারা বলে, এসব গবাদিপশুর পেটে যা কিছু আছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট এবং আমাদের (মহিলা) সাথীদের জন্যে তা হারাম, তবে যদি এ (পশুর পেটে) মরা কিছু থাকে

شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ

তাহলে তাতে তারা (নারী-পুরুষ) উভয়েই সমান অংশীদার; আল্লাহ তায়ালা অতি শীঘ্রই তাদের এ ধরনের উদ্ভট কথা বলার প্রতিফল দান করবেন; নিসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সর্বজ্ঞ। ১৪০. অবশ্য যারা (নেহায়াত) নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের যে রেযেক দান করেছেন তা নিজেদের ওপর হারাম করে নিলো, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে (নানা ধরনের) মিথ্যা (কথা) রচনা করলো; এসব কাজের মাধ্যমে এরা সবাই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলো, এরা কখনো সৎপথের অনুসারী ছিলো না।

রুকু ১৭

১৪১. মহান আল্লাহ তায়ালা- যিনি নানা প্রকারের উদ্যান বানিয়েছেন, কিছু লতা-গুল্ম, যা কোনো কান্ড ছাড়াই মাচানের ওপর তুলে রাখা (হয়েছে, আবার কিছু গাছ), যা মাচানের ওপর তুলে রাখা হয়নি (স্বীয় কান্ডের ওপর তা এমনিই দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন), খেজুর গাছ এবং বিভিন্ন (স্বাদ ও) প্রকার বিশিষ্ট খাদ্যশস্য ও আনার- (এগুলো স্বাদে গন্ধে এক রকমও হতে পারে), আবার তা ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে, যখন তা ফলবান হয় তখন তোমরা তার ফল খাও, তোমরা ফসল তোলার দিনে (যে বঞ্চিত) তার হক আদায় করো, কখনো অপচয় করো না; কেননা, আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। ১৪২. গবাদিপশুর মধ্যে (কিছু পশু হচ্ছে) ভারবাহী ও কিছু হচ্ছে খাবার উপযোগী, আল্লাহ তায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন তা তোমরা খাও এবং (এ পর্যায়ে) কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। ১৪৩. (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দিয়েছেন এই) আট প্রকারের গৃহপালিত জন্তু, (প্রথমত) তার দুটো মেষ, (দ্বিতীয়ত) তার দুটো ছাগল (হে মোহাম্মদ), তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, এর (নর

حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا

দুটো কিংবা মাদি) অথবা তাদের মায়েরা যাকিছু পেটে রেখেছে তার কোনোটি (কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে) হারাম করেছেন? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও! ১৪৪. (তৃতীয়ত) দুটো উট, (চতুর্থত) দুটো গরু; এর (নর দুটো কিংবা মাদী) দুটো কি আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন, অথবা এদের উভয়ের মায়েরা যা কিছু পেটে রেখেছে তা (কি তিনি তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন)? আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদের (হারামের) আদেশটি দিয়েছিলেন তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? অতপর তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে হতে পারে যে মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে অজ্ঞতাবশত আল্লাহর নামে মিথ্যা (কথা) রচনা করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

রুকু ১৮

১৪৫. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (এদের) বলো, আমার কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছে তাতে একজন ভোজনকারী মানুষ (সাধারণত) যা খায় তার মধ্যে এমন কোনো জিনিস তো আমি পাচ্ছি না– যাকে হারাম করা হয়েছে, (হাঁ, তা যদি) মরা জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শুয়োরের গোশ্‌ত (হয় তাহলে তা অবশ্যই হারাম), অতপর এসব হচ্ছে নাপাক, অথবা এমন (এক) অবৈধ (জন্তু) যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে, তবে যদি কাউকে না-ফরমানী এবং সীমালংঘনজনিত অবস্থা ব্যতিরেকে (এর কোনো একটি জিনিস খেতে) বাধ্য করা হয়, তাহলে (তার ক্ষেত্রে) তোমার মালিক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ১৪৬. আর আমি ইহুদীদের জন্যে নখযুক্ত সব পশুই হারাম করে দিয়েছি, গরু এবং ছাগলের চর্বিও আমি তাদের জন্যে হারাম করেছি, তবে (জন্তুর চর্বির)

حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

যা কিছু তাদের উভয়ের পিঠ, আঁত কিংবা হাড়ের সাথে জড়ানো থাকে তা (হারাম) নয়; এভাবেই এগুলোকে (হারাম করে) আমি তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দিয়েছিলাম, নিসন্দেহে আমি সত্যবাদী। ১৪৭. (এরপরও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলো, অবশ্যই তোমাদের মালিক এক বিশাল দয়ার আধার, (তবে) অপরাধীদের ওপর থেকে তাঁর শাস্তি কেউই ফেরাতে পারবে না। ১৪৮. অচিরেই এ মোশরেক লোকগুলো বলতে শুরু করবে, যদি আল্লাহ তায়ালা চাইতেন তাহলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা তো শেরেক করতাম না, না (এভাবে) আমরা কোনো জিনিস (নিজেদের ওপর) হারাম করে নিতাম; (তুমি তাদের বলো, এর) আগেও অনেকে (এভাবে আল্লাহর আয়াতকে) অস্বীকার করেছে; অবশেষে তারা আমার শাস্তির স্বাদ ভোগ করেছে; তুমি (তাদের) জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কাছে কি সত্যিই (এমন) কোনো জ্ঞান (মজুদ) আছে? (থাকলে) অতপর তা বের করে আমার জন্যে নিয়ে এসো, তোমরা তো কল্পনার ওপর (নির্ভর করেই) কথা বলো এবং (হামেশাই) মিথ্যার অনুসরণ করো। ১৪৯. তুমি (আরো) বলো, (সব কিছুর) চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকেই সৎপথে পরিচালিত করে দিতেন। ১৫০. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো (যাও), তোমাদের সেসব সাক্ষী নিয়ে এসো যারা একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তায়ালাই এসব জিনিস (তোমাদের ওপর) হারাম করেছেন। (তাদের মধ্যে) কিছু সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়ও, তবু তুমি তাদের সাথে কোনো সাক্ষ্য দিয়ো না, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা পরকালের ওপর ঈমান আনেনি, আসলে তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে, (তাদেরও তুমি কখনো অনুসরণ করো না।)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

রুকু ১৯

১৫১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি বলো, এসো আমিই (বরং) তোমাদের বলে দেই তোমাদের মালিক কোন্ কোন্ জিনিস তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন (সে জিনিসগুলো হচ্ছে), তোমরা তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, দারিদ্রের আশংকায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা, আল্লাহ তায়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্যে মর্যাদাবান করেছেন তাকে কখনো যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা করো না এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে কতিপয় নির্দেশ), আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, এগুলো যেন তোমরা মেনে চলো, আশা করা যায় তোমরা (তাঁর বাণীসমূহ) অনুধাবন করতে পারবে। ১৫২. তোমরা কখনো এতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না, তবে উদ্দেশ্য যদি নেক হয় তাহলে সে একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমায় পৌঁছা পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওযন (করার সময়) ন্যায্যভাবেই তা করবে, আমি (কখনো) কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখনি তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে)-ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেয়া সব অংগীকার পূরণ করো এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন (তোমরা যেন এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে।

তাফসীর

আয়াত ১৩৬-১৫২

এই দীর্ঘ পর্বটি এর পূর্ববর্তী পর্ব ও তার উপসংহারসহ একটি মক্কী সূরার অংশ বিধায় কোরআনের মক্কায় অবতীর্ণ অংশের অঙ্গীভূত। কোরআনের এই মক্কী অংশের আলোচ্য বিষয় কেবল আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আইনের আদর্শিক ও আকীদাগত ভিত্তি গড়ার জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন, ততোটুকু ছাড়া এতে আইন সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য রাখা হয় না। কেননা ইসলাম তখনো নিজের আইন চালু করবে এমন কোনো রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। ইসলামের অভ্যন্তরে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশকারী, আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর আইন পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদাতকারী একটি পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ গঠনের আগে এবং মানব সমাজকে আল্লাহর আইন ও বিধান অনুসারে শাসনকারী ও আল্লাহর আইনের বাস্তবায়নের জন্যে আল্লাহর শরীয়ত সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনের শর্ত আরোপকারী একটি ক্ষমতাবান ইসলামী রাষ্ট্র আগে শরীয়ত নিয়ে আলোচনা না হোক-এটাই আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন। তাই তিনি এরূপ অসময়োচিতভাবে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হওয়া থেকে শরীয়তকে রক্ষা করেছেন। বস্তুত ইসলামী আইন ও শরীয়ত সংক্রান্ত আলোচনার আগে মানুষের মন মগয ও সামাজিক পরিবেশকে তার উপযোগী করে প্রস্তুত করাই ইসলামের স্বভাব ও নীতি। এই নীতিই তাকে উপযুক্ত নিষ্ঠা, মর্যাদা ও তেজস্বিতা দান করে থাকে।

একটি মক্কী সূরার অংশ হিসাবে এই দীর্ঘ পর্বটিতে আইন প্রণয়নের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই বিষয়টি মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং ইসলামে আইন প্রণয়ন ও হুকুম জারী করার গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেয়। এটা যে ইসলামের প্রধান বিষয়, তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নিয়োজিত হবার আগে আমি কোরআনের সামগ্রিক আদর্শগত প্রেক্ষাপটে এই পর্বটির প্রধান প্রধান আলোচিত বিষয় ও তার ইশারা ইংগিতগুলো তুলে ধরতে চাই।

'জাহেলী যুগের আরব সমাজ তাদের ফসল, জীবজন্তু ও সন্তানাদিকে ঘিরে যে সব জাহেলী রীতি প্রথা পালন ও যেসব অলীক ধ্যান ধারণা পোষণ করতো, এক কথায়, তাদের সমাজ ও সম্পদ সংক্রান্ত রীতি প্রথা ও ধারণা বিশ্বাস নিয়ে পর্বটি আরম্ভ হয়েছে। এই সব ধ্যান ধারণা ও রীতি প্রথা ছিলো নিম্নরূপ,

১. আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে সম্পদ তথা ফসল ও পশু দিয়েছিলেন, তাকে তারা দুই ভাগে ভাগ করতো। একটা অংশ আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতো এবং দাবী করতো যে, এটা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। আর একটা অংশ নির্দিষ্ট করতো তাদের মনগড়া অসংখ্য খোদা তথা দেবদেবীর জন্যে। তাদেরকে তারা তাদের নিজ সম্পদ ও সন্তানদের ওপর আল্লাহর অতিরিক্ত অংশীদার মনে করতো। (আয়াত ১৩৬)

২. এরপর তারা আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট অংশটির ওপর অবিচার করতো। তার একটি অংশ তারা নিয়ে নিতো এবং তা তাদর মনগড়া শরীকদেরকে দিয়ে দিতো। অথচ শরীকদের জন্যে নির্ধারিত অংশটি আল্লাহকে দিতো না। (ওই আয়াতের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)

৩. শরীকদের অর্থাৎ ধর্মীয় পুরোহিতদের উৎসাহ ও প্রেরণায় তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করতো। পুরোহিতরা তাদের জন্যে সামাজিক বিধি ও প্রথা রচনা করতো। সমাজের লোকেরা

সামাজিক চাপে এবং ধর্মীয় কু-সংস্কারের প্রভাবে এই সব বিধি ও প্রথা মেনে চলতো। দারিদ্র ও সামাজিক মর্যাদাহানির ভয়ে তারা মেয়ে শিশুকেও হত্যা করতো। আর মান্নতের ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুও হত্যার আওতায় আসতো। যেমন আব্দুল মোত্তালেব মান্নত করেছিলেন তার যদি দশটা পুত্র সন্তান জন্মে এবং তারা তাকে রক্ষা করার মতো শক্তি সামর্থ অর্জন করে, তাহলে তাদের একজনকে তিনি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেবেন। 'অনুরূপ মোশরেকদের অনেককে তাদের শরীকরা সন্তান হত্যায় উৎসাহিত করে.....' (আয়াত ১৩৭)

৪. তারা কতক পশু ও কতক ফসলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো এবং দাবী করতো যে, ওগুলো আল্লাহর বিশেষ অনুমতি ছাড়া খাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে, কতক পশুর ওপর আরোহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো, আবার কতক পশুকে যবাই করা বা তার পিঠে আরোহণ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণকে নিষিদ্ধ করতো। কতক পশুকে কোরবানীতে যবাই করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো। কেননা হজ্জে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। উপরন্তু তারা বলতো যে, এসব কাজ নাকি তারা আল্লাহর হুকুমেই করে। (আয়াত ১৩৮)

৫. কোনো কোনো পশুর গর্ভস্থ বাছুরকে তারা তাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট ও মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো। তবে গর্ভস্থ বাছুর যদি মৃত হতো, তবে তাকে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যে বৈধ ঘোষণা করতো। অথচ এই হাস্যকর আইনকেও তারা আল্লাহর আইন বলে চালাতো। (আয়াত ১৩৯)

এই ছিলো জাহেলী যুগের আরব সমাজের ধ্যান ধারণা, রীতিপ্রথা ও কর্মকান্ড। কোরআনের এই মক্কী সূরার আলোচ্য দীর্ঘ পর্বটি এই রীতি প্রথাগুলোর অবসান ঘটানো, মানুষের মন থেকে এগুলোর আকর্ষণ মুছে ফেলা এবং সমাজ থেকে এগুলোর উচ্ছেদ ঘটানোর উদ্দেশ্যে নাযিল হয়।

আলোচ্য পর্বে কোরআন যেভাবে উক্ত উদ্দেশ্য সফল করেছে তা হলো, সে প্রথমেই ঘোষণা করেছে যে, নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত যারা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর মিথ্যে দোহাই পেড়ে আল্লাহর দেয়া জীবিকাকে হারাম করেছে, তারা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হয়নি, বরং সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্টও হয়েছে। তাদের ধ্যান ধারণা ও আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যে দাবী সবই বৃথা ও নিষ্ফল হয়েছে।

অতপর সে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই বলে যে, যে ধন সম্পদে তারা এই সব গর্হিত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, সে ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই জন্মিয়েছেন মাচার ওপর তোলা উদ্যানসমূহ এবং মাচার ওপর না তোলা উদ্যানসমূহ। তিনিই তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এতোসব জীবজন্তু। যিনি যাদের জীবিকা দেন, তিনিই তাদের সর্বময় কর্তা, মালিক ও মনিব এবং তিনিই মানব জাতির জন্যে তাদেরকে দেয়া যাবতীয় জীবিকার ব্যাপারে আইন রচনার অধিকারী। এই প্রসংগে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক ফসল ফলমূল ও উদ্যানের উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহের মধ্য থেকে কিছু জীবজন্তুর উল্লেখ করেছেন, যাদের কোনোটা বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কোনোটার গোশত খাওয়া হয়, কোনোটার চামড়া, পশম ও চুল দিয়ে বিছানা তৈরি হয়। এ প্রসংগে মানুষ ও শয়তানের মাঝে বিরাজিত চিরস্থায়ী শত্রুতারও উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, এহেন প্রকাশ্য ও চিরস্থায়ী শত্রুর কু-প্ররোচনায় মানুষ কিভাবে বিভ্রান্ত হয় এবং কিভাবে তাদের পদাংক অনুসরণ করে।

এরপর বিস্তারিত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, পশুদের সম্পর্কে তারা যে ধ্যান ধারণা পোষণ করে, তা নিতান্তই শিশুসুলভ, নির্বোধসুলভ এবং একেবারেই অযৌক্তিক। এই সব বাজে

ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। পর্যালোচনার শেষ ভাগে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন যে, এই সব যুক্তিহীন আইন কানুনকে তোমরা কিসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য মনে করো? 'আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদেরকে এই সব আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?' আর সে জন্যেই কি এই আইনের গুপ্ত রহস্য তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না, এবং শুধু তোমাদেরকেই এই আদেশ দেয়া হয়েছিলো? এখানে আল্লাহর নামে মিথ্যে দোহাই পাড়া ও মিথ্যে অপবাদ দেয়াকে ধিক্কার ও নিন্দা জানানো হয়েছে এবং মানুষকে না জেনে শুনে বিভ্রান্ত করার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। এই নিন্দা ও ধিক্কারকে এই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বকে আইন প্রণয়নের অধিকারের উৎস রূপে গন্য করা হয়েছে, আর এই ক্ষমতা যে সব খাবার জিনিসকে নিষিদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তারও কিছু সংখ্যকের ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে, চাই তা শুধু মুসলমানদের ওপর নিষিদ্ধ করা হোক, অথবা শুধুমাত্র ইহুদীদের ওপর হারাম এবং মুসলমানদের জন্যে হালাল করা হচ্ছে। এরপর যে বিষয়টির পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হলো মোশরেকরা তাদের এই জাহেলী জীবনধারাকে আল্লাহর ইচ্ছার ফল বলে উল্লেখ করেছে। তারা বলেছে, 'আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমরা মোশরেক হতাম না এবং কোনো হালালকে হারাম করতাম না।' এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ ধরনের কথা বলা প্রত্যেক কাফেরেরই বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর আযাব না এসে যাওয়া পর্যন্ত তারা এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকতো না। 'এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা নবীর দাওয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যতক্ষণ না আমার আযাবের স্বাদ উপভোগ করেছে।' বস্তুত আল্লাহর আইন ছাড়াই কোনো জিনিসকে হারাম করা শেরকের মতোই। দুটোই আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্য। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, তোমাদের এই সব মনগড়া হালাল হারামের উৎস ও ভিত্তি কী? অর্থাৎ কোনোই ভিত্তি নেই। 'তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান ও প্রমাণ আছে ?....................'

অতপর এই বিষয়ে তাদের কর্মকান্ডের পর্যালোচনার সমাপ্তি টানা হয়েছে তাদেরকে সাক্ষ্যদানের মঞ্চে আগমনের আহবান জানানোর মধ্য দিয়ে, যেমন সূরার প্রথম দিকেও এ ধরনের আহবান জানানো হয়েছে। উভয় জায়গায় একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একটাই– আল্লাহর সাথে শেরক করা এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আইন প্রণয়ন করা। 'বলো, তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে নিয়ে এসো, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে হারাম করেছেন .... ' (আয়াত ১৫০)

এ আয়াতে আমরা ভাষার অভিন্নতা ছাড়াও যে জিনিসটি লক্ষ্য করি তা এই যে, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আইন প্রণয়ন করে, তাদেরকেই প্রবৃত্তির খেয়ালখুশীর অনুসারী, আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং আখেরাতে অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনগুলোকে স্বীকার করতো, আখেরাতে বিশ্বাস করতো, আল্লাহর নির্দেশকে অনুসরণ করতো, তাহলে আল্লাহকে ডিংগিয়ে নিজেদের জন্যে ও অন্যান্য মানুষের জন্যে আইন প্রণয়নের ধৃষ্টতা দেখাতো না এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া হারাম ও হালাল ঘোষণা করতো না।

পর্বটির শেষপ্রান্তে এসে তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছে যে, এসো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে কী কী অকাট্যভাবে হারাম করেছেন, তা জানিয়ে দেই। এখানে আমরা

সামষ্টিক জীবনের জন্যে কিছু মৌখিক নীতিমালার সাক্ষাত পাই, যার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ রয়েছে তাওহীদের। বাকীগুলোর মধ্যে কিছু আদেশ নিষেধও রয়েছে। তবে নিষিদ্ধ জিনিসই বেশী।

এই সব নিষিদ্ধ জিনিস হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতামাতার প্রতি সদাচরণ, দারিদ্রের ভয়ে সন্তানহনন- এই সাথে জীবিকার আশ্বাসও দেয়া হয়েছে। গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছে যাওয়া, নিষিদ্ধ প্রাণকে ন্যায়সংগতকরণ ব্যতিরেকে হত্যা করা, এতীমের সম্পত্তি ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া স্পর্শ করা যতোক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। অতপর ক্রয় বিক্রয়ের পণ্যকে সঠিকভাবে মাপার আদেশ, সাক্ষ্যদান ও সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের আদেশ, এমনকি সে যদি আত্মীয়ও হয় এবং ওয়াদা পালনের আদেশ। এই সবগুলোকে আল্লাহ তায়ালা নিজের উপদেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বারবার এটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

এই সমস্ত আদেশ নিষেধের মধ্যে আকীদা বিষয়ক মূলনীতি ও ইসলামী আইনের মৌল আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ দুটো বিষয়ের এমন সুসমন্বিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থান ও এমন একত্র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যে, কোরআন অধ্যয়নকারীর কাছে এর তাৎপর্য অস্পষ্ট থাকে না। এই সমস্ত আদেশ ও নিষেধকে এই দীর্ঘ পর্বের শেষে 'আল্লাহর সঠিক ও সরল পথ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। (আয়াত ১৫৪)

এখানে গোটা পর্বের বক্তব্যের সার নির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং একে একটি মাত্র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ঘোষণার আকারে পেশ করা হয়েছে।

এই সার নির্যাস অনুসারে ইসলাম অথবা শেরকের সংজ্ঞা নির্ধারণে ইসলামের আইন কানুন ও আকীদা বিশ্বাস একই ভূমিকা পালন করে। বরঞ্চ এর আকীদা বিশ্বাস থেকেই এর আইন কানুন উৎসারিত। আরো সতর্কভাবে বলতে গেলে, এর আইন কানুন অবিকল এর আকীদা বিশ্বাস। কেননা এর আইন কানুন এর আকীদা বিশ্বাসেরই বাস্তব রূপ। এই মৌলিক সত্যটি কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে এবং কোরআনের বর্ণনাভংগি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অথচ শত শত বছর ধরে মুসলমানদের মনে বিরাজমান ধর্ম সংক্রান্ত ধারণা বিশ্বাস থেকে এই সত্যটিকে ক্রমাগতভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক পন্থায়। এমনকি পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়িয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা তো দূরের কথা, এর উৎসাহী ভক্তরা পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌত্বকে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ব্যাপার বলে মনে করতে আরম্ভ করেছে। ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের জন্যে তারা যেমন উতলা ও আবেগোদ্দীপ্ত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে তেমন হয় না। ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও এবাদাত সংক্রান্ত বিধান থেকে যারা বিচ্যুত, তাদের বিচ্যুতিকে যেমন বিচ্যুতি গন্য করা হয়, ইসলামের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান থেকে বিচ্যুতিকে সে ধরনের বিচ্যুতি গন্য করা হয় না। অথচ ইসলাম এমন একটা জীবন বিধান, যার আকীদা, এবাদাত ও আইন কানুনে কোনো বিভাজন নেই। কিছু কুচক্রী মহল সুপরিকল্পিত পন্থায় শত শত বছর ধরে এর মধ্যে বিভাজন ঢুকানোর চেষ্টা করেছে। এরই ফলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তথা সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত বিষয়টি এতো অপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে, এমনকি ইসলামের সবচেয়ে আবেগাপ্লুত ভক্তদের কাছেও। একটা মক্কী সূরার আলোচ্য বিষয় আইন কানুন ও সরকার নয়। বরং আকীদা বিশ্বাসই তার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। সেই সাথে সে সামষ্টিক জীবনের কোনো একটা উপবিধির বাস্তবায়নেও আগ্রহী হয়ে থাকে। কেননা সামষ্টিক জীবন আর প্রধানতম মূলনীতি – সার্বভৌমত্বের সাথে সংযুক্ত। আর এই প্রধান মূলনীতির ওপর ইসলামের ভিত্তি ও তার প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

যারা মূর্তিপূজাকারীকে মোশরেক বলে অভিহিত করে, অথচ খোদাদ্রোহী শক্তির শাসন ও বিচার ফয়সালা গ্রহণকারীকে মোশরেক বলে আখ্যায়িত করে না এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তির প্রতি বিরক্ত হয়, কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির ওপর বিরক্ত হয় না, তারা কোরআন অধ্যয়ন করে না এবং ইসলামকে চেনে না। তাদের উচিত আল্লাহ যেভাবে কোরআন নাযিল করেছেন, সেই ভাবেই তা পড়া এবং বিশেষত 'কাফেরদেরকে যদি অনুসরণ করো, তবে তোমরা অবশ্য অবশ্য মোশরেক হয়ে যাবে', এই উক্তিটা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা।

ইসলামের এই আবেগদীপ্ত দরদী ভক্তদের কেউ কেউ প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার কিছু কিছু আইন, পদক্ষেপ ও কথাবার্তা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়ে খুঁত ধরেন যে, অমুক কাজ ইসলাম বিরোধী অথবা ইসলাম অনুসারী। কোথাও কোথাও কিছু ইসলাম বিরোধী আইন বা বিধি ব্যবস্থা দেখে তারা রেগে যান। যেন ইসলাম পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছে, তাই অমুক অমুক ক্রটি যেন তার পূর্ণতাকে রাহুগ্রস্ত না করে।

এই সব দ্বীনদরদী ব্যক্তি তাদের অজান্তেই ইসলামের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। বরং এ ধরনের খুঁটিনাটি ক্রটি ধরার জন্যে নিষ্ফল চেষ্টা করে তার দেহে এমন ক্ষতের সৃষ্টি করেন, যা সহজে নিরাময়যোগ্য নয়। জনগণের এমন অনেক মূল্যবান শক্তিকে তারা এই সব খুঁটিনাটি চেষ্টায় অপচয় ও নষ্ট করেন, যা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করা যেত। এসব কাজ দ্বারা তারা আসলে জাহেলী সমাজ রাষ্ট্রের পক্ষে এই বলে সাক্ষ্য দেন যে, ইসলাম এখানে কায়েমই আছে, কেবল অমুক অমুক ক্রটি শুধরালেই তা পূর্ণতা লাভ করবে। অথচ এখানে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার ফয়সালার সর্বময় ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ও এখতিয়ার যতোক্ষণ মানুষের হাত থেকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত না হবে, ততোক্ষণ গোটা ইসলামের অস্তিত্বই বিলুপ্ত থাকবে।

মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বহাল থাকলেই অর্থাৎ আল্লাহর আইন চালু থাকলেই এবং সেই আইন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই ইসলামের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব না থাকলে ইসলামের অস্তিত্বও থাকতে পারে না। আজকের পৃথিবীতে ইসলামের একমাত্র সমস্যা এটাই যে, এখানে খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভূত্বের ওপর আগ্রাসন চালানো, ও তা ছিনতাই করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

অতপর তা নিজের জন্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিশ্চিত করছে এবং জীবন, সহায় সম্পদ ও সন্তানাদি সম্পর্কে নিজেদের খেয়ালখুশীমত বিধি নিষেধ প্রয়োগ করছে। এটাই সেই সমস্যা যার মোকাবেলা করার জন্যে কোরআন এতো বিপুল পরিমাণ উদ্দীপনাময় বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, একে দাসত্ব ও প্রভুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে, এবং এর ওপর ঈমান ও কুফর এবং ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ফয়সালা নির্ভরশীল বলে জানিয়েছে।

ইসলাম স্বীয় অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে সত্যিকার লড়াই চালিয়েছে, তা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত লড়াই ছিলো না। তাই এ কথা বলা যাবে না যে, ইসলামের আবেগোদ্দীপ্ত ভক্তরা নিছক ধর্মীয় পরিচিতির জন্যে চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত। এ লড়াই সামাজিক ও নৈতিক উচ্ছংখলতার বিরুদ্ধেও ছিলো না। কেননা এ সব হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্বের লড়াইয়ের পরবর্তী লড়াই। বস্তুত ইসলাম নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্ব প্রথম যে লড়াই করেছে, তা ছিলো সার্বভৌমত্বের অধিকারী কে হবে, সেটা স্থির করার লড়াই। এ জন্যে সে মক্কায় থাকা অবস্থাতেই

এ লড়াই এর সূচনা করেছিলো। সেখানে সে কেবল আকীদা বিশ্বাসের পর্যায়ে এ কাজ করেছিলো, রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা বা আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেনি। তখন কেবল মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে যে, সার্বভৌমত্ব তথা প্রভূত্ব ও সর্বময় শাসন ক্ষমতা এবং আইন হুকুম জারীর ক্ষমতা ও শর্তহীন আনুগত্য লাভের অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কোনো মুসলমান এই সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করবে না এবং অন্য কেউ দাবী করলেও তা মেনে নেবে না। মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমানদের মনে যখন এই আকীদা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ দিলেন মদীনায়।

সুতরাং ইসলামের একনিষ্ঠ ও আবেগদীপ্ত ভক্তরা ভেবে দেখুন, তারা ইসলামের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করার পর যা করা উচিত তা করছেন কিনা।

প্রাচীন ও আধুনিক জাহেলিয়াতের সামঞ্জস্য

আয়াতগুলোর সার্বিক আলোচনা এ পর্যন্তই। এবার একে একে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করবো।

'আল্লাহ যে ফসল ও গবাধি পশু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে একাংশ তারা আল্লাহর জন্যে বরাদ্দ করতো ...' (আয়াত ১৩৭)

ফসল ও গবাদি পশুর ব্যাপারে প্রচলিত জাহেলী ধ্যান ধারণা ও ঐতিহ্য বর্ণনা করার পাশাপাশি কোরআন ঘোষণা করছে যে, তাদের ফসল ও গবাদিপশু সব আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আকাশ ও পৃথিবী থেকে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জীবিকা প্রদান করে না। এই ঘোষণার পর বলা হচ্ছে তারা আল্লাহর দেয়া এই সব জীবনোপকরণ দিয়ে কী করে। এই দুইটি উপকরণ থেকে তারা একাংশ আল্লাহর জন্যে এবং অপরাংশ তাদের দেবদেবীর জন্যে বরাদ্দ করতো। (মন্দিরের রক্ষক ও পুরোহিতরাই যে শেষোক্ত অংশটির ভক্ষক হতো, সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক) অতপর তারা আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট অংশটিও সাবাড় করে দিতো, যেমন আয়াতে বলা হচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন তারা কোনো খাবার জিনিস কা'বা শরীফে ঢুকাতো, তখন তার একাংশ আল্লাহর জন্যে এবং আর একাংশ মূর্তিগুলোর জন্যে আলাদা আলাদাভাবে রেখে দিতো। মূর্তিগুলোর সামনে রক্ষিত খাবারের ওদিক থেকে আল্লাহর জন্যে রক্ষিত খাবারের দিকে বাতাস প্রবাহিত হলে আল্লাহর অংশটাকে সরিয়ে এনে মূর্তির অংশটার সাথে যুক্ত করতো। আর যখন আল্লাহর অংশের দিক থেকে বাতাস মূর্তিগুলোর অংশের দিকে বয়ে আসতো, তখন যে অংশ যেখানে ছিলো, সেখানেই রেখে দিতো। কোনোটি সরিয়ে রাখতো না। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা মন্তব্য করেছেন যে, 'কতো খারাপ তাদের বিচার-ফয়সালা।'

মোজাহেদ থেকে বর্ণিত, তারা তাদের ফসলের একাংশ আল্লাহর নামে এবং আরেক অংশ তাদের দেবদেবীর নামে নির্দিষ্ট করে রাখতো। এরপর আল্লাহর অংশ থেকে কিছু যদি বাতাসে উড়ে দেবদেবীর অংশে চলে আসতো, তাহলে তারা তা সেই ভাবেই রেখে দিতো। আর যদি দেবদেবীর অংশ থেকে কিছু উড়ে আল্লাহর অংশের দিকে চলে আসতো, তাহলে সেটা তুলে নিয়ে পূর্বের স্থানে রেখে দিতো। তারা বলতো, আল্লাহ তায়ালা তো সম্পদশালী, তাঁর এটুকুর দরকার নেই। আর পশুর মধ্য থেকে যেগুলোকে তারা এভাবে দুই ভাগে ভাগ করতো, তা হলো বাহীরা ও সায়েবা শ্রেণীভুক্ত উটনী। প্রথমটিকে কান চিরে ও দ্বিতীয়টিকে অক্ষত অবস্থায় প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতো এবং দ্বিতীয়টিকে কোনোভাবে কাজে লাগানো বৈধ মনে করতো না।

কাতাদা বলেন, জাহেলী সমাজের কিছু লোক তাদের পশু ও ফসলের একাংশ আল্লাহর জন্যে এবং একাংশ তাদের দেবদেবীর জন্যে বরাদ্দ করতো। যদি আল্লাহর অংশের কিছুটা দেবদেবীর অংশের সাথে মিশে যেত, তবে তা বহাল রাখতো। আর দেবদেবীর অংশের কিছুটা যদি আল্লাহর অংশের সাথে মিশতো, তাহলে তা সেখান থেকে তুলে এনে দেবদেবীর অংশের সাথে মিশিয়ে রাখতো। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আল্লাহর জন্যে বরাদ্দকৃত অংশ ভোগ করতো, দেব দেবীর অংশে হাত দিতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তাদের ফয়সালা ভীষণ খারাপ।'

সুদ্দী বলেন, তারা তাদের সম্পদকে ভাগ করে এক ভাগকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতো। আর ফসলের চারা রোপণ করলে তার একাংশ আল্লাহর জন্যে এবং একাংশ তাদের দেব দেবীর জন্যে নির্দিষ্ট করতো। আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট অংশে যে সফল উৎপন্ন হতো, তা দান করে দিতো। আর দেবদেবীর নামে নির্দিষ্ট অংশে যে ফসল ফলতো, তা দেবদেবীর নামেই ব্যয় করতো। দেবদেবীর অংশের ফসল যখন নষ্ট হয়ে যেতো এবং আল্লাহর অংশ বেশী হয়ে যেতো, তখন তারা বলতো, 'আমাদের দেবদেবীর জন্যে খরচ না করে উপায় নেই।' অতপর আল্লাহর অংশ নিয়ে দেবদেবীর নামে ব্যয় করতো। আর যখন আল্লাহর অংশে ফসল ফলতো না এবং দেবদেবীর অংশের ফসল বেশী হতো, তখন বলতো, 'আল্লাহ তায়ালা চাইলে নিজের অংশ বাড়িয়ে নিতে পারতেন।' তাই দেবদেবীর অংশ থেকে কিছুই আল্লাহর অংশে তুলে দিতো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তাঁরা যদি তাদের বণ্টনের নীতিতে নিষ্ঠাবান হতো, তাহলে বণ্টনের এ পদ্ধতিটা ছিলো নিকৃষ্ট ধরনের। আমার কাছ থেকে নেবে অথচ আমাকে দেবে না– এটা কেমন বিচার?'

ইবনে জারীর বলেন, আল্লাহর উক্তি 'তাদের বিচার ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' এতে উল্লেখিত মোশরেকদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার অংশ থেকে তাদের দেবদেবীর জন্যে নেয় অথচ তাদের দেবদেবীর অংশ থেকে আমাকে দেয় না– এটা তাদের খুবই অন্যায় বিচার। আল্লাহ তায়ালা এ উক্তি দ্বারা তাদের চরম মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার বিবরণ দিয়েছেন। তারা ন্যায়ের পথ থেকে এতোই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে যে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করছেন ও খাদ্য দিয়েছেন এবং যিনি তাদেরকে অপরিমেয় সম্পদ দান করেছেন, তাঁর প্রতিও তারা সুবিচার করতে রাযী নয়। আর অগ্রাধিকার দিলো তাকে, যে তাদের কোনো লাভও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানরা তাদের বন্ধুদের কাছে পশু ও ফসল সম্পর্কে মোমেনদের সাথে ঝগড়া করার জন্যে যে সব কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে, এ হচ্ছে তারই অংশ বিশেষ। এই সব ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপের মধ্যে শয়তানের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। কেননা এ সব কুপ্ররোচনা দিয়ে সে তার বন্ধুদেরকে মোমেনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। মানুষ শয়তানদের তথা সমাজপতি ও পুরোহিতদের স্বার্থ এই যে, প্রথমত এর মাধ্যমে তারা তাদের বন্ধুদের ও অনুসারীদের মনে স্থান করে নেয়, এবং তাদেরকে তাদের মধ্যে প্রচলিত বাতিল ধ্যান ধারণা ও অলীক আকীদা বিশ্বাস অনুসারে তাদের লোভ লালসা চরিতার্থ করতে উস্কে দেয়। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষকে মিথ্যে ধারণায় মাতিয়ে রেখে দেবদেবীর জন্যে বরাদ্দকৃত অংশের নামে নিজেদের আর্থিক লাভবান হবার সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। পক্ষান্তরে জ্বিন শয়তানদের স্বার্থ এই যে, এর মাধ্যমে তারা মানব জাতিকে কুপ্ররোচনা দিয়ে তাদেরকে ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিকৃতির পথে ঠেলে দিতে এবং দুনিয়ার ধ্বংসের মুখে ও আখেরাতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়।

বিকৃতি ও দুর্নীতির এই রূপটি আরবের জাহেলী সমাজে প্রচলিত ছিলো, সমকালীন গ্রীক, পারসিক ও রোম সমাজেও প্রচলিত ছিলো এবং ভারত আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আজও প্রচলিত রয়েছে। এগুলো আর্থিক দুর্নীতির এমন কতকগুলো রূপ, যা শুধু প্রাচীন জাহেলী সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক জাহেলী সমাজেও আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন করেন নি এমন বহু আর্থিক লেনদেনের রীতি প্রচলিত আছে। এভাবে আধুনিক জাহেলিয়াত ওইসব প্রাচীন জাহেলিয়াতের সাথে মোশরেকসুলভ রীতিনীতিতে সমভাবাপন্ন। জাহেলিয়াত এমন প্রত্যেকটি ব্যবস্থা ও রীতিনীতির নাম, যার মাধ্যমে আল্লাহর আইনের অনুমতি ছাড়াই মানুষের কার্যকলাপ পরিচালনা করা হয়। এর আকার আকৃতি যতো বিচিত্র রকমেরই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এভাবে মোশরেকদের জন্যে তাদের শরীকরা তাদের সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে ....' (আয়াত ১৩৮)

অর্থাৎ দেবদেবী ও শয়তানরা যেমন তাদের কাছে তাদের অন্যায় আর্থিক কর্মকান্ডকে শোভন করেছে তথা ন্যায় সংগত কাজ বানিয়ে দেখিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে, তেমনি তারা তাদের সন্তান হত্যাকেও ভালো কাজ বানিয়ে দেখিয়েছে। তারা কখনো অভাবের ভয়ে, কখনো যুদ্ধবন্দিনী হবার ভয়ে, কখনো সামাজিক অমর্যাদার ভয়ে মেয়ে শিশুদেরকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আবার কখনো দেবদেবীর নামে মান্নত মেনে সন্তান বলি দিতো। যেমন আব্দুল মোত্তালেব সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকে রক্ষা করতে সক্ষম এমন দশটি সন্তানের পিতা হলে একটি সন্তানকে বলি দেবেন বলে মান্নত করেছিলেন।

এটা সুবিদিত যে, মানুষ জাহেলী কুপ্রথা দ্বারা প্ররোচিত হয়েই উক্ত উভয় প্রকারের অপকর্মে লিপ্ত হতো। এই সব জাহেলী প্রথা ছিলো মানুষের জন্যে মানুষের রচিত প্রথা। এখানে 'শরীক' বলতে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমাজপতি, পুরোহিত ও মন্দিরের রক্ষকরা এবং জ্বিনদের সহযোগীরা। আয়াতে এই কু-প্ররোচনার মূল উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, 'তাদের ধ্বংস সাধন ও তাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মতলবে....' তাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়াটা তাদের সন্তান হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয়, অতপর সামগ্রিকভাবে সামাজিক জীবনে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা, মানুষের উদভ্রান্ত পশুতে পরিণত হওয়া এবং তাদের নৈরাজ্যবাদী ও দুর্নীতিবাজ শাবকদের স্বার্থ ও খেয়ালখুশীর অনুকূলে পরিচালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এভাবেই তারা সন্তান হত্যা ও সম্পদ বিনাশের প্ররোচনা পায়, অথচ তাকে অগ্রাহ্য করা ও প্রতিরোধ করার কোনো শক্তি পায় না। কেননা ধর্ম সংক্রান্ত বিভ্রান্তিকর ধ্যান ধারণা সমাজে প্রচলিত কুপ্রথাগুলোকে আরো আনুকূল্য ও সহায়তা দিয়ে থাকে।

এই বিভ্রান্তিকর ধর্ম বিশ্বাস এবং তা থেকে উৎসারিত ও সমাজ প্রথা কেবল প্রাচীন জাহেলী সমাজেই সীমিত থাকেনি। আজকের আধুনিক জাহেলী সমাজে আমরা এগুলোর উপস্থিতি আরো পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। এই সব ঐতিহ্য ও রীতিপ্রথা মানুষকে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও দুর্দশায় নিক্ষেপ করে, অথচ তা থেকে সে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পায় না। শুধু দৈহিক ও মানসিক কষ্টে নিক্ষেপ করে না বরং বহু সাধ্যাতীত আর্থিক ব্যয়েরও কারণ ঘটায়। জীবনী শক্তি ধ্বংস করে এবং নৈতিকতার সর্বনাশ সাধন করে। অথচ এ থেকে পরিত্রাণ পাবারও পথ খুঁজে পায় না। সকালে এক পোশাক, দুপুরে এক পোশাক, সন্ধ্যায় আরেক পোশাক, খাটো পোশাক, চাপা পোশাক ও নানা রকমের হাস্যকর পোশাক এবং হরেক রকমের সাজসজ্জা ও বিলাস ব্যসনের

সামগ্রী এ সবই বলতে গেলে দাসত্বের সামগ্রী। এ সব কারা তৈরী করছে এবং কারা এর জন্যে উৎসাহ যোগাচ্ছে? বহু ফ্যাশন কারখানা এর পেছনে রয়েছে, রয়েছে ব্যাংক ও অর্থায়ন সংস্থা, যারা তাদের পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করে এবং বিপুল অংকের মুনাফা লাভ করে। এর পেছনে এক দল ইহুদী পুঁজিপতিও রয়েছে, যারা গোটা মানব জাতিকে ধ্বংস করতে চায়, যাতে বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। তারা প্রকাশ্য অস্ত্র ও সেনাবাহিনী দিয়ে বিশ্বকে দখল করতে চায় না, বরং নিজেদের তৈরি মতবাদ ও মূল্যবোধকে বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। চাপিয়ে দিতে চায় নিজেদের নিকৃষ্ট মতাদর্শ ও কৃষ্টি এবং সমাজ প্রথার আকারে তা চালু করতে চায়। তারা জানে যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিধি-ব্যবস্থা ও রীতি প্রথার আকারে প্রচলিত না করলে শুধু মতবাদ দিয়ে কাজ হয় না। সামাজিক কৃষ্টি ও রীতিপ্রথা এমন এক অস্পষ্ট জিনিস, যা দিয়ে সাধারণ মানুষ তেমন মাথা ঘামায় না। কেননা এর মূল কোথায়, আর শাখা প্রশাখা কোথায়, সে সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা থাকে না।

এটা আসলে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের কারসাজি। এটা বিচিত্র রূপধারী জাহেলিয়াত।

আমরা যদি কোরআনকে শুধু প্রাচীন জাহেলিয়াতের উপাখ্যান মনে করি, সর্বকালের সকল জাহেলিয়াতের বিবরণ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা মনে না করি এবং প্রতি মুহূর্তে বিকৃতির দিকে ধাবমান পরিস্থিতিকে সঠিক পথ 'সেরাতুল মোস্তাকীম'-এর দিকে পরিচালিত করার পথনির্দেশ হিসাবে মনে না করি, তাহলে কোরআনকে সঠিকভাবে বুঝা ও তাদের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।

অবশ্য শয়তানী চক্রান্ত যতোই ভয়াবহ এবং তার চাপ যতোই দুঃসহ হোক, কোরআন আমাদের সামনে আশার আলাও প্রজ্জ্বলিত করে। সে আমাদেরকে জাহেলিয়াতের ভীতি থেকে মুক্ত করে এবং আমাদের সামনে সেই বৃহত্তম সত্য উদঘাটিত করে, যার ব্যাপারে আমরা কখনো কখনো বিভ্রান্তের মধ্যে থাকি। সেই মহাসত্য এই যে, শয়তানরা ও তাদের সাংগোপাংগরা আল্লাহর মুঠোর মধ্যে ও নিয়ন্ত্রণের আওতায়। তারা যে কিছু করে নিজেদের ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থের ভিত্তিতেই করে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের রশ্মি সাময়িকভাবে ঢিলে করে দেন এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে কিছুটা সুযোগ দেন বলেই তারা এটা করতে পারে। এই সুযোগ দানের উদ্দেশ্য হলো তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তারা এসব করতে পারতো-না। কেবল পরীক্ষার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা এই সুযোগ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। কাজেই রসূল (স.) ও মোমেনদের ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। তাদের নিজ কাজ যথারীতি চালিয়ে যাওয়া উচিত। শয়তানরা যতো চক্রান্ত করতে চায় এবং আল্লাহর ওপর যতো মিথ্যা আরোপ করতে চায়, করতে থাকুক এবং তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা ও তার পরোয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। এ কথাই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা চাইলে তারা এটা করতো না, কাজেই তাদের ও তাদের মিথ্যাচারের পরোয়া করো না।'

প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আরবের মোশরেকরা তাদের বিভ্রান্তিপূর্ণ ও বিকারগ্রস্ত জাহেলী ধর্মমতকে ও কর্মকান্ডকে নিজেদের তৈরি বলার সাহস করতো না, বরং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর ওপর চাপাতো এবং দাবী করতো যে, আল্লাহ তায়ালাই ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে ওই ধর্ম তাদেরকে দিয়েছেন।

আধুনিক জাহেলী সমাজেও শয়তানরা এরূপ করছে। তাদের অধিকাংশই নাস্তিক কমিউনিষ্টদের মতো ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে না। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা ও প্রকাশ্যে ধর্মমতে প্রত্যাখ্যান করার স্পর্ধা দেখায় না। আরবের জাহেলী সমাজের শয়তানরা যে পন্থায় কাজ করতো, এরাও সেই একই পন্থার আশ্রয় নিয়ে আছে। তারা বলে, আমরা ধর্মকে সম্মান ও ভক্তি করি। তারা দাবী করে যে, তারা যে সব আইন কানুন তৈরী করে, মূলত ধর্মই তার উৎস। এটা কমিউনিষ্টদের চেয়েও জঘন্য ও নোংরা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মানুষের অন্তরে বিরাজমান ধর্মীয় ভাবাবেগকে চাপা দিয়ে রাখা হয়। অবশ্য ইসলামকে চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কেননা ইসলাম নিছক অস্পষ্ট কোনো ভাবাবেগ নয়। এ পদ্ধতিতে ধর্মীয় ভাবাবেগকে চাপা দিয়ে রেখে স্বাভাবিক ধর্মীয় শক্তিকে অনৈসলামী জাহেলী অবকাঠামোর অভ্যন্তরে বিলীন করে দেয়া হয়। এটা সবচেয়ে জঘন্য ও নিন্দনীয় পদ্ধতি।

এরপর ইসলামের আবেগদীপ্ত দরদী ভক্তরা আবার চলে আসেন ইসলামী তত্ত্বের কিছু সংখ্যাক খুঁটিনাটি বিষয়কে সজোরে প্রত্যাখ্যান করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতো। একটি জাহেলী মোশরেকসুলভ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের সমগ্র ক্ষমতা ও অধিকারকেই গ্রাস করতে বসেছে, সেখানে তাদের সমস্ত অস্থিরতা ও অসন্তোষ ওই সব খুঁটিনাটি বিষয় ও বিধিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। আর এহেন নির্বোধসুলভ অসন্তোষ ও অস্থিরতা নিয়ে তারা এই জাহেলী মোশরেকসুলভ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর ইসলামের লেবেল আঁটার কাজটি সম্পূর্ণ করতে চান। সেই সাথে তারা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে এই মর্মে সাক্ষ্যও দেন যে, তা ইসলামী বটে, কেবল অমুক অমুক খুঁটিনাটি বিধি লংঘিত হচ্ছে।

ইসলামের এই সকল দরদী ভক্তরা প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে যথারীতি বহাল রেখে তাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ধর্মীয় লেবেলধারী পেশাদার ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোও অনুরূপ ভূমিকা পালন করে থাকে। অবশ্য ইসলাম কোনো লেবেলকে স্বীকার করে না এবং কোনো পেশাদার যাজক বা পুরোহিতকে তার মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ দেইনি।

'তারা ঘোষণা করতো যে, এই পশু ও ক্ষেত নিষিদ্ধ ....' (আয়াত ১৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন, 'এ হচ্ছে মোশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহর দেয়া বিবরণ। তারা নিজ খেয়ালখুশী মতো এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই যে কোনো জিনিসকে হালাল এবং যে কোনো জিনিসকে হারাম ঘোষণা করতো।'

হিজর শব্দের অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ। যারা আল্লাহর ক্ষমতা ও এখতিয়ারকে জবরদখল করতো এবং দাবী করতো যে, তাদের রচিত আইনই আল্লাহর আইন। তারা কিছু কিছু ফসল ও কিছু কিছু পশুকে নিজেদের দেবদেবীর জন্যে বরাদ্দ করতো আর বলতো, এই পশুগুলো এবং এই ফসলগুলো তাদের জন্যে নিষিদ্ধ। তাদের দাবী মোতাবেক আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে খাওয়াতে চান, তারা ছাড়া ওই সব পশুর গোশত ও ফসল খেতে পারবে না। এ ব্যাপারে কতক লোককে অনুমোদিত বলে স্থির করার অধিকার ছিলো কেবল যাজক, পুরোহিত ও সমাজপতিদের। আরো কিছু পশুকে তারা আরোহণের জন্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো। এগুলো সূরা মায়েদার একটি আয়াতে বাহীরা, সায়েবা ও ওসীলা নামে অভিহিত। অপর কতকগুলো পশুকে নির্দিষ্ট করেছিলো এভাবে যে, ওগুলোতে আরোহণ, যবাই ও দুধ দোহনের সময় আল্লাহর নাম নেয়া যাবে না। কেবল দেবদেবীর নাম নিতে হবে। এ সবই ছিলো আল্লাহর নামে তাদের জঘন্য মনগড়া মিথ্যাচার।

আবু জাফর ইবনে জারীর বলেন যে, 'আল্লাহর নামে তাদের মনগড়া মিথ্যাচার' এ কথার অর্থ হলো, তারা এক একটা জিনিসকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলতো যে, এটিকে আল্লাহই নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই দাবীকে প্রত্যাখ্যান করছেন, এবং রসূল (স.)-কে ও মোমেনদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ওরা মিথ্যা দাবী করছে।

এভাবে আমরা জাহেলিয়াতের বিভিন্ন আচার ও প্রথা দেখতে পাই এবং তা কোনো বিশেষ যুগের জাহেলিয়াতের নয় বরং সকল যুগের জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু জাহেলী সমাজ এমন ধৃষ্টতাও দেখাতে শুরু করেছে যে, গোটা বিশ্বজগতকে তারা জড় সর্বস্ব স্বয়ম্ভূ বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে না, তাদের কেউ কেউ ধর্মকে নিছক একটা আকীদা বিশ্বাস বলে মনে করে এবং সমগ্র জীবন জুড়ে বিস্তৃত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে না।

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, যে জাহেলিয়াত এমন একটা বিশ্ব জোড়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যাতে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর জন্যে নয়, বরং মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট এবং দাবী করে যে, তারা ধর্মকে সম্মান করে ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই তারা তাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও আইন কানুন প্রণয়ন করে, এই জাহেলিয়াতের কর্মপন্থাই সবচেয়ে জঘন্য ও সবচেয়ে কুটিল কর্মপন্থা। যে সব অঞ্চলে এক সময় ইসলামী শাসন চলতো, সেখানে কামাল পাশার নগ্ন ধর্ম বিদ্বেষী তুর্কী পদ্ধতির পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যর্থ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদ উপরোক্ত কুটিল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। কামাল পাশা আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদেরই হাতে গড়া নেতা ছিলো। তাঁর প্রবর্তিত উগ্র ধর্মনিরপেক্ষ পদ্ধতি পৃথিবীতে মুসলমানদের সর্বশেষ বৃহত্তম রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। কিন্তু কামালের এ পদ্ধতি তুরস্ক ছাড়া আর কোনো এলাকায় প্রভাব বিস্তারকারী মডেল হতে পারেনি। ইসলামকে বর্জন করার কারণে এই ধর্মদ্রোহী পদ্ধতি সেই সব জাতির কাছে অপ্রিয় হয়ে গেছে, যাদের অন্তরে এখনো ধর্মীয় ভাবাবেগ সুপ্ত রয়েছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক খৃষ্টবাদ ও ইহুদীবাদ নতুন পদ্ধতি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করছে। এ পদ্ধতিরও লক্ষ্য একই মুসলমানদের ঐক্যের সম্ভাবনা নস্যাত করা এবং খেলাফতের পুনপ্রতিষ্ঠা ঠেকানো। কিন্তু কামাল পাশার প্রবর্তিত পদ্ধতির ভুলত্রুটিগুলোর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সে জন্যে নয়া ষড়যন্ত্রকে ধর্মীয় পোশাক পরানো হয়েছে এবং তাতে কিছুটা ধর্মীয় আবহ যুক্ত করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে অংশত প্রত্যক্ষ প্রচারণার মাধ্যমে এবং অংশত ছোট ছোট অনৈসলামী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের ব্যবস্থার মাধ্যমে, যাতে মনে হয় যে, যে সব কাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা হয়েছে, তা ছাড়া রাষ্ট্রের আর সব কার্যকলাপ ভালো। বস্তুত এই ধর্মীয় পোশাক পরা ধর্মনিরপেক্ষতাই এ যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের পরিচালিত জঘন্যতম ষড়যন্ত্র।

তবে কিছু কিছু খৃষ্টবাদী ও ইহুদীবাদী মহল ইদানীং সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে তুর্কী পদ্ধতির ধর্মনিরপেক্ষতাকে 'ইসলামের পুনরুত্থানের একটা আন্দোলন' আখ্যায়িত করে তা পুনর্বহাল করা যায় এবং আমরা যেন স্বয়ং কামাল পাশার ঘোষিত এ বক্তব্যকে আর সঠিক বলে বিশ্বাস না করি যে, ওটা ইসলামকে পুরোপুরিভাবে প্রত্যাখ্যানকারী তথা ধর্মহীন ধর্মনিরপেক্ষতা।

ওরিয়েন্টালিষ্ট বা প্রাচ্যবাদী গোষ্ঠী (যারা খৃষ্টবাদী ও ইহুদীবাদী সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক প্রচারণার হাতিয়ার) কামাল পাশার প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার

অভিযোগ প্রক্ষালনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেননা ওই পদ্ধতিতে নাস্তিক্যবাদের মুখোশ উন্মোচিত হবার পর তার ভূমিকা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর শেষ বৃহত্তম ইসলামী খেলাফতকে ধ্বংস করার যে দুর্নাম সে কুড়িয়েছে, তা তাকে অতপর নতুন সংশোধিত ভূমিকা পালনে সক্ষম রাখেনি। এই নতুন ভূমিকা হলো, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় ধ্যান ধারণার প্রচারণা। ইসলামের নাম পরিবর্তন করে 'ধর্ম' নামে নামকরণ। ধর্মের নাম ব্যবহার করে চরিত্রবিধ্বংসী ও সহজাত নৈতিকতাবিনাশী কাজ চালিয়ে যাওয়া। জাহেলিয়াতকে ইসলামের পোশাক পরানো, যাতে করে ইসলাম দরদী সরল জনগণকে বিভ্রান্ত করে দলে ভেড়ানো যায় এবং মুখে এই প্রতারণাপূর্ণ মুখোশ এঁটে জনগণকে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা– যা ক্রুসেড যুদ্ধের কলংকের দরুন বিগত তেরশো বছর ধরে ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত চালিয়েও তারা করতে পারেনি।

'আর তারা বলতো যে, এই পশুদের পেটে যা আছে, তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্যে।' (আয়াত ১৪০)

মোশরেকরা এভাবে তাদের ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপ চালিয়ে যেতো। পৌত্তলিকতাপ্রসূত এসব বিকৃত ধ্যান ধারণার মধ্যে একটা ধারণা ছিলো এই যে, হারাম ও হালাল ঘোষণা করার অধিকার শুধু পুরুষদের। সেই সাথে তারা এ দাবীও করতো, পুরুষরা যে বিধি রচনা করে, তা আল্লাহরই রচিত। তাছাড়া এক শ্রেণীর পশুর গর্ভস্থ বাছুরকে তারা পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং মহিলাদের জন্যে হারাম ঘোষণা করতো। কিন্তু বাছুর মৃত ভূমিষ্ঠ হলে তাতে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার থাকতো। এর পেছনে কোনো যুক্তি-প্রমাণের বালাই ছিলো না। কেবল পুরুষদের খেয়ালখুশীই এ ধরনের উদ্ভট ধর্ম আবিষ্কার করেছিলো।

আয়াতের শেষ ভাগে যারা এ ধরনের মিথ্যে আইন প্রণয়ন করে তাকে আল্লাহর আইন বলে চালাবার ধৃষ্টতা দেখায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে এই বলে যে,

'আল্লাহ তায়ালা তাদের বিকৃতির সমুচিত শাস্তি দেবেন। তিনি সর্বজ্ঞ এবং মহাকুশলী।'

অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন– ওইসব অজ্ঞ মোশরেকের মতো অনুমানের ভিত্তিতে নয়।

কোরআনের ভাষ্য ও ভ্রান্তির বেড়াজাল

মানুষ যখন কোরআনের সাথে সাথে এই সব গোমরাহী ও তার ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করে, তখন সে অবাক না হয়ে পারে না। আল্লাহর আইন ও বিধান এবং তার সহজ সরল পথ সেরাতুল মোস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কী কুফল ভোগ করতে হয়, আন্দায অনুমান, কুসংস্কার ও অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে চললে কতো বড় খেসারত দিতে হয়। ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস অনুসরণের ফলে ব্যক্তিকে তার নিজ বিবেকের কাছে ও সমাজের কাছে কিরূপ জবাবদিহি করতে হয়, আল্লাহর আইনকে পরিত্যাগ করে মনগড়া আইন অনুসরণ করলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন কিরূপ জটিল আকার ধারণ করে, পরবর্তী আয়াতে তার একটা ঝলক দেখানো হয়েছে,

'যারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছে .... তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' ....(আয়াত ১৪১)

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় তাদের সর্বনাশ হয়েছে। তারা নিজেদের ও সন্তানদের দিক থেকে, বিবেক ও আত্মার দিক থেকে, আল্লাহ তাদেরকে যে গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন সেই মর্যাদার দিক থেকে, সর্বোপরি হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীপ্রাপ্তির দিক থেকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

এরপর ১৪২ ও ১৪৩ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সেই মৌল সত্যের দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছেন, যা থেকে তারা বিপথগামী হয়েছিলো। সেই বিপথগামিতার বর্ণনা পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে ধারাবাহিকভাবে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে ফসল ও পশু সম্পদের উৎসের দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। এগুলোকে নিয়ে তারা জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদের কুপ্ররোচনা অনুসারে কাজ করে থাকে। অথচ তারা তাঁদের এই সব সম্পদ সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ তায়ালাই এগুলো সৃষ্টি করেছেন। যাতে তারা তাঁর শোকর আদায় করে। অবশ্য তাদের শোকরের মুখাপেক্ষী আল্লাহ তায়ালা নন। তিনি দয়ালু ও অভাবশূন্য। তিনি কেবল তাদের দ্বীন দুনিয়া শুধরে যাক এটা চান। অথচ যারা কিছুই সৃষ্টি করেনি, তাদের কথামতো তারা চলে। তারা তাদের সম্পদের একাংশ আল্লাহর জন্যে এবং একাংশ ওইসব প্রতিমার জন্যে বরাদ্দ করে। শুধু তাই নয়, শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর অংশ নিয়ে ছিনিমিনিও খেলে।

কোরআনের সরল সহজ কথা হলো, সৃষ্টিকর্তা ও জীবিকাদাতা যিনি, পালনকর্তা ও প্রভুও তিনি। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দেয়া সম্পদে হস্তক্ষেপ করাও বৈধ নয়। তাঁর আইন ও বিধান অনুসারেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। আল্লাহর আইন ও বিধান রসূলের কাছে আগত ওহীতে প্রতিফলিত, তারা যেগুলোকে আল্লাহর আইন বলে দাবী করে, তাতে নয়।

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি মাচার ওপর তোলা উদ্যানসমূহ ও মাচার ওপর না তোলা উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন। (আয়াত ১৪২-১৪৩)

আল্লাহ তায়ালাই এই সব উদ্যান প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। মৃত থেকে জীবনকে বের করে আনেন। উদ্যানগুলোর মধ্যে নানা শ্রেণীভেদ আছে। এক শ্রেণীর উদ্যান মানুষ লাগায় এবং তা দেয়ালে বা মাচায় তুলে দেয়। আর এক রকম উদ্যান আছে, যা স্বয়ম্ভূ। এগুলো কারো কোনো চেষ্টা ছাড়া আপনা-আপনিই জন্মে। এগুলো আল্লাহর প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন স্বাদের এবং পরস্পরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অসাদৃশ্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও ফলমূল সৃষ্টি করেন, যয়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেন। অনুরূপ বিভিন্ন রকমের পশুও সৃষ্টি করেন, এদের মধ্যে কতক আছে ভারবাহী, কতক অভারবাহী, কতক ছোট ও কতক বড়। আল্লাহ তায়ালাই পৃথিবীতে জীবনের বিস্তার ঘটিয়েছেন, তাকে রকমারি রূপ দিয়েছেন, সেগুলোকে মানুষের জীবনের উপযোগী বানিয়েছেন। এরপরও কিভাবে মানুষ এই সব আয়াত ও তথ্যের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের নির্দেশ মোতাবেক পশু ও ফসলাদির ব্যাপারে কাজ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে রকমারি জীবিকা ও সম্পদ দান করেন, সে সম্পর্কে কোরআনে বিস্তর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। এর উদ্দেশ্য হলো, মানব জীবনের ওপর আইন ও হুকুম জারী করার সর্বময় ক্ষমতা যে কেবল আল্লাহর, সে ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থাপন। কেননা যিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবিকাদাতা ও পালনকর্তা, তিনিই প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র ন্যায়সংগত ও অবিসংবাদিত অধিকারী।

এখানে কোরআন ফসলাদি ও ফলমূল এবং পশু ও তার মধ্যে নিহিত নেয়ামতের বিরাট বিবরণ দিয়েছেন। এগুলো ইতিপূর্বে যেমন আল্লাহকে একমাত্র এবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করার জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব তথা আইন ও আদেশ নিষেধ জারী করার সর্বময় ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যে। এ থেকে বুঝা যায় যে, উক্ত দুটোই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সমান। আর ফসলের উল্লেখ প্রসংগে আল্লাহ বলেন,

'খাও তাঁর ফসল থেকে......... এবং অপচয় করো না।'

ফসল কাটার দিনই তাঁর প্রাপ্য দিয়ে দেয়ার আদেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে কোনো কোনো রেওয়ায়াতে এ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু সূরার ভূমিকায় আমি বলেছি যে, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা পূর্বাপর মক্কায় অবতীর্ণ এ অংশটির মাঝখান থেকে এ আয়াত বাদ দিলে তার ধারাবাহিকতা অটুট থাকে না। আয়াতটি মদীনায় নাযিল হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হলে এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফসলের একটি অংশ দান করার আদেশ থেকে বুঝা যায় না যে, এটা যাকাতই হতে হবে। এ আয়াত সম্পর্কে একাধিক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এ দ্বারা অনির্ধারিত সদকা বুঝানো হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাতের আদেশ এসেছে হিজরী দ্বিতীয় বছরে।

'অপচয় করো না, আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না।'

এ কথা দ্বারা খাওয়া ও দান করা– উভয় ক্ষেত্রেই অপচয় বুঝানো হয়েছে। কেননা বর্ণিত আছে যে, আরবরা দানের ব্যাপারেও প্রতিযোগিতা করতো আর প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে অপচয় করতো। এ জন্যেই আল্লাহ অপচয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন।

পশুদের প্রসংগ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

'আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও..........'

এ দ্বারা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, তাদের যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তা আল্লাহর প্রদত্ত এবং আল্লাহর সৃজিত। শয়তান তো কিছুই সৃষ্টি করেনি। তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকার ব্যাপারে শয়তানের নির্দেশ অনুসরণের কী যুক্তি থাকতে পারে? তাছাড়া শয়তান তো তাদের প্রকাশ্য শত্রু। তাহলে সেই প্রকাশ্য শত্রুর কথামতো চলার হেতু কী?

এরপর শুরু হচ্ছে জাহেলী কু-সংস্কার ও অলীক ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা। এগুলোর ওপর আলোকপাত করে এক এক করে আলোচনা করে তার ভেতরকার সেই সব হীন ও কলংকজনক দিকগুলো উদঘাটন করা হয়েছে, যার পক্ষে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করা চলে না। এমন কি সেগুলোর কর্তা নিজেই লজ্জিত হবে, যখন দেখবে যে, তার পক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই। ১৪৪ ও ১৪৫ আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন।

যে পশুগুলো নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং যার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, এগুলো আট জোড়া। প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীকে যখন তার সংগীর সাথে উল্লেখ করা হয়, তখন তাকে জোড়া বলা হয়। মেষ থেকে এক জোড়া এবং ছাগল থেকে এক জোড়া। এগুলোর মধ্যে কোনোটি মানুষের ওপর হারাম করা হয়েছে, নাকি পেটে থাকতেই তা হারাম ঘোষিত হয়েছে?

'আমাকে জ্ঞানের ভিত্তিতে জানাও, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

কেননা এ সব বিষয়ে অনুমানের ভিত্তিতে ও বিনা প্রমাণে কোনো ফতোয়া বা আদেশ গ্রহণযোগ্য হয় না।

অনুরূপভাবে, গরুর জোড়া ও উটের জোড়া থেকেই কোনটি কখন নিষেধ করা হলো? নাকি পেটে থাকতেই ওগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে?

আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা কি এ সংক্রান্ত আদেশ দানের সময় উপস্থিত ছিলে?

অর্থাৎ আল্লাহর সুনিশ্চিত নিষেধাজ্ঞা ছাড়া যখন কোনো কিছু হারাম হতে পারে না, তখন এই নিষেধাজ্ঞাটা কখন কোথায় বসে.দেয়া হলো? তোমরা কি সেখানে উপস্থিত থেকে তা শুনেছো?

এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে আইন প্রণয়নের বৈধ উৎস একমাত্র আল্লাহ– আর কেউ নয়। মোশরেকরাও দাবী করতো যে, তাদের ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা আসলে আল্লাহরই নিষেধাজ্ঞা। তাই তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে,

'মানুষকে বিনা প্রমাণে বিপথগামী করার জন্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায়, তার চেয়ে অত্যাচারী আর কে..........'

বস্তুত, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া মনগড়া একটা বিধান বানিয়ে বলা যে, তা আল্লাহর বিধান, এটা নিকৃষ্টতম যুলুম। যারা এমন কাজ করে, তারা মানুষকে গোমরাহ করার জন্যেই তা করে। এ ধরনের লোকদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করেন না। কেননা তারা তাদের ও হেদায়াতের মাঝখানের যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলেছে এবং বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়েছে। এ ধরনের যালেমদেরকে হেদায়াত করা আল্লাহর রীতি নয়।

কতিপয় হারাম জিনিষের বর্ণনা

এতক্ষণ মোশরেকদের বাতিল ও মিথ্যা ধ্যান ধারণা, ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন আকীদা বিশ্বাস ও কার্যকলাপগুলোর পরিচিতি দেয়া হলো। তাদের ক্ষেত, ফসল ও পশু, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের খেয়ালখুশী বা শয়তান, সমাজপতি ও পুরোহিতদের প্ররোচনা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের স্রষ্টা যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ নয়, তাই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কোনো সিদ্ধান্ত বা বিধান দেয়ার অধিকার নেই, বরং বান্দার যাবতীয় সহায়-সম্পদের বিধি বিধান দেয়ার সর্বময় ক্ষমতা শুধু আল্লাহর, এ কথাও দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয়া হলো। এরপর এখন আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আসলে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোন কোন জিনিস হারাম করেছেন, তা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে বললে হবে না; তিনি যা করেছেন তা– সুনিশ্চিত ওহী ও প্রমাণের ভিত্তিতে হারাম করেছেন। আনুষংগিকভাবে একথাও জানানো হচ্ছে যে, আইন রচনার ও হুকুম জারী করার আইনগত ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর। তিনি যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন, তখন তা হারাম এবং কোনো জিনিসকে হালাল ঘোষণা করেন, তখন তা হালাল হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোনো মানুষের বা আর কারো কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই, কিংবা আইন প্রণয়নের ক্ষমতায় তাঁর সাথে কেউ কোনোভাবে শরীকও নেই। আনুষংগিকভাবে, ইহুদীদের ওপর কী কী হারাম করা হয়েছিলো এবং মুসলমানদের ওপর হালাল করা হয়েছিলো, তাও জানানো হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আইন লংঘন ও যুলুম করার কারণে ইহুদীদের ওপর বিশেষ শাস্তি স্বরূপ কিছু হালাল জিনিসকেও হারাম করা হয়েছিলো।

'বলো, আমার কাছে যে ওহী এসেছে তাতে...........' (আয়াত ১৪৬ - ১৪৮)

ইবনে জারীর তাবারী বলেন,

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (স.)-কে বলেন, হে মোহাম্মদ, যে সব মোশরেক তাদের পশু, ফসল ও সন্তানদের বেলায় নিজেদের খেয়ালখুশী ও তাদের শরীক বাতিল মাবুদ তথা দেবদেবী, সমাজপতি, যাজক ও পুরোহিতদের ইচ্ছা অনুসারে একটিকে হালাল ও একটিকে হারাম ঘোষণা করে, তাদেরকে তুমি বলো যে, তোমাদের কাছে কি এই সব জিনিসের হারাম ঘোষণা সম্বলিত দলীল প্রমাণ নিয়ে কোনো দূত আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে? যদি এসে থাকে, তবে আমাকে জানাও। অথবা আল্লাহ তায়ালা কি তোমাদের উপস্থিতিতে এতদসংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছেন যে,

তোমরা সে অনুসারে এগুলোকে হারাম বানিয়ে নিলে? তোমরা এ ধরনের দাবী করলে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। তাই তোমরা এমন দাবী করতে পারবে না। যদি করো তবে তোমাদের মিথ্যা জনসমক্ষে ধরা পড়ে যাবে। আমি তো আমার কাছে ওহীযোগে আসা কেতাবে এমন কোনো খাদ্যকে হারাম ঘোষিত হতে দেখি না, যাকে তোমরা হারাম বলো। তবে আল্লাহর নাম সহকারে যবাই করা হয়নি এমন মৃতদেহ, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোশত, যা অপবিত্র এবং মোশরেকদের যবাই করা জন্তু– এগুলো হারাম বটে।

এখানে মোশরেকদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যে সব জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করে তা হালাল এবং যেগুলোকে হালাল ঘোষণা করে তা হারাম। তাই তারা একদিকে যেমন আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম ঘোষণাকারী, অপরদিকে তেমনি মিথ্যাবাদীও।

এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্তে ও সীমালংঘন না করে বাধ্য হয়ে খায়, তার জন্যে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, দয়াশীল।'

অর্থাৎ উল্লেখিত নিষিদ্ধ জিনিসগুলো কেবল বাধ্য হয়ে জান বাঁচানোর জন্যে খেতে বাধ্য হলে খাওয়া যাবে। তবে যতোটুকু খেলে জান বাঁচানো যায়, তার চেয়ে বেশী খাওয়া যাবে না এবং মজা লাগার জন্যে বেশী করে খাওয়া যাবে না। এই সীমা মেনে হারাম জিনিস খেলে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেবেন এবং শাস্তি দেবেন না। অনন্যোপায় অবস্থায় এই সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে তিনি দয়ালু। নচেত ইচ্ছা করলে তিনি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ রাখলেও রাখতে পারতেন।

অনিবার্য অবস্থায় হারাম জিনিসের কী পরিমাণ খাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ফেকাহ শাস্ত্রে তথা ইসলামী আইনে মতভেদ রয়েছে। একটি মত হলো, যতোটুকু খেলে জীবন রক্ষা করা যাবে এবং না খেলে মারা যাওয়ার আশংকা আছে, কেবল ততোটুকুই খাওয়া যাবে। আর একটি মত হলো, যতোটুকু খেলে তৃপ্তি লাভ হয়, ততোটুকু খাওয়া যাবে। তৃতীয় মত এই যে, কিছুটা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখাও বৈধ, যখন আশংকা দেখা দেয় যে, পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় খাদ্য সরবরাহ বিচ্ছিন্ন থাকবে বা সংগ্রহ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিধি বর্ণনা করার দরকার নেই। এখানে এটুকুই যথেষ্ট।

ইহুদীদের ওপর আল্লাহ প্রত্যেক নখর বিশিষ্ট প্রাণী নিষিদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ যে প্রাণীর পায়ের খুর বিভক্ত নয়, তথা উট, হাঁস, কবুতর ইত্যাদি। অনুরূপভাবে, গরু ও মেষের চর্বিও নিষিদ্ধ করেছেন। অবশ্য পিঠের চর্বি এবং নাড়িভুঁড়িতে ও হাড়ে মিশ্রিত চর্বি হারাম ছিলো না। তাদের ওপর এই কড়াকড়ির কারণ ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর আইন লংঘন করতো।

(আয়াত ১৪৭)

আয়াতে এই নিষেধাজ্ঞার কারণ দর্শানো হয়েছে। ওই কারণটা ইহুদীদের জন্যে নির্দিষ্ট। বলা হয়েছে যে, এই কারণটাই সঠিক, তারা যেটা বলে সেটা ঠিক নয়। তারা বলে যে, তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকুব (আ.) নিজেই নিজের ওপর এগুলোকে নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। তারা তাঁর অনুকরণে সেই জিনিসগুলোই নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। এগুলো ইয়াকুবের জন্যে হালাল ছিলো। কিন্তু তাদের খোদাদ্রোহিতার জন্যে হারাম করা হয়েছে। এভাবে এই পবিত্র জিনিসগুলো থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

'তারা যদি তোমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে ....' (আয়াত ১৪৮)

অর্থাৎ তোমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করলে বলে দিও যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে ও তাঁর মোমেন বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট দয়াশীল। তাঁর দয়া তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির ওপরও বিস্তৃত। সৎ ও

অসৎ সবার জন্যেই তিনি দয়ালু। দয়া ও ধৈর্যের কারণে তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য লোককেও শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করেন না। কেননা তাদের কেউ কেউ সময় ও সুযোগ পেলে তাওবাও করতে পারে। তবে তাঁর আযাব বড়ই কঠিন। অপরাধীরা তা থেকে নিরাপদ আছে শুধু আল্লাহর ধৈর্যের কারণে এবং নির্দিষ্ট সময় সমাগত না হওয়ার কারণে। এ কথাটার মধ্যে আশা ও ভীতি দুটোই ভারসাম্যপূর্ণভাবে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বান্দার মনের স্রষ্টা। তিনি তার মনকে কখনো কখনো ভয় দিয়ে এবং কখনো আশা দিয়ে হেদায়াতের পথে ডাকেন, যাতে সে হেদায়াত গ্রহণ করে।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ

এ পর্যন্ত তাদের সকল অপযুক্তি ও তালবাহানার জাল ছিন্ন করে দেয়ার পর তাদের সর্বশেষ ওজুহাতটি খন্ডন করার জন্যে আল্লাহ বলেন,

'মোশরেকরা বলবে, তারা যে শেরক ও গোমরাহীতে লিপ্ত, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং জবরদস্তিমুলক। আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে তাঁর অজেয় শক্তি দ্বারা তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। (আয়াত ১৪৯)

মানুষ তার কর্মকান্ডে স্বাধীন, না আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সে সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে। আহলে সুন্নাত, মোতাযেলা, মোজাকেরা ও মুরজিয়া প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে এ বিতর্ক ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এই বিতর্কের মধ্যে গ্রীক দর্শন, গ্রীক যুক্তিবিদ্যা এবং খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটায় তা এমন জটিল আকার ধারণ করেছে যে, প্রকৃত ইসলামী যুক্তিবিদ্যার কাছে তা একেবারেই অসংলগ্ন ও অপরিচিত। সরাসরি কোরআনের সহজ সরল পদ্ধতি যদি অনুসৃত হতো, তা হলে এ বিতর্ক এতো জটিল আকার ধারণ করতো না এবং তা এতো ঘোরালো হতো না।

এখানে আমরা মোশরেকদের এই উক্তিটা এবং কোরআন তার যে জবাব দিয়েছে তা যদি লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাই যে, ব্যাপারটা কতো সহজ ও সরল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'মোশরেকরা বলবে, আল্লাহ তায়ালা যদি চাইতেন, তবে আমরাও মোশরেক হতাম না, আমাদের পূর্বপুরুষরাও হতো না এবং আমরা কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতাম না।'

অর্থাৎ তাদের এই অপকর্মগুলোর জন্যে তারা আল্লাহর ইচ্ছাকে দায়ী করেছে। আল্লাহ চাইলে তারা এসব করতো না।

কোরআন কিভাবে এর জবাব দিয়েছে দেখা যাক। কোরআন জবাব দিয়েছে যে, তারা অতীতের লোকদের মতোই নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অতীতে যারাই এরূপ আচরণ করেছে, তারা আল্লাহর আযাবের স্বাদ উপভোগ করেছে। আর প্রত্যেক প্রত্যাখ্যানকারীর জন্যেই আল্লাহর আযাব নির্ধারিত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তাদের পূর্ববর্তীরাও এভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছে এবং শেষ পর্যন্ত আমার শাস্তির স্বাদ পেয়েছে।'

এভাবে এমন একটা ঝাঁকুনি দেয়া হয়েছে যে, যা চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, উদাসীনতা দূর করে দিতে পারে এবং শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে চিন্তা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভংগির বিশুদ্ধীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির প্রতি কিছু আদেশ ও কিছু নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এগুলোকে সুনিশ্চিতভাবে জানা তাদের পক্ষে সহজ-সাধ্য। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাটা অদৃশ্য ব্যাপার। তা জানার

কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই। সুতরাং মোশরেকরা কী করে তা জানলো? আর জানেনি যখন, তখন কি করে তাঁকে নিজেদের কাজের জন্যে দায়ী করলো? এ কথাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'বলো, তোমাদের কাছে কি কোনো সুনিশ্চিত তথ্য আছে, যা আমাদের কাছে পেশ করতে পারো? তোমরা তো কেবল ধারণারই অনুসরণ করে থাক এবং তোমরা কেবল অনুমানই করে থাকো।' (আয়াত ১৪৯)

অর্থাৎ আল্লাহর কিছু আদেশ নিষেধ রয়েছে, যা অকাট্যভাবে জানা যায়। সেই সব অকাট্য ও সুনিশ্চিত তথ্য ত্যাগ করে অনুমানের পথ অনুসরণ করে অজ্ঞতার তেপান্তরে পাড়ি জমানোর কী প্রয়োজন।

এ হচ্ছে এ বিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা। আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্ধারিত ভাগ্য কী, তা অজানা ও অদৃশ্য ব্যাপার। সেই অদৃশ্য জিনিস জানার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর চাপাননি যে, সেই অনুসারে তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলবে ও তার সাথে খাপ-খাইয়ে নেবে। তিনি শুধু তাঁর প্রকাশ্য আদেশ নিষেধ জানার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যাতে তার আলোকে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এ কাজটি করলেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়াত দান এবং ইসলামের জন্যে বক্ষ উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট। এভাবে এ বিতর্ক বাস্তব, সহজ ও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এতে আর কোনো জটিলতা ও অস্পষ্টতা থাকে না।

আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে মানুষকে শুরু থেকেই এমনভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন যে, সে হেদায়াত তথা সৎ পথ ও সততা ছাড়া আর কিছু চিনতোই না, কিংবা সততার দিকে যেতে বাধ্য হতো কিংবা অন্তরে কেবল সততার চেতনাই ঢুকিয়ে দেয়া হতো, ফলে কোনো চাপ প্রয়োগ ছাড়াই সত্য ও ন্যায়ের পথে চালিত হতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এটা চাননি। তিনি চেয়েছেন আদম সন্তানদের মনে হেদায়াত ও গোমরাহী উভয় দিকে ধাবিত হবার যোগ্যতা,ক্ষমতা ও আগ্রহ ঢুকিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করবেন। যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে ধাবিত হবে, তাকে হেদায়াত লাভে সাহায্য করবেন এবং যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে ধাবিত হবে, তাকে সেদিকে যাওয়ার সুযোগ দেবেন। এই ইচ্ছা অনুসারে জগত পরিচালনা করাই তাঁর রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'বলো, চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে হেদায়াত করে দিতেন।' (আয়াত ১৫০)

সুতরাং বিষয়টা একেবারেই স্পষ্ট এবং এতো সহজ যে, মানবীয় বিবেকের কাছে তা বোধগম্য। বরং একে জটিল করা ও এ নিয়ে তর্ক করাটাই ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী চেতনার কাছে অপরিচিত ও বিদঘুটে ব্যাপার। এ নিয়ে যতো তর্ক হয়েছে, তা কোনো তৃপ্তিদায়ক সমাধানে উপনীত হতে পারেনি। কেননা এ বিতর্ক অস্বাভাবিক পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে।

প্রত্যেক তত্ত্ব বা মতবাদের একটা স্বাভাবিক রূপ থাকে। সেই স্বাভাবিক রূপ অনুসারেই তাকে ব্যবহার করার পদ্ধতি নির্ণীত হয়ে থাকে এবং তার প্রকাশভংগিটাও নির্ণীত হয়ে থাকে। একটা বস্তু সংক্রান্ত তত্ত্বের ব্যবহার পদ্ধতি কারখানার পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা স্থির করা যায়। একটা অংক শাস্ত্রীয় তত্ত্বের ব্যবহার পদ্ধতি মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন ফর্মুলা দ্বারা নির্ণয় করা যায়। এ সবের উর্ধের কোনো তত্ত্বের ব্যবহার অবশ্যই অন্য কোনো পদ্ধতি অনুসারেই হতে হবে। এ সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি যে, এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ পরীক্ষণ পদ্ধতি দ্বারাই নির্ণয় করতে হবে এর ব্যবহার পদ্ধতি।

আল্লাহর এই দ্বীন একটা বাস্তব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে এসেছে। সুস্পষ্ট আদেশমালা ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ সেই বাস্তব ব্যবস্থাটার স্বরূপ নির্ণয় করে। সুতরাং আল্লাহর অদৃশ্য ইচ্ছাকে কোনো কিছুর জন্যে দায়ী করা একটা অনধিকার চর্চা, একটা অযৌক্তিক প্রয়াস এবং একটা বৃথা চেষ্টা মাত্র। দৃশ্যমান, বাস্তব ও ইতিবাচক কাজেই এই চেষ্টা প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

পরবর্তী আয়াতে (১৫১ আয়াত) আল্লাহ তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মোশরেকদের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য তলব করেন, যেমনটি প্রভুত্ব ও খোদায়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে সূরার শুরুতে সাক্ষ্য তলব করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন,

'বলো, কে বৃহত্তর সাক্ষী? বলো, আল্লাহই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী ....' (আয়াত ১৯)

আর এখানে বলেছেন,

'বলো, তোমরা তোমাদের সেই সব সাক্ষীকে নিয়ে এসো.............' (আয়াত ১৫১)

বস্তুত এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। আল্লাহর সাথে খোলাখুলিভাবে অন্যান্যের পূজা করা বা অন্যান্যকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে যে সচেতন শেরক করা হয়, আর মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন ও হুকুম জারীর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যে আরেক রকমের শেরক করা হয়, এই উভয় ধরনের শেরকের মধ্যে ইসলাম কোনো পার্থক্য করে না, বরং এই দুটোকে একই পর্যায়ের শেরক গন্য করে। শেষোক্ত প্রকারের শেরকের ক্ষেত্রে যদিও স্থান বিশেষে মানব রচিত আইনকে আল্লাহর আইন বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাতে কিছু এসে-যায় না। যারা শেষোক্ত প্রকারের শেরকে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই মনগড়া হালাল হারাম নির্ধারণ ও আইন রচনা করে, তাদেরকে এ আয়াতে আল্লাহর আয়াতসমূহকে প্রত্যাখ্যানকারী, আখেরাতে অবিশ্বাসী এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বলে গ্রহণকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াতের ভাষাও অবিকল এ রকম।

'সেই আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করেছেন। অথচ এরপরও কাফেররা তাদের প্রতিপালকের সাথে অন্যদেরকে সমকক্ষ বলে গ্রহণ করে।'

যারা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে জবর দখল করে এবং মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তারা যতই দাবী করুক যে, তাদের রচিত আইন আল্লাহরই আইন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সুস্পষ্ট রায় ঘোষণা করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহর রায় ও ফয়সালা ঘোষণার পর আর কারো কোনো রায় বা ফয়সালা থাকতে পারে না।

আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা উচিত কি কারণে আল্লাহ তায়ালা এরূপ রায় দিলেন, আর কেনইবা তিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যানকারী বলে আখ্যায়িত করলেন। কেননা আল্লাহর বিধি বিধান ও তাঁর হুকুমের পেছনে কী মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, তা অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যারা মানুষের ওপর হুকুম জারী ও মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন করে, তারা যতোই দাবী করুক যে, ওটা আল্লাহরই আইন, তাদেরকে আল্লাহ তাঁর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা 'আয়াত' দ্বারা যদি প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলী বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে সে হিসাবেও তারা তাঁর আয়াত প্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহর প্রতিটি প্রাকৃতিক নিদর্শন তথা প্রতিটি সৃষ্টি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা। যিনি

কাউকে সৃষ্টি করেন এবং জীবিকাও দেন, তিনি অবশ্যই তার মালিক। কাজেই তিনিই যে তার একমাত্র হুকুমদাতা ও আইনদাতা, সার্বভৌম ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী সর্বময় প্রভু হবেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাকে একমাত্র সার্বভৌম প্রভু ও আইনদাতা হিসাবে স্বীকার করে না, সে অবশ্যই তার প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। আর যদি 'আয়াত' দ্বারা কোরআনের আয়াতগুলোকে বুঝানো হয়, তাহলে এ হিসাবে সে আরো স্পষ্টভাবে 'আয়াত প্রত্যাখ্যানকারী' সাব্যস্ত হয়। কেননা কোরআনের আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও অকাট্যভাবে ঘোষণা করে যে, মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের জন্যে আইন ও বিধান রচনার একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে আল্লাহকে মেনে নেয়া, তাঁর বিধান ও শরীয়তকে একমাত্র বৈধ আইন হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাঁর কার্যকর আইন ও পরাক্রান্ত হুকুম বলে সমগ্র মানুষের একমাত্র তাঁরই দাস ও অনুগত বান্দা হওয়া অপরিহার্য।

একইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারীদেরকে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী বলে রায় দিয়েছেন। কেননা যে ব্যক্তি আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাযির হওয়া ও জবাবদিহী করার অপরিহার্যতায় বিশ্বাস রাখে, তার পক্ষে আল্লাহর প্রভুত্বকে কখনো জবরদখল করা ও মানব জীবনের ওপর তাঁর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারকে নিজের জন্যে দাবী করা সম্ভব হয় না। এই সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁর বিচার ফয়সালায়, আইন-কানুনে ও আদেশ নিষেধে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

সবার শেষে তাদের সম্পর্কে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন যে, তারা অন্যদেরকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে। অর্থাৎ তিনি তাদের ওপর শেরকের দোষারোপ করেছেন, যা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। কেননা তারা যদি তাওহীদপন্থী বা একত্ববাদী হতো, তাহলে যে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর একক বৈশিষ্ট্য, তাতে তারা নিজেরা অংশীদার হবার ধৃষ্টতা দেখাতো না, বা অন্য কেউ তার দাবীদার হতে চাইলে বা তা প্রয়োগ করলে তা মেনে নিতো না।

আমার মতে, যারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়াই আইন রচনা করে, তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকারকারী, আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসকারী এবং শেরককারী– যা করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়– হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণ এটাই। আল্লাহর এই রায় বা ফয়সালা নিয়ে বিতর্ক করার অধিকার কোনো মুসলমানের থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়ে গেছে। যার কোনো রদবদল হয় না। মহান আল্লাহর এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়া থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়, প্রত্যেক মুসলমানের সেটাই ভেবে দেখা দরকার।

আল্লাহ তায়ালা কি কি কাজ হারাম করেছেন

সাক্ষ্য আহবান ও মোশরেকদের মনগড়া নিষিদ্ধের তালিকা প্রত্যাখ্যানের পর আল্লাহ তায়ালা বাস্তবিক পক্ষে যে সব জিনিসকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তার তালিকা দিচ্ছেন পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে। এই পর্যায়ে হারাম ঘোষিত জিনিসগুলোর পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক কর্তব্যের উল্লেখও দেখতে পাবো, যার বিপরীতে একটা নিষিদ্ধ হারাম কাজ রয়েছে। এই নিষিদ্ধ কাজগুলোর শুরুতেই রয়েছে আল্লাহর সাথে শেরকের বিষয়টি। কেননা এটাই সর্ব প্রথম স্তম্ভ, যার ওপর যাবতীয় আদেশ-নিষেধের ভিত্তি স্থাপিত।

'বলো, তোমরা এসো, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর কী কী হারাম করেছেন............' (আয়াত ১৫২ - ১৫৪)

ইতিপূর্বে আলোচিত পশু, ফসলাদি এবং জাহেলী যুগের কু-সংস্কার, রীতি প্রথা ও ধ্যান ধারণা সংক্রান্ত বিধিসমূহের প্রেক্ষাপটে এই আয়াত কটিতে বর্ণিত উপদেশমালার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে,এগুলোই ইসলামের মূল ভিত্তি। এগুলো তাওহীদভিত্তিক বিবেকের সজীবতার ভিত্তি, পরবর্তী বংশধরসহ পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার ভিত্তি, পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ও পবিত্রতা সহ্ সামাজিক জীবনের ভিত্তি এবং আল্লাহর সাথে করা অংগীকারের সাথে সংযুক্ত মানবাধিকারের নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক জীবনের ভিত্তি। এর শুরুই হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদ দিয়ে।

এই উপদেশমালার শেষ পর্যায়ে দেখতে পাই, আল্লাহ্ জানাচ্ছেন যে, এটাই তাঁর সরল সোজা ও নির্ভুল পথ 'সিরাতুল মুসতাকীম', আর এ ছাড়া অন্য যে পথগুলো রয়েছে তা মানুষকে তার গন্তব্যে পৌছার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়।

এই তিনটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা এমন একটা বিষয়ের পরে এসেছে, যাকে জাহেলিয়াতের একটা পার্শ্বদৃশ্য বলে মনে হয়। অথচ আসলে সেটাই ইসলামের মৌলিক বিষয়। কেননা এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলোর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, তোমরা এসো, আমি তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়ে দেই কী কী জিনিস তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের ওপর হারাম করেছেন।'

অর্থাৎ তোমাদের কথিত আল্লাহর হারামকৃত জিনিস নয়, বরং সত্যি সত্যি যেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন, সেগুলোর কথা তোমাদেরকে জানাবো। এগুলোকে হারাম করেছেন তোমাদের 'রব', যার 'রব' সুলভ অর্থাৎ প্রতিপালকসুলভ ভূমিকা পালনের নিরংকুশ অধিকার রয়েছে। 'রব' বলা হয় তাকে, যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, লালন পালন করেন, আদেশ নিষেধ জারী করেন এবং প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত, নিরংকুশ ও সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সুতরাং হারাম বা হালাল করা 'রবের'ই নিরংকুশ ও একক অধিকার এবং এটা তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীক। কাজেই যিনি হারাম করেন তিনিই 'রব'। আর আল্লাহ তায়ালা একাই এই 'রব'-এর পদে অধিষ্ঠিত।

'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না ....'

এটি হচ্ছে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তি। এর ওপরই দাঁড়িয়ে আছে ফরয কাজসমূহ এবং অন্যান্য কর্তব্য। আর এটি থেকেই উৎসারিত হয় অধিকার ও কর্তব্য। অন্যান্য আদেশ নিষেধ, ফরয ও ওয়াজেব, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি বিধান এবং অন্যান্য আইন কানুনের আগে এই মূলনীতিটিই প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী। সর্বাগ্রে জরুরী কাজ এই যে, মানুষ যেন তাদের জীবনে আল্লাহর 'রব' সুলভ ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়, যেমন জরুরী তাদের আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহকে 'ইলাহ' বা মাবুদ হিসাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। আল্লাহর সাথে কাউকে 'রব' বা প্রতিপালক হিসাবেও শরীক করা যাবে না, ইলাহ হিসাবেও নয়। স্বীকার করতে হবে যে, তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র শাসক ও পরিচালক এবং সকল উপায় উপকরণ ও অদৃষ্টের একমাত্র নিয়ন্তা, বিচারের দিন তিনিই মানুষের হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদানের একমাত্র সর্বময় কর্তা এবং বিচার ফয়সালা ও আইন প্রণয়নেও তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক।

এ বাক্যটি মানুষের বিবেককে শেরকের যাবতীয় মলিনতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা, মানুষের বুদ্ধিকে বাতিল চিন্তা থেকে পবিত্র করা, সমাজকে জাহেলী রীতি-প্রথা থেকে মুক্ত করা এবং মানুষকে ও তার জীবনকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার হাতিয়ার।

শেরক যে ধরনেরই হোক, সবচেয়ে বড় ও জঘন্য হারাম কাজ। কেননা এটা সকল হারাম ও ঘৃণ্য কাজের দিকে মানুষকে টেনে নেয়। তাই এই জঘন্যতম কাজকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা জরুরী, যাতে মানুষ তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ, হুকুমদাতা ও আইনদাতাকে স্বীকার না করে এবং আল্লাহ তায়ারা ছাড়া আর কারো এবাদাত-উপাসনা না করে। আর শেরকের বিপরীত জিনিস তাওহীদ হলো সমস্ত সৎকাজ ও সৎ চিন্তার প্রধান ভিত্তি। এটা না থাকলে কোনো এবাদাত, সৎকাজ ও সৎ চরিত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

এ কারণে উপদেশমালাটি শুরু হয়েছে এই মূলনীতি দিয়ে!

' আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করো না।'

প্রসংগত এই উপদেশমালার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর ওপর একটা দৃষ্টি দেয়া যাক, যাতে আমরা জানতে পারি যে, উপদেশমালার শুরুতে যে শেরকের উল্লেখ রয়েছে, আসলে তা কী। এই সমগ্র পর্বটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো আইন প্রণয়ন ও তা কার্যকরকরণে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ। এই আয়াতের পূর্বে সাক্ষ্য সম্বলিত যে আয়াতটা রয়েছে তা হলো,

'তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের সেই সাক্ষীদেরকে নিয়ে এসো ....' (আয়াত ১৫১)

এ আয়াতটা আমাদের স্মরণে রাখা জরুরী। সেই সাথে ইতিপূর্বে আমি যে আলোচনা করেছি, তাও মনে থাকা দরকার, যাতে কোরআনে শেরক বলতে কী বুঝিয়েছে তা হৃদয়ংগম করতে পারি। এ দ্বারা আকীদাগত শেরক এবং সার্বভৌমত্বের শেরক দুটোই বুঝায়। আয়াতগুলো ও তার উপলক্ষ উপস্থিত রয়েছে। যে কেউ তা অধ্যয়ন করে বুঝে নিতে পারে।

এ বিষয়টা আমাদের চিরদিন স্মরণ রাখা উচিত। কেননা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামকে তার আসল অর্থ ও তাৎপর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শয়তান যে চেষ্টা চালিয়েছে, তা এখন সফল হতে শুরু করেছে। এ জন্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ব্যাপারটা ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে এবং চেতনা ও অনুভূতিতে তা তার বিশ্বাসগত ভিত্তি থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। তাই ইসলামের অতি দরদী ব্যক্তিদেরকেও দেখতে পাই, তারা আনুষ্ঠানিক এবাদাত তথা নামায রোযা ইত্যাদির সংশোধন, নৈতিক অধোপতন রোধ, কিংবা শরীয়তের কোনো খুঁটিনাটি বিধি লংঘন সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা করেন, কিন্তু তারা সার্বভৌমত্বের মূলনীতি এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে তার গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো কথা বলেন না। তারা অনেক ছোট-খাটো গুনাহর বাদ-প্রতিবাদ করেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ অর্থাৎ সামাজিক জীবনের ওপর আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপারে কোনো বাদ প্রতিবাদ করেন না।

আল্লাহ মানুষকে অন্য কোনো উপদেশ দেয়ার আগে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার উপদেশ দিয়েছেন। আর এ উপদেশটাকে এমন জায়গায় স্থাপন করেছেন যে, তার থেকে নিষিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে সবগুলো উপদেশ শুরু করা হয়েছে।

এই মূলনীতিটার ভিত্তিতেই যে কোনো ব্যক্তি সচেতনভাবে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তার সাথে মানব সমাজও সুষ্ঠুভাবে সম্পৃক্ত হয়, মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী মৌলিক মানবীয় মূল্যবোধগুলোও এই সুবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে এই মূল্যবোধগুলো প্রবৃত্তির তাড়না ও সামাজিক রীতি প্রথার লুণ্ঠনের শিকার হয় না।

'পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি।'

এ হচ্ছে পরবর্তী বংশধরদের সাথে পরিবারের যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা। আল্লাহর সাথে যোগসূত্র স্থাপন ও আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার পর এই ব্যবস্থার আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর ভালোভাবেই জানা ছিলো যে, তিনি মানুষের প্রতি তার পিতামাতার চেয়েও দয়ালু। তাই তিনি পিতামাতাকে সন্তান সম্পর্কে এবং সন্তানদেরকে পিতামাতা সম্পর্কে সদাচারের উপদেশ দিয়েছেন। আর এই উপদেশকে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব ও প্রতিপালকত্বের সাথে যুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং বার্ধক্যকালে পিতামাতার প্রতি সন্তানদের এবং সন্তানদের দুর্বলাবস্থায় তাদের প্রতি পিতামাতার অনুদার ও বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের দারিদ্রের আশংকা করা উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা সবার জীবিকা প্রদান করে থাকেন।

'গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাছে যেয়ো না।'

পরিবারের ব্যাপারে উপদেশ দেয়ার পর যে ভিত্তির ওপর পরিবার ও গোটা সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। এই ভিত্তিটি হলো পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সতিত্ব। তাই তিনি গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞাটি এর পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা, এর বিশেষত্ব প্রথম নিষেধাজ্ঞার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কেননা তার ওপর সবগুলো উপদেশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

উল্লেখ্য যে, গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীলতা যেখানে থাকে, সেখানে কোনো পারিবারিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না এবং কোনো সমাজ ব্যবস্থা স্থিতিশীল হতে পারে না। পরিবার ও সমাজের টিকে থাকার জন্যে পবিত্রতা ও সতিত্ব অপরিহার্য। যারা অশ্লীলতার বিস্তার চায়, তারা পরিবারের স্থিতিহীনতা ও সমাজের ধ্বংস কামনা করে।

আরবীতে 'ফাহেশা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, সীমা অতিক্রমকারী কাজ। অনেক সময় 'ফাহেশা' দ্বারা শুধু ব্যাভিচার বুঝায়। সম্ভবত এখানেও সেটাই বুঝানো হয়েছে। কেননা এখানে বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ব্যাভিচারও এসব নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের অন্যতম। নচেত আভিধানিক অর্থে হত্যাকান্ড ও এতিমের সম্পত্তি আত্মসাত করা– উভয়ই ফাহেশা তথা সীমা অতিক্রমকারী কাজ। আর আল্লাহর সাথে শরীক করা তো সবচেয়ে বড় ফাহেশা বা সীমা অতিক্রমকারী কাজ। কাজেই পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষাপটে এখানে ফাহেশা দ্বারা ব্যভিচার বুঝাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। 'ফাওয়াহিশ' এর বহুবচন। বহুবচন দ্বারা ব্যাভিচারের কাছাকাছি যে সব বেহায়ামি ও অশ্লীলতার কাজ রয়েছে, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেমন মেয়েদের রূপ ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো, শরীরের গোপনীয় স্থান তথা সতর খোলা, অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল কথাবার্তা, অশ্লীল ইংগিত, অশ্লীল চালচলন, অশ্লীল হাসিঠাট্টা, উত্তেজনাকর সাজসজ্জা, উত্তেজনা ও নির্লজ্জতার বিস্তার ঘটানো-এসবই অশ্লীলতা এবং সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ অশ্লীলতা অর্থাৎ এসব হচ্ছে ব্যাভিচারের ভূমিকা স্বরূপ। এসব অশ্লীলতার মধ্যে কতক থাকে গোপন এবং কতক থাকে প্রকাশ্য। কতক থাকে মনের মধ্যে লুকানো এবং অংগ প্রত্যংগে প্রকাশিত। এই সবই পরিবার ও সমাজের ভিত্তি ধ্বংস করে, মানুষের বিবেক মনকে কলুষিত করে এবং মানুষের দৃষ্টিভংগিতে হীনতা ও নোংরামি এনে দেয়। এ জন্যেই পিতামাতা ও সন্তান সংক্রান্ত বক্তব্যের পরেই এটি আলোচিত হয়েছে।

যেহেতু এই সব অশ্লীলতা বৃহত্তর অশ্লীলতার প্ররোচনা দেয়, তাই 'কাছে যেয়ো না' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে অপকর্মের উপকরণগুলোকে নিষ্ক্রিয়

করে দেয়া যায় এবং ইচ্ছাশক্তি ও সংযম শক্তিকে দুর্বলকারী আকর্ষণ থেকে রক্ষা করা যায়। এ জন্যে বেগানা স্ত্রীর প্রতি প্রথম অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টির পর পুনদৃষ্টি হারাম করা হয়েছে, মেলামেশাকে কেবল অনিবার্য পর্যায়ে সীমিত অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেজেগুঁজে সুগন্ধি মেখে রাস্তাঘাটে চলা হারাম করা হয়েছে। যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে এমন চালচলন, হাসিঠাট্টা, ইশারা-ইংগিত পবিত্র ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ইসলাম মানুষকে প্রথমে অবাধ সুযোগ দিয়ে পাপসুলভ পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে তারপর সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্যে তাদের স্নায়ুর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে চায় না। ইসলাম অপরাধ সংঘটিত করার পর শাস্তি প্রয়োগের আগেই মানুষকে অপরাধ থেকে রক্ষা করতে চায়। ইসলাম মানুষের বিবেক, স্নায়ুমন্ডল, অংগ প্রত্যংগ ও আবেগ অনুভূতিকে পাপের স্পর্শমুক্ত রাখতে চায়। মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখেন এবং তিনি সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ও প্রাজ্ঞ। যারা মানুষের মধ্যে অশ্লীল কামনা বাসনার বিস্তার ঘটাতে চায় এবং অশ্লীল কথা, ছবি, গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, অবাধ মেলামেশা এবং যাবতীয় প্রচার মাধ্যম দ্বারা উদ্দাম যৌনতা উস্কে দিতে চায়, তারা ইসলামকে ও মুসলমান সমাজকে কোন পথে ঠেলে দিতে চায়, তাও কারো অজানা নয়।

'ন্যায়সংগত বিধি ব্যবস্থা ছাড়া আল্লাহর নিষিদ্ধ করা প্রাণকে হত্যা করো না।' ....

কোরআনে শেরক, ব্যাভিচার ও হত্যাকান্ড– এই তিনটে অপরাধের বিরুদ্ধে প্রায় এক সাথেই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে এমন আয়াতের সংখ্যা প্রচুর। এর কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটেই হত্যাকান্ড বিশেষ। প্রথমটা অর্থাৎ শেরক হচ্ছে মানুষের ফেতরাত তথা সহজাত বিবেক, মন ও মনীষাকে হত্যা করার শামিল। দ্বিতীয়টা অর্থাৎ ব্যভিচার সমাজ ব্যবস্থাকে হত্যা করার শামিল। আর তৃতীয়টা অর্থাৎ হত্যাকান্ড হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষকে বধ করা। যার ফেতরাত তথা জন্মগত বিবেক, মন ও মনীষা তাওহীদমুখী হয় না, তার ফেতরাত মৃত। (৮ম পারার দ্বিতীয় রুকুর প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন) আর যে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, সে সমাজও মৃত সমাজ। সে সমাজের ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য। গ্রীক, রোমান ও পারসিক সভ্যতা ইতিহাসের উদাহরণ হয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতারও ধ্বংসের ঘন্টা বেজে উঠেছে। কেননা যে সব দুষ্কর্ম ও নৈতিক বিশৃংখলা জাতিগুলোর ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে, তা সবই সেখানে নগ্নভাবে দেখা দিয়েছে। যে সমাজে হত্যাকান্ড ও বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তার ধ্বংস অবধারিত। এ জন্যে ইসলাম এই অপরাধগুলো দমনে কঠোরতম শাস্তির বিধান দিয়েছে। কেননা সে তার সমাজকে ধ্বংসের উপকরণগুলো থেকে নিরাপদ রাখতে চায়।

ইতিপূর্বে অভাবের ভয়ে সন্তান হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এখানে হত্যাকান্ড সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেকটা ব্যক্তিগত হত্যাকান্ড সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতিকে নিরাপত্তাহীন করে তোলে। যেমন সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো হত্যাকান্ড ঘটানো বা দেশে বিদ্রোহ ও নৈরাজ্য ছড়ানো ব্যতীতই কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করে। আর যে কারো প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিরই প্রাণ রক্ষা করে।' বস্তুত আগ্রাসন বা আক্রমণ কোনো ব্যক্তি বিশেষের ওপর পতিত হলেও তা সমগ্র মানব জাতির বিরুদ্ধেই পরিচালিত বলে গন্য হয়। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা শুরুতেই মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষের জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। সেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ জীবনের নিরাপত্তা সহকারে চলাফেরা ও উৎপাদন উপার্জনের অবাধ সুযোগ বিদ্যমান। ন্যায়সংগত কারণ ব্যতীত সেখানে কেউ কোনো কষ্টের শিকার হয় না। যে ন্যায়সংগত কারণে কারো প্রাণ বধ করা যায়, তা আল্লাহ তায়ালা

শরীয়তের আইনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। এ নিয়ে কোনো আন্দাজ অনুমান ও চিন্তা গবেষণার অবকাশ রাখেননি। তবে উপযুক্ত কারণে কারো প্রাণ বধ করার আইন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার আগে চালু হবে না। কেননা তার আগে এ আইন বাস্তবায়নের শক্তি মুসলমানদের হাতে আসবে না।

ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলনের স্বাভাবিক পদ্ধতি সম্পর্কে আমি যে পরিচিতি তুলে ধরেছি, তার প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত বক্তব্যটি তাৎপর্যবহ। তাই সমাজ জীবনের এই বিধানগুলোকে কোরআন উপযুক্ত বাস্তব প্রাসংগিকতা ছাড়া উল্লেখ করেনি। (অর্থাৎ মাদানী সূরা ছাড়া অপরাধের শাস্তির বিধান দেয়া হয়নি।– অনুবাদক)

আল্লাহর আরো নিষিদ্ধ কাজ এবং আদিষ্ট কাজের বিবরণ দেয়ার আগে আল্লাহ তাঁর আদেশ ও উপদেশকে যথাযথ গুরুত্ব দানের তাগিদ দেয়ার জন্যে বলছেন,

'আল্লাহ তোমাদেরকে এই উপদেশ এজন্যে দিয়েছেন যেন তোমরা উপলব্ধি করো।'

কোরআনের রীতি অনুসারে প্রত্যেক আদেশ ও নিষেধের পর এরূপ মন্তব্য করে তার সাথে আল্লাহর যোগসূত্র স্থাপন করা হয়। এ ধরনের মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো এ কথা পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করা যে, সমস্ত আদেশ ও নিষেধ জারী করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর, যাতে মানুষের বিবেকে তা বাস্তবায়নের জন্যে যথেষ্ট গুরুত্ববোধ ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।

এতে উপলব্ধি করার জন্যেও ইংগিত রয়েছে। মানুষের বিবেকবুদ্ধির দাবী এই যে, আল্লাহর উক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই মানুষকে আল্লাহর আইনের অনুগত করার জন্যে যথেষ্ট হোক এবং আর কোনো দিক থেকে কোনো চাপ দেয়ার প্রয়োজন না হোক। আর এর আগেই বলা হয়েছে যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা মানুষের একমাত্র স্রষ্টা ও জীবিকাদাতা, সুতরাং মানুষের জীবনের ওপর তাঁর ক্ষমতা ও কতৃত্বই একমাত্র কার্যকর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি।

পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের বক্তব্যের যথেষ্ট মিল থাকা সত্তেও দুটোকে আলাদা আলাদা আয়াতে উল্লেখ করার হেতু এই যে, এখানে আদেশ বাস্তবায়নের জন্যে বান্দাদেরকে আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করার উপযুক্ত কিছু শক্তিশালী মন্তব্য আসা দরকার। সে জন্যেই দুই আয়াতের মাঝখানে এই জোরদার মন্তব্য স্থান পেয়েছে।

'এতিম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পন্থা ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যেয়ো না।'

এতিম হচ্ছে সমাজের এক দুর্বল সদস্য। কেননা সে তার পালক ও রক্ষক পিতাকে হারিয়ে মুসলিম সমাজের ঘাড়ের বোঝায় পরিণত হয়।

সামাজিক নিরাপত্তার ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলিম সমাজকে এই বোঝা বহন করতে হবে। এতীম ছিলো জাহেলী আরব সমাজে একেবারেই নিরাপত্তাহীন। এতীম সম্পর্কে কোরআনে বিপুল সংখ্যায় নানাভাবে ও ক্ষেত্র বিশেষে কঠোর ভাষায় এমন সব নির্দেশ এসেছে, যা ওই সমাজে এতীমদের অত্যন্ত করুণ অবস্থা ব্যক্ত করে। অবশেষে আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে একজন মহৎহৃদয় এতীমকেই নিজের দূত হিসাবে পাঠালেন। তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মিশন সম্পাদনের দায়িত্ব দিলেন এবং সমগ্র মানব জাতির রসূল হিসাবে পাঠালেন। যে দ্বীন তিনি তাঁর মাধ্যমে পাঠালেন, তাতে এতীমের যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনকে অন্যতম প্রধান মূলনীতি হিসাবে স্থান দিলেন। এতীমের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত এই নির্দেশের একটি নমুনা বর্তমান পর্বের ১৫২ আয়াতে আমরা দেখতে পাই। 'তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত এতীমের সম্পত্তির কাছে যেয়ো না।'

সুতরাং এতীমের অভিভাবকের কর্তব্য, এতীমের উপকার হয় এমন পন্থা ছাড়া সে যেন তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করে। তার সম্পত্তির হেফাযত, তাকে উৎপাদনশীল ও লাভজনক বানানো এবং পূর্ণ বিকশিত ও উৎপাদনশীল অবস্থায় তার কাছে তার বয়োপ্রাপ্তির পর অর্পণ করাই তার

যথোচিত কাজ। বয়োপ্রাপ্তি বলতে বুঝায় শারীরিক ও মানসিকভাবে এতোটা শক্ত সমর্থ হওয়া যেন সে নিজের সম্পত্তির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। এভাবে সমাজ এতীমকে নিজের একজন উপকারী সদস্যরূপে গড়ে তুলতে পারে এবং তার কাছে সমর্পণ করতে পারে।

এতীমের বয়োপ্রাপ্তি নিয়ে ফেকাহ শাস্ত্রে তথা ইসলামী বিধানে কিছু মতভেদ রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন যায়েদ ও ইমাম মালেকের মতে বয়োপ্রাপ্তি অর্থ যৌবনে পদার্পণ। ইমাম আবু হানীফার মতে পঁচিশ বছর সুদ্দীর মতে ত্রিশ বছর। মদীনার আলেমদের মতে যৌবনপ্রাপ্তি ও বুদ্ধির পরিপক্বতার একত্র সমাবেশ, চাই বয়স যাই হোক।

'আর তোমরা সঠিকভাবে পণ্য পরিমাপ করো ....'

এখানে যথাসাধ্য ন্যায় ও ইনসাফের সাথে পারস্পরিক বাণিজ্যিক লেনদেন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে এ কাজটিকেও ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করে বলা হয়েছে যে, আমি কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো আদেশ দেই না। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে পারস্পরিক আদান প্রদানও আকীদা বিশ্বাসের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যম বিশেষ। আর যিনি এই আদেশ দিচ্ছেন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং পুরো ব্যাপারটা আল্লাহর এবাদাত ও উলুহিয়্যাতের সাথে যুক্ত এবং আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। আর জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সাথে এর সংযোগ বহাল রয়েছে।

জাহেলী ব্যবস্থাগুলো আকীদা ও এবাদাতের মধ্যে এবং আইন-কানুন ও লেনদেনের মধ্যে আগেও পার্থক্য করতো, আজকালও করে। এ কারণেই কোরআনের সূরা হূদে হযরত শোয়ায়ব (আ.)-এর জাতির নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে,

'হে শোয়ায়ব, তোমার নামায কি এই আদেশ দেয় যে, আমাদের বাপ দাদার আমল থেকে চলে আসা মূর্তিপূজা অথবা আমাদের ধন সম্পদে আমাদের যা ইচ্ছে তা করা চলবে না?'

এ জন্য কোরআন অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসায় ও বেচাকেনার সাথে আকীদা বিশ্বাসের যোগসূত্র স্থাপন করে। এর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা এবং ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন আর তার এবাদাত ও সামাজিক অর্থনৈতিক লেনদেনের বিধান যে ইসলামের বিধান হিসাবে একই পর্যায়ের ও একই মানের তা তুলে ধরা।

'আর যখন তোমরা কথা বলবে, ন্যায়সংগতভাবে বলবে, যদিও নিকটাত্মীয় হয়।'

এখানে আমরা দেখতে পাই ইসলাম মানুষের বিবেককে কতো উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। ইসলাম শুরুতেই আল্লাহর সাথে তার সংযোগ স্থাপন করে। তার মনে আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাস ও আল্লাহর প্রত্যক্ষ তদারকীর ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে। কেননা এখানে সে মানবীয় দুর্বলতার এমন একটা পিচ্ছিল ও স্পর্শকাতর স্তরের সম্মুখীন, যা তাকে আত্মীয়-স্বজনের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে। যেহেতু প্রত্যেক মানুষ দুর্বল, অসম্পূর্ণ ও সীমিত আয়ু সম্পন্ন, আর আত্মীয়-স্বজন দ্বারা তার এই দুর্বলতার কিছুটা প্রতিকার সম্ভব, আত্মীয়তা তার অসম্পূর্ণতার পরিপূরক হতে পারে এবং আত্মীয়তার ব্যাপকতা তার শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে, এ জন্যে আত্মীয়স্বজনের প্রতি তার দুর্বলতা আসা স্বাভাবিক। তাই যখন কোনো আত্মীয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া বা রায় দেয়ার প্রশ্ন আসে, তখন সে পড়ে যায় ঘোরতর দ্বিধাদ্বন্দ্বে। এই পিচ্ছিল ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ইসলাম মানুষের বিবেককে সত্য ভাষণ ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলার শক্তি ও সাহস যোগায়। আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ, তার তদারকীর ওপর আস্থা স্থাপন, আত্মীয়দের সাহায্যের অভাব ঘটলে আল্লাহর সাহায্যকে যথেষ্ট মনে করা এবং আল্লাহ তায়ালা তার ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও কাছে এ কথা মনে রেখে আল্লাহকে ভয় করে আত্মীয়ের অধিকারের ওপর আল্লাহর অধিকারকে ও তাঁর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার ওপর জোর দেয়। এ জন্যই এ আদেশ ও এর

পূর্ববর্তী উপদেশসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে কোরআন আল্লাহর অংগীকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই বলে, 'আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করো।'

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আত্মীয়স্বজনের স্বার্থের প্রতিকূল হলেও ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কথা বলা, পণ্য সঠিকভাবে পরিমাপ করে দেয়া, এতীমের সম্পত্তিতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ না করা, মানুষের জানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা– এ সবই আল্লাহর সাথে করা মানুষের অংগীকারের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত শেষোক্তটি সবচেয়ে বড় অংগীকার। এ সমস্ত অংগীকার মানুষের সহজাত সত্ত্বা, বিবেক, মন ও মনীষার কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তার সৃষ্টির সূচনা মুহূর্তেই। কেননা সে সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই তার স্রষ্টার সাথে তার সংযোগ রয়েছে এবং যে প্রাকৃতিক নিয়ম ভেতর থেকে তাকে ও তার চার পাশের জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে সচেতনভাবে অনুভব করে।

এ নির্দেশগুলো দেয়ার পর পুনরায় মন্তব্য করা হয়েছে,

'তোমাদেরকে আল্লাহ এই উপদেশও দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ করো।'

উল্লেখ্য যে, স্মরণ হলো উদাসীনতার বিপরীত। স্মরণকারী মন উদাসীন মনের বিপরীত। স্মরণকারী মন সব সময় আল্লাহর সাথে করা সকল অংগীকারকে স্মরণ করে এবং এই অংগীকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উপদেশকে প্রতি মুহূর্তে মনে রাখে, কখনো ভোলে না।

এই মৌল নীতিমালা বলতে ইসলামের সমস্ত আকীদা বিশ্বাস ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় আইন কানুনের সার নির্যাস। এর শুরু হয়েছে আল্লাহর একত্ব দিয়ে এবং শেষ হয়েছে আল্লাহর অংগীকার দিয়ে। এর মাঝে আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে। এই সব কিছুর সমন্বয়ে তৈরী হয়েছে আল্লাহর সহজ সঠিক পথ সেরাতুল মোস্তাকীম। এর বাইরে আর কোনো সঠিক পথ নেই। যা আছে, সবই বিপথগামিতা ও ভ্রষ্টতার পথ, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার পথ। পরবর্তী আয়াতে (১৫৩ আয়াত) তাই বলা হয়েছে,

'বস্তুত এ হচ্ছে আমার সরল ও সঠিক পথ। ....'

এখানে এসে শেষ হচ্ছে সূরার সেই সুদীর্ঘ অংশটি, যা শুরু হয়েছে ১১৪ আয়াত ('আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হুকুমদাতা ও বিচারক খুঁজবো........) থেকে।

এখানে এসে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে অংশটি সমাপ্ত হয়েছে। আর এর মাঝে আলোচিত হয়েছে সার্বভৌমত্ব ও আইন-রচনার ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়, যা ফসলাদি ও সন্তানাদি ভাগ করা, যবাই করা জন্তু ও মান্নতের জন্তুর হালাল হারাম নির্ণয় করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, আলোচিত হয়েছে যাবতীয় আকীদা ও ঈমান সংক্রান্ত তত্ত্ব, যাতে বুঝা যায় যে, এই সমস্ত আলোচ্য বিষয় আকীদার সাথেই সংশ্লিষ্ট। এমন কি পূর্ববর্তী সূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথেও এর যোগসূত্র রক্ষা করা হয়েছে যা ব্যাপকতর পর্যায়ে আকীদা বিশ্বাসের সাথেও যুক্ত। সেই সাথে তাতে আল্লাহর এবাদাত, আনুগত্য ও দাসত্বের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বস্তুত এটা একই পথ– আল্লাহর পথ– আল্লাহর দিকে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথ। একমাত্র আল্লাহকেই প্রতিপালক (রব), মাবুদ ও হুকুমদাতা (ইলাহ) এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে মেনে নেয়ার পথ। জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের সর্বাত্মক আনুগত্যের পথ। এই পথের বাইরে যা আছে তা গোমরাহীর পথ।

'তোমাদেরকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাকওয়া অবলম্বন করো।' তাকওয়াই হচ্ছে আকীদা বিশ্বাস ও আমলের সফলতার দিক-নির্দেশক। তাকওয়া বা আল্লাহভীতিই মানুষকে সেরাতুল মোস্তাকীমে পৌঁছে দেয়।

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾ ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْۤ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾ اَنْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّاۤ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ سَنَجْزِي

১৫৩. এটা হচ্ছে আমার (দেখানো) সহজ সরল পথ, অতএব একমাত্র এরই তোমরা অনুসরণ করো, কখনো ভিন্ন পথ অবলম্বন করো না, কেননা (ভিন্ন পথ অবলম্বন করলে) তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এ হচ্ছে তোমাদের (জন্যে আরো কয়েকটি বিধান); আল্লাহ তায়ালা (এর মাধ্যমে) তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন (যেন তোমরা এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করবে। ১৫৪. অতপর আমি মূসাকে (হেদায়াত সম্বলিত) কিতাব দান করেছিলাম, (তা ছিলো) পরিপূর্ণ এবং বিশদ হেদায়াত ও রহমত, যাতে করে (বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের) লোকেরা এ কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে, (একদিন) তাদের (সবাইকে) তাদের মালিকের সমীপে হাযির হতে হবে।

রুকু ২০

১৫৫. এ কল্যাণময় কেতাব আমিই (তোমাদের জন্যে) নাযিল করেছি, অতএব তোমরা এর অনুসরণ করো এবং (কেতাবের শিক্ষানুযায়ী) তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করো, হয়তো তোমাদের ওপর (দয়া ও) অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। ১৫৬. (এখন) তোমরা আর একথা বলতে পারবে না যে, (আল্লাহর) কিতাব তো আমাদের আগের (ইহুদী ও খৃষ্টান এ) দুটো সম্প্রদায়কেই দেয়া হয়েছিলো, (তাই) আমরা সেসব কিতাবের পাঠ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। ১৫৭. অথবা একথা বলারও কোনো অজুহাত পাবে না যে, যদি (ইহুদী খৃষ্টানদের মতো) আমাদেরও কোনো কিতাব দেয়া হতো, তা হলে আমরা তো তাদের চাইতে বেশী সৎপথের অনুসারী হতে পারতাম, (আজ) তোমাদের কাছে (সত্যিই) তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত (সর্বস্ব কিতাব) এসেছে (তোমরা এর অনুসরণ করো), তার চাইতে বড়ো যালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (জেনে রেখো), যারাই এভাবে আমার আয়াত

الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾ قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ

থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, অচিরেই আমি তাদের এ জঘন্য আচরণের জন্যে এক নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দেবো। ১৫৮. তারা কি (সে দিনের) প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে (আসমান থেকে আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশ্‌তা নাযিল হবে, কিংবা স্বয়ং তোমাদের মালিকই তাদের কাছে এসে (তাদের হাতে কিতাব দিয়ে) যাবেন, অথবা মালিকের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শনের কোনো অংশ এসে (তাদের জান্নাত-জাহান্নাম দেখিয়ে দিয়ে) যাবে, (অথচ) যেদিন সত্যিই তোমার মালিকের (পক্ষ থেকে এমন) কোনো নিদর্শন আসবে, সেদিন তো (হবে কেয়ামতের দিন, তখন) যে ব্যক্তি এর আগে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি তার ঈমান দিয়ে ভালো কিছু অর্জন করেনি, তার জন্যে এ ঈমান আনাটা কোনোই কাজে আসবে না; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, (ঠিক আছে,) তোমরাও প্রতীক্ষা করো, আমিও প্রতীক্ষা করছি। ১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোনো দায়িত্বই তোমার ওপর নেই; তাদের (ফয়সালার) ব্যাপারটা আল্লাহ তায়ালার হাতে, (যেদিন তারা তাঁর কাছে ফিরে যাবে) তখন তিনি তাদের বিস্তারিত বলবেন, তারা কে কি করছিলো। ১৬০. তোমাদের মাঝে কেউ যদি একটা সৎকাজ নিয়ে (আল্লাহ তায়ালার সামনে) আসে, তাহলে তার জন্যে দশ গুণ বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে, (অপরদিকে) যদি কেউ একটা গুনাহের কাজ নিয়ে আসে, তাকে (তার) একটাই প্রতিফল দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপরই যুলুম করা হবে না। ১৬১. (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের) বলো, অবশ্যই আমার মালিক আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন– সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন বিধান, এটাই হচ্ছে ইবরাহীমের একনিষ্ঠ পথ, সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না। ১৬২. তুমি (একান্ত বিনয়ের সাথে) বলো, অবশ্যই আমার নামায, আমার

وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝١٦٣ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝١٦٤ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ۝١٦٥

(আনুষ্ঠানিক) কাজকর্ম, আমার জীবন, আমার মুত্যু– সব কিছুই সৃষ্টিকুলের মালিক আল্লাহ তায়ালার জন্যে। ১৬৩. তাঁর শরীক (সমকক্ষ) কেউ নেই, আর একথা (বলার জন্যেই) আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি সর্বপ্রথম। ১৬৪. তুমি (আরো) বলো, (এরপরও) আমি কি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মালিক সন্ধান করে বেড়াবো? অথচ (আমি জানি) তিনিই সব কিছুর (নিরংকুশ) মালিক; (তাঁর বিধান হচ্ছে) প্রতিটি ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্যে এককভাবে নিজেই দায়ী হবে এবং কেয়ামতের দিন কোনো বোঝা বহনকারী ব্যক্তিই অন্য কোনো লোকের (পাপের) বোঝা বহন করবে না, অতপর (একদিন) তোমাদের সবাইকে তোমাদের (আসল) মালিকের কাছে ফিরে যেতে হবে, সেদিন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সেসব কিছুই জানিয়ে দেবেন, যা নিয়ে (দুনিয়ার জীবনে) তোমরা মতবিরোধ করতে। ১৬৫. তিনিই সেই (মহান) সত্তা, যিনি তোমাদের এ যমীনে তাঁর খলিফা বানিয়েছেন এবং (এ কারণে তিনি) তোমাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞতার) পরীক্ষা নিতে চান; (জেনে রেখো,) তোমার মালিক শাস্তিদানের ব্যাপারে অত্যন্ত (কঠোর ও) তৎপর, (আবার) তিনিই বড়ো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়।

তাফসীর
আয়াত ১৫৪-১৬৫

এই অংশটি সূরার শেষ পর্ব। এই পর্বটিতেও তার মূল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং ইসলামের আকীদা ও সামগ্রিক বিধানের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়টির আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। শেষ পর্বটিতে এই বিষয়ের আলোচনা আরো ব্যাপকভাবে করা হয়েছে।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের মৌলতত্ত্ব বিশেষত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সূরার প্রথম পর্বেও আলোচনা করা হয়েছে আকীদা ও ধর্মীয় মূলনীতি সম্পর্কে। কেননা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ধর্মীয় ও আকীদা বিষয়ক মূলনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান অংশ। উল্লেখ্য যে, সূরার শেষার্ধে প্রথমাংশের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পুনরালোচিত হয়েছে।

কেতাব, রসূল , ওহী ও ঈঙ্গিত নিদর্শন।

এসব নিদর্শন তথা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হলে ও তা প্রত্যাখ্যান করলে ধ্বংস অনিবার্য।

আখেরাত ও আখেরাতের কর্মফল নীতি

রসূল (স.) ও তাঁর মোশরেক জাতির মাঝে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ, রসূল (স.)-কে ইসলামের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দান।

সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক (রব) হিসাবে গ্রহণ এবং অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ মোমেনের জন্যে অবৈধ।

বিশ্ব প্রতিপালক সকল জিনিসের প্রকৃত মালিক, পরিচালক এবং যেভাবে ইচ্ছা করেন কিছু মানুষকে অন্য মানুষের স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাদের মধ্য থেকে যাদের চান, ধ্বংস করে দিতে পারেন।

এই বিষয়গুলোই সূরার শুরুতে আলোচিত হয়েছে। একই সূরার শুরুতে ও শেষে একই বিষয় আলোচিত হওয়ার তাৎপর্য কী দাঁড়ায়, সেটা কোরআনের প্রকাশভংগি বুঝে যারা কোরআন অধ্যয়ন করেন, তাদের কাছে অজানা নয়।

সূরার এই শেষ পর্বটি হযরত মূসার ওপর নাযিলকৃত কেতাব সংক্রান্ত বক্তব্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এ বক্তব্য এর পূর্বে আল্লাহর সরল সঠিক পথ বা সেরাতুল মুসতাকীম সংক্রান্ত বক্তব্যের পরিপূরক, যাতে বলা হয়েছে, 'এ হচ্ছে আমার সরল সঠিক পথ, এর অনুসরণ করো। ....এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর এই সরল সঠিক পথ পূর্ববর্তী নবীদের কেতাব ও শরীয়ত থেকে প্রলম্বিত হয়ে মোহাম্মদ (স.) পর্যন্ত চলে এসেছে। অতীতের ওই সব শরীয়তের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী শরীয়ত হলো হযরত মূসা (আ.)-এর শরীয়ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিধান সম্বলিত একখানা কেতাব দিয়েছিলেন এবং তাকে হেদায়াত ও রহমতের উৎস বানিয়েছিলেন, যাতে তার জাতি আখেরাতে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, অতপর আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছি ....' (আয়াত ১৫৫)

অতপর এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখে নতুন বরকতময় কেতাবেরও উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূসার ওপর নাযিল হওয়া কেতাবের সাথে একাত্ম, যাতে আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন দিয়ে তার অনুসরণ ও তার অবাধ্যতার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, জনগণ এর অনুসরণ করলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর রহমত পাবে। 'এই হচ্ছে একটা বরকতময় কেতাব, যা আমি নাযিল করেছি ....' (আয়াত ১৫৬)

এ কেতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো আরবের লোকেরা যেন এই বাহানা না করতে পারে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো আমরা কোনো কেতাব পাইনি। ওদের মতো আমাদের কাছেও যদি

কোনো কেতাব আসতো, তাহলে আমরা তাদের চেয়ে বেশী হেদায়াত পেতাম। এখন তো কেতাব এসে গেছে এবং তালবাহানা করার সুযোগ আর নেই। এখন যারা এ কেতাবকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা কঠিন শাস্তি পাবে। (আয়াত ১৫৭ –১৫৮)

বস্তুত কোরআন নাযিল হবার পর কোনো তালবাহানা বা ছলছুতোর সুযোগ না থাকলেও আরবরা আগের মতোই পৌত্তলিকতা ও শেরেক অব্যাহত রেখেছিলো এবং নিজেদের মনগড়া বিধি বিধানকে আল্লাহর আইন বলে দাবী করে যাচ্ছিলো। অথচ আল্লাহর একখানা কেতাব বিদ্যমান এবং তাতে তাদের ওসব মনগড়া বিধি নেই। তারা আল্লাহর নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা এখনো দেখতে চায় এবং দেখানো হলে কোরআনকে মেনে নেবে ও অনুসরণ করবে বলে ওয়াদা করে। অথচ তারা যে সব নিদর্শন দাবী করে, সেগুলো পুরোপুরি বা আংশিকভাবে এলে তো শেষ ফয়সালা হয়ে যাবে এবং তখন আর ঈমান এনে লাভ হবে না। (আয়াত ১৫৯)

এই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও অন্য সেই সব ধর্মের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন, যা আকীদা বিশ্বাসে ও আইন কানুনে তাওহীদপন্থী নয়। সেই সাথে তিনি জানান যে, তিনিই সেই সব ধর্মের অনুসারীদের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন এবং কর্মফল দেবেন তাঁর ন্যায়বিচার ও দয়া অনুসারে। (আয়াত ১৬০ –১৬১)

অতপর এই পর্বের এবং এই সূরার শেষ অংশটি এসেছে। এতে আল্লাহর গুণগান এবং ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হয়েছে। সেই আকীদা বিশ্বাস হলো, সর্বাত্মক তাওহীদ, নির্ভেজাল দাসত্ব, আখেরাতের অনিবার্যতা, পরীক্ষা ও কর্মফল প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করার অপরিহার্যতা, আল্লাহর প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক হিসাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর নিজ ইচ্ছানুসারে তাঁর বান্দাদের এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত করা, অনুরূপভাবে উপরোক্ত তাসবীহের মাধ্যমে আল্লাহর প্রভুত্ব ও খোদায়ীর চমকপ্রদ স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া, যা রসূলের (স.) স্বচ্ছতম ও পবিত্রতম অন্তরেই প্রতিফলিত হয়। আর এ সব কেবল কোরআনের বর্ণনাভংগিতেই যথাযথভাবে ফুটে ওঠে। (আয়াত ১৬২-১৬৫)

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার পৃথক পৃথকভাবে এক একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'অতপর আমি মূসাকে কেতাব দিয়েছি...' (আয়াত ১৫৫)

এখানে 'অতপর' শব্দটির অর্থ পূর্ববর্তী ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ আয়াতে যে সব বক্তব্য এসেছে তার পরে। কেননা আলোচনা ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। 'সৎকর্মশীলের প্রতি নেয়ামত পূর্ণ করার জন্যে' এ কথাটার ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে জারীর বলেন, অর্থাৎ মূসাকে তাওরাত দিয়েছি, যাতে তার প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ হয়, তাকে আমার সম্মান প্রদানের কাজ সম্পূর্ণ হয়, কেননা সে সৎকর্মশীল ও আল্লাহর অনুগত ছিলো। শরীয়ত মোতাবেক সকল কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতো।

দ্বীনের বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে তার জাতির কাছে তুলে ধরাও এর উদ্দেশ্য।

'সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে' এ কথার ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা বলেন, অর্থাৎ এতে হালাল হারামের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আর সেই কেতাব নাযিল করা হয়েছিলো হেদায়াত ও রহমত হিসাবে, যাতে তার জাতি হেদায়াত লাভ করে ও আল্লাহর সামনে উপস্থিতি

সম্পর্কে ঈমান আনে, আর তার ফলে আল্লাহ তাদের ওপর দয়া করেন ও আযাব থেকে রেহাই দেন।

এই উদ্দেশ্যে মূসাকেও কেতাব দিয়েছিলোম, আর এই একই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছেও কেতাব দিয়েছি, যাতে তোমরা হেদায়াত ও রহমত লাভ করো। (আয়াত ১৫৫)

বস্তুত এ কেতাব বরকতময়! ইতিপূর্বে ৯২ আয়াতের ব্যাখ্যাতেও আমি এ কথা বিস্তারিতভাবে বলে এসেছি। সেখানে এ কেতাবের উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাপকতর প্রেক্ষিতে ইসলামী আকীদা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসংগে। আর এখানে এর উল্লেখ করা হয়েছে শরীয়তের বিধি সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে। দুই জায়গাতেই ভাষা অনেকটা কাছাকাছি। এখানে এই কেতাবের অনুসরণের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং অনুসরণ করলে আল্লাহর রহমত পাওয়া যেতে পারে বলে আশ্বাস দেয়া হয়েছে। এখানে আলোচনা সামগ্রিকভাবে শরীয়তের বিধিকে কেন্দ্র করে এবং সূরার প্রথম দিকে আকীদা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

এরপর ১৫৬ ও ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সমস্ত ওযর আপত্তি ও ছলছুতো বাতিল হয়ে গেছে। তোমাদের কাছে এই বরকতময় কেতাব নাযিল হওয়ার পর সে সব ওযর আপত্তির আর অবকাশ নেই। এ কেতাব অত্যন্ত বিস্তারিত বিধায় তোমাদেরকে আর কোনো কেতাবের ওপর নির্ভর করতে হবে না কিংবা এমন কোনো শূন্যতা বা অভাব এতে নেই যে, তোমাদের নিজেদের আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা পূরণ করতে হবে। (আয়াত ১৫৬ - ১৫৭)

আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো যে, প্রত্যেক রসূলকে তার জাতির কাছে পাঠাবেন। অবশেষে যখন শেষ নবীর পালা এলো, তখন তিনি মোহাম্মদ (স.)-কে শেষ নবী করে পাঠালেন। তাই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র মানব জাতির কাছে প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রসূল।

আরবরা বলতে পারতো যে, মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.) নিজ নিজ জাতির নবী ছিলেন, আমরা তাদের কেতাব পড়ে দেখার সুযোগ পাইনি, সে সম্পর্কে কিছু জানতেও পারিনি। আমাদের কাছে যদি আমাদের ভাষায় একখানা কেতাব আসতো, তাহলে আমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেয়েও বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত জাতি হয়ে যেতাম। এখন তো তাদের কাছে কেতাব এসেছে, তাদের মধ্য থেকে একজন রসূলও এসেছেন, তিনি সমগ্র মানব জাতির রসূল। তিনি যে কেতাব নিয়ে এসেছেন, সে কেতাবের সত্যতার প্রমাণ ওই কেতাব নিজেই। আর তাতে আরো বহু সন্দেহাতীত অকাট্য তথ্য রয়েছে। সেই কেতাব তাদের গোমরাহীর বিরুদ্ধে হেদায়াত এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্যে রহমত স্বরূপ।

এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ও প্রত্যাখ্যান করে, অথচ এই আয়াতগুলো তাকে হেদায়াত, সততা ও কল্যাণের দিকে আহবান জানাচ্ছে, সে ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিজেকে ও অন্যদেরকে এই মহা কল্যাণ থেকে ফিরিয়ে রেখে এবং পৃথিবীতে জাহেলী মতাদর্শ ও আইন কানুনের বিস্তার ঘটিয়ে যে ব্যক্তি অরাজকতার সৃষ্টি করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এই উজ্জ্বল সত্য থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার স্বভাব-প্রকৃতিতে কোনো জন্মগত খুঁত অবশ্যই থাকার কথা, যা তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন উটের পায়ের পাতায় এক ধরনের অস্বাভাবিক খুঁত থাকার কারণে তা পথের ওপর সোজা হয়ে চলতে পারে না, বরং ঈষৎ নুয়ে চলতে চলতে পথ থেকে দূরে সরে যায়।

এই অবস্থাটাকেই আয়াতে 'ইয়াসদিফুন' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা সত্য ও স্বাভাবিক পথের ওপর টিকে থাকতে পারে না, যেমন রুগ্ন উট সঠিক ও স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। তবে যেহেতু তারা তাদেরই স্বেচ্ছামূলক বিপথগামিতার কারণে এই অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তাই তারা তাদের এই বিকৃত চলনের কারণে আযাবের উপযুক্ত হবে।

'যারা আমার আয়াত থেকে দূরে সরে যায়, তাদেরকে আমি তাদের দূরে সরে যাওয়ার কারণে শাস্তি দেবো।

কোরআনে এমন বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাকে অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করে, যাতে পাঠক আসল অর্থটা অনুভব করে। এ ধরনের শব্দ ব্যবহার কোরআনের বাচনভংগির একটা বৈশিষ্ট্য। এখানে ব্যবহৃত 'ইয়াসদিফু' শব্দটি তদ্রূপ। এটি এই 'সাদাফ' শব্দ থেকে গৃহীত, যা উটের একটা রোগের নাম। এই রোগে আক্রান্ত উট সোজা হয়ে চলতে পারে না, বরং ঈষৎ নুয়ে চলে। অনুরূপভাবে সূরা লোকমানে 'লা তুসায়্যির খাদ্দাকা' (মুখ ঘুরিওনা) উটের একটা রোগের নাম 'সা'র' থেকে গৃহীত। এই রোগে আক্রান্ত উট সহজে ঘাড় নাড়াতে পারে না, তাই বাধ্য হয়ে সে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। অনুরূপ 'হাবিতাত আমালুহুম' (সৎকাজ নষ্ট হয়ে যাওয়া) উটের বিষাক্ত ঘাস খেয়ে পেট ফুলে যাওয়া অর্থ-বোধক 'হুবুত' শব্দ থেকে গৃহীত। এ ধরনের আরো বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এই হুমকির ধারার আর একটি বক্তব্য এসেছে পরবর্তী ১৫৮ আয়াতে। কোরআনের প্রতি ঈমান আনার জন্য তারা যে অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখানোর শর্ত আরোপ করতো তারই জবাবে এ কথা বলা হয়েছে।

সূরার শুরুতেও এ ধরনের হুমকির উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

'তারা বলেছে যে, মোহাম্মদের কাছে ফেরেশতা আসে না কেন? আমি যদি ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে তো চূড়ান্ত ফায়সালাই হয়ে যেত এবং তাদেরকে আর সময় দেয়া হতো না। আর এখানে ১৫৮ আয়াতেও একই ধরনের হুমকি দেয়া হয়েছে। (আয়াতটি দেখুন)

এ একটা চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট হুমকি। কেননা আল্লাহর রীতি এই যে, যখন কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং তার পরও লোকেরা তার ওপর ঈমান আনে না, তখন তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া অবধারিত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তাদেরকে বলছেন যে, তারা যে অলৌকিক ঘটনাবলী দেখতে চায়, তার যদি কিছু অংশও এসে পড়ে, তবে তাদেরকে তারপর ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর আর ঈমান বা সৎকাজে কোনো লাভ হবে না। উল্লেখ্য যে, সৎকাজ সব সময় ঈমানের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং ইসলামের দৃষ্টিতে তা ঈমানের বাস্তব রূপ।

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে 'যেদিন তোমার প্রভুর কিছু কিছু নিদর্শন এসে পড়বে' এই বাক্যটিতে 'নির্দশন' দ্বারা কেয়ামতের আলামত বুঝানো হয়েছে। এই আলামত দেখা যাওয়ার পর ঈমান বা সৎকাজ গৃহীত হয় না। এ পর্যায়ে কয়েকবার নির্দিষ্ট আলামতের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দুনিয়ার জীবনে প্রচলিত রীতি অনুসারে এর যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটিই উত্তম। কেননা সূরার শুরুতে এ ধরনের বক্তব্য রয়েছে।

অতপর রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাঁর আনীত দ্বীনকে পৃথিবীর আর সকল ধর্মমত থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবীদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে খন্ড খন্ড করেছে.............' (আয়াত ১৫৯)

রসূল (স.)-এর আনীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে পৃথিবীর অন্য সকল ধর্মমতের আকাশ পাতাল ব্যবধান, চাই তা পৌত্তলিকতা হোক, অথবা ইহুদী, খৃষ্টান বা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অন্য কোনো মতবাদ হোক।

রসূল (স.)-এর সাথে এ সব বাতিল ধর্মমতের কোনোই সম্পর্ক নেই। তাঁর দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, তাঁর শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত বিধান এবং তাঁর পন্থা ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য বৈশিষ্ট্যধারী। ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও আইন কানুন অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ বা আইন কানুনের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে, এটা সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোনো বাতিল মতবাদ বা আইনকে ইসলামী বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। ইসলাম শুধু ইসলামই এবং ইসলামী আইন শুধু ইসলামী শরীয়ত, অন্য কিছু নয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী অর্থনীতিই শুধু ইসলামী। ইসলাম চিরকাল অবিভাজ্য। একে খন্ডিত করলে তার সাথে রসূল (স.)-এর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

যে আকীদা বা মতাদর্শ ইসলাম বহির্ভূত, মুসলমানদেরকে প্রথম মুহূর্তেই তা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে এবং প্রত্যাখ্যান করতে হবে। অনুরূপভাবে যে আইন ও যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নয়, তাকেও বিনা বাক্যে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এসব ব্যবস্থার কোনো অংশের সাথে ইসলামের কোনো অংশের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য আছে কি নেই, সেটা আদৌ কোনো বিবেচনারই বিষয় নয়।

আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম। যারা ইসলামকে খন্ডিত করে এবং ইসলামের ভিত্তিতে একত্রিত হয় না, তাদের সাথে রসূল (স.)-এর কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর কাছে আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর শরীয়তই ইসলাম। যারা আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান এবং আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো শরীয়ত গ্রহণ করে, রসূল (স.) তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেন না। ব্যাপারটাকে এভাবে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে, প্রথম দৃষ্টিতেই করতে হবে এবং কোনো খুঁটিনাটি বিধির অনুসন্ধান করা যাবে না।

যারা এভাবে ইসলামকে খন্ডিত করে এবং সে জন্য রসূল (স.) তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না, আল্লাহর ফায়সালা অনুসারে তাদের ব্যাপার এর পরে আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত এবং তাদের কর্মকান্ডের হিসাব আল্লাহই নেবেন।

'তাদের ব্যাপার আল্লাহর হাতে এবং তিনিই তাদেরকে জানাবেন তারা কী করতো।'

আর হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ দয়া ও ক্ষমাকে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি অবলম্বন করেন। তাই মোমেন অবস্থায় যে একটি সৎ কাজ করবে, সে দশটি সওয়াব পাবে। আর যে একটা গুনাহের কাজ করবে, তার জন্যে একটা গুনাহই লেখা হবে। আল্লাহ কারো ওপর যুলুম করেন না এবং কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেন না। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সৎকাজ গ্রহণযোগ্য হওয়া ও একটির বিনিময়ে দশটি সওয়াব পাওয়ার শর্ত হলো ঈমানের সাথে সৎকাজ করা। কাফের অবস্থায় কোনো সৎকাজ গৃহীত হয় না। (আয়াত ১৬০)

তাওহীদ বিশ্বাসের রূপরেখা

সূরার শেষে এবং আইন প্রণয়ন ও সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত দীর্ঘ আলোচনার শেষে রয়েছে সর্বাত্মক তাওহীদের শিক্ষা সম্বলিত পাঁচটি আয়াত। প্রতিটি আয়াতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় অন্তরের অনস্থলে বদ্ধমূল করা হয়েছে তাওহীদের মর্মবাণী। এ তাওহীদের আওতাভুক্ত হয়েছে আদর্শের একত্ব, পদ্ধতির একত্ব, লক্ষ্যের একত্ব, কাজের একত্ব, ইলাহ ও রবের একত্ব, এবাদাত ও দাসত্বের একত্ব এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর এবং তার রীতি ও উপাদানসমূহের ওপর দৃষ্টির একত্ব ও ব্যাপকতা। (আয়াত ১৬১-১৬৫)

এই ক'টি আয়াত এবং সূরার প্রথম দিককার কয়েকটা আয়াতের সাথে সমন্বিত হয়ে জাহেলিয়াতের মনগড়া রসম-রেওয়ায, আইন-কানুন, যাকে তারা মিথ্যেমিথ্যি আল্লাহর বিধান বলে দাবী করতো, তার উপসংহার হিসেবে গণ্য। এ উপসংহারের তাৎপর্য আর কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বলো, আমার রব আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন ....' (আয়াত ১৬১)

এই ঘোষণা একাধারে কৃতজ্ঞতা, প্রত্যয় ও আত্ম-বিশ্বাসের সুষমামন্ডিত। কৃতজ্ঞতার কারণ বক্রতাহীন নিখুঁত সরল ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ, প্রত্যয়ের কারণ এবাদাতের যথাযথ উপলব্ধি এবং আত্মবিশ্বাসের কারণ মহান আল্লাহর সাথে অটুট সম্পর্ক। 'নির্ভুল ও নিখুঁত দ্বীন'। হযরত ইবরাহীমের আমল থেকে এটাই আল্লাহর প্রাচীনতম দ্বীন, যিনি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর পিতা। 'একমুখী ইবরাহীমের আদর্শ। তিনি মোশরেক ছিলেন না।'

'বলো, আমার নামায, আমার এতেকাফ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্যে ....'(আয়াত ১৬২)

এ আয়াতে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক একমুখিতার উল্লেখ করা হয়েছে। হৃদয়ের প্রতিটি ভাবান্তর, জীবনের প্রতিটি কাজ, নামায ও এতেকাফ, জীবন ও মৃত্যু, আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও বাস্তব জীবন এবং মৃত্যু ও তার পরবর্তী সকল কর্মকান্ড সহকারে আল্লাহর প্রতি একমুখী হওয়ার অঙ্গীকার জানানো হয়েছে।

এ আয়াতটিকে সর্বাত্মক ও পূর্ণাংগ তাওহীদের প্রতীকী তাসবীহ বলা যেতে পারে। এটি আল্লাহর পূর্ণাংগ এবাদাত ও দাসত্ব এবং পূর্ণ তাওহীদের অংগীকারনামা বিশেষ। এতে নামায ও এতেকাফ এবং জীবন ও মৃত্যুকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সব কটিকে বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যিনি সারা বিশ্বের শাসক, পরিচালক, পালনকর্তা, রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও সর্বময় কর্তা। তাঁর কাছে এমনভাবে আত্মসমর্পণের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যেন আপন সত্ত্বার ও আয়ুষ্কালের কণামাত্রও আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুক্ত না থাকে এবং এর পথে কোনো বাধা-অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

'বলো, আল্লাহ ছাড়া কি আর কাউকে 'রব' অনুসন্ধান করবো? ....' (আয়াত ১৬৪)

এ আয়াতে আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তার অভ্যন্তরে যতো জড়পদার্থ বা প্রাণী আছে, মানুষের জানা অজানা যতো সৃষ্টি আছে, গোপন ও প্রকাশ্য যতো জিনিস ও যতো ঘটনা আছে, আল্লাহকে সেই সব কিছুর প্রভু ও প্রতিপালক ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের সকলকে আকীদা

বিশ্বাস, এবাদাত ও আইন বিধান– সব কিছুর দিক দিয়েই সর্বতোভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন করা হয়েছে। আয়াতের শুরুতে নেতিবাচক প্রশ্ন তুলে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

'বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতিপালক হিসাবে অনুসন্ধান করবো, অথচ তিনি সব কিছুর প্রভু!'

কথাটার মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এ রকম,

আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব হিসাবে অনুসন্ধান করবো, অথচ তিনিই আমার ওপর হুকুম জারী ও শাসন করেন, আমার সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, আমার ওপর সর্বাত্মক আধিপত্য ও প্রতাপ বজায় রাখেন। আমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও নির্দেশ দান করেন, আমার মনের প্রতিটি ইচ্ছা ও অংগ প্রত্যংগের প্রতিটি কর্মের জন্যে তাঁর কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হয়, সৎকাজ বা অসৎকাজ যাই করি তার জন্য হিসাব দিতে হয়।

আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে কি খোদা হিসাবে গ্রহণ করবো, অথচ এই মহাবিশ্ব তাঁর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে এবং আমি ও তোমরা তাঁর প্রভুত্বের অধীন?

আল্লাহকে ছাড়া কি আর কাউকে খোদা হিসাবে গ্রহণ করবো, অথচ প্রতিটি ব্যক্তি নিজের গুনাহের জন্যে দায়ী এবং অন্য কেউ তার দায়িত্ব বহন করে না!

আল্লাহকে ছাড়া কি আর কাউকে খোদা হিসেবে মেনে নেবো, অথচ তাঁর কাছে আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে এবং যে সব বিষয়ে মানব সমাজ পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে তার হিসাব নেবেন?

আল্লাহকে ছাড়া কি আর কাউকে রব হিসাবে মেনে নেবো, অথচ তিনিই পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন ও পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, জ্ঞান বুদ্ধিতে, শারীরিক আকৃতি ও শক্তিতে এবং সম্পদে একজনকে আর একজনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যাতে কে কৃতজ্ঞ এবং কে অকৃতজ্ঞ হয়, পরীক্ষা করতে পারেন?

আল্লাহ ছাড়া কি আর কাউকে প্রতিপালক মানবো, অথচ তিনি দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং তাওবাকারীর জন্যে ক্ষমাশীল।

আল্লাহ ছাড়া কি আর কাউকে প্রভু মানবো, তাঁর আইন, হুকুম ও বিচার ফয়সালার কাছে নতি স্বীকার করবো, অথচ আল্লাহকেই একমাত্র প্রভু ও মনিব বলে প্রমাণকারী এতো সব অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন বিদ্যমান।

বস্তুত এ আয়াতটি ঈমান ও আকীদার সেই আসল স্বরূপ তুলে ধরে, যা রসূল (স.)-এর অন্তরে বিদ্যমান ছিলো। আর এটিকে কোরআনের এই অপূর্ব বাচনভংগি ছাড়া আর কোনো জিনিস এরূপ নিখুঁতভাবে ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে না। এ আয়াতটি আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা নিরংকুশভাবে আল্লাহর হাতে তুলে দেয়, যেমন তুলে দেয় সূরার প্রথম দিকের আয়াত, 'বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করবো, অথচ তিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং তিনি সবাইকে খাওয়ান, নিজে আহার করেন না ...?' (আয়াত ১৪)

আয়াতের শেষভাগে যে ধরনের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার তাৎপর্য নিয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছি, পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, এ সব বক্তব্য কখনো মোমেনের আকীদা ও বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করে এবং কখনো ইসলামের কোনো আইনগত বিধির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে।

সূরার শেষ পর্যায়ে এসে একটি বার যদি গোটা সূরার আলোচিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেই, তবে এক বিস্ময়কর জিনিস দেখতে পাই। সূরার আকৃতি অনুসারে এই আলোচিত বিষয় এতো ব্যাপক যে, মানুষের রচিত গ্রন্থ হলে এইটুকু সূরায় এর একশো ভাগের এক ভাগ জিনিসও আলোচনা করা সম্ভব হতো না। এক কথায় বলা যায়, এ সূরাটায় ইসলামের সবকটি মৌলিক উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে। আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব, মহাবিশ্বের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তত্ত্ব ও তথ্য এবং তার ওপর আল্লাহর ইচ্ছার অপ্রতিরোধ্য প্রতিফলন, মানব সত্ত্বার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা, হেদায়াত ও গোমরাহী, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের কুপ্ররোচনা, কেয়ামতের দৃশ্য, মানবেতিহাসের বিভিন্ন দৃশ্য এবং জীবন ও জগতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রভৃতি এতে স্থান পেয়েছে। এ সূরার আলোচ্য বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্তসার বের করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য স্বয়ং সূরার ওপর দৃষ্টি দেয়াই বাঞ্ছনীয় হবে।

বস্তুত কোরআন এক বরকতময় কেতাব এবং এতো অল্প পরিসরে এতো বিপুল সংখ্যক বিষয়ের সমাবেশ ঘটানোও এর বরকতময় হওয়ার একটি প্রমাণ বটে। অতএব, বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্যেই সকল প্রশংসা।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আঝ ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড

সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ
সূরা আল হুজুরাত
সূরা ক্বাফ
সূরা আয যারিয়াত
সূরা আত তূর
সূরা আন নাজম
সূরা আল ক্বামার

২০তম খন্ড

সূরা আর রাহমান
সূরা আল ওয়াক্বেয়া
সূরা আল হাদীদ
সূরা আল মোজাদালাহ
সূরা আল হাশর
সূরা আল মোমতাহেনা
সূরা আস সাফ
সূরা আল জুমুয়া
সূরা আল মোনাফেকুন
সূরা আত তাগাবুন
সূরা আত তালাক্ব
সূরা আত তাহ্‌রীম

২১তম খন্ড

সূরা আল মুলক
সূরা আল ক্বালাম
সূরা আল হাক্বাহ
সূরা আল মায়ারেজ
সূরা নূহ
সূরা আল জ্বিন
সূরা আল মোযযাম্মেল
সূরা আল মোদ্দাসসের
সূরা আল ক্বেয়ামাহ
সূরা আদ দাহর
সূরা আল মোরসালাত

২২তম খন্ড

সূরা আন নাবা
সূরা আন নাযেয়াত
সূরা আত তাকওয়ীর
সূরা আল এনফেতার
সূরা আল এনশেক্বাক
সূরা আল বুরুজ
সূরা আত তারেক
সূরা আল আ'লা
সূরা আল গাশিয়া
সূরা আল ফজর
সূরা আল বালাদ
সূরা আশ শামস
সূরা আল লায়ল
সূরা আল এনশেরাহ
সূরা আত তীন
সূরা আল আলাক্ব
সূরা আল ক্বদর
সূরা আল বাইয়্যেনাহ
সূরা আয যেলযাল
সূরা আল আদিয়াত
সূরা আল ক্বারিয়াহ
সূরা আত তাকাসুর
সূরা আল আসর
সূরা আল হুমাযাহ
সূরা আল ফীল
সূরা কোরায়শ
সূরা আল কাওসার
সূরা আল কাফেরূন
সূরা আন নাসর
সূরা লাহাব
সূরা আল এখলাস
সূরা আল ফালাক্ব
সূরা আন নাস